
কিশোর
বিশ্ব ক্লাসিকস
বেতাল পঞ্চবিংশতি
বত্রিশ সিংহাসন
আঙ্কল টমস কেবিন
ট্রেজার আইল্যাণ্ড



বাণী প্রকাশ : এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা ৭০০০০৭

শ্রীপাচু ভট্টাচার্য্য, কংকণাময়ী প্রেস ৯/৭ বি, প্যারী মোহন সুর লেন

কলিকাতা ৭০০০০৬, কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

মূল্য : ৬০.০০

কিশোর বিশ্ব ক্লাসিকস

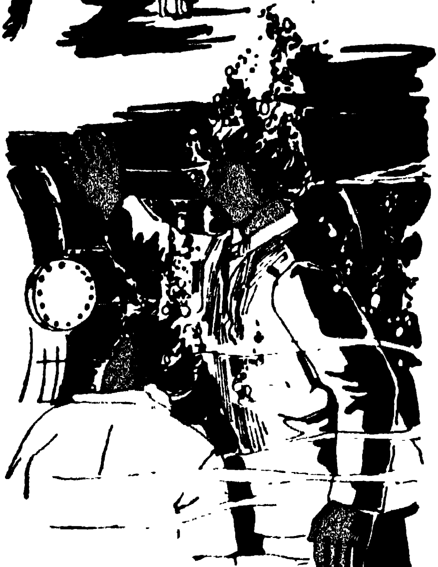
ভাষান্তর ও সংকলন ঃ সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ



বাণী প্রকাশ







বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারের বিভিন্ন স্বাদের পূর্ণগ্রন্থ নিয়ে এই ক্লাসিকসটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এতে রয়েছে ট্রেজার আইল্যাণ্ডের মত শ্বাসরুদ্ধকারী ও বেনহুরের মত হৃদয় আপ্লুত করা উপন্যাস, গ্যালিভারস ট্রাভেলস ও রবিন হুডের মত রোমাঞ্চকর কাহিনী, রয়েছে বেতাল পঞ্চবিংশতির মত জীবনাদর্শ নির্ভর বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনীর সহজ সরল অনুবাদ।

মূলতঃ কিশোর মনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হলেও এই সংকলন গ্রন্থটি অভিভাবক থেকে শুরু করে শিশু কিশোর সকলেই পাঠ করে অভূতপূর্ব রসাস্বাদনের অনুভূতি লাভ করবেন।

এই সংকলনে সন্নিবেশিত কাহিনীগুলি বহু পঠিত বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও পরিবেশনের গুণে ও অনুবাদের চমৎকারিত্বে এটি নিঃসন্দেহে উন্নতমানের। ভাষান্তরিত করতে গিয়ে কাহিনীগুলির ক্লাসিক-স্বাদ এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। কোথাও চিরায়ত সাহিত্যের সুর নষ্ট হয়ে কাহিনী লঘু হয়ে ওঠেনি।

অনুবাদ সংকলনটি একদিকে রুদ্ধশ্বাসে শেষ করতে হয় অন্যদিকে বারবার পাঠে আকৃষ্ট করে পাঠকমনকে। নিঃসন্দেহে সংকলন গ্রন্থটি যে কোন পাঠকের সংগ্রহের তালিকা সমৃদ্ধ করবে।

একাধিক গ্রন্থ সন্নিবেশনের নামে ক্লাসিকস গ্রন্থগুলির নামমাত্র উল্লেখ রেখে অনুবাদ সংকলন প্রকাশের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে—তার দ্বারা পাঠককে প্রকৃত ক্লাসিক-স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আমাদের অনুবাদ গ্রন্থটি এই ধরনের প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে এটি বাজারে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্লাসিকস গ্রন্থের আসনে আদৃত হলে আমরা ধন্য হব।



বেনহুর

প্রথম পর্ব

১

মাউন্ট জেবেলের শেষ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসা একটি নদীখাত ধরে একটি উটের পিঠে চড়ে এক পথিক মরুভূমির উপত্যকা অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চলছিল। উটের পিঠে ছোটখাটো একটা তাঁবু তৈরি করে তার মধ্যে বসে ছিল সে।

পথিককে দেখে মনে হচ্ছিল তার বয়স পঁয়তাল্লিশ। তার সাদা কালো দাড়িটা বুক পর্যন্ত নেমে এসেছিল। তার মাথায় একটা রুমাল বাঁধা ছিল। তার বাদামী রঙের মুখখানার অনেকটা ঢাকা পড়ে ছিল।

দু ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত পুব দিকে এগিয়ে চলছিল উটটা। তারপর দুপুরের দিকে একবার ডেকে উঠল সকরুণ কণ্ঠে। তার ডাক শুনে হাওদা বা তাঁবুর পর্দাটা সরিয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল পথিক। তারপর 'ইথ' 'ইথ' বলে উটটাকে হাঁটু গেড়ে বসার ইঙ্গিত করল।

উটটা বসতেই তার উপর থেকে নেমে পড়ল পথিক। রেশমী ফিতেয় বাঁধা রুমালটা সরিয়ে দিতেই নিগ্রোদের মত কালো মুখটা বেরিয়ে পড়ল। মাথায় শক্ত খাড়া চুল। তার চেহারাটা মিশরের ফারাও বা টলেমিসের মত অনেকটা দেখতে।

উট থেকে নেমে হাত পা ঘষতে ঘষতে উটের চারদিকে ঘুরতে লাগল পথিক। মাঝে মাঝে যতদূর দৃষ্টি যায় চোখ ফেলে দূরে তাকাচ্ছিল সে। সে যেন কোন লোকের বা দলের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। তারা যে আসবেই সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল সে।

উটের পিঠে রাখা একটা বাক্স থেকে কিছুটা জল নিয়ে উটের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল পথিক। তারপর বাক্স থেকে লাল সাদা ডোরাকাটা একটা মোটা কাপড়, একগোছা কাঠ আর একটা বেতের খুঁটি বার করে একটা ছোটখাটো তাঁবু তৈরি করল সে। তাঁবুর ভিতর মেঝের উপর একটা

কার্পেট পেতে দিল। এর পর বেতের ঝুড়ি থেকে কিছু খাবার বার করে. কার্পেটের উপর সাজিয়ে রাখল। তার পর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে আবার চারদিকে তাকাতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল দূরে দিগন্তের কোলে মরুভূমির বালির উপর একটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে। বিন্দুটাকে ক্রমশঃ বড় হতে দেখে আশা জাগল তার মনে। ক্রমে দেখা গেল একটা সাদা উট পিঠে এক হাওদা বা ভ্রাম্যমান শিবির নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তা দেখে সে বলে উঠল 'ঈশ্বর সহায়'। তার চোখে জল এল আনন্দে।

প্রথম পথিকটি ছিল মিশরীয়। নবাগত পথিকটি তার সামনে এসে উটটাকে থামাল। তারপর বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাতদুটো রেখে প্রার্থনা করে উটের পিঠ থেকে নেমে এল। মিশরীয় লোকটি তার দিকে এগিয়ে যেতেই দুজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল।

নবাগত মিশরীয়কে বলল, হে ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক, তুমি শান্তি লাভ করো।

মিশরীয় নবাগতকে বলল, হে ভাই, তুমি সত্যধর্মে বিশ্বাসী। তুমিও শান্তি লাভ করো।

নবাগত লোকটির মুখখানা সরু হলেও চেহারাটা ছিল বলিষ্ঠ। গায়ের রং ফর্সা ও লালচে ধরনের। পোশাক আশাক ছিল মিশরীয়ের মতই। গায়ের শালটা মাথায় পাগড়ির মত জড়ানো ছিল। পায়ে ছিল লাল চামড়ার চটি। তাদের কারোরই হাতে কোন অস্ত্র ছিল না।

দুজনেই উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখল আর একটা উট আসছে তাদের দিকে। অবশেষে সে উটটা এসে থামতেই নবাগত নেমে এসে আগের দুজন পথিককে আলিঙ্গন করল। মিশরীয় লোকটি নবাগত দুজনকে বলল, শিবির প্রস্তুত, খাবার প্রস্তুত। ভিতরে চলে এস।

সবাই ভিতরে যেতে মিশরীয় নবাগত দুজনের পায়ের চটি খুলে তাদের পা ধুইয়ে দিল। তারপর বলল, এবার খাওয়া শুরু করা যাক।

খাওয়ার আগে তিনজনেই বুকের উপর হাত রেখে প্রার্থনা করল। তারা বলতে লাগল, হে ঈশ্বর, তুমি সকলের পিতা, তুমি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করো আর আমাদের আশীর্বাদ করো। তোমার ইচ্ছা আমরা যেন পূরণ করতে পারি।

তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন। তবু সবাই সবার প্রার্থনার ভাষা বুঝতে পারল।

এক স্বর্গীয় আবেগে ভরে উঠেছিল তাদের অন্তর। ঈশ্বরের অলৌকিক উপস্থিতি তারা যেন অনুভব করতে পারছিল।

এই তিনটি পথিকের মিলনের ঘটনাটি ঘটে রোমক বর্ষ খৃষ্টপূর্ব ৭৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে। মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে তিনজন পথিকই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন ও পান করার পর আলোচনা শুরু করল নিজেদের মধ্যে।

ভোজসভার প্রধান হিসাবে মিশরীয় পথিকটিই প্রথমে কথা বলল। সে বলল, অনেক দিন আমাদের একসঙ্গে হাঁটতে হবে। আমার মতে যিনি সকলের শেষে এসেছেন তিনিই প্রথমে আলোচনা শুরু করুন।

সকলের শেষে আসা পথিকটি প্রথমে বলতে লাগল, আমি গ্রীস দেশের এথেন্স নগরী থেকে এসেছি। আমার নাম গ্যাসপার। আমার পিতার নাম ক্লিথেন্স। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানচর্চাই ছিল আমার জীবনের সাধনা। আমাদের দেশে দুই মহান দার্শনিকের একজন শিখিয়েছেন, সকলের মধ্যে আত্মা আছে এবং সে আত্মা অমর। আর একজন শিখিয়েছেন ঈশ্বর এক ও ন্যায়পরায়ণ।

একথা শুনে হিন্দু পথিক সমর্থনের হাসি হাসল।

গ্রীক পথিকটি বলে যেতে লাগল, আমাদের দেশের পশ্চিম অঞ্চলে থেসালিতে অলিম্পাস নামে যে একটি পর্বত আছে দেবরাজ জিউস যেখানে বাস করেন। সেই অলিম্পাস পর্বতের একটি গুহাতে থেকেই সাধনা শুরু করি আমি। আমার আশ্রমের দরজা থেকে সমুদ্র দেখা যেত। একদিন দেখলাম একটি জাহাজ থেকে একটি লোক লাফ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে সাঁতার কেটে কূলে এসে উঠল। আমি সেই লোকটিকে এনে আশ্রয় দিলাম আমার আশ্রমে। পরে জানলাম সে একজন ইহুদী এবং ইতিহাস ও আইন-বিদ্যায় সুপণ্ডিত। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম ঈশ্বর সত্যি সত্যিই আছেন এবং তিনি আবার আসবেন এই পৃথিবীতে। যে সব সাধু সন্তগণ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেছেন ও চলাফেরা করেছেন তাঁরাও সবাই এই কথাই বলেন।

কোন এক রাতে আমি আমার গুহার দরজায় বসে নিজেকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখলাম সমুদ্রের অন্ধকার বুকে একটি তারা জ্বল্ জ্বল্ করছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সে তারা আমার গুহার দরজার উপরে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানেই আমি সহসা অচৈতন্য

হয়ে পড়লাম। চেতনা ফিরে পেয়ে আমার মনে হলো আমি যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে কে যেন আমায় বলল, গ্যাসপার, তোমার ধর্মবিশ্বাসের জয় হয়েছে। তুমি ধন্য। যাঁর আসার কথা আছে, পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে আগত আরো দুজনের সঙ্গে তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। আগামী কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাত্রা শুরু করবে। যে আত্মা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার উপর আস্থা রাখবে।

পরদিন সকালে জেগে উঠে অনুভব করলাম সূর্যের থেকে উজ্জ্বল এক আলো জ্বল জ্বল করছে আমার অন্তরে। সন্ন্যাসীর পোশাক ছেড়ে যে পোশাক সন্ন্যাসজীবনের আগে পরতাম তা পরলাম। আমার শহর থেকে আসার সময় যে ধনসম্পত্তি এনেছিলাম তা সঙ্গে নিয়ে একটি জাহাজে উঠে পড়লাম। জাহাজ থেকে এন্টিওকে নামলাম। সেখানে একটি উট কিনে আবার যাত্রা শুরু করলাম। উটের পিঠে চড়ে এমেন, দামাস্কাস, বোস্রা ও ফিলাডেলফিয়া হয়ে এখানে এলাম। আমার কাহিনী আমি সব বললাম। এবার তোমাদের কথা বল।

এবার মিশরীয় হিন্দু পথিকের দিকে তাকিয়ে তাকে কি ঈশারা করতে সে তার কথা বলতে শুরু করল। সে বলল, জন্মসূত্রে আমি ব্রাহ্মণসন্তান। ব্রাহ্মণের প্রথম আশ্রম হলো ব্রহ্মচর্য আশ্রম বা ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবন শেষ করে গার্হস্থ্য আশ্রম বা সংসার জীবনে প্রবেশ করলাম। কিন্তু তখন ধর্ম ও ব্রহ্ম সম্পর্কে সংশয় দেখা দিল আমার মনে। আমি কিছুতেই শান্তি পেলাম না। ঘোর অবিশ্বাসী ও নাস্তিক হয়ে উঠলাম আমি। মনে শান্তিলাভের জন্য আমি ঘুরে বেড়ালাম বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে। একবার গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে সেইখানে গঙ্গাসাগর বা সাগরদ্বীপে গেলাম? ভাবলাম কপিল মুনির আশ্রমে বসে ভক্ত ও শিষ্যদের সকলের সঙ্গে আনন্দ পাব। কিন্তু যে সব হিন্দু তীর্থযাত্রীরা বছরে দুবার করে সাগরে স্নান করতে আসে তাদের দেখে মনে করুণা জাগল আমার। তাদের অবস্থা দেখে দুঃখ হলো। অনেক সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণ কত দূর দূরান্ত থেকে এসে সমুদ্রের বেলাভূমিতে জ্বলন্ত বালুকারাশির উপর শুয়ে থাকে। তাদের জন্য দুঃখ হলো আমার। কিন্তু কোন কথা বলতে পারলাম না আমি। কারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কথা বললে বা তাদের প্রতি

দয়া দেখালে পরিবার, দেশ ও সমাজ থেকে আমি হব বিতাড়িত। আমিও তাদের মতই একজন হয়ে যাব।

তবু একদিন আমি মন্দিরে উপস্থিত শিষ্যদের সেকথা বললাম। তারা তাড়িয়ে দিল আমায় অবিশ্বাসী বলে। তীর্থযাত্রীদের বলতে তারা পাথর ছুঁড়ে মারত আমায়। পথে সেকথা কাউকে বলতে গেলেই সে পালিয়ে যেত। অনেকে আবার মারতে আসে আমায়। এমন কি সমাজ থেকে পরিত্যক্ত ও বিতাড়িত ব্যক্তিদের বোঝাতে পারলাম না সেকথা। কারণ সমাজ তাদের পরিত্যাগ করলেও সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করত তারা। শাস্ত্রকে মানত। তাদের জন্য তাদের প্রতি মমতাবশতঃ কোন কথা বললেও সেকথা মানত না তারা। ফলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটা জায়গাও রইল না যেখানে নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করতে পারি আমি। মানবসমাজ ঘৃণা হয়ে উঠল আমার কাছে। ঈশ্বর ছাড়া আর সকলের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য কোন নির্জন আশ্রম খুঁজতে লাগলাম আমি। একদিন গঙ্গার তীর ধরে উপর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ক্রমে একদিন সুদূর হিমালয়ে চলে গেলাম। সেখানে ঈশ্বরলাভের জন্য অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর তপস্যা শুরু করে দিলাম।

একদিন রাতে সরোবরের তীরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বললাম, হে ঈশ্বর কবে তুমি তোমার দেওয়া আমার এই দেহকে ফিরিয়ে নেবে? কবে আমি মুক্তি পাব? সহসা সরোবরের জলের বুকে একটি আলো কেঁপে কেঁপে জ্বলতে লাগল। তারপর সেই আলোটা এগিয়ে এসে আমার মাথার উপর স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল। সে আলোর উজ্জ্বলতায় চোখ আমার ধাঁধিয়ে গেল। চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলাম মাটির উপর। সহসা এক মধুর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। কে আমায় বলল, তোমার ভালবাসার জয় হয়েছে। তোমার মুক্তি আসন্ন। পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত থেকে আগত আরো দুজনের সঙ্গে তোমার মুক্তিদাতার আবির্ভাবকে দেখতে পাবে। তারা সেই আবির্ভাবের সাক্ষী হবে। তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য কাল সকালেই যাত্রা শুরু করো। যে আত্মা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাকে অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করবে।"

সেই থেকে সেই আলো আমার কাছে কাছেই আছে। একদিন পথে এক পাহাড়ের এক জায়গায় এক মূল্যবান পাথর পেয়ে হরিদ্বারে সেটাকে

বিক্রয় করে দিলাম। লাহোর, কাবুল ও জেওজা হয়ে ইস্পাহানে এলাম। একটা উট কিনলাম।

তারপর বাগদাদে গেলাম। নির্ভয়ে একাকী পথ চলতে লাগলাম, কারণ সেই আত্মা আমার সঙ্গে ছিল। এখনো আছে। ভাইসব, আমাদের কত গৌরব। আমরা আমাদের ত্রাণকর্তাকে দেখব। তাঁর সঙ্গে কথা বলব। তাঁকে পুজো করব। আমার কথা সব শেষ হলো।

এবার মিশরীয় লোকটি গম্ভীর কণ্ঠে বলতে শুরু করল। সে বলল, আমি মিশরের অধিবাসী। নাম বালথাজার। রাজবংশে পুরোহিত কুলে আমার জন্ম হয় আলেকজান্দ্রিয়াতে। উপযুক্ত শিক্ষাও আমি পেয়েছি। ফারাওদের আমল থেকে দুটো ধর্ম প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। একটি ব্যক্তিগত, আর একটি সাধারণের জন্য। জনসাধারণের মধ্যে বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম প্রচলিত আছে, কিন্তু পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে একেশ্বরবাদী ধর্ম। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে দেখা দেয় সংশয় আর অসন্তোষ। ঈশ্বর যদি পরম ন্যায়পরায়ণ হন, তিনি যদি ন্যায়ের অধিপতি হন তাহলে ভাল ও মন্দের মধ্যে এর পার্থক্য কেন? সত্যকে সাধারণের কাছ থেকে গোপন রেখে পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে গোপন করে রাখা হয় কেন? একদিন আলেক-জান্দ্রিয়া শহরের অন্তর্গত ব্রুকিয়াম নামে এক জনবহুল জায়গায় আমি বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। শ্রোতাদের মধ্যে ছিল পাঠকক্ষের ছাত্র, সেরাপিয়ান-এর পুরোহিত, যাদুঘরের ভ্রমণবিলাসী, আর গ্রাম থেকে আসা অনেক মানুষ। ঘোড়দৌড়ের মাঠের কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি সবরকম শ্রেণীর মানুষই ছিল। দেশী বিদেশী অনেক মানুষ আমার বক্তৃতা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। ঈশ্বর, আত্মা, ধর্ম-অধর্ম, সৎ-অসৎ, স্বর্গ, পবিত্র জীবন, সততার পুরস্কার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম আমি। আমার কথা শুনে শ্রোতারা প্রথমে অবাক হলো। পরে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে আসল ঈশ্বর ও ধর্মের ধারণা ও আদর্শকে নস্যাৎ করে দিল তারা। আমার কথা ব্যর্থ হলো। আমি হার মানতে বাধ্য হলাম তাদের কাছে।

হিন্দু সাধকটি বলল, মানুষই মানুষের শত্রু।

মিশরীয় আবার বলতে শুরু করল, সেই দিন থেকে নীল নদের উজান ভাটিতে অনেক ঘুরলাম। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে একেশ্বরবাদ ও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য স্বর্গলাভরূপ পুরস্কারের কথা প্রচার করতে লাগলাম। অনেক চেষ্টা করলাম আমি। অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারে পথ হাঁটতে

হাঁটিতে প্রার্থনার সুরে বললাম, আজ পৃথিবী মৃতপ্রায়। আর কবে তুমি আসবে? হে ঈশ্বর, মুক্তির দিন কতদূরে তা বুঝতে পারছি না কেন?

নদীর স্বচ্ছ জলে তখন অনেকগুলি তারা ঝলমল করছিল। মনে হলো, একটি তারা স্থানচ্যুত হয়ে জল থেকে উপরে উঠে এল। সে তারার উজ্জ্বলতায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তারাটি ধীরে ধীরে আমার উপরে অনেক কাছে এসে জ্বলতে লাগল। আমি অভিভূত হয়ে বসে পড়ে হাতে মুখ ঢাকলাম। এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর আমাকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, মিজরাইমপুত্র, তুমি ধন্য। তোমার সংকর্মের জয় হয়েছে। তোমার মুক্তি আসন্ন। পৃথিবীর দূর প্রান্ত হতে আগত দু'জন সাধকের সঙ্গে তুমি তোমার ত্রাণকর্তাকে দেখতে পাবে। তাঁর আবির্ভাবের সাক্ষী হবে। তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সকাল হলেই যাত্রা শুরু করো। তারপর তাদের সঙ্গে জেরুজালেমে গিয়ে ইহুদীদের রাজার খোঁজ করবে। বলবে, 'জন্মসূত্রে যিনি ইহুদীদের রাজা, তিনি কোথায়? পূবের আকাশে তাঁর তারাকে আমরা দেখেছি।' তাঁকে পূজো করার জন্যই ত আমরা এসেছি। যে আত্মা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখো।

বালথাজারের কথা শেষ হতেই তারা তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তিনজনেই হাতে হাত মেলাল। সকলের চোখেই জল এল। সকলেরই ভিতর থেকে স্বস্তির এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে তারা সবাই এক অনির্বচনীয় আত্মিক আনন্দ লাভ করবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁবু গুটিয়ে ফেলে উটের পিঠে যাত্রা শুরু করল ওরা। চাঁদ উঠেছে আকাশে। শীতের রাত্রিতে চাঁদের আলোয় ওরা এগিয়ে চলল মরুভূমির উপর দিয়ে। মিশরীয় ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সার দিয়ে তিনটি উট চলছিল। ওদের অশরীরী ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছিল।

সহসা তাদের সামনে একটা উঁচু জায়গায় একটা অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল। ক্রমে সেই শিখাটা একটি উজ্জ্বল বিন্দুতে পরিণত হলো। তাদের বুকের মধ্যে একটা শিহরণ জাগল, হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হলো। তারা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, নক্ষত্র! নক্ষত্র! ঈশ্বর আমাদের সঙ্গী।

২

জেরুজালেম শহরের জোপ্পা ফটকের কাছে সরু পথটার দুপাশে বড় বড় গম্বুজ। এই এলাকাটা বাজারের একটা অংশ। এর পর শুরু হয়েছে আসল

শহর। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। তখনো সেখানে ছিল লোকের ভিড়। সে ভিড়ের মধ্যে অনেক নবাগত বিদেশীও ছিল। দক্ষিণ দিকে প্রাচীরের গায়ে একটি গাধার লাগাম হাতে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে ছিল। পুরুষটির বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। তার কালো দাড়িতে সাদার ছিট লেগেছে। তাদের পোশাক-আশাক ইহুদীদের মত। বোঝা যাচ্ছিল তারা গাঁয়ের মানুষ। গাঁয়ের মানুষ শহরে এসে স্বভাবতই তারা কৌতূহলী হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল।

গাধাটা ঘাস খাচ্ছিল আর স্ত্রীলোকটি তার পিঠে বসে ছিল। তার গায়ে ছিল মোটা সুতোর এক ঢিলে জামা। একটা সাদা ওড়নায় মুখটা ঢাকা ছিল তার।

একটি লোক এমন সময়ে এগিয়ে এসে পুরুষটিকে বলল, তুমি নাজারেথ-এর যোশেফ না?

যোশেফ জবাব দিল, হাঁ, আমাকে ঐ নামে ডাকে সকলে। আরে বন্ধু রাব্বি স্যামুয়েল যে! তুমি শান্তিলাভ করো।

রাব্বি বলল, আমিও তোমাদের শান্তি কামনা করি। গ্যালিলিতে জিলটরা কি করছে?

যোশেফ বলল, আমি এক ছুতোর মিস্ত্রী। নাজারেথ একটা গ্রাম, শহর থেকে দূরে। আমি সব সময় নিজের কাজ নিয়েই থাকি। কোন দলাদলি করার সময় পাই না।

রাব্বি বলল, তুমি একজন ইহুদী, ডেভিডের বংশধর। প্রথামত জিহোবার কড়ি না দিয়ে শুধু কর দিয়েই তৃপ্ত থাকত সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।

যোশেফ কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

রাব্বি বলল, এক দেনারিউন (রোমের রৌপ্য মুদ্রা) এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু কর ধার্য করাটাই আমার মতে অপরাধ। আমার কথা হলো এই যে, কর দেওয়া মানেই অত্যাচারকে মেনে নেওয়া। আচ্ছা একটা কথা বলত, জুডাস কি নিজেকে মেসায়া বা পরিত্রাতা বলে দাবি করছে তুমি ত তার অনুচরদের মধ্যেই থাক।

যোশেফ বলল, তার অনুচরেরা তাকে 'মেসায়া' বলে, আমি শুনেছি একথা।

এমন সময় গাধার পিঠে বসে থাকা স্ত্রীলোকটির মুখ থেকে ওড়নার

অবগুণ্ঠনটা সরে যেতেই তার সুন্দর মুখখানা চোখে পড়ল রাব্বির। আগ্রহের সঙ্গে বলল রাব্বি, এটি কি তোমার মেয়ে? বেশ সুন্দরী ত!

স্ত্রীলোকটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনটা টেনে দিল তার মুখের উপর।

যোশেফ বলল, ও আমার মেয়ে নয়।

রাব্বির কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। যোশেফ বলল, তা হলে ও হচ্ছে বেথলেহেম-এর জোথকিম ও আন্নার মেয়ে। তাদের নাম তুমি নিশ্চয় শুনেছ। তাঁরা অবশ্য এখন দুজনেই মারা গেছেন। তাদের দুটি মেয়ে—মারিয়ান ও মেরি। এর নাম হলো মেরি। আইনমতে সম্পত্তির ভাগ পেতে হলে নিকট আত্মীয়কেই বিয়ে করতে হবে। ও এখন আমারই স্ত্রী।

রাব্বি বলল, আগে তুমি ছিলে ওর—

ওর কাকা।

রাব্বি বলল, ঠিক। তোমরা হয়ত বেথলেহেমেই যাচ্ছ।

এর পর আকাশের দিকে মুখ তুলে সে বলল, ইজরায়েলের ঈশ্বর এখনো বেঁচে আছেন। তিনিই এর প্রতিশোধ নেবেন।

এই কথা বলেই সেখান থেকে চলে গেল রাব্বি। যোশেফও কচি ঘাসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ফটক পার হয়ে বেথেলহেমের পথ ধরল। জলপাই গাছের জঙ্গলে ভরা হিলোম উপত্যকায় নামার পথটা উঁচু-নিচু। যোশেফ গাধার লাগামটা হাতে নিয়ে স্ত্রীলোকটির পাশে পাশে সাবধানে পথ হাঁটতে লাগল।

মেরির বয়স তখন পনের। গায়ের রং সাদা ধবধবে। মাথাভর্তি একরাশ সোনালি চুল। নিখুঁত নাক। ঠোঁটদুটি পুরু। চোখদুটি বেশ আয়ত নীল। মাঝে মাঝে হাতদুটি আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করছিল মেরি।

রেফাইমের প্রান্তর পার হয়ে ক্রমে তারা মার ইলিয়াসে এসে পৌঁছল। উপত্যকাটা এখানে ক্রমে উঁচু হয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। পাহাড়টার ওপারে বেথলেহেম শহরের প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। যোশেফ কিন্তু উপর দিকে না গিয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। এক জায়গায় অনেক মানুষ ও জীবজন্তুর ভিড়। ভিড় দেখে যোশেফ ভাবল এই ঘিঞ্জি শহরের মধ্যে মেরির থাকার মত ঘর পাওয়া যাবে না হয়ত। তাই সে শহরে না গিয়ে তার বাইরে গ্রামাঞ্চলের এক 'খান' বা সরাইখানার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো।

খানের দারোয়ান ফটকের বাইরে বসে ছিল। তার পিছনে একটা বর্শা হেলান দেওয়া ছিল। পাশে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। সরাইখানাটা বেশী বড় নয়, আবার ছোটও নয়।

দারোয়ানের কাছে গিয়ে যোশেফ বলল, জিহোবা আপনাকে শান্তি দিন।

দারোয়ানও যোশেফের শান্তি কামনা করল। যোশেফ বলল, আমি বেথেলহেমের লোক। একটা ঘর চাই থাকার মত।

দারোয়ান বলল, ঘর খালি নেই।

যোশেফ আবার বলল, আমি হচ্ছি নাজারেথের যোশেফ, ডেভিডের বংশধর। সকলে হয়ত শুনে থাকবে।

পরিচয় পেয়ে দারোয়ান তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে সম্মানের সঙ্গে বলল, আপনি ডেভিডের বংশধর? আপনাকে অভিবাদন জানাই। হাজার বছর আগে হয়ত খোলা হয়েছিল এই খান। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোন ভাল মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে দয়া করে এসে দেখুন একটা ঘরও খালি নেই।

যোশেফ বলল উঠোনটা খালি আছে।

কিন্তু নানা মালপত্রে বোঝাই হয়ে আছে।

যোশেফ বলল, আমি আমার জন্য ভাবছি না। ভাবছি শুধু আমার স্ত্রীর জন্য। এই শীতের রাতে বাইরে আকাশের নিচে ত আর থাকতে পারে না। আচ্ছা শহরেও কি কোন ঘর পাওয়া যাবে না?

এবার দারোয়ান একটু ভেবে নিয়ে বলল, আপনার জন্য চেষ্টা করব। পাহাড়ের উপর গিয়ে পড়ে থাকতে হবে না আপনাকে। আপনার স্ত্রীকে আপনি নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি।

যোশেফ বলল, নিরাশ্রয় পথিকের আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

এই বলে মেরিকে নিয়ে এল সে।

মেরিকে দেখে দারোয়ান বলল, আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি একটি গুহাতে সেখানে আপনাদেরই পূর্বপুরুষ ডেভিড একদিন তাঁর ভেড়ার পাল নিয়ে নিরাপদে থাকতেন। পরে তিনি যখন রাজা হন তখনো তিনি এই গুহাতে এসেই বিশ্রাম নিতেন। তাঁর সঙ্গে থাকত অনেক জন্তু-জানোয়ার। রাস্তায় বা উঠোনে থাকার থেকে এই গুহাতে থাকা অনেক ভাল। যে মেঝেতে একদিন ডেভিড ঘুমিয়েছেন সে মেঝে সত্যিই পবিত্র।

কথা বলতে বলতে তারা সেই গুহার সামনে এসে পড়ল। দারোয়ান কাঠের হুড়কো তুলে দরজাটা খুলল। মেরিকে গাধার পিঠ থেকে নামানো হলো।

যোশেফ ও মেরি দেখল ঘরটি একটি গুহার সম্মুখভাগ। লম্বায় চল্লিশ ফুট, চওড়ায় প্রায় পনের ফুট আর ন'দশ ফুট উঁচু। ঘরের মেঝেটা উঁচু-নিচু। তার ভেতরে ছিল কিছু শস্য আর খড়ের বোঝা, হাঁড়িকুঁড়ি, বাসনপত্র আর গৃহস্থালির কিছু জিনিস। দেওয়ালের গায়ে সিমেন্ট ও পাথর দিয়ে বাঁধানো পশুদের খাওয়ার জন্য কিছু জাবনার পাত্র আছে। মেঝের উপর ধুলো জমেছে। ছাদ থেকে মাকড়সার জাল ঝুলছে। বোঝা গেল ঘরটি বর্তমানে অব্যবহৃত।

দারোয়ান যোশেফকে বলল, এখানে যে খড় আছে তা প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারেন।

তারপর মেরিকে সে বলল, এখানে থাকতে পারবেন ত?

এরপর দারোয়ান চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, তাহলে আপনারা শান্তিতে থাকুন।

৩

বেথলেহেমের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় দু মাইল দূরে পাহাড়ের ওপারে যে একটা মাঠ আছে সেখানে পাহাড়ের গায়ে অনেক দিনের পুরনো একটা মাড়া বা ভেড়ার খোঁয়াড় আছে। কিন্তু তার ছাদ ধসে পড়ায় বাড়িটা ভেঙ্গে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে তার চারদিকে বেড়াটা ঠিকমত থাকায় মেষপালকরা ভেড়ার পাল নিয়ে মাঝে মাঝে সেখানে এসে আশ্রয় নেয়। পাথরের দেওয়ালগুলো মানুষ সমান উঁচু। তবু পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গল থেকে কখনো কখনো ক্ষুধিত চিতাবাঘ বা সিংহ সেই পাথরের দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে ভিতরে এসে পড়ে।

যাই হোক, সেদিন একদল মেষপালক তাদের পশুর পাল নিয়ে সেই ভাঙ্গা মাড়াতে এসে আশ্রয় নেয়। সকাল থেকে গরু, মোষ, ভেড়া প্রভৃতি পশুদের চিৎকারে ও মেষপালকদের হাঁকডাকে মুখরিত হয়ে ওঠে জায়গাটা।

সন্ধ্যা হলে মেষপালকেরা মাড়ার ভিতর ঢুকে পড়ল। ফটকের পাশে আগুন জ্বালিয়ে একজনকে পাহারায় রেখে তারা ভিতরে বিশ্রাম করতে গেল।

সে রাতে আকাশ ছিল পরিষ্কার। আকাশভরা তারাগুলো জ্বলজ্বল

করছিল। এক গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল চারদিকে। মনে হচ্ছিল কোন এক শুভ সংবাদ দান করার জন্য আকাশটা অনেকটা নিচে নেমে এসেছে আর সে সংবাদ শোনার জন্য উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছে সারা পৃথিবী।

তখন রাত প্রায় দুপুর। আলখাল্লা পরা পাহারাদার হেঁটে বেড়াচ্ছিল ফটকের সামনে। এবার তার বিশ্রামের সময় এসে গেছে। সহসা অন্ধকারের মধ্যে চাঁদের আলোর মত একটা উজ্জ্বল আর নরম আলো যেন তার চারদিকে জ্বলে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষা করতে লাগল। ক্রমে সেই আলোটা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। সেই আলোয় সামনের মাঠটা ও আরো অনেক কিছু দেখা যেতে লাগল। বরফের মত ঠাণ্ডা কনকনে একটা দমকা হাওয়া এসে তার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দিল। সে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, আকাশের সব তারা নিবে গেছে। তবু একটা আলো আকাশ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে তার দিকে। এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত সেই আলোটা ক্রমশই উজ্জ্বলতর ও আরো বড় হতে লাগল। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'জাগো জাগো।'

কুকুর ও ভেড়া ছাগলগুলো ডাকতে ডাকতে ছোটাছুটি করতে লাগল। ঘুমন্ত লোকগুলো জেগে উঠে অস্ত্রহাতে বেরিয়ে এল। একবাক্যে সবাই জিজ্ঞাসা করল, কি হলো?

পাহারাদার ভয়ে ভয়ে উত্তর করল, ঐ দেখ একটা জ্বলন্ত আলো আকাশ থেকে নেমে আসছে।' আলোটা তখন তাদের মাথার উপরে এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তারা সবাই চোখ ঢেকে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে তারা উপুড় হয়ে পড়ে গেল। এমন সময় সহসা এক আকাশবাণী শোনা গেল, ভয় নেই।

তারা সবাই কান খাড়া করে শুনতে লাগল। সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর আবার বলল ভয় নেই। ওঠ, চেয়ে দেখ, তোমাদের সকলের জন্য পরম আনন্দজনক এক শুভ সংবাদ বহন করে এনেছি।

তারা শুনল, এ কণ্ঠস্বর দেবদূতের। দেবদূত বলল, তোমাদের মধ্যেই ডেভিডের শহর বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করবেন তোমাদেরই পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা প্রভু খৃষ্ট।

কথাগুলো যেন গেঁথে গেল তাদের স্তব্ধ মনের মধ্যে।

কণ্ঠস্বর আবার বলল, তোমরা দেখতে পাবে, এক গুহায় জাবনার পাত্রের মধ্যে কাপড়ের পুঁটলি জড়ানো অবস্থায় এক শিশু শুয়ে আছে।

কথা বলা শেষ হলেও এক উজ্জ্বল আলোর বৃত্তের মধ্যে এক গোলাপী আভা হয়ে স্থির হয়ে রইল সেই দেবদূত। সে দেবদূতের অনেকগুলো সাদা সাদা পাখা ঝলমল করতে লাগল। তখন আরো কতকগুলি উজ্জ্বল মূর্তি তার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে এক ঐক্যতানে বলতে লাগল, মাথার উপর ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধির হোক। পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসুক। শুভবুদ্ধি লাভ করুক পৃথিবীর মানুষ।

বারবার অসংখ্য কণ্ঠের এক মধুর ঐক্যতানে ধ্বনিত হলো সেই আকাশবাণী। এবার উপরের দিকে মুখ করে সেই দেবদূত পাখা মেলল। সে পাখার উপরের দিকটা বরফের মত সাদা আর নিচের দিকটা মুক্তোর মত নানা বর্ণে মণ্ডিত। এর পর পাখা মেলে শূন্যে ভাসতে ভাসতে অনেক উপরে সকলের চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই কণ্ঠস্বর। দেখতে দেখতে আলোটাও নিবে গেল।

পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল মেষপালকেরা। অবশেষে একজন তাদের মধ্যে বলে উঠল, এ নিশ্চয় ঈশ্বরের বার্তাবহ দেবদূত গ্যাব্রিয়েল।

অন্য একজন বলল, প্রভু খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেছেন, দেবদূত তাই বলল না?

আর একজন এবার বলল, তাই ত বলল। দেবদূত আরো বলল, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ডেভিডের শহর বেথেলহেম-এ, তাই না? পুঁটলিতে জড়ানো এক শিশুরূপে তাকে দেখতে পাব আমরা।

আর একজন বলল, সে শিশু শুয়ে থাকবে একটি জাবনার পাত্রে।

প্রথম বক্তা জ্বলন্ত আগুনের নিচে তাকিয়ে বলল, জাবনার পাত্র আছে সারা বেথেলহেম এর মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে। সেটা হলো পুরনো খান বা সরাইখানার কাছে একটা গুহা। ভাইসব, চল আমরা যাই। সেখানে গিয়ে প্রভুকে আমরা পুজো করব। পুরোহিতরা অনেক দিন থেকেই খৃষ্টের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আছেন। এবার তিনি জন্ম নিয়েছেন। তাঁর নক্ষত্র ও দেবদূত আমাদের বলে দিয়েছেন।'

একজন মেষপালক বলল, কিন্তু আমাদের ভেড়ার পাল কে দেখবে?

তাদের কথা প্রভুই ভাববেন। চল তাড়াতাড়ি, আর দেরি করো না।

মাড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মেষপালকেরা। একযোগে তারা সোজা চলে গেল সেই গুহায়। তাদের মাড়ায় দরজা খোলাই রইল। কোন পাহারাদার রইল না তাদের মেষের পালকে দেখার জন্য।

তারা গুহার সামনে গিয়ে দেখল ভিতরে একটি লণ্ঠন ঝুলছে। কারো কোন অনুমতি না নিয়েই ভিতরে ঢুকে পড়ল তারা। যোশেফ ভিতরেই ছিল।

যোশেফকে মেষপালকেরা বলল, আজ রাতে যে শিশুটি জন্মেছে এখানে এবং জাবনার পাত্রে পুঁটলি জড়িয়ে শুয়ে আছে তাকে দেখতে এসেছি আমরা।

মেষপালকেরা নির্বাক হয়ে শিশুকে দেখতে লাগল। অলৌকিকতার কোন চিহ্ন নেই। সাধারণ এক নবজাতকের মতই শুয়ে আছে এ শিশু।

তারা আবার বলল, এর মা কোথায়?

একটি স্ত্রীলোক মেরির পাশে শুয়ে ছিল। সে শিশুকে এনে মেরির কোলে দিল। মেষপালকেরা মেরির কোলে শিশুকে আর একবার দেখল।

একজন মেষপালক বলল, ইনিই খৃষ্ট।

সকলে নতজানু হয়ে একবাক্যে বলে উঠল, খৃষ্ট।

আর একজন বারবার বলতে লাগল, ইনিই আমাদের প্রভু। তাঁর গৌরব প্রচারিত হোক স্বর্গ ও মর্তালোকে।

সরল প্রকৃতির মেষপালকের মনে কোন সন্দেহ নেই। তারা সরল অকুণ্ঠ বিশ্বাসে সেই দেব-শিশুকে দর্শন করে দেবমাতা মেরির কাপড়ের অঞ্চলপ্রান্ত চুম্বন করে চলে গেল। তারা খান বা সরাইখানাতে গিয়েও একথা সকলকে বলল। মাড়ায় ফেরার পথে তারা দেবদূতের সেই কথাটি মন্ত্রের মত উচ্চারণ করতে লাগল বারবার, মাথার উপরে ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি হোক। পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসুক। শুভবুদ্ধি লাভ করুক পৃথিবীর সব মানুষ।

৪

এদিকে গুহার মধ্যে খৃষ্টের জন্মের সতেরো দিনের মাথায় সেই তিনজন জেবেলের পথ ধরে জেরুজালেমে এসে হাজির হলো। সেড্রন নদী পার হয়ে তাঁরা যাদের দেখতে পেল পথে তাদেরই জিজ্ঞাসা করল, ইহুদের রাজা হয়ে যিনি জন্ম নিয়েছেন তিনি কোথায়?

বিদেশী পথিকদের দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল সব স্থানীয় লোকেরা। কৌতূহল বশে তারা সাধু পথিকদের পিছু পিছু শহরে এসে পড়ল। এক জায়গায় তেরাস্তার মোড়ে এক রোমক রক্ষী তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল।

মিশরীয় লোকটি রক্ষীকে বলল, ইহুদের রাজা হয়ে যিনি জন্মেছেন তাঁর খোঁজে এসেছি আমরা এখানে। তুমি কি বলতে পার তিনি কোথায় আছেন ?

রক্ষী তাদের দেখে জোরে হাঁক দিল। পাশের ঘর থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এল।

তখন রাস্তায় ভিড় জমে যেতে অফিসার চিৎকার করে উঠল, রাস্তা ছাড়।

জনতা সরে গিয়ে পথ করে দিল। অফিসার বালথাজারকে বলল, কি চাও তোমরা ?

বালথাজার বলল, ইহুদীদের রাজা হয়ে যিনি জন্মেছেন তিনি কোথায় ?

অফিসার জিজ্ঞাসা করল, কে হেরোড ?

বালথাজার বলল, হেরোড ত সিজারের কাছ থেকে জায়গির পেয়েছেন। হেরোড নয়। ইহুদীদের আর কোন রাজা নেই।

কিন্তু দেবদূত আমাদের বলেছে। আমরা তাঁর নক্ষত্রকে দেখেছি। তাঁকেই আমরা পূজো করতে এসেছি।

অফিসার বলল, আমি তা জানি না, আমি ইহুদী নই। আপনারা পুরোহিত হান্নাসকে জিজ্ঞাসা করুন। আরো ভাল হবে যদি আপনারা হেরোডকে একথা জিজ্ঞাসা করেন। ইহুদীদের অন্য কোন রাজা থাকলে তিনিই তার সন্ধান দেবেন।

সেদিন রাতে সেই তিনজন বিদেশী পথিক খান-এর উঠোনে শুয়েছিল। তখনো ঘুম আসেনি তাদের চোখে। তিনটি পাথরে মাথা রেখে শুয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে তারা তখন ভাবছিল, আমরা কত কষ্ট করে বেথেলহেম শহরে এসে পৌঁছেছি। তিনিও জন্মেছেন। অথচ এখনো তাঁকে খুঁজে বার করতে পারিনি আমরা।

যে কোন মুহূর্তে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর বা কোন আকাশবাণী শোনার জন্য কান পেতে থাকে তারা। তাই রাত্রি গভীর হলেও ঘুম আসে না তাদের চোখে।

এমন সময় খিলানের তলা দিয়ে কয়েকজন লোক উঠোনের অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। বিদেশী পথিকদের বলল, আপনারা জেগে উঠুন। আমার মনিব স্বয়ং রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি। আপনাদের শান্তি কামনা করছি। ক্ষমা চাইছি। তিনি আমাকে আপনাদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে বলেছেন।

বালথাজার বলল, রাজা যখন চেয়েছেন, আমরা অবশ্যই যাব। তাঁর ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা। আমরা তোমার সঙ্গেই যাব।

আর কোন কথা না বলে সংবাদদাতার সঙ্গে এগিয়ে চলল সেই বিদেশী পথিক তিনজন।

লোকটি তাদের একটা বিরাট প্রাসাদের সামনে এসে একটি খোলা দরজা দেখিয়ে বলল, ভিতরে চলে যান। রাজা ওখানেই আছেন।

তারা ভিতরে ঢুকে সিংহাসনের সামনে কার্পেটের উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শুয়ে পড়ল। একজন পরিচারক এসে সিংহাসনের সামনে তিনটি টুল রেখে গেল। রাজা হোরোড একটি ঘণ্টার উপর হাত রাখল। রাজা বলল, বসুন আপনারা।

তারা টুলের উপর বসলে রাজা বলল, আজ বিকালে সংবাদ পেয়েছি তিনজন বিদেশী বহু দূর থেকে এসেছেন। আপনারাই কি সেই লোক?

মিশরীয় বালথাজার রাজাকে সেলাম জানিয়ে বলল, হে শক্তিমান মহামান্য হেরোড, ধূপের সৌরভের মত আপনার খ্যাতি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত। আমরাই সেই লোক।

হেরোড বলল, আপনারা কে? কোথা হতে আসছেন? আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের পরিচয় দিন।

তারা একে একে প্রত্যেকের কথা বলল। রাজা তখন প্রশ্ন করল, আপনারা ফটকে কর্তব্যরত অফিসারকে কি প্রশ্ন করেছিলেন?

মিশরীয় বলল, আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, ইহুদীদের রাজা হয়ে যিনি জন্মেছেন তিনি কোথায়?

রাজা আশ্চর্য হয়ে বলল, ইহুদীদের আর একজন রাজা আছে নাকি? আর পাঁচজন লোকের মত আমাকেও কৌতূহলী করে তুলেছেন আপনারা।

বালথাজার বলল, একটি নবজাতক শিশুই হলো সেই রাজা।

এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি ভেসে উঠল হেরোডের মনে। অনেক নিহত শিশুর ছায়ামূর্তি দেখা দিল তার সামনে। সে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল, কিন্তু সে রাজা কোথায়?

বালথাজার বলল, আমরা সেটাই ত জানতে চাই।

রাজা বলল, আপনারা আমাকে একটি আশ্চর্য কথা বললেন। যাই হোক, এই নবজাতকের কথা কত দূর থেকে কি করে আপনারা জানলেন তা বলুন। আমিও তাহলে আপনাদের সঙ্গে তার অনুসন্ধান করব। পেলে

আপনাদের কথামত কাজ করব। তার উন্নতি ও গৌরববৃদ্ধির জন্য সীজারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসে তার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করব। আমি আপনাদেরও যথাযোগ্য সম্মানে ভূষিত করব।

বালথাজার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে রাজন, এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন। আমরা তাঁরই আদেশে এসেছি এখানে। সংকল্প করেছি জগতের ত্রাণকর্তাকে খুঁজে বার করে তাঁর পূজা করব। তাঁর আবির্ভাবের সাক্ষী হব। পথ নির্দেশের জন্য ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি নক্ষত্র দিয়েছেন। সেই নক্ষত্রই আমাদের পথ দেখিয়ে পৃথিবীর এক একটি প্রান্ত থেকে এখানে এনেছে।

হেরোড চমকে উঠল। ক্রমে সে সন্দিগ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল। সে বলল, নতুন রাজার আগমনের ফল কি হবে?

মানুষের মুক্তি।

কিসের থেকে মুক্তি?

তাদের পাপের হাত থেকে মুক্তি।

কেমন করে তা সম্ভব হবে?

ঈশ্বরের নির্দেশে বিশ্বাস, ভালবাসা আর সৎকার্য।

তাহলে আপনারা খৃষ্টের বার্তাবহ? তাই ত?

হে রাজন, আমরা আপনার ভৃত্য।

রাজা হেরোড এবার ঘণ্টায় হাত রাখল। পরিচারক এলে তাকে বলল, উপহারগুলো নিয়ে এস।

পরিচারক উপহার সামগ্রী নিয়ে এল। তারপর প্রত্যেককে লাল নীল কাপড়ের একটি করে বহির্বাস ও একটি করে সোনার কটিবন্ধ দিল। তারা প্রাচ্যদেশীয় প্রথামত মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে দান গ্রহণ করল।

হেরোড সিংহাসন থেকে নেমে এসে বলল, আমি বলছি, আপনারা বেথেলহেমে চলে যান। নবজাতকের সন্ধান করুন। তার সন্ধান পেলে আমাকে জানাবেন যাতে আমিও তার পূজা করতে পারি। পথে কেউ আর আপনাদের বাধা দেবে না।

রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেল বিদেশীরা।

রাজার রক্ষী তাদের সরাইখানা পর্যন্ত নিয়ে গেল। তখন তারা তিনজনে যুক্তি করে উটের পিঠে চেপে বেথেলহেমের পথে যাত্রা শুরু করল।

৫

বেথেলহেমের পুব দিকের আকাশে তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। পাহাড়ের চূড়ায় সে আলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উপত্যকায় তখনো জমে আছে রাতের অন্ধকার। গুহার কাছে পুরনো 'খান'-এর ছাদে যে প্রহরী পাহরা দিচ্ছিল সে দেখল একটি উজ্জ্বল আলোকশিখা পাহাড় থেকে সেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। সে প্রথমে ভাবল কোন একটা মানুষ হয়ত মশাল হাতে নেমে আসছে পাহাড় থেকে। পরে তার মনে হলো ধূমকেতু। পরে সে দেখল একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র ক্রমশই নেমে আসছে। তখন সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সে চিৎকার শুনে ঘুমন্ত মানুষরা সবাই ছাদে এসে সে আলো দেখে ভয় পেয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। ক্রমে তারা সাহসে ভর করে দেখল, যে গুহায় খৃষ্টের জন্ম হয়েছে নক্ষত্রটি তার সামনে নেমে এসে স্থির হয়ে জ্বল জ্বল করতে লাগল।

এমন সময় সেই বিদেশী তিনজন 'খান'-এর সামনে এসে উটের পিঠ থেকে নামল। তারা ফটকের সামনে থেকে ভিতরে ঢোকার জন্য তাড়াতাড়ি করতে লাগল। প্রহরী এসে দরজা খুলে দিল। তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি জুডিয়ার বেথেলহেম নয়?

প্রহরী বলল, না, এটা একটা খান বা সরাইখানা। শহরটা একটু আগে।

মিশরীয় বালথাজার বলল, এখানে কাছাকাছি কোথাও কি একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে?

খানের লোকেরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখপানে তাকাল। কেউ কেউ বলল, হ্যাঁ জন্মেছে।

গ্রীক বলল, আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।

বালথাজার বলল, যে তারাটি আপনারা এখানে এখন দেখতে পাচ্ছেন ঐ রকম একটি তারাকে দেখে তার নির্দেশেই আমরা বহু দূর থেকে এসেছি। আমরা এসেছি তাঁকে পূজো করতে।

হিন্দু বলল, ঈশ্বর আছেন। আমরা আমাদের ত্রাণকর্তাকে পেয়েছি। আমরা ধন্য। তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন আমাদের।

খানের লোকেরা তখন সবাই নবাগত তিনজনকে নিয়ে গুহার দিকে এগিয়ে চলল। তারা সেখানে গিয়ে দেখল সেই নক্ষত্রটি তখনো গুহার দরজার কাছে জ্বলছে। তারা কাছে যেতে সেটি উপরে উঠে মিলিয়ে গেল।

ঘরের ভিতর একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। তারা ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখল মেরির কোলে একটি নবজাত শিশু।

নত হয়ে প্রণাম করল তারা শিশু ভগবানকে। বালথাজার মেরিকে জিজ্ঞাসা করল, এই শিশু কি আপনার?

মেরি বলল, হ্যাঁ, এটি আমারই ছেলে।

অন্য সব শিশুদের মতই একটি সাধারণ শিশু যার মাথার উপরে কোন জ্যোতির বৃত্ত নেই, নেই কোন মুকুট, মুখে নেই কোন কথা। শিশুটি লণ্ঠনের আলোর দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। তবু তারা সেই শিশুকেই ভগবান ভেবে তার পুজা করল। সোনা, ধূপ ও গন্ধদ্রব্যের অনেক উপহার তার সামনে নামিয়ে দিল শ্রদ্ধাভরে।

দ্বিতীয় পর্ব

১

এরপর একুশটি বছর পার হয়ে গেছে। তখন জুডিয়ায় চলছে চতুর্থ শাসনকর্তা ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস-এর শাসনকাল। এর মধ্যে অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেছে জুডিয়ায়। খৃস্টের জন্মের এক বছরের মধ্যেই রাজা হেরোডের মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুর আগে হেরোড তার রাজ্য ভাগ করে তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যায়। হেরোডের তিন ছেলের নাম ছিল এ্যান্টিলাস, ফিলিপ আর আর্বেলাস। কিন্তু আর্বেলাসকে রাজা করে যায় হেরোড। সীজার হেরোডের সব ব্যবস্থা মোটামুটি মেনে নিলেও আর্বেলাসকে রাজা হতে দিলেন না। তিনি তাকে গল দেশে নির্বাসিত করেন। তাছাড়া জুডিয়াকে আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে না রেখে রোমের অধীনস্থ একটি প্রদেশে পরিণত করে তাকে সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেন। ফলে জুডিয়ার শাসনভার দেওয়া হলো এক প্রকিউরেটারের হাতে এবং জুডিয়ার রাজধানী জেরুজালেম-এর অন্তর্গত মাউন্ট জিয়ন হতে চলে গেল সিজারিয়াতে। আবার সামারিয়াকে জুডিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েই হান্নাসকে প্রধান

পুরোহিতের পদ থেকে সরিয়ে সে মর্যাদা দান করল ফেবুদের ছেলে ইসমায়েলকে।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দুপুরে মাউন্ট জিয়নের প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে দুটো কিশোর মগ্ন হয়ে পড়েছিল এক গভীর আলোচনায়। একজনের বয়স ছিল উনিশ আর একজনের বয়স ছিল সতের। দুজনেই ছিল দেখতে সুন্দর। মনে হবে দুই ভাই। দুজনেরই মাথার চুল ও চোখ কালো, গায়ের রং ও মুখ বাদামী রঙের। দুজনেরই চেহারা ছিল বয়সের আনুপাতিক।

দুজনের মধ্যে যে বড় ছিল তার মাথাটি ছিল অনাবৃত, পরনে ঘাঘরার মত ঢিলা জামা, পায়ে স্যাণ্ডেল। সে ছিল রোমক। সে ছিল রোমের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। ক্রুটাসের বন্ধু মেসালা পরে অক্টেভিয়াস সিজারের পক্ষে যোগদান করে। অক্টেভিয়াস পরে রোমের সম্রাট অগাস্টাসরূপে শাসনভার গ্রহণ করলে সে তার বন্ধু বৃদ্ধ মেসালার ছেলেকে জুডিয়ায় কর আদায় ও বিলি ব্যবস্থার ভার দিয়ে জেরুজালেমে পাঠিয়ে দেয়। এই ছেলেটিই হলো সেই উনিশ বছরের যুবক যার কথা আগে বলা হয়েছে। এই ছেলেটি প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে একই প্রাসাদে থাকত।

এই রোমক যুবক মেসালার সঙ্গে সতের বছরের যে ছেলেটি ছিল সে ছিল ইহুদী। তার মাথাটা ছিল এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঢাকা আর সেই কাপড়টি ছিল হলুদ একটি শাড়ি দিয়ে বাঁধা। তার নাম ছিল জুডা।

জুডা মেসালাকে জিজ্ঞাসা করল, কাল তাহলে নতুন প্রোকিউরেটার আসছেন?

মেসালা জবাব দিল, হ্যাঁ আসছেন।

কে তোমাকে বলল?

নতুন শাসনকর্তা ও প্রধান পুরোহিত ইসমায়েল কাল রাতে আমার বাবাকে বলেছেন।

পাঁচ বছর আগে এই বাগানেই তারা বিদায় নিয়েছিল পরস্পরের কাছ থেকে। পাঁচ বছর পর আজ আবার তারা মিলিত হলো এই বাগানে। সেদিন জুডা তার বন্ধুকে বিদায় দেবার সময় বলেছিল, প্রভুর আশীর্বাদ তোমার সঙ্গী হোক। তখন মেসালা তাতে বলেছিল, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

জুডা বলল, পাঁচ বছর আগেকার সেই বিদায়ের মুহূর্তটি আজও মনে পড়ে আমার। তুমি সেদিন যখন রোমে চলে যাও তখন আমি কেঁদেছিলাম। আজ তুমি পাণ্ডিত্য অর্জন করে, রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে ফিরে এসেছ। তোমাকে আমি হিংসা করছি না। তবু কি আজ তুমি সেই মেসালাই থাকবে ?

মেসালা বলল, আমি কি কোনভাবে তোমার মনে আঘাত দিয়েছি ?

জুডা বলল, পাঁচ বছরের মধ্যে আমিও কিছু শিখেছি। জুডিয়া আগে ছিল এক স্বাধীন রাজ্য, এখন তা রোমের অধীন। সেদিনের স্বাধীন রাজ্য জুডিয়া আর আজকের জুডিয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ। এখন আমি একজন সামারিটানের থেকেও অধম। তবে ইসমায়েল আইনত প্রধান পুরোহিত নয় আর তাকে কেউ মানবেও না।

মেসালা এক তীক্ষ্ণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তারপর বলল, তুমি ভাবছ ইসমায়েল এখানে জবরদস্তি বসেছেন। সব মানুষ এমন কি স্বর্গমর্ত্যও বদলায় কিন্তু একজন ইহুদী বদলায় না। এই দেখ, একটা বৃত্ত আঁকছি। এই বৃত্তের মধ্যে আছে আব্রাহাম, আইজাক আর জ্যাকব। মাঝখানে আছে ঈশ্বর, মন্দির আর জুডিয়া। ইহুদীরা ভাবে এই বৃত্তের বাইরে আর কোন জগৎ নেই, কোন ভাল কিছু নেই। তাদের মতে শিল্প, চিত্র ভাস্কর্য দেখা পাপ। পূজার বেদী আর ধর্মসভার বাইরে কোন কিছুই জান না। কাব্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, কোন কিছুই জান না তোমরা। যুদ্ধে যা জয় করো পরের দিনই তা হারাও। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয় জুডা।

জুডা শান্ত কণ্ঠে বলল, আমি না এলেই ভাল করতাম। এবার আমাদের বিদায় নেওয়াই ভাল পরস্পরের কাছ থেকে। আমি চেয়েছিলাম আমার পুরনো বন্ধুকে, পেলাম একটি—

পেলে একটি রোমককে।

জুডা বিদায় নিয়ে পথ চলতে শুরু করল। মেসালা তার কাঁধে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ গেল তার সঙ্গে। চলতে চলতে বলল, এইভাবে ছোটবেলায় হাঁটতাম আমরা।

পরে সে আবার বলল, আমার কথা শোন। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমার উপকার করতে চাই। আমি সৈনিক হতে চাই। তুমিও সৈনিক হও। সমস্ত সংকীর্ণতার গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে এস। মোজেস ও

গতানুগতিক যত সব ভাবধারার বোকামি ছাড়। সবাই এখন বলবে রোমই হলো জগৎ এবং জুডিয়া তার অধীন। এখন বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে কাজ করো।

জুডা মেসালার হাতটা তার কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল। তার চোখে জল এল। সে বলল, আমি তোমাকে বুঝতে পারি, কারণ তুমি রোমক, আমি ইহুদী। তথাপি যে বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে ছিল তা আর ফিরবে না। বিদায়। আমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুক।

ফটক পার হয়ে চলে গেল জুডা। মেসালা হাত নেড়ে বলল, তাই হোক। প্রেমের দেবতার মৃত্যু হোক, রণদেবতার জয় হোক।

জুডা তাদের প্রাসাদের মত বিরাট বাড়িটার ভিতর অন্যমনস্কভাবে ঢুকে গেল। তার ঘরের ভিতর ঢুকে পর্দাটা ফেলে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল।

আমরাহ নামে এক মিশরীয় ক্রীতদাসী তাকে ছেলের মত স্নেহ করত। সে তার জন্য রাতের খাবার নিয়ে এল। ক্রীতদাসীর বয়স পঞ্চাশ। গায়ের রং কালো, কালো চোখ, মাতৃত্বের মমতা মাখা মুখ। শিশুকাল থেকেই সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে জুডাকে। তাই স্নেহের বশে সে মুক্তি পেলেও নিত না। জুডাই ছিল তার জীবন।

জুডা খেতে খেতে একসময় বলল, মেসালাকে তোমার মনে আছে আমরাহ? আজ তার কাছে গিয়েছিলাম।

আমারাহ বলল, মনে আছে। বুঝেছি, কিছু একটা হয়েছে। সব কথা খুলে বল।

জুডা বলল, মোট কথা, সে বদলে গেছে। আমি তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।

এরপর ছাদের ঘরে শুতে যাবার পথে মার সঙ্গে দেখা করতে গেল জুডা। মাকে সব কথা খুলে বলল সে। ইহুদীদের প্রতি মেসালার ঘৃণার কথা সব বলল।

তার মা বলল, দেখ বাবা, একজন রোমক যখন ইজরায়েলীদের ঘৃণার চোখে দেখে তখন সে মিশর, আসিরিয়া ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের মতই ভুল করে, বোকামি করে। আর তার ফলও সেইরকম পায়। আমাদের জাতির মধ্যে কোন কবি, শিল্পী বা যোদ্ধা জন্মায়নি বলে তোমার বন্ধু যে অভিযোগ করেছে তার কোন ভিত্তি নেই। রোমের মত আমাদেরও শ্রেষ্ঠ মানুষের অভাব নেই। ওদের আছেন যেমন সিজার, আমাদের তেমন

মোজেস ; ওদের টারকুইন, আমাদের ডেভিড ; ওদের অগাস্টাস, আমাদের, সলোমন। আর আছেন সিনা আর ম্যাকাবি। তাছাড়া ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের কথা বললে আমরাই ত শ্রেষ্ঠ। আর তুলনার দরকার নেই।

জুডা জিজ্ঞাসা করল, আমি কি সৈনিক হতে পারব ?

মা বলল, কেন পারবে না ? মোজেস কি ঈশ্বরকে যোদ্ধা বলেননি ? আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু তুমি মিশরের সেবা করবে না, সেবা করবে প্রভুর।

পরদিন সকালে তার বোনের গান শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল জুডার। তার টির্জা নামে একটি ছোট বোন ছিল। সে খুব ভাল গান গাইতে পারত।

জুডা তার বোনকে বলল, আমি রোমে চলে যাচ্ছি। আমি সৈনিক হব।

টির্জা বলল, সৈনিক হলে মারা যাবে।

সে কাঁদতে লাগল। জুডা তাকে বোঝাল, সব সৈনিকই মারা যায় না।

আমরাহ তাদের জন্য প্রাতরাশ নিয়ে এল। কিন্তু ওরা খাওয়া শুরু করতে না করতে বড় রাস্তা থেকে সামরিক বাজনার শব্দ এল। জুডা বলল, প্রিটোরিয়া থেকে সৈন্য আসছে। আমি দেখতে যাচ্ছি ছাদে।

ছাদের উত্তর পূর্ব কোণে টালির আলসের উপর ঝুঁকে সে নিচের দিকে তাকাল। টির্জা তার পাশে এসে তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল। জুডা দেখল, একদল পদাতিক সৈন্যদলের আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে খালি মাথায় এক অফিসার আসছে।

জুডা আরো দেখল রাস্তার দুপাশে বিক্ষুব্ধ জনতা ধ্বনি দিচ্ছে, অত্যাচারী রোমক কুকুর ইসমায়েল দূর হয়ে যাও। হান্নাসকে ফিরিয়ে দাও। দুপাশের বাড়ি থেকে অনেকে ঘুষি দেখাচ্ছে। মেয়েরা চটি ছুঁড়ে মারছে। অফিসারের গলায় দ্রাক্ষালতার মালা দেখে জুডা বুঝল, ঐ অফিসারটিই সেনাপতি ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস। জুডিয়ার নতুন প্রোকিউরেটার।

নতুন শাসনকর্তা ভ্যালেরিয়াস জুডাদের বাড়ির নিচের তলায় আসতেই যে টালির উপর জুডা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল সেই টালিটা ভেঙ্গে এমনভাবে ভ্যালেরিয়াসের মাথায় পড়ে গেল যাতে মনে হলো জুডাই সে টালিটা ফেলেছে। জুডা হাত বাড়িয়ে টালিটা ধরতে গিয়েও পারল না। সে টালির আঘাতে ঘোড়া থেকে মাটিতে মরার মত পড়ে গেল ভ্যালেরিয়াস।

জুডা ভয় পেয়ে গেল। নিচে প্রচুর গোলমাল শুরু হলো। সৈন্যরা জোর করে ঢুকে পড়ল জুডাদের বাড়িতে। তারা দারোয়ান ও বাড়ির

চাকর-বাকরদের হত্যা করে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। জুডা তাড়াতাড়ি নিচের তলায় নেমে মার কাছে ছুটে গেল।

সৈনিকদের মধ্যে মেসালাও ছিল। সে জুডাকে দেখে সৈনিকদের বলল, এই সেই।

সৈনিকদের মধ্যে একজন অফিসার বলল, এ ত ছেলেমানুষ। এই খুনী?

মেসালা বলল, বুড়ো না হলে কি খুন করা যায় না? এটা ওর বোন আর ওই হলো মা। গোটা পরিবারকেই পেয়ে গেছেন এক জায়গায়।

জুডা তাকে বাঁচাবার জন্য অনেক মিনতি করল মেসালাকে। কিন্তু মেসালা তা শুনেও শুনল না। সে অফিসারকে বলল, আমার আর কিছু বলার নেই। প্রেমের দেবতার মৃত্যু হোক। রণদেবতার জয় হোক।

জুডা বলল, হে প্রভু, যেদিন প্রতিশোধের দিন আসবে সেদিন তুমি যেন আমার হয়ে তাকে আঘাত করো।

জুডা অফিসারকে বলল, স্যার, আপনি দয়া করে আমার মা ও বোনকে ছেড়ে দিন।

অফিসার সৈনিকদের বলল, মেয়েদের দুর্গে নিয়ে যাও। তাদের কোন ক্ষতি করো না। আর এই ছেলেটির হাত বেঁধে রাজপথে নিয়ে যাও। পরে শাস্তি হবে।

আমরাহ মেঝের উপর পড়ে ছিল। সে জুডার হাঁটু ধরে কাঁদতে লাগল। জুডা তার কানে কানে বলল, আমার মা ও বোনের জন্য তোমায় বাঁচতে হবে আমরাহ।

আমরাহ উঠোন দিয়ে ফটক পার হয়ে পালিয়ে গেল। অফিসার বলল, ওকে যেতে দাও। গোটা বাড়িটা সীল করে দিচ্ছি। কেউ ঢুকতে পারবে না। ও বাইরে না খেয়ে মরবে।

জুডাকে ধরে নিয়ে গেল সৈনিকরা।

পরদিন একদল সৈনিক এসে গোটা বাড়িটা ইট দিয়ে গেঁথে একেবারে বন্ধ করে গেল। তার সামনের দেওয়ালে একটি বিজ্ঞপ্তি লেখা বোর্ড টাঙিয়ে দিয়ে গেল যাবার সময়। তাতে লেখা ছিল, এই সম্পত্তির মালিক সম্রাট স্বয়ং।

পরদিন দুপুরবেলায় একদল অশ্বারোহী একজন বন্দীকে নিয়ে জেরুজালেমের দিক থেকে নাজারেথে প্রবেশ করল। বন্দীটি তরুণ এবং

জুডাই হলো সেই বন্দী। সৈনিকরা শিঙা বাজিয়ে তাদের আগমনবার্তা জানাতে পথে ভিড় জমে গেল।

জুডাও তখন ক্লান্তিতে আর হাঁটতে পারছিল না। তার হাতদুটো পিছনে বাঁধা ছিল। মাথা খালি, পা খালি। পা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। এক জায়গায় অফিসার ঘোড়া থেকে নামতেই জুডা লুটিয়ে পড়ল। পিপাসা পেয়েছিল দারুণ। কিন্তু মুখে কোন কথা বলতে পারছিল না। জনতার মধ্য থেকে তাকে কোনরকমে সাহায্য করতে সাহস পাচ্ছিল না কেউ।

এমন সময় একটা কুড়ুল, একটা করাত আর ছুরি হাতে ছুতোর মিস্ত্রীর বেশে যোশেফ এসে হাজির হলো সেখানে। তার মাথায় ছিল পাগড়ি। তার ভিতর থেকে তার সাদা চুল ঝুলে পড়েছিল। তার গায়ে ছিল মোটা কাপড়ের ধূসর রঙের জামা। মুখের উপর ছড়িয়ে ছিল সাদা দাড়ি।

ভিড়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বন্দীর অবস্থা দেখে যোশেফ বলল, প্রভু তাকে রক্ষা করুন।

যোসেফের সঙ্গে ছিল এক তরুণ যুবক। তাকে তখনও কেউ দেখেনি। যুবকটি বন্দীর অবস্থা দেখে কাউকে কিছু না বলে কাঁধের কুড়ুলটা নামিয়ে একটা কলসী যোগাড় করে কাছের একটা কূয়ো থেকে জল নিয়ে এসে কলসীর কাছে গিয়ে তাকে জল খেতে বলল।

সৈনিকরা স্তব্ধ হয়ে ব্যাপারটা দেখতে লাগল। কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

কাঁধের উপর মমতা রাখা হাতের ছোঁয়া পেয়ে চোখ মেলে তাকাল জুডা। দেখল তারই মত বয়সের এক তরুণ যুবক। বাদামী চুলের গোছার ছায়া পড়েছে তার মুখে। নীল চোখদুটি ভালবাসা আর মমতায় উজ্জ্বল। সেই চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে সব দুঃখ ও যাতনা ভুলে গেল জুডা। কলসিটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে প্রাণ ভরে জলপান করল সে।

তার জল খাওয়া হয়ে গেলে কলসিটা যথাস্থানে রেখে গিয়ে কুড়ুল কাঁধে নিয়ে নীরবে সে তার বাবা যোশেফের কাছে চলে গেল। তারপর দুজনই নীরবে সেখান থেকে চলে গেল তাদের পথে। সৈন্যদল ও জনতা অবাক হয়ে তাকিয়ে উঠল যুবকটির পানে। এইভাবে জুডা ও মেরীর পুত্র যীশুর সঙ্গে প্রথম দেখা হলো।

তৃতীয় পর্ব

১

তখন সেপ্টেম্বর মাস। ইতালির নেপলস শহরে তখন শীত। একদিন সেই শীতের সকালে অষ্ট্রিয়া নামে একটি জাহাজ নেপলস শহর থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মিসেনাম বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করল। মহামান্য ট্রিবিউন কুইণ্টাস অরিয়াস ছিলেন সেই জাহাজের অন্যতম যাত্রী।

পালে পশ্চিমের হাওয়া লাগায় বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছিল জাহাজটা। দুপুর নাগাদ পার হয়ে যেত পীণ্টাস-এর উপকূল। কেবিনের পাটাতন থেকে সকলের উপর সতর্ক নজর রেখে চলেছিল অরিয়াস। তার বিশেষ নজর ছিল দাঁড়িদের উপর। দাঁড়িদের বসার বেঞ্চিতে এক একটা নম্বর দেওয়া আছে। সেই নম্বরেই তাদের পরিচয়।

এইসব দাঁড়িরা সবাই ক্রীতদাস অথবা কয়েদী। ষাট নম্বরের দাঁড়ির চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখছিল ট্রিবিউন অরিয়াস। দেখল দাঁড়িটি বয়সে যুবক, একমনে দাঁড় টেনে চলেছিল। তার কোমরে একখণ্ড পট্টি ছাড়া গোটা দেহটা নগ্ন।

অরিয়াস নিজের মনে বলল, হা ভগবান, যুবকটাকে দেখে ভ'র মনে হচ্ছে তার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর নিতে হবে।

দাঁড়িটি মুখ ঘুরিয়ে তার পানে তাকাতেই অরিয়াস দেখল, একজন ইহুদী, এক তরুণ যুবক।

ট্রিবিউন স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকে দেখছে দেখে ভয় পেয়ে গেল যুবকটি। তার হাতের দাঁড় থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মেট অর্থাৎ উপরওয়ালারা হাতুড়ী পিঠিয়ে তাকে সতর্ক করে দিল। সে আবার দাঁড় টানায় মন দিল।

ক্রমে জাহাজটা মেসিনা যোজক পার হয়ে এটনার উপকূল ছাড়িয়ে গেল। এটনার আকাশে তখন ছিল কালো মেঘের ছায়া।

এরপর অরিয়াস কেবিনের পাটাতন থেকে বারবার লক্ষ্য করেছে যুবক দাঁড়িটিকে। আর মনে মনে বলেছে, ছেলেটির মনের জেদ আছে। ইহুদী হলেও তাকে বর্বর মনে হচ্ছে না। ওর সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে।

অস্ট্রীয়া জাহাজটি যখন আইওনিয়ান সাগরের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছিল তখন এক সময় অরিয়াস জাহাজের পিছনের গলুই-এর উপর

দাঁড়িয়ে দেখল যাট নম্বরের দাঁড়ি এগিয়ে আসছে তার দিকে। সে তাকে মেটতে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল।।

দাঁড়ি এসে তার সামনে নত হয়ে বলল, হে মহান অরিয়াস, মেট আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলল। তাই এসেছি।

অরিয়াস বলল, মেট আমাকে বলল তুমি শ্রেষ্ঠ দাঁড়ি।

দাঁড়ি বলল, মেট দয়ালু।

তুমি কতদিন একাজ করছ?

প্রায় তিন বছর।

দাঁড় টানছ?

হ্যাঁ, একটি দিনের জন্যও বিরাম নেই।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি ইহুদী।

আমার বাবা ছিলেন জেরুজালেমের রাজকুমার। তিনি সমুদ্র পথে বাণিজ্য করে বেড়াতেন। মহান অগাস্টাসের অতিথিশালায় তিনি সমাদর ও সম্মান লাভ করতেন।

তার নাম?

ইথামার, হুর বংশের লোক।

ট্রিবিউন আশ্চর্য হয়ে বলল, হুর বংশের সন্তান তুমি। তুমি এখানে এলে কি করে?

জুডাই হলো সেই দাঁড়ি যুবক। জুডা মাথা নিচু করে ভয়ে ভয়ে বলল, প্রোকিউরেটার ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাসকে হত্যা করার অভিযোগের ফলে।

অরিযাস প্রশ্ন করল, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার করো?

জুডা উত্তর করল, সর্বশক্তিমান জেহোভার নামে শপথ করে বলছি আমি নির্দোষ।

তোমার কি কোন বিচার হয়নি?

না।

অরিয়াস সবিস্ময়ে বলল, সেকি, কোন বিচার হয়নি অথচ দণ্ড! কে দিয়েছিল এই দণ্ডাদেশ?

সৈন্যরা আমায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে সমুদ্রতীরে নিয়ে আসে। সেই দিন থেকেই আমি ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করে চলেছি।

নিজের স্বপক্ষে তোমার কিছু বলার আছে?

তার উত্তরে হঠাৎ ছাদের টালি ভেঙ্গে পড়ার ঘটনাটার কথা সব খুলে বলল জুডা।

সব কথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনে অরিয়াস ভাবল, একটা দুর্ঘটনার জন্য তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটা গোটা সম্ভ্রান্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। অথচ এর কথা যদি সত্য হয় তাহলে এ সম্পূর্ণ নির্দোষ। এক অন্ধ আক্রোশের বলি হয়ে ওর জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

নিজে ট্রিবিউন ও এই জাহাজের সর্বময় কর্তা হয়েও বিমূঢ় ও বিহ্বল হয়ে ভাবতে লাগল অরিয়াস। জুডার কথা সে বিশ্বাস করেছে, তার মনে জেগেছে করুণা আর মমতা। তবু সে এখনি কিছু করতে পারে না। এখন সাইথেরা যেতে হবে এক বিশেষ কাজে এবং সেক্ষেত্রে জুডার মত এক শ্রেষ্ঠ দাঁড়িকে প্রয়োজন আছে তার। তাছাড়া ক্রীতদাসেরা অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে। জুডাই যে রাজবংশজাত বেনহুর সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

অরিয়াস নিজেকে সামলে নিয়ে জুডাকে বলল, এখন তুমি যাও।

বেনহুর আবার তার চৌকিতে গিয়ে বসল। এক অদৃশ্য আশার পাখি অস্পষ্ট স্বরে গান করছে যেন তার অন্তরের নিভৃতে। সে পাখিকে সে দেখতে না পেলেও এবং তার গানের ভাষা বুঝতে না পারলেও তার গানটা অন্তঃ শুনতে পাচ্ছে সে। সে তাই খুশি হয়ে প্রার্থানা জানাল ঈশ্বরকে, হে ঈশ্বর! যে ইজরায়েলীদের তুমি ভালবাস আমি তাদেরই সন্তান। আমার এটাও প্রার্থনা, তুমি আমার সহায় হও!

২

ট্রিবিউন অরিয়াসের নৌবহরে ছিল একশোটা জাহাজ। এই বিশাল নৌবহর সাইথেরা দ্বীপের পূব দিকে এ্যান্টিমোসা উপসাগরে এক জায়গায় জড়ো হতেই সারাদিন ধরে জাহাজগুলো পরীক্ষা করে দেখল অরিয়াস।

আসলে এই নৌবহর নিয়ে এক বিরাট জলদস্যুদলকে দমন করতে চলেছে অরিয়াস। এই জলদস্যু দলের আছে ষাটটি জাহাজ এবং সে দলটি এসেছে ইউক্সাইন থেকে। তাদের সব জাহাজগুলিই অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্যে ভরা। দস্যুদের দলপতি একজন গ্রীক এবং জাহাজগুলোর নাবিকরাও গ্রীক। এই সব দুর্ধর্ষ জলদস্যুরা সমুদ্রের বুকে পণ্যবাহী জাহাজ পেলেই লুটতরাজ করে। সমুদ্রবক্ষে এক বিরাট এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে তারা। শুধু তাই নয়, উপকূলবর্তী শহরগুলোতেও রাত্রিবেলায় লুটপাট করে যায়। ফলে

সেখানকার লোকেরাও সব সন্ত্রস্ত। এই জলদস্যুদলের সব শক্তিকে ধ্বংস করে দেবার জন্যই এক অভিযানে চলেছে ট্রিবিউন অরিয়াস।

কিন্তু প্রথমে তাকে জানতে হবে এখন জলদস্যুরা কোথায় আছে। এমন সময় উত্তর দিক থেকে একটা জাহাজকে আসতে দেখল অরিয়াস। জাহাজটা মালবাহী, আসছে বাইজান্টিয়াম থেকে। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে দরকারী কিছু তথ্য জানতে পারল সে। জানতে পারল প্রথমে জলদস্যুরা হেফিস্টিয়া লুট করে থেসালির দিকে এগিয়ে যায় ও পরে তারা ইউবিয়া ও হেলাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায় কোথায় তা জানা যায়নি।

তবু বুঝতে পারল অরিয়াস দস্যুদল এখন ঠিক থার্মোপলির কাছাকাছি কোন স্থানে আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দুদিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে তাদের। আর তার জন্য একটুও সময় নষ্ট করা চলবে না।

অরিয়াস নিজে পঞ্চাশটি জাহাজকে পাঠিয়ে দিল সমুদ্রের দিকে। দস্যু-দলের দেখা পেলেই তাদের আক্রমণ করার আদেশ দিয়ে দিল তার লোকদের।

এদিকে বেনহুরের কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে রোজ মাত্র দু ঘণ্টা করে দাঁড় টানতে হয়। তাছাড়া একদিন পূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছে এর মধ্যে। ফলে দেহের ক্লান্তিটা অনেক কেটে গেছে। তাই দাঁড় টানতে আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। জাহাজটা এগিয়ে চলেছিল উত্তর দিকে। সন্ধ্যে হতেই কেবিন থেকে ধূপের গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। বেনহুর বুঝতে পারল ট্রিবিউন প্রার্থনায় বসেছে। সে বুঝতে পারল তাহলে হয়ত যুদ্ধ আসন্ন।

যা সে ভেবেছিল ঠিক তাই হলো। সে দেখল ট্রিবিউন বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরে ঢাল নিয়ে কেবিন থেকে পাটাতনের উপর উঠে এসেছে। তাহলে সত্যিই যুদ্ধ আসন্ন।

যুদ্ধ বা বিপদের সময় দাঁড়িদের বসার বেঞ্চির সঙ্গে আংটাসহ একটা লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। যুদ্ধ আসন্ন বলে এই জাহাজের সব দাঁড়িদের একে একে শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হলো। কিন্তু একমাত্র ষাট নম্বর দাঁড়ি রেহাই পেল।

ট্রিবিউন মেটকে ডেকে বলে দিল, ওকে আর শিকল পরিও না। শিকল ছাড়াই ও ভাল আছে।

ক্রমে রাত্রি গভীর হলো। জাহাজ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। শুধু জলের উপর দাঁড়ের ওঠাপড়ার শব্দ ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ একেবারে। যে নাবিকরা ছুটিতে ছিল তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। পাটাতনের উপর অরিয়াসও ঝিমিয়ে পড়েছিল। একমাত্র বেনহুরের চোখে ঘুম ছিল না।

সহসা বেনহুর অরিয়াসের কাছে চলে গিয়ে তাকে জাগাল। অরিয়াস সকলকে জাগিয়ে দিল। জলদস্যুরা এসে পড়েছে, প্রস্তুত হও।

সঙ্গে সঙ্গে যত নাবিক অস্ত্র তুলে দিল হাতে। নাবিকরা সবাই ছিল পেশাদারী সৈনিক। ডেকএর উপর তীর বর্শা, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র এনে স্তূপাকার করা হলো। বাড়তি লণ্ঠনগুলো সব জ্বালা হলো। আগুনে বোমাও প্রস্তুত রাখা হলো।

শত্রুপক্ষে অনেকগুলো জাহাজ আচমকা এসে পড়ল তাদের সামনে। শুরু হয়ে গেল আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ। প্রচুর গোলমাল ও চিৎকার চেঁচামেচি চলতে লাগল।

হঠাৎ জাহাজের উপর শত্রুপক্ষের একটা মৃতদেহ দেখে বোধহয় বুঝতে পারল শত্রুরা তাদের জাহাজে ঢুকে পড়েছে। আগুনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারদিক। বেনহুর ভাবল তাহলে ত অরিয়াসের জীবনও বিপন্ন। ঈশ্বর যেন তাকে রক্ষা করেন। তার মৃত্যু হলে তার নবজাগ্রত সব আশা নির্মূল হয়ে যাবে নিঃশেষে। মনে মনে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠল বেনহুর, না তা হতে পারে না। তা যদি হয় তাহলে অরিয়াসের সঙ্গে সেও মৃত্যু বরণ করবে।

লাফ দিয়ে কয়েকটা সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল বেনহুর। দুপক্ষেরই জাহাজগুলো সব জট পাকিয়ে উঠেছে। অনেক জাহাজ ভেঙ্গে গেছে। সে দেখল আগুন লেগে তাদের জাহাজটাও ভেঙ্গে পড়েছে। হঠাৎ নিচের সিড়িটা ভেঙ্গে পড়তে সে ছিটকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। সে দেখল তার চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অসংখ্য উত্তাল তরঙ্গমালার উচ্ছ্বাস।

সমুদ্রে অসহায়ভাবে ভাসতে ভাসতে একটা ভাঙ্গা তক্তা পেয়ে তার উপর উঠে বসল বেনহুর। সে দেখল দুপক্ষের জাহাজগুলো জ্বলছে। চারদিকে শুধু ধোঁয়া আর আগুন। সে বুঝতে পারল না এখানো যুদ্ধ চলছে কিনা। বুঝতে পারল না এ যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হয়েছে।

হঠাৎ বেনহুর দেখল একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে। তার আলো দেখা যাচ্ছে। এমন সময় তার দুহাত দূরে দেখল শিরস্ত্রাণ পরা একটি লোক হাত

ফুটো তুলে ডুবছে আর উঠছে। তার মাথার শিরস্ত্রাণটা চকচক করছে। সেটা থুঁতনির সঙ্গে আটকানো আছে। ডুবন্ত মানুষটা যেই হোক মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে প্রাণপণে।

লোকটির মুখটা একবার জলের ধারে উঠতেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল বেনহুর। লোকটি ট্রিবিউন অরিয়াস। তাড়াতাড়ি তক্তাটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে অরিয়াসকে তার উপর তুলে নিল বেনহুর।

এমন সময় বেনহুর দেখল যে জাহাজটা এগিয়ে আসছিল সেটা তাদের ফেলে চলে গেছে। তখন ভোর হয়ে এসেছে। তক্তার উপর উঠে অরিয়াস বলল, তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে বঁচিয়েছে। যদি বাঁচি তোমাকে মুক্ত করে দেব। তুমি তোমার মা বোনের কাছে ফিরে যাবে অথবা যেখানে যেতে চাও যাবে!

এর পর অরিয়াস বেনহুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, দূরে একটা জাহাজ আসছে, শুনতে পাচ্ছ ?

বেনহুর চারদিকে তাকিয়ে বলল, কোন দিকে থেকে ?

ঐ দেখ। বাইরে কোন নিশান দেখতে পাচ্ছ ? তাহলে বোঝা যেত কাদের জাহাজ ?

দেখতে পাচ্ছি না। তবে এই দিকেই আসছে।

দেখ ত, যদি রোমক জাহাজ হয় তাহলে মাস্তুলের উপর একটা শিরস্ত্রাণ থাকবে।

তাহলে অনেন্দের কথা। শিরস্ত্রাণ দেখতে পাচ্ছি।

বেনহুর ভাল করে দেখতে লাগল জাহাজটাকে।

অরিয়াস বলল, জাহাজটা চলে যাচ্ছে।

কোন দিকে ?

আমাদের ডান দিকে যে একটা জাহাজ আছে সেটাকে বোধ হয় উদ্ধার করতে যাচ্ছে। আমি যেমন আমার দেবতাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমিও তোমার দেবতাকে ধন্যবাদ দাও। কারণ জলদস্যুদের জাহাজ কখনো কোন জাহাজকে উদ্ধার করে না। ওরা শুধু ধ্বংস করতেই জানে। ও জাহাজ নিশ্চয় আমাদের পক্ষের। মাস্তুলের শিরস্ত্রাণ দেখে আমি চিনতে পেরেছি ওটা রোমক জাহাজ। তাহলে ওদের ডাক এদিকে আমাদের নিয়ে যাবে। আমি তোমার বাবাকে চিনতাম। তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি হবে আমার দত্তক ছেলে।

তক্তার উপর দাঁড়িয়ে বেনহুর হাত তুলে জাহাজটাকে ডাকতে জাহাজটা এদিকে এসে তাদের তুলে নিল।

নৌযুদ্ধে রোমক পক্ষেরই জয় হলো। অভিযান শেষে বিজয় গৌরবে মিসেনামে ফিরে এল অরিয়াসের অবশিষ্ট নৌবহর। সেখানে মহাসমারোহে বিজয়-উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। অরিয়াসকে জানানো হলো বিরাট সম্বর্ধনা।

অরিয়াস রাজকীয় জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বেনহুরের। কিভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে সাহসের সঙ্গে তাকে উদ্ধার করেছে সমুদ্রের বুক থেকে সে কথা সবাইকে জানাল। তারপর বেনহুরকে কাছে ডেকে সস্নেহে তার কাঁধের উপর হাত রেখে সবাইকে বলল, এই হলো আমার পুত্র ও উত্তরাধিকারী। আপনারা আমাকে যেমন ভালবাসেন তেমনি আজ থেকে ওকেও ভালবাসবেন। সে আমার সব বিষয়সম্পত্তি লাভ করবে এবং আমার নামেই তার হবে পরিচয়।

এর পর যত শীঘ্র সম্ভব দত্তক গ্রহণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করল অরিয়াস।

চতুর্থ পর্ব

১

তখন খৃষ্টীয় ২৯ সাল। জুলাই মাস। অরিয়াস দত্তকপুত্র হিসাবে বেনহুরকে গ্রহণ করার পর চার পাঁচ বছর কেটে গেছে। তখন পরিপূর্ণ যৌবন লাভ করে বেশ রমণীয় হয়ে উঠেছে বেনহুরের দেহকান্তি। সে এখন সমুদ্রের বুকে ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ নাম করেছে। একটি বাণিজ্য জাহাজের মালিক।

সেদিন অনেক নদী সমুদ্র পার হয়ে বেনহুরের জাহাজ এ্যান্টিয়ক শহরের ধারে অরেন্টাস নদীর মোহনায় নোঙর করেছে সবেমাত্র।

পরদিন সকাল হতেই এ্যান্টিয়ক শহরের মস্ত বড় ধনী ব্যবসায়ী সাইমোনাইদিস-এর বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলো বেনহুর। সাইমোনাই-দিস অনেকগুলি বাণিজ্য জাহাজের মালিক। অনেক দূর দূরান্তে তার ব্যবসা বাণিজ্য চলে।

বাড়িতে ঢুকেই বেনহুর দেখল প্রবেশপথের দুধারে কত পণ্যদ্রব্যে বোঝাই

মাল গুদাম। অনেকজন কাজ করছে। জাহাজে মাল পাঠাবার উপযুক্ত অনেক কাঠের বাক্স তৈরি করছে মিস্ত্রীরা। সেই সব দেখতে দেখতে সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, যার এত নাম ডাক, যে এত বড় ধনী ব্যবসায়ী সেই মানুষ একদিন ছিল তার বাড়ীর ক্রীতদাস।

একটি লোককে দিয়ে সাইমোনাইদিসকে খবর পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল বেনহুর। লোকটি ফিরে এসে পথ দেখিয়ে বেনহুরকে নিয়ে যেতে লাগল। সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাদের বাগানের মধ্যে একটি ঘরে নিয়ে গেল তাকে। অজস্র পারসিক গোলাপ ফুটে আছে সে বাগানে।

একটি বারান্দা পার হয়ে আধখোলা পর্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। লোকটি বেনহুরের আগমনবার্তা ঘোষণা করলে ঘরের ভিতর পরিষ্কার কণ্ঠে একজন বলল, ঈশ্বরের নামে তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও।

ভিতরে গিয়ে বেনহুর দেখল রেশমী পোশাকে ঢাকা মেদবহুল এক বৃদ্ধ চওড়া হাতলওয়ালা একটা গদী আঁটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে এবং এক সুন্দরী তরুণী আর একটা চেয়ারে বসে আছে।

বেনহুর তাদের দুজনকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি যদি ইহুদী বণিক সাইমোনাইদিস হন তাহলে আমাদের পিতা আব্রাহামের ঈশ্বর আমাদের শান্তি দিন।

লোকটি বলল। আমিই সাইমোনাইদিস জন্মসূত্রে ইহুদী। আপনাকে অভিনন্দন জানাই, আপনার পরিচয় জানতে চাই।

বৃদ্ধ সাইমোনাইদিসের মাথার পাতা কাটা সাদা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে মাথার চারদিকে। তার ভ্রূর চুলগুলোও পেকে গেছে। কালো চোখদুটো খুবই উজ্জ্বল।

বেনহুর বলল, আমি জুডা; জেরুজালেমের রাজা হুর বংশের প্রধান ইথামারের ছেলে। সাইমোনাইদিস বলল, জেরুজালেম রাজবংশের যে কোন লোক আমার ভবনে সব সময় স্বাগত।

এর পর পাশে বসা তরুণীটিকে সে বলল, এস্তার, যুবককে একটি আসন দাও।

দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। বেনহুর একটা চেয়ারে বসে বলল, গতকাল নদীপথে আসতে আসতে শুনলাম, আপনি আমার বাবাকে চিনতেন। তাই শহরে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

সাইমোনাইদিস বলল, আমি রাজা হুরকে চিনতাম। জলপথে তাঁর যে

ব্যবসা বাণিজ্য ছিল সেই সূত্রেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। নেহেমিয়ার কাছে শুনেছি রাজা হুরের একটি ছেলে ছিল। এস্থার, যুবককে পানীয় দাও।

এস্থার একটি পূর্ণ পানপাত্র এনে বেনহুরের সামনে রাখল। বেনহুর তরুণীটির হাতটা আলতোভাবে ছুঁয়ে সে পানপাত্র ফিরিয়ে দিয়ে বলল, দয়া করে বিরূপ হবেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। পরে আমি তা গ্রহণ করব। উনি আপনার বাবা ত?

এস্থার বলল, আমি সাইমোনাইদিসের মেয়ে।

মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। সুন্দর মুখ, কালো চোখ, মেদুর চাউনি।

বেনহুর এবার সাইমোনাইদিসের দিকে তাকিয়ে বলল, মৃত্যুকালে আমার বাবার একটি বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। তার নাম ছিল সাইমোনাইদিস। আমি শুনেছি, আপনিই সেই লোক।

সাইমোনাইদিস রেগে গেলেও শান্ত কণ্ঠে বলল, রাজা হুরের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল সেটা বলার আগে আপনি কে তার প্রমাণ দেখতে চাই। কোন লিখিত প্রমাণ আছে? মুখের কথার কি দাম আছে? আমার হাতে প্রমাণ দিন। তবে স্বীকার করব।

সাইমোনাইদিসের কথাটা উড়িয়ে দিতে পারল না বেনহুর। সে ঠিকই বলেছে। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল বেনহুরের। তিন বছরের মধ্যে সব পরিচয় সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মা ও বোন নেই, কোন আত্মীয় বা পরিচিত কাউকে খুঁজে পায়নি। আজ সে একা, একেবারে আত্মীয়-পরিজন বিবর্জিত এক নিঃসঙ্গ যুবক।

অবশেষে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল বেনহুর, কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই। আমি শুধু আমার কাহিনী আপনাকে বলতে পারি। কিন্তু তাতে ত আপনার সন্দেহ দূর হবে না। হে সাইমোনাইদিস, আপনাকে আমার ক্রীতদাস হিসেবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অথবা আপনার সম্পত্তির হিসাব নিতে আসিনি আমি। আমি এসেছি শুধু আমার মা ও বোন টির্জার খবর জানতে। আপনি তাদের কোন খবর জানেন কি?

এর পরও কেন তার বাবা বেনহুরকে স্বীকার করে নিতে পারছে না হুর বংশের ছেলে বলে তা বুঝতে পারল না এস্থার। তার চোখে জল এল। সাইমোনাইদিস বলল, আমি বেনহুরের দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছি। তাদের খোঁজ নেবার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু কোন খোঁজ পাইনি। তারা হারিয়ে গেছে।

আর্তকণ্ঠে বলে উঠল বেনহুর, তাহলে সব আশাই আমার নির্মূল হলো। আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা করবেন। আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ।

সাইমোনাইদিস বলল, আপনি শান্তিলাভ করুন।

বেনহুর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল সে। তার মুখটা লাল হয়ে উঠল কি ভেবে। তার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, ঘন্টা বাজাও এস্তার।

ঘন্টা বাজাতেই ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। একটি লোক এসে মনিবকে সেলাম করে দাঁড়াল।

সাইমোনাইদিস তাকে ডেকে বলল, কাছে এস মালুচ। তোমাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। একটি যুবক সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। তাকে দেখতে ইহুদীদের মত। সে কি করে, কোথায় থাকে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তা জেনে প্রতিদিন রাতে আমাকে খবর দেবে। তার যদি কোন কথাবার্তা শুনতে পাও তাও জানাবে আমায়। সে যদি শহর ছেড়ে কোথাও চলে যায় তাহলে তুমিও যাবে। তবে সব সময় তাকে বন্ধুর মত দেখবে। তোমার সঙ্গে যদি তার কখনো দেখা হয় বা কথা বলে, অবস্থা বুঝে সাবধানে জবাব দেবে। কিন্তু আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি বা এ কাজের ভার দিয়েছি তা বলবে না। যাও, চলে যাও।

ভৃত্যটি চলে গেলে সাইমোনাইদিস তার মেয়েকে বলল, এস্তার, যুবকটি যখন কথা বলছিল তখন আমার মনে হলো সে তোমার মন জয় করে নিয়েছে।

মুখ নিচু করে এস্তার বলল, সত্যি বলছি বাবা, আমি তার সব কথা বিশ্বাস করেছি।

তাহলে তুমি বলতে চাও এই যুবকই রাজা হুরের হারানো ছেলে?

আমি ঠিক জানি না। তবে সে যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে মিথ্যা কখনো সত্যের ভূমিকায় এত ভাল অভিনয় করেনি।

খুশি হয়ে সাইমোনাইদিস বলল, তবে আমার জীবনের কাহিনী বলছি, শোন। হিলোম উপত্যকায় এক কবরখানায় আমার জন্ম হয়। বাপ মা ছিল জন্ম ক্রীতদাস। রাজার বাগানে ডুমুর ও দ্রাক্ষালতার দেখাশোনা করত। ছেলেবেলায় আমিও তাদের সাহায্য করতাম। আমার বাপই আমাকে বেচে দিয়েছিল রাজা হুরের কাছে। রাজা হুর আমাকে আলেক-

জান্দ্রিয়ায় তার মালগুদামে কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। সেখানে দু বছর কাজ করার পর সপ্তম বছরে মোজেস এর বিধান অনুসারে মুক্তি পাই আমি।

এস্তার প্রশ্ন করল, আমার মার কি হল ?

মুক্ত হয়ে আমি আমার মনিবের কাছে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। আমিও তাঁকে ভালবাসতাম। আমি তাঁরই কাছে কাজ করতে চাইলাম। তিনি আমাকে কাজ দিলেন। কাজের জন্য বেতন দিতেন। মনিবের প্রতিনিধি হয়ে জলপথে স্থলপথে বহু দেশে রেশমের ব্যবসা করে বেড়িয়েছি। প্রচুর লাভ করে অনেক ধনরত্ন আনলাম একবার। একদিন জেরুজালেমে আমার মনিবের বাসভবনেই তোমার মাকে দেখতে পাই। তাকে দেখে ভালবাসলাম, হৃদয় বিনিময় করলাম। সে ছিল ক্রীতদাসী। বিয়ের অনুমতি চাইলাম রাজা হুরের কাছে। তোমার মাও আমাকে ভালবেসে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু সে বলল সে মনিবকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। আমি তাকে বিয়ে করলে আমাকেও ঐ বাড়িতেই থাকতে হবে দাস হয়ে। অগত্যা তারই জন্য আবার আমি ক্রীতদাস হলাম। বাঁ কানে আজও আমার তুরপুনের দাগ আছে।

এস্তার বলল, সত্যিই বাবা. তোমার ভালবাসা কত মহৎ।

সাইমোনাইদিস আবার বলতে লাগল, দাস হলেও মনিব আমাকে নিজের লোকের মত দেখত। বিশ্বাস করত। ক্রমে প্রধান নায়েব হয়ে উঠি। এমন সময় একদিন সমুদ্রে ডুবে আমার মনিব মারা যান। তাঁর বিধবা স্ত্রীর আমলেও আমিই প্রধান নায়েব হিসাবে সব কাজ কারবার দেখাশোনা করতে লাগলাম। সব কারবারেই প্রচুর লাভ হতে লাগল। এইভাবে দশ বছর কেটে গেল।

তারপর নেমে এল এক চরম আঘাত। প্রোকিউরেটার গ্র্যাটাস-এর সেই দুর্ঘটনা। কিন্তু সেই দুর্ঘটনাটাকে রোমকরা হত্যা হিসাবে রটনা করল। সেই অজুহাতে বিধবার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হলো। গোটা পরিবারটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে জনগণের মন থেকে মুছে দেওয়া হলো একেবারে। তারা বেঁচে আছে কি মারা গেছে সেকথা আজও জানতে পারিনি।

এস্তারের চোখে জলের ধারা বয়ে চলেছিল।

সাইমোনাইদিসের কাহিনী শেষ হয়নি তখনো। সে বলল, খবর পেয়ে জেরুজালেমে ফিরে এলাম। প্রধান ফটকের কাছে যেতে ওরা আমাকে

গ্রেপ্তার করে এ্যাণ্টনিয়া দুর্গের এক অন্ধকার কারাকক্ষে রেখে দিলে। একদিন স্বয়ং ভ্যালেরিয়াস এসে হুর বংশের সব ধনরত্ন ও টাকা পয়সা দাবি করল আমার কাছ থেকে। কারণ তখন আমার নামেই সব কাজ কারবার চলত। তাই সে তার হুকুমমত সব কাগজে সই করতে বলল। আমি আপত্তি করতে ওরা নির্যাতন শুরু করল। আমি কিছুতেই মাথা নত করলাম না। অবশেষে সে মুক্তি দিল আমায়। নতুন করে বাণিজ্য শুরু হল। এ্যান্টিয়কের সাইমোনাইদিস্‌-এর নামে। তারপর থেকে দারুণ উন্নতি হয়েছে আমার। তুমি তার সবই জান। আমার মনিবের আমলের পুঁজি অনেক গুণ বেড়ে যায়। তিন বছর পর সিজারিয়াতে গ্র্যাটাস আমাকে বন্দী করে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য আবার নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু আমাকে টলাতে পারেনি কোন কিছু। অবশেষে ভগ্নদেহ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম আমার কথা ভেবে ভেবে তোমার মা র‍্যাচেল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। পরে স্বয়ং রোমের সম্রাটের কাছ থেকে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যের অনুমতিপত্র নিয়ে এলাম। নায়েব থাকাকালে আমার যা ছিল তার থেকে এখন অনেক গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু এস্তার, এই ধন-সম্পদ নিয়ে আমি কি করব ?

এস্তার বলল, এই সব কিছুর প্রকৃত মালিক ত তা নিতেই এসেছিল।

সাইমোনাইদিস বলল, তোমাকে আমি নিঃস্ব করে যাব না, তুমি আমার মা। যুবকটি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়াল তখন ওকে বেশই চিনতে পারলাম। ও যেন ওর বাবার যৌবনের প্রতিমূর্তি। একবার মনে হলো, তাকে অভিবাদন জানিয়ে আমার অর্জিত সব ধনসম্পদ তাকে দেখাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলাম, সে যে আমার মনিবের ছেলে তা নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। তাছাড়া তার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে হবে, কারণ ধনীর ছেলে অনেকেই খারাপ হয়।

এস্তার বলল, সে ত চিরদিনের মত চলে যাবে এখান থেকে। আর ত আসবে না।

আমার বিশ্বস্ত মালুচ সময় হলেই তাকে নিয়ে আসবে।

কিন্তু কবে আসবে ?

হ্যাঁ আসবে, দেরি হবে না। অন্ততঃ একজন সাক্ষী এখনো বেঁচে আছে। এখনো সে তাকে ঠিক চিনতে পারবে। সে সাক্ষীকে তার সামনেই হাজির করব। তা যতদিন না হয় ঈশ্বরের উপরেই ছেড়ে দিতে হবে।

২

ছায়াঘেরা সাইপ্রাস বনের মধ্য দিয়ে একা একা যাচ্ছিল বেনহুর। পথের ধারে সহসা একটি দেশীয় লোককে শুয়ে থাকতে দেখল সে। তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আপনিও কি আমার পথেই যাবেন ?

লোকটি বলল, আমি যাব স্টেডিয়ামের দিকে। যে ভেরীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তা প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে বাজানো হচ্ছে। ওখানে রথের দৌড়ের প্রতিযোগিতা হবে।

বেনহুর বলল, আমি অরিয়াসের ছেলে। আপনি ?

লোকটি বলল, আমি এ্যান্টিয়কের বণিক। নাম মালুচ।

আমিও তা দেখতে চাই, কারণ এ ব্যাপারে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

বন পার হয়ে ওরা দেখল একটা মাঠকে স্টেডিয়ামের মত করে সাজানো হয়েছে। বর্শা পুঁতে দড়ি বেঁধে সীমানা ঘেরা হয়েছে। দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিড় ঠেলে ওরা দুজনে দর্শকদের জায়গায় বসল।

বেনহুর দেখল, প্রতিযোগীদের মোট নটা রথ আছে। প্রতিটি রথে চারটে করে ঘোড়া আছে। প্রথম আটটা রথ ধীর গতিতে এল। কিন্তু শেষ রথটা এল জোর কদমে। দর্শকরা হৈ চৈ করতে শুরু করে দিল। ঘোড়াগুলো হকচকিয়ে গিয়ে গোলমাল করতে লাগল।

বেনহুর দেখল দর্শকদের মধ্য থেকে লম্বা সাদাকালো দাড়িওয়ালা আধ-বুড়ো একটি লোক উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত মুঠো করে নবম প্রতিযোগীর উদ্দেশে ছুঁড়ছে। তার চোখদুটো আগুনের মত জ্বলছে। দর্শকরা তার উত্তেজনা দেখে হাসাহাসি করছে।

বেনহুর তার পাশের দর্শকদের জিজ্ঞাসা করল, লোকটি কে ?

দর্শকরা বলল, মরুভূমি অঞ্চলের এক প্রধান। মস্তবড় ধনী লোক। বহু উট ও ঘোড়ার মালিক। নাম শেখ ইণ্ডেরিম।

রথটা তখন অনেক কাছে এসে পড়েছে। রথের চালক ঘোড়াগুলোকে বশে আনতে পারছিল না। শেখ তাকে লক্ষ্য করে গালাগালি করছিল। অবশেষে শেখের লোকজন ঘোড়াগুলোকে ধরে শান্ত করল।

এর পর দুটো কালো আর দুটো সাদা ঘোড়ায় টানা আর একটি রথ এল। রথটি দেখতে খুব সুন্দর। রথের গায়ে স্বর্ণখচিত লতাপাতা আঁকা। চাকা

ছুটি অপরূপ কারুকার্য করা। সে রথটি এগিয়ে আসতে দেখে হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে উঠল দর্শকরা।

বেনহুর রথের চালককে চেনে মনে হলো। দেখল সে রথের রথী হচ্ছে মেসালা।

প্রতিযোগী রথগুলির মহড়া শেষ হলো। আবার প্রতিযোগিতা হবে পরে।

স্টেডিয়াম থেকে নামতে নামতে শুনতে পেল একজন আরব চিৎকার করে বলছে, শেখ ইল্ডেরিম ঘোষণা করেছেন, তিনি চারটি ঘোড়া নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে এসেছেন। তিনি একজন শক্তিমান চালক চান। যে তাঁকে সেই চারটি ঘোড়ায় টানা রথ চালিয়ে খুশি করতে পারবে তাকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

বেনহুর মালুচকে জিজ্ঞাসা করল, এর পর কোথায় যাওয়া হবে?

মালুচ বলল, কাস্টালিয়ায় ঝর্ণার ধারে।

বেনহুর সেখানে যেতে চাইল।

সেখানে গিয়ে দেখল, পাহাড়ের উপর থেকে একটা জলধারা মস্তবড় একটা পাথরের পাত্রে পড়ে নিচের একটা ফাটলের মধ্যে চলে যাচ্ছে। পাত্রটার পাশে পাহাড়ের খাঁজে একজন পুরোহিত বসে আছে। লোকটার মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি আর বলিরেখা। মাঝে মাঝে দর্শকদের মধ্য থেকে এক একজন লোক মুদ্রাসমেত তার হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছে আর পুরোহিতটি মুদ্রা নিয়ে তাকে প্যাপিরাস গাছের একটি করে পাতা দিচ্ছে। লোকটি তখন পাতাটাকে পাশের পাত্রের জলে ডুবিয়ে ভিজে পাতাটাকে সূর্যের আলোয় মেলে ধরছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ফুটে উঠছে একটি করে কবিতা। সেই কবিতাতেই তার ভাগ্যের কথা লেখা আছে। বেনহুরের ইচ্ছা হচ্ছিল সেও তার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে। কিন্তু তার আগেই সে দেখল একদল লোক উট আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছে এই দিকে।

প্রথমে আসছিল একটা উট। উটের পিঠে ছিল একটা হাওদা বা ছোট তাঁবু। তার মধ্যে বসেছিল এক নারী ও পুরুষ। দুজন অশ্বারোহী বর্শাধারী উটের দুদিকে পাহারা দিয়ে উটটাকে চালিয়ে নিয়ে আসছিল। উটের পিঠে চেপে থাকা নারী পুরুষকে সবাই অভিবাদন জানাচ্ছিল।

এমন সময় রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ শুনে জনতা ভয় পেয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। মালুচ বেনহুরকে বলল, দেখছ, রোমক লোকটা এমনভাবে রথ চালাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে জনতাকে পিষে ফেলবে।

বেনহুর দেখল রথারোহী বেপরোয়াভাবে রথ চালাচ্ছে এবং রথটা উটের সামনা-সামনি এসে পড়েছে। উটের আরোহী দুজন ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পুরুষটি বৃদ্ধ আর নারীটি তরুণী যুবতী। বৃদ্ধ আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না।

বেনহুর তখন উটের নারী পুরুষকে বাঁচাবার জন্য রথের ঘোড়াগুলোর সামনে গিয়ে দুটো ঘোড়াকে ধরে রথের দণ্ডটা ঘুরিয়ে দিল। রথের আরোহীকে বলল, রোমক কুকুর কোথাকার! তুই কি লোক চাপা দিয়ে নিজে মরতে চাস?

মেসালাই ছিল রথের আরোহী। রথটা উল্টে পড়ে গেল। মেসালা রথেই কোনরকমে বসে রইল, কিন্তু তার সঙ্গী মার্টিলাস ছিটকে পড়ে গেল রথ থেকে।

এর পর মেসালা রথ থেকে নেমে এসে উটের আরোহী বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি আপনাদের দুজনের কাছ থেকেই ক্ষমা চাইছি। আপনাদের আমি ঠিকমত দেখতে পাইনি।

তারপর মেয়েটিকে সম্বোধন করে বলল, হে অপরিচিতা, তুমি যেমন সুন্দরী, তেমনি নিষ্ঠুরা। এ্যাপোলো যদি তোমাকে সরিয়ে না নেন পৃথিবী থেকে তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে।

মার্টিলাস ততক্ষণে উঠে ঘোড়াগুলোকে শান্ত করেছে। মেসালা রথে চেপে রথ চালিয়ে চলে গেল। উটের পিঠ থেকে মেয়েটি মেসালার রথটার দিকে তাকিয়ে রইল।

উটের আরোহী বৃদ্ধকে বেনহুর ডেকে বলল, তুমি লোকটাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছ।

বৃদ্ধ বলল, আমার নাম বালথাজার। আমি মিশরের লোক। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। ডফনে গ্রামের ওপারে তালবনের ধারে শেখ ইণ্ডেরিম যে তাঁবু ফেলেছেন আমরা সেইখানেই উঠেছি। আমরা তাঁরই অতিথি। সেখানেই আমাদের খোঁজ করবে। তুমি অবশ্যই যাবে। তোমার পানাহারের ব্যবস্থা থাকবে সেখানে।

৩

সেদিন সাইমোনাইদিস তার চেয়ারটায় বসে ছিল। তার মেয়ে এস্তার তার কাছেই ছিল। এমন সময় মালুচ ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানাল তাদের।

সাইমোনাইদিস তাকে জিজ্ঞাসা করল, যুবকটির কোন খোঁজ পেলে?

মালুচ তার সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলল। সাইমোনাইদিস তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, তোমার কর্তব্য ভালভাবেই পালন করেছ। তবে তার পরিচয় কি জানলে বল।

সে একজন ইজরায়েলী এবং জুডার বংশজাত।

তুমি ঠিক জান?

হ্যাঁ, ঠিক জেনেছি।

সে এখন কি চায় তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছ?

তার প্রথম উদ্দেশ্য তার মা ও বোনের খোঁজ করা। তারপর তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো রোম ও বিশেষ করে মেসালার উপর প্রতিশোধ নেওয়া।

সাইমোনাইদিস বলল, কিন্তু মেসালা প্রভাবশালী লোক।

মালুচ বলল, তা হোক, তবে তারও শক্তি আর তেজস্বিতা কম নেই। সার্কাসে রথের প্রতিযোগিতায় সে-ই জিতবে।

কি করে বুঝলে?

তার কথা শুনে ও মুখের ভাব দেখে বুঝেছি।

ঠিক আছে, এখন যাও। আসন্ন প্রতিযোগিতায় যুবকটিকে সাহায্য করবে। সকালে এস। ইল্‌দেরিমকে একটা চিঠি দেব।

মালুচ চলে গেলে সাইমোনাইদিস আপন মনে বলল, আমিও হয়ত সার্কাসে যাব।

তারপর সে কিছুটা দুধ খেয়ে তার মেয়েকে বলল, ঈশ্বর আমার প্রতি খুবই সদয়। আমার এই শেষ জীবনে যখন জীবনের সব আশাই নির্মূল হতে বসেছিল তখন তিনি নতুন এক আশার বাণী পাঠিয়েছেন।

সেদিন তালবাগানের ধারে শেখ ইল্‌দেরিমের তাঁবুতে বসে বেনহুর ইল্‌দেরিমের সঙ্গে গল্প করছিল, এমন সময় বালথাজারকে ধরে এনে ডিভানের উপর বসানো হলো। একটা লাঠি আর একজন চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে চলাফেরা করত বালথাজার।

ইল্‌দেরিম বালথাজারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, বালথাজার, ইনিই বেনহুর, আমাদের অতিথি। এঁকে আমি কথা দিয়েছি, আগামীকাল আমার ঘোড়াগুলি নিয়ে ইনি আমার রথ চালিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। ইনি সাইমোনাইদিসের পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছেন। ইনি যদিও ইজরায়েলী বলে পরিচয় দিয়েছেন তথাপি এঁকে মহান রোমক নাবিক অরিয়াসের পুত্র হিসাবেই জানবেন।

বালথাজার বলল, কাল আমার জীবন যখন বিপন্ন হয় তখন এঁরই মত এক যুবক এগিয়ে এসে আমাকে বাঁচান।

এর পর বেনহুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনিই কি সেই যুবক ?

বেনহুর বলল, গতকাল কাস্টানিয়া ঝর্ণার ধারে এক উদ্ধত রোমকের ঘোড়াগুলো যখন আপনার উটের উপর প্রায় এসে পড়েছিল তখন আমিই সেগুলোকে থামিয়ে দিয়েছিলাম।

শেখ ইণ্ডেরিম আশ্চর্য হয়ে বলল, এতবড় একটা কাজ করেছেন, কিন্তু আমাকে ত কিছু বলেননি। এ কাজের পুরস্কার আমি ছাড়া আর কে দেবে এখানে ?

এর পর খাবার প্রস্তুত হলে প্রাচ্য প্রথায় তিনজন খেতে বসল। একজন আরব, একজন ইহুদী আর একজন মিশরীয়।

পঞ্চম পর্ব

১

সেদিন মেসালা যখন তার অফিস ঘরে বসে কাজ করছিল তখন দুজন সভাসদ এসে ঘরে ঢুকল। এই দুজন সভাসদকে দুটি শীলকরা সরকারী খামের চিঠি দিয়ে একই লোকের কাছে পাঠাচ্ছে মেসালা। একই লোক প্রোকিউরেটর ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাসকে লেখা দুটি চিঠির বিষয়বস্তু এক। দুটি চিঠি নিয়ে দুজনে দুটি ভিন্ন পথে যাবে একই লোকের কাছে। একজন যাবে জলপথে আর একজন যাবে স্থলপথে।

চিঠির বিষয়টি নিচে দেওয়া হলো। মেসালা গ্র্যাটাসকে লিখছে জেরুজালেমের হুর বংশের যুবরাজ বেনহুরের অপরাধ নিশ্চয় মনে আছে ? তাকে আপনার স্মরণ না থাকলে আপনার কপালের কাটা দাগটার সাহায্য নিতে পারেন। আপনার জীবননাশের চেষ্টার শাস্তি হিসাবে তার গোটা পরিবারকে দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সেই সম্পত্তি আজ আমরা দুজনে ভাগ করে নিয়ে ভোগ করে চলেছি। সেদিন গোটা পরিবারটাকেই নিশ্চিত মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবার এক পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তার মা বোনকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছিল আপনার হয়তো তা মনে আছে। তবে তারা আজ বেঁচে আছে কি না তা

জানতে ইচ্ছা করে। অপরাধী বেনহুরকে জাহাজের ক্রীতদাস করে পাঠানো হয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সেই বেনহুর আজ কুইন্টাস অরিয়াসের দত্তকপুত্র। আপনি জানেন কনসাল ম্যাক্সেন্টিয়াস পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করবেন সেই অভিযানে বেনহুরও যোগদান করবে। জাহাজের দাঁড় টানতে টানতে যে বেনহুরের আগেই মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল সেই বেনহুর আজ বহাল তবিয়তে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথা উঁচু করে। ফলে এখনই আমি বিশেষ বিপন্নবোধ করছি। কারণ অতীতে একদিন এই বেনহুর আমার খেলার সাথী থাকলেও আজ তার জীবনের একমাত্র চিন্তা হলো আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা। দেশের জন্য তার মা বোনের জন্য নিজের জন্য ও হারানো সম্পত্তির জন্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায় সে। এই ইহুদী বেনহুরকে আমি গতকাল নিজের চোখে দেখেছি কাস্টালিয়া ঝর্ণার ধারে। আমার বিশ্বাস, এখন তাকে পাওয়া যাবে তালবনের ধারে শেখ ইল্‌দেরিমের শিবিরে। আমার শক্ত মুঠোর বাইরে এই শেখ আর বেশীদিন থাকতে পারবে না। কনসাল ম্যাক্সেন্টিয়াস এই শেখকে জাহাজে চাপিয়ে রোমে পাঠিয়ে দিতেও পারে। এখন ইহুদী বেনহুরকে নিয়ে কি করবেন তা আপনিই ভেবে দেখবেন। তবে যা কিছু করবেন স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করেই করবেন। আপনার বন্ধু হিসাবে আপনার যে কোন কাজের ভার নেবার জন্য প্রস্তুত।

২

মেসালার দুটি চিঠি নিয়ে তার সভাসদ দুজন বেরিয়ে চলে যায় তাদের গন্তব্য স্থানের দিকে। এদিকে স্নান ও প্রাতরাশের পর শেখের শিবিরে গিয়ে ঢুকল বেনহুর।

ডিভানের উপর বসেছিল শেখ। বেনহুরকে দেখেই সে বলল, এখনি আমার ঘোড়া এসে পড়বে। আপনি বসুন।

বেনহুর জিজ্ঞাসা করল, ঘোড়াগুলোকে কি রথের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে না এখনো হয়নি?

তাহলে ঘোড়াগুলোর সঙ্গে আগে আমার পরিচয় হওয়ার দরকার। তাদের নাম জানতে হবে এবং মেজাজ বুঝে নিতে হবে। তাহলে সুবিধা হবে আমার পক্ষে।

শেখ জিজ্ঞাসা করল, রথটা আনবে ত?

বেনহুর বলল, মোট পাঁচটি ঘোড়ার মধ্যে চারটির জন্য সাজ আনা হবে আর পাঁচ নম্বর ঘোড়াটির জন্য আনা হবে শুধু লাগাম।

বেনহুর নিজের হাতে চারটি ঘোড়াকে সাজ পরাল। তারপর মুখে লাগাম এঁটে দিল। অবশেষে সে পাঁচনম্বর ঘোড়া সাইরিয়াসের উপর চেপে বসল। সাইরিয়াসকে মাঝখানে রেখে তার দুদিকে দুটো করে ঘোড়াকে রাখল। চারটি ঘোড়ার লাগাম আলগা করে তুলে দেওয়া হলো তার হাতে।

শিবির থেকে মাঠ পর্যন্ত একটা লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেনহুরকে। রথের পরিবর্তে ঘোড়ার পিঠে চেপে বাকি ঘোড়াগুলোকে চালাতে লাগল বেনহুর। প্রথমে ধীর গতিতে ও পরে জোর কদমে চালাতে লাগল সে ঘোড়াগুলোকে। পুরো এক ঘণ্টা ধরে এইভাবে অনুশীলন করল বেনহুর।

এরপর ঘোড়া থেকে নেমে এসে বেনহুর শেখকে বলল, ধন্যবাদ! আমাদের ঘোড়াগুলো ভাল। আর একটু অনুশীলন করলেই হয়ে যাবে।

কিছু পরে মালুচ এসে শেখকে বলল, শেখ সাহেব। সাইমোনাইদিসের কাছ থেকে চিঠি এনেছি। পাওয়ামাত্র পড়তে বলেছেন।

সেইখানে দাঁড়িয়ে খামের শীল ভেঙ্গে কাপড়ে জড়ানো দুখানি চিঠি বার করে তা পড়তে লাগল ইণ্ডেরিম।

প্রথম চিঠিখানিতে সে লিখেছে অরিয়াসের দত্তক পুত্রের সম্বন্ধে বলছি। তার যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি যেন তা করেন। যুবকটি আমার খুবই প্রিয়পাত্র। দরকার হলে তার জন্য যে কোন ক্ষতিপূরণ করতে আমি রাজী আছি। আপনি যেন সার্কাসে প্রতিযোগিতার দিন সদলবলে উপস্থিত থাকবেন। আপনাদের সকলের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছে, অসীম ক্ষমতার অধিকারী এক পদস্থ রোমক কর্মচারী কুনসাল ম্যাক্সেন্টিয়াসের আসার আয়োজন হচ্ছে। যে সব অ-রোমক ব্যক্তির অর্থ ও প্রচুর মালপত্র আছে তাদের সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। হেরোডের রাজ্যে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। সেখানে আপনার অনেক বিষয় সম্পত্তি আছে। এ্যান্টিয়ক থেকে দক্ষিণমুখী রাজপথে যে সব রক্ষী আছে আপনি তাদের নির্দেশ দেবেন তারা যেন বহির্গামী ও আগমনকারী যে কোন পত্রবাহককে তল্লাসী করে। কারো কাছে

আপনার সম্পর্কিত কোন চিঠিপত্র পেলে তারা যেন আপনাকে তা দেখায়। চিঠি পড়েই পুড়িয়ে ফেলবেন।—আপনার বন্ধু সাইমোনাইদিস।

চি ঠ দুখানি পড়ে কাপড়ের মধ্যে পুরে কোমরে রেখে দিল ইণ্ডেরিম।

৩

সেদিন বেনহুরের জন্যই অপেক্ষা করছিল শেখ ইণ্ডেরিম। ডিভানে নিজের পাশে বেনহুরকে বসিয়ে খাম খুলে বলল, অরিয়াসপুত্র, লাতিন ভাষায় লেখা এই চিঠিটা পড়ে দিন।

চিঠিটা মেসালা লিখেছে গ্র্যাটাসকে। বেনহুর পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল তার। তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। মেসালা লিখেছে, দুষ্কৃতিকারীর মা ও বোন সম্পর্কে আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা হয়ত মনে আছে আপনার। তবে তারা আজও বেঁচে আছে কিনা তা জানতে চাই।

পড়তে পড়তে চমকে উঠল বেনহুর। কথাগুলো বারবার পড়ল। তারপর মনে মনে বলল, তারা নিশ্চয় মরেনি, মরলে ও জানতে পারত।

চিঠিটা আগে নিজে পড়ে পরে শেখকে শোনাল। তারপর বলল, আমার জীবনের ইতিহাস আপনাকে বলিনি এর আগে। কিন্তু এখন বলা দরকার। কারণ এখন সেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদের।

বেনহুব চিঠির সেই অংশটা আবাব পড়ল যেখানে লেখা ছিল, মাক্সেন্টিয়াস যদি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আরবকে জাহাজে চাপিয়ে রোমে পাঠিয়ে দেয় তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তা শুনে গর্জন করে উঠল শেখ। বলল, আমি দশ হাজার বর্শাধাবী অশ্বারোহীর মালিক, আমাকে কিনা রোমে পাঠাবে।

সে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো ক্রুদ্ধ সাপের চোখের মত জ্বলতে লাগল। তারপর আবার বলতে লাগল, হে ঈশ্বর! আমি স্বাধীন মানুষ, তবু আমাকে ক্রীতদাস করতে চায়? কবে এই স্পর্ধার অবসান হবে? প্রভুর পায়ের তলায় পড়ে থাকা কুকুরের মত বাঁচতে হবে আমায়? আমার বয়সটা যদি কমে যেত, আবার যদি যৌবন ফিরে পেতাম!

বলতে বলতে বেনহুরের কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, অরিয়াসপুত্র, আমি যদি আপনার মত বয়সে যুবক, শক্তিশালী এবং রণকুশল হতাম! এই মুহূর্তে ছদ্মবেশ দূর করে ফেলে আপনার সঙ্গে একযোগে ঝাঁপিয়ে

পড়তাম শত্রুর উপর। আমি জানি তুমিই হুরপুত্র। শোন হুরপুত্র, তোমার উপর যে অন্যায় যে অবিচার করা হয়েছে, আমার উপর তার অর্ধেকও যদি করা হত, যদি দুঃসহ দুঃখে আর অপমানের জ্বালা আমাকে সব সময় তাড়া করে নিয়ে বেড়াত তাহলে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠতাম আমি ভয়ঙ্করভাবে। আর দেশে দেশে সে আগুন ছড়িয়ে দিতাম। রোমের বিরুদ্ধে যে কোন মুক্তিযুদ্ধের সামিল হতাম। রোমের যা কিছু সব পুড়িয়ে ফেলতাম। প্রতিটি জীবন্ত রোমককে বিদ্ধ করতাম অস্ত্রাঘাতে।

বলতে বলতে হাঁপাতে লাগল শেখ। তার কথা বন্ধ হতে আশ্চর্য হয়ে গেল বেনহুর। তার মুখে নিজের নাম শুনে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেল সে। একজন মানুষ অন্ততঃ তাকে চেনে। সুন্দর মরুভূমি অঞ্চল থেকে আসা এক আরব তাকে চিনতে পেরেছে।

বেনহুর জিজ্ঞাসা করল, এ চিঠি কোথা হতে পেলেন শেখ সাহেব?

শেখ বলল, সব রাজপথে আমার লোক আছে। একজন পত্রবাহকের কাছ থেকে এই চিঠি উদ্ধার করা হয়েছে। আমার কথার জবাব কিন্তু পাইনি।

বেনহুর বলল, আপনার কথামত কাজ আমি করব। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যে প্রতিহিংসা আমি পোষণ করে আসছি অন্তরে, সেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই রোমে এসেছি আমি। অন্য কোন শাস্ত্র না শিখে শুধু রণকৌশল শিখেছি বিভিন্ন জায়গায় যত গ্ল্যাডিয়েটর ও সার্কাসের বিজয়ী বীরদের কাছে। তাদের কাছে শিক্ষা নিয়েছি। তবে শেখসাহেব, আমি যুদ্ধবিদ্যা শিখে সৈনিক হয়েছি, কিন্তু আমার স্বপ্নকে আজো সফল করে তুলতে পারিনি। আমার প্রতিহিংসা আজও চরিতার্থ হয়নি। আমার সেই স্বপ্নকে সফল করার উদ্দেশ্যেই পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে যোগ দিয়েছি আমি। এই অভিযান থেকে যদি আমি সুস্থ দেহে ফিরে আসি তাহলে আমি হব রোমক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী রোমের শত্রু। এই হলো আমার জবাব।

বেনহুরকে চুম্বন করে শেখ বলল, তোমার হাতে হাত দিয়ে শপথ করলাম। তোমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করব আমি। আমার যত সব লোকজন, ঘোড়া, উট এবং বিস্তীর্ণ মরুভূমি প্রস্তুত হয়ে থাকবে তোমার জন্য।

এই বলে সেখান থেকে দ্রুত পায়ে চলে গেল ইণ্ডেরিম।

৪

তখন রাত্রি ঘন হয়ে উঠেছে। শিবিরের দরজায় একা বসেছিল বেনহুর। হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে মালুচ এসে উপস্থিত হলো সেখানে। ঘোড়া থেকে নেমেই মালুচ বলল, শেখ ইণ্ডেরিম আমায় পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। তিনি এখন অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।

কোন প্রশ্ন বা দ্বিধা করল না বেনহুর। ঘোড়ায় করে রওনা হয়ে পড়ল মালুচের সঙ্গে। ইণ্ডেরিম তখনো ফেরেনি শিবিরে।

সাইমোনাইদিসের বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থামাল মালুচ। একা বাড়ির ভিতর ঢুকল বেনহুর।

একটি ঘরের ভিতর সাইমোনাইদিস, শেখ ইণ্ডেরিম ও এস্তার বসেছিল। বেনহুর ঘরে ঢুকতেই সবাই তার দিকে তাকাল।

সাইমোনাইদিস বলল, হুরপুত্র, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আপনাকে শান্তি দান করুন।

বেনহুর বলল, আপনার ছেলের মত আমিও আপনাকে সে কামনা ফিরিয়ে দিই।

সাইমোনাইদিস মাথাটা নত করে সে দান গ্রহণ করে এস্তারকে দরকারী কাগজগুলি আনতে বলল।

এস্তার দেওয়ালের তাক থেকে এক বাণ্ডিল প্যাপিরাস পাতা এনে দিল। সাইমোনাইদিস একটা পাতা নিয়ে বলল, রোমকদের হাত থেকে আপনার বাবার যে অর্থ বাঁচাতে পেরেছিলাম, এই তার হিসাব। সম্পত্তি কিছু রক্ষা করতে পারিনি। শুধু রোম, আলেকজান্দ্রিয়া, দামাস্কাস, কার্থেজ, ভ্যালেন্সিয়া ও অন্য সব দেশে যে অর্থ আমি আদায় করতে পেরেছিলাম তার মোট পরিমাণ ইহুদী মুদ্রায় একশো বিশ ট্যালেণ্ট।

পাতাটা পড়ার পর এস্তারের হাতে দিয়ে আর একটা পাতা তুলে নিল। তারপর বলল, এই একশো বিশ ট্যালেণ্ট নিয়ে ব্যবসা শুরু করে মোট লাভ হয়েছে পাঁচশো তিপান্ন ট্যালেণ্ট। তাহলে সব মিলিয়ে মোট হয় ছশো তিয়াত্তর ট্যালেণ্ট। এই সবটারই মালিক আপনি। তার ফলে আপনি আজ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী এবং এই ধন সম্পদ নিয়ে আপনি করতে পারেন না এমন কোন কাজ নেই।

হিসাব লেখা পাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনহুর। তারপর বলল,

আপনার প্রভুভক্তির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই সাইমোনাইদিস। এই কাগজপত্রে যা কিছুর হিসাব লেখা আছে জাহাজ বাড়িঘর, মালপত্র, উট, ঘোড়া ও নগদ অর্থ সব কিছুই আমি ফিরিয়ে দিলাম আপনাকে। এইসব কিছুরই মালিক আপনি। তবে আমার অনুরোধ আমার বাবার অপর একশো বিশ ট্যালেণ্ট আমাকে দেবেন আপনি। আর একটা শর্ত, আমার মা বোনকে খুঁজে বার করার কাজে আপনি আমায় যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। শেখ ইণ্ডেরিম, আপনি সাক্ষী রইলেন।

এস্তারের চোখে জল এসেছিল। তবু তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সাইমোনাইদিস অবাক আনন্দিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। ইণ্ডেরিমও খুশি হয়ে তার দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল।

সাইমোনাইদিস আবেগে অভিভূত হয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, আপনার বাবার জীবিতকালে ও তাঁর মৃত্যুর পরেও আমি যেমন তাঁর সেবা করেছি, তেমনি আপনারও সেবা করে যাব। তবে সব হিসাব আপনি দেখেননি।

এই বলে আর একটা কাগজ তার হাতে দিল। তাতে হুর পরিবারের ভৃত্য তালিকা ছিল। পাতাটা নিয়ে পড়তে লাগল বেনহুর।

১। মিশরদেশিনী আমরাহ্ জেরুজালেমের প্রাসাদরক্ষিনী।

২। সাইমোনাইদিস, এ্যান্টিয়কের নায়েব।

৩। সাইমোনাইদিসের কন্যা।

সাইমোনাইদিস বলল, আমি আপনাদের চির জীবনের দাস। আমার কানে এখনো তুরপুনের দাগ আছে। আপনি আমাদের আইনত মুক্তি দিতে পারেন না। সমপর্যায়ভুক্ত না হলে র‍্যাচেলকে আমার স্ত্রী হিসাবে পেতাম না। তাই স্বেচ্ছায় আমি এ দাসত্ব বরণ করে নিয়েছিলাম।

বেনহুর বলল, আপনার স্ত্রী কি চিরজীবনের দাসী ছিলেন?

হ্যাঁ তাই।

অশান্তভাবে ঘরময় পায়চারি করতে করতে বেনহুর বলল, আপনাদের আমি মুক্তি দেব। আপনি শুধু আমার উদ্দেশ্য সাধনের পথে সাহায্য করুন। সৎ পরামর্শ দিন।

সাইমোনাইদিসের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, হে আমার স্বর্গত প্রভুর প্রিয় পুত্র। আপনার জন্য আমি সব করব, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে সারা জীবনভোর আপনার সেবা করে যাব। আমার শুধু একটা আবেদন,

আপনাকে ঘোষণা করতে হবে, নায়েব হিসাবে আপনার সব সম্পত্তির দায় আমার উপরেই ন্যস্ত থাকবে।

বেনহুর বলল, আমি তাই করব। লিখে দিতে হবে কি?

না আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। আপনার বাবার বেলায় যেমন ছিল তাই থাকবে।

এরপর সাইমোনাইদিস তার মেয়েকে বলল, এস্তার, এবার তুমি তোমার কথা বল।

লজ্জায় এস্তারের মুখটা রাঙা হয়ে উঠল। বেনহুরের কাছে গিয়ে এস্তার বলল, আমার মা নেই, আমাকে আমার বাবার কাছে যাবার অনুমতি দিন।

এস্তারের একটি হাত ধরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বেনহুর বলল, তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে।

এরপর সাইমোনাইদিস এস্তারকে খাবার আনতে বলল। রাত তখন অনেক হয়েছিল। ওরা খেতে বসল। খাবার এনে তা পরিবেশন করতে লাগল এস্তার।

৫

প্রতিযোগিতার আগের দিন বিকাল বেলায় বেনহুর শেখ ইণ্ডেরিমের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে তালবাগান থেকে শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথে মালুচের সঙ্গে তাদের দেখা হতেই মালুচ বেনহুরকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, মেসালার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার পথে আর কোন বাধা নেই। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

বেনহুর মালুচকে ধন্যবাদ দিলে মালুচ আবার বলল, আপনার নিশান সাদা আর মেসালার নিশান লাল সোনালি মেশানো। কাল শহরের প্রতিটি আরব ও ইহুদী সাদা ফিতে পরবে জামায়।

মালুচ একটা বিজ্ঞপ্তির কাগজ দিয়ে চলে গেল। বেনহুর সেটা ইণ্ডেরিমকে পড়ে শোনাতে লাগল। তাতে প্রতিযোগিতার কর্মসূচীর বিবরণ ও প্রতিযোগীদের পরিচয় লেখা ছিল। সার্কাসের সম্পাদক এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে।

প্রতিযোগীর সংখ্যা মোট ছ'জন। ১। করিন্থিয়ার নিসিম্পাস—হলুদ নিশান। ২। রোমের মেসালা—লাল সোনালি নিশান। ৩। এথেন্সের

ক্লিন্থেস—সবুজ নিশান। ৪। বাইজান্টিয়ামের ভিসিয়ুস—কালো নিশান। ৫। সিডোনিয়ার এ্যাডমিটাস। ৬। মরুভূমির শেখ ইণ্ডেরিমের ঘোড়াচালক ইহুদী বেনহুর—সাদা নিশান।

ইণ্ডেরিম অবাক হয়ে গেল বিস্ময়ে। বলল, চালক ইহুদী বেনহুর! এ নাম কেন?

বেনহুরের ধারণা এর পিছনে আছে মেসালার হাত।

সেদিন মধ্যরাত্রি থেকেই এ্যান্টিয়ক শহরের সব প্রবেশপথ খুলে দেওয়া হলো। দর্শকরা সার্কাসের ভিতরে গিয়ে গ্যালারীতে বসে পড়ল। পরদিন সকালেই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। যাদের আসন সংরক্ষিত ছিল তারা সকাল থেকেই আসতে আরম্ভ করল। পম্পি ফটকে বাজনা বাজতে লাগল।

প্রতিযোগীরা দলে এসে ঢুকল। দৌড়, কুস্তী, নক্সা, মুষ্টিযুদ্ধ ও রথচালনা—এইসব খেলা অনুসারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরনে ছিল।

চার ঘোড়ার রথগুলি যখন একের পর এক করে চক্রাকারে মাঠ পরিক্রমা করছিল তখন জনতা ধ্বনি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল। অনেকে মেসালা আর বেনহুরের নাম করে ধ্বনি দিতে লাগল।

বেলা তিনটের মধ্যে অন্য সব খেলা শেষ হয়ে গেল। এরপর শুরু হলো রথের দৌড়। প্রতি রথে সংযুক্ত ছিল চারটি করে ঘোড়া।

৬

প্রতিযোগিতা যেদিন শেষ হলো সেদিন রাত্রিতেই শেখ ইণ্ডেরিমের দলবল মরুভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। শেখ আর বেনহুর তুজনে মধ্যরাত্রিতে রওনা হবে।

শেখ বেনহুরকে অনেক রাজকীয় উপহার খুশি হয়ে দিতে চাইল। কিন্তু বেনহুর তা নিতে রাজী হলো না। তারা তুজনে যাত্রা শুরু করবে এমন সময় মালুচ এসে বেনহুরকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, সাইমোনাইদিস আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মালুচ এরপর বলল, এথেনীয় যুবক ক্লিন্থেস মারা গেছে। তার রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

বেনহুর বলল, মেসালার খবর কি?

মালুচ বলল, সে প্রাণে বেঁচে গেছে, কিন্তু তার পা খোঁড়া হয়ে গেছে। সে কোন দিন পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবে না।

ইণ্ডেরিম বলল, এবার তাহলে ঘোড়া আনতে বলি। আপনাদের এখনি রওনা হতে হবে। সাইমোনাইদিস বাণিজ্যের কাজ ঠিকই চালাবেন। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই।

এমন সময় একটি ছেলে নতজানু হয়ে বেনহুরকে বলল, শেখ সাহেবের সুপরিচিত বালথাজারের কন্যা আইরাস অনুরোধ করেছেন, যুবক বেনহুর যেন আগামী বেলা চারটের সময় ইভার্নীর প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তার পিতা বালথাজার এখন ইভার্নীর প্রাসাদেই বাস করছেন।

বেনহুর শেখের অনুমতি চাইলে শেখ সে অনুমতি দিল।

বেনহুর তখন ছেলেটিকে বলল, যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বলো আমি আগামী কাল দুপুরে তাঁর সঙ্গে ঐ প্রাসাদে গিয়ে দেখা করব।

মাঝরাতে শেখ ইণ্ডেরিম চলে গেল। বেনহুরের জন্য একটি ঘোড়া ও পথ প্রদর্শক রেখে গেল।

পর দিন দুপুরের আগেই মিশরকুমারী আইরাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য ইভার্নীর প্রাসাদে চলে গেল বেনহুর।

প্রাসাদের লম্বা টানা বারান্দা পার হয়ে একটি বন্ধ দরজার সামনে এসে সে দাড়াতেই আশ্চর্যভাবে আপনা থেকে খুলে গেল দরজাটা। রোমক রীতিতে সাজানো একটি ঘর দেখা গেল।

আইরাস ত দূরের কথা, কোন জনমানবের দেখা পেল না বেনহুর। চারদিকে তাকাতে লাগল সে। কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। প্রাসাদটা কবরের মত স্তব্ধ। এবার ভয় হতে লাগল বেনহুরের। তার মনে হলো, এটা নিশ্চয় কারো ষড়যন্ত্র। চক্রান্ত করে তাকে এখানে আনা হয়েছে হত্যা করার জন্য।

ঘরের দুপাশে অনেকগুলো দরজা ছিল। কিন্তু সব দরজাই বন্ধ। ধাক্কা দিলেও সেগুলো খুলল না। অনেকক্ষণ ঘরটার মধ্যে বসে রইল বেনহুর। তারপর হঠাৎ দুজন অচেনা লোক ঘরে ঢুকল। দুজনই বেশ লম্বা এবং শক্তিশালী। বেনহুর একজনকে চিনতে পারল। সে প্রতিযোগিতায় মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম স্থান অধিকার করে। তার নাম নর্থম্যান। নর্থম্যানের সঙ্গী যুবকটি দেখতে ইহুদীর মত। দুজনেরই পরনে [illegible] মুষ্টিযোদ্ধাদের মত খাটো পোশাক।

বেনহুর তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সাদা আলখাল্লা খুলে শুধু একটা তলবাস পরে হাতদুটো ভাঁজ করে বুকের উপর রেখে থামের আড়ালে দাঁড়াল।

তারা এগিয়ে আসতেই বেনহুর বলল, থাম, একটা কথা আছে।

তারা থামল।

বেনহুর বলল, তোমরা আমাকে খুন করতে এসেছ?

হ্যাঁ।

তাহলে তোমরা একা একা আমার সঙ্গে লড়াই করো।

তারা এতে রাজী হলো। বেনহুর একজনের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ফেলে দিল বেনহুর। যুবকটি আর উঠতে পারল না। সে ছিল অনেকটা বেনহুরের মত।

বেনহুর এবার দেখল নর্থম্যান সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাকে। নর্থম্যান বলল, আরে এইমাত্র তুমি যে প্যাঁচ খেললে সে ত আমার প্যাঁচ। তুমি ত ইহুদী নও। তাহলে তুমি?

কুইন্টাস অরিয়াসকে চেন?

হ্যাঁ বিলক্ষণ চিনি। তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর একটি ছেলে ছিল। তাকে ত আমিই এ প্যাঁচ শিখিয়েছিলাম।

বেনহুর বলল, আমিই সেই অরিয়াসের ছেলে।

এগিয়ে এসে নর্থম্যান বেনহুরকে ভাল করে দেখে বলল, তিনি বলেছিলেন এখানে একটা ইহুদীকে পাব যাকে খুন করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হবে।

বেনহুর বলল, কে তোমাকে বলেছে একথা?

নর্থম্যান বলল, মেসালা। সে উঠে হাঁটতে পারবে না কক্ষনো। শুয়ে শুয়েই সে আমাকে হুকুম দিয়েছিল।

বেনহুর তাকে এবার বলল, আমাকে খুন করার জন্য মেসালা তোমাকে কত দিত?

এক হাজার সেস্তেরতাই।

তুমি তাই পাবে আমার কাছ থেকে এবং আরো তিন হাজার বাড়তি দেব।

অতিরিক্ত চার হাজারে রফা হলো। বেনহুর বলল, মেসালার কাছ থেকেও এক হাজার তুমি পাবে। তার পথ বলে দিচ্ছি। তোমার যে সঙ্গীটি ঘরে পড়ে আছে সে দেখতে আমারই মত। আমি এই পোশাকই পরে থাকব এবং আমার পোশাকটা তাকে পরিয়ে দেব। তারপর তাকে এখানে ফেলে রেখে আমরা চলে যাব। আমি খুন হয়েছি বলে মেসালার কাছ থেকে তোমার প্রাপ্য টাকা তুমি নিয়ে নেবে।

নর্থম্যান হো হো শব্দে হেসে উঠল। বলল গ্রেট সার্কাসের পাশে আমি একটা মদের দোকান খুলে ফেলব।

তাদের কাজ সেরে নর্থম্যান ও বেনহুর দুজনে দুদিকে চলে গেল।

সেদিন রাতে সাইমোনাইদিসের বাড়িতে গিয়ে ইভার্নী প্রাসাদের ঘটনার কথা সব খুলে বলল বেনহুর। তার সব কথা শুনে সাইমোনাইদিস বলল, ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। এই ঘটনার ফলে মেসালা ও গ্র্যাটাস দুজনেই আপনার মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবে। আপনি নিশ্চিত মনে জেরুজালেমে গিয়ে হারানো প্রিয়জনদের খোঁজ করতে পারবেন।

বেনহুর এস্থারকে বলল, আমার মা বোনকে যদি খুঁজে পাই তাহলে তোমাকেও আমাদের জেরুজালেমের বাড়িতে নিয়ে যাব। তুমি টির্জার বোন হয়ে থাকবে সেখানে।

এই বলে শেখের আস্তানায় গিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে পড়ল বেনহুর।

এদিকে সেই রাতেই মেসালাকে খবর দেওয়া হলো বেনহুর মারা গেছে। মেসালা তখন এই সংবাদ দেবার জন্য গ্র্যাটাসের কাছে একজন লোক পাঠাল।

ষষ্ঠ পর্ব

১

যে রাতে মরুভূমি অঞ্চলে যাবার জন্য এ্যান্টিয়ক শহর ত্যাগ করে বেনহুর, তার পর থেকে ত্রিশ দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাসের জায়গায় এসেছে পন্টিয়াম পাইলেট ট্রিবিউন হয়ে। এই পরিবর্তনের জন্য সাইমোনাইদিস সম্রাটের ডান হাত সেজানুসকে পাঁচ ট্যালেন্ট দিয়েছিল। কারণ পাইলেটের আমলে জেরুজালেমে গিয়ে নির্বিঘ্নে প্রিয়জনদের খোঁজ করতে পারবে বেনহুর।

পাইলেট ট্রিবিউন হয়ে আসায় কাজও হলো। ক্ষমতা হাতে পেয়েই হুকুম দিল পাইলেট, জুডিয়ার সব কারাগার ভাল করে পরিদর্শন করে দেখতে

হবে আর তার আগে সব বন্দীদের অপরাধ উল্লেখ করে একটি,পূর্ণ তালিকা তৈরি করে তার কাছে পাঠাতে হবে।

একদিন জেসিয়ুস নামে এক কারারক্ষী একগোছা চাবি নিয়ে ট্রিবিউনের কাছে এসে বলল, আজ হতে আট বছর আগে ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস আমাকে এই দুর্গের কারারক্ষী নিযুক্ত করেছিলেন। এই চাবিগুলিতে প্রতিটি কারাকক্ষের সংখ্যা ছাপ মারা আছে। তার সঙ্গে আছে কারাকক্ষগুলির মানচিত্র। পাঁচ নম্বর কক্ষে তিনটি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বন্দী আছে। রাষ্ট্রের পক্ষে তারা বিপজ্জনক বলে তাদের অন্ধ ও বোবা করে আজীবন আটক রাখা হয়েছে। ঐ ঘরটা কুষ্ঠ রোগের আগার। কিন্তু এই মানচিত্রে আছে পাঁচটি ঘরের কথা, কিন্তু ঘর আছে ছটি ! আর আমি দেখেছি তিনটি বন্দীর জায়গায় আছে একটি বন্দী।

জেসিয়ুস ট্রিবিউনকে আরো বলল, গতকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম। দেখলাম সে ঘরে একজনমাত্র বৃদ্ধ, অন্ধ, উলঙ্গ ও জিহ্বাহীন বন্দী আছে। তার মাথার চুল জটা হয়ে গেছে। গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে গেছে। তার সঙ্গীদের কথা জানতে চাইলে সে ঘাড় নাড়ল। আমি ঘরটা ভাল করে খুঁজে দেখলাম। কারো কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। দুজন মারা গেলে তাদের হাড় থাকত। বন্দী লোকটি আমার মনের কথা বুঝতে পেরে আমাকে ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা গর্তের কাছে নিয়ে গেল। আমাকে গর্তের কাছে মুখ রেখে সে চিৎকার করে উঠল। আমি তখন তাকে সরিয়ে দিয়ে ডাকলাম, কেউ আছ ?

প্রথমে কোন উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলাম। এক নারীকণ্ঠ জবাব দিল, ঈশ্বরের জয় হোক।

নারীকণ্ঠ বলল, আমি ইজরায়েলের এক নারী। আমি আমার কন্যাসহ এখানে কবরস্থ হয়ে আছি। আমাদের বাঁচাও। না হলে মরে যাব।

তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

ট্রিবিউন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস অবিচার করেছে বন্দীদের উপর।

জেসিয়ুস বলল, নারী বন্দীদের না খাইয়ে মারতে চেয়েছিল গ্র্যাটাস। তাই তাদের কোন হিসাব নেই বন্দীদের তালিকায়। পুরুষ বন্দীটির কাছে জেনেছি তাকে যে খাদ্য পানীয় দেওয়া হত তার থেকে সে ঐ নারী বন্দীদের পাঠিয়ে দিত।

ট্রিবিউন বলল, আর দেরী নয়। স্ত্রীলোক দুটিকে উদ্ধার করতে হবে।

এই বলে সে একজন লোককে ডেকে বলল, কয়েকজন শ্রমিককে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। কারাকক্ষের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

এই হতভাগিনী নারীবন্দীরাই হলো বেনহুরের মা ও বোন টির্জা।

ট্রিবিউনের নির্দেশে পাঁচ নম্বর ঘরের একদিকের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলা হলো। ট্রিবিউন ভিতরে ঢুকতেই স্ত্রীলোক দুটি আর্তনাদ করে উঠল। কাছে এস না, আমরা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত। আমরা অস্পৃশ্য।

ট্রিবিউন শিউরে উঠল। বলল, ঠিক আছে। ওখান থেকেই তোমরা বল, কে তোমরা, কে তোমাদের কেন এখানে রেখেছে?

স্ত্রীলোক দুটি যা যা বলল মশালের আলোয় ট্রিবিউন তা সব লিখে নিল। তারপর তাদের জন্য খাদ্য ও পানীয় আনতে বলল।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বলল, হে উদার রোমক, আমাদের জন্য কিছু পোশাক ও জলের ব্যবস্থা করে দিন।

ট্রিবিউন বলল, সব ব্যবস্থাই হবে। আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন। আজ রাত্রেই আপনাদের মুক্ত করে দুর্গের বাইরে ছেড়ে দেওয়া হবে। বিদায়।

মাঝরাতে দুর্গ থেকে মুক্ত হয়ে মা ও মেয়ে রাজপথে নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে এসে দাঁড়াল। মা বলল, এবার আমরা কোথায় যাব?

এদিকে বেনহুরও সেই দিন সন্ধ্যার সময় শহরে পোঁছল। ভেবেছিল রাতটা কোথাও কাটিয়ে দেবে। কিন্তু আবার কি মনে হলো সে তাদের বাড়ির দিকে যেতে লাগল।

বাড়ির ফটকের সামনে এসে দেখল, তখনো বিজ্ঞপ্তিটা লাগানো আছে বাড়ির সামনে, 'এই সম্পত্তির মালিক স্বয়ং সম্রাট।'

সাইমোনাইদিসের কাছ থেকে সে শুনেছে, আমরাহ্ এই বাড়িতেই আছে। সেই তাকে খাদ্য ও পানীয় পাঠিয়েছে।

বেনহুর দরজায় ধাক্কা দিল। কোন সাড়া না পেয়ে সে পশ্চিম ও দক্ষিণ ফটকে গেল। সেখানেও দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়াশব্দ পেল না। তখন বেনহুর দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তিতে ফটকের সামনেই শুয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময় এ্যান্টেনিয়া দুর্গের দিক থেকে দুজন স্ত্রীলোক হুরবাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল।

বৃদ্ধা বলল, টির্জা, এইটাই সেই বাড়ি না?

টির্জা বলল, কিন্তু সকাল হলেই সবাই আমাদের শহর থেকে তাড়িয়ে দেবে। আর ঢুকতে দেবে না। আমরা যে কুষ্ঠরোগী।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল টির্জা।

মেয়ের হাত ধরে চলে যাচ্ছিল মা। এমন সময় রাস্তার আলোয় তারা দেখল ফটকের সামনে সিঁড়ির উপর কে শুয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত লোকটির মুখপানে তাকিয়ে চমকে উঠল বৃদ্ধা। টির্জার কানে কানে বলল, ঈশ্বর আছেন। এই ত আমার ছেলে, তোর ভাই।

টির্জা বলে উঠল, আমার ভাই জুডা!

টির্জা নতজানু হয়ে চুম্বন করতে যাচ্ছিল জুডাকে। কিন্তু তার মা তাকে সরিয়ে নিয়ে বলল, এ জন্মে নয়, আমরা যে কুষ্ঠরোগী।

মা মেয়েকে টানতে টানতে রাস্তা পার হয়ে ওধারে গিয়ে এক জায়গায় বসে ঘুমন্ত জুডার দিকে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় বুড়ি আমরাহ্ ফলের ঝুড়ি হাতে বাড়িটার মোড় ঘুরে ফটকের সামনে এসে সিড়িতে একটি লোককে শুয়ে থাকতে দেখে পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল। হঠাৎ লোকটির মুখের উপর নজর পড়তে চমকে উঠল সে। সে তখন জুডার একটি হাত তুলে নিয়ে সে হাতে চুম্বন করল।

ঘুম থেকে জেগে উঠে বেনহুর আমরাহ্কে দেখে চমকে উঠল। বলল, আমরাহ্ তুমি!

আমরাহ্ তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। তার হাত ধরে বেনহুর বলল, মা ও টির্জার কথা কিছু জান আমরাহ্?

আমরাহ্ কোন কথা বলতে পারল না। শুধু কাঁদতে লাগল। টির্জা এগিয়ে আসছিল। কিন্তু তার মা তাকে আসতে দিল না। বেনহুরকে ধরে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল আমরাহ্।

পরদিন সকালে শহরের লোকজন মা ও মেয়েকে দেখতে পেয়ে পাথর ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিল সেখান থেকে। বলল, তোরা কুষ্ঠরোগী, শহর থেকে পালা।

এদিকে বেনহুর মালুচের সহায়তায় ট্রিবিউনের কাছ থেকে জানতে পারল দুটি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোক মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু তারা এখন কোথায় তা সে জানে না।

একদিন সকালে একটা সরাইখানায় প্রাতরাশ খেতে খেতে বেনহুর

দেখল, গ্যালিলি থেকে একদল লোক এসেছে। তারা বয়সে যুবক, শক্ত সমর্থ চেহারা। তারা সব গাঁয়ের লোক।

বেনহুর ভাবল. এই সরল গ্রাম্য লোকদের কোন কাজে লাগানো যেতে পারে।

এমন সময় একটি লোক উত্তেজিতভাবে ছুটে এসে বলল. একটা ষড়যন্ত্র চলছে। মন্দিরের টাকায় পাইলেট পয়ঃপ্রণালী তৈরী করবে।

সকলে বলাবলি করতে লাগল, দেবতার টাকা এইভাবে খরচ করবে?

আগন্তুক লোকটি চিৎকার করে বলল, তাহলে এখনি চল সব। বহু লোক পাইলেটের সঙ্গে দেখা করার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জনতার সঙ্গে বেনহুরও পাইলেটের বাসভবনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বেনহুর গিয়ে দেখল, এক বিরাট জনতা অপেক্ষা করছে। তার মধ্যে সব শ্রেণীর লোকই আছে। একজন ভিতর থেকে এসে বলল, পাইলেট দেখা করবে না।

একজন সিনেটর রক্ষী নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। ক্রমশ ভিড় বাড়তে লাগল। সহসা প্রচণ্ড হৈচৈ শুরু হলো জনতার মধ্যে। অনেকে আঘাত পেয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল। বেনহুর সামনে কি হচ্ছে দেখতে পেল না। সে একটি লোককে তুলে ধরে বলল, দেখ ত, কি হচ্ছে ভিড়ের মধ্যে?

লোকটি বলল, ভিতর থেকে একজন ইহুদীর বেশধারী রোমক লাঠি হাতে জনতাকে মারছে। ওরা বৃদ্ধদেরও বাদ দিচ্ছে না।

বেনহুর তখন লোকটিকে নামিয়ে দিয়ে জনতাকে বলল, ঐ রোমকদের শিক্ষা দিতে আমি যা বলব করবে?

জনতা একবাক্যে বলল, হ্যাঁ করব।

বেনহুর বলল, ফটকের কাছে বাগানে অনেক গাছ আছে। গাছ থেকে এক একটা ডাল ভেঙ্গে নাও। ওদের আক্রমণ করো।

জনতার প্রত্যেকে একটা করে ডাল ভেঙ্গে নিয়ে রোমকদের আক্রমণ করতেই তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। জনতা তাদের তাড়া করতেই বেনহুর বলল, আর তাড়া করো না। সিনেটর একদল সৈন্য নিয়ে আসছে। ওদের হাতে তরোয়াল আছে। আমরা পেরে উঠব না।

জনতা ফটক পার হয়ে চলে যেতেই প্রধান রক্ষী এসে বেনহুরকে জিজ্ঞাসা করল, উদ্ধত যুবক, তুমি রোমক না ইহুদী?

বেনহুর বলল, আমি জুডার পুত্র, এখানেই আমার জন্ম। তুমি কি চাও?

যুদ্ধ।

আমি নিরস্ত্র।

আমি তোমাকে অস্ত্র দিচ্ছি।

সৈনিকটি তাকে একটা তরোয়াল আর ঢাল দিল। শুরু হলো যুদ্ধ। দুজনেই তরোয়াল খেলার পাঁচ দেখাতে লাগল। অবশেষে বেনহুরের আঘাতে ধরাশায়ী হলো সৈনিকটি। তখন গ্লাডিয়েটরদের প্রথামত বিজিত শত্রুর পিঠে পা রেখে সমবেত সকলকে অভিবাদন জানাল বেনহুর। তারপর আর একজন রক্ষীকে বলল, তোমার সহকর্মী মৃত। আমি তার তরোয়াল আর ঢাল নিয়ে গেলাম। তার দেহ ওখানে রইল।

গ্যালিলিবাসীরা অভিনন্দন জানাল বেনহুরকে। তাকে তাদের নেতা বলে স্বীকার করে নিল।

বেনহুর বলল তোমরা এখন চলে যাও। বেথানির খান-এ আমার সঙ্গে দেখা হবে। যাবার সময় এই ঢাল আর তরোয়ালটা নিয়ে যাবে। তাহলে চিনতে পারব আমি।

জনতা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি?

জুডার সন্তান।

জনতা তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। বেনহুর তাদের বলল, বেথানিতে যাবে ত?

জনতা একযোগে বলল, হ্যাঁ যাব।

সপ্তম পর্ব

১

গ্যালিলিবাসীরা বেথানির খান-এ গিয়ে বেনহুরের সঙ্গে দেখা করতেই সে তাদের সঙ্গে তাদের দেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে তাদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে তিনটি সেনাদল গড়ে তুলল। সাইমোনাইদিস তাকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল আর শেখ তাকে রসদ সরবরাহ করল।

একদিন বেনহুর তার নতুন বাসস্থান গ্যালিলির অন্তর্গত একটি গুহার সামনে বসেছিল, এমন সময় এক পত্রবাহক এসে তাকে একখানি চিঠি দিল।

বেনহুর চিঠি খুলে দেখল, জেরুজালেম থেকে মালুচ লিখেছে, একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর নাম ইলিয়াস। তিনি দীর্ঘকাল নির্জন বনে কাটিয়েছেন। আপনি যার আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছেন জর্ডন নদীর ধারে বসে তিনিও তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁর কথা শুনেছি। নিজে এসে দেখে বিচার করুন।

বেনহুর গ্যালিলিবাসীদের বলল, বন্ধু, তোমরা প্রস্তুত থাক। আমাদের সকল প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। আমি নিজে যাব রাজার খবর নিতে।

শেখ ইণ্ডেরিম ও সাইমোনাইদিসকে তার জেরুজালেম যাবার কথা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়ে রাত্রিকালেই একজন আরব পথপ্রদর্শককে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল বেনহুর ঘোড়ায় চেপে।

বেনহুর যখন আগামী দিনের কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল তখন হঠাৎ দেখল যাত্রী নিয়ে একটি উট আসছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল বেনহুর, উটের পিঠে আছে বালথাজার আর তার কন্যা আইরাস।

বৃদ্ধ বালথাজার বেনহুরকে চিনতে পেরে বলল, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তোমার উপর। আমি ভাল দেখতে পাচ্ছি না। তবু মনে হচ্ছে শেখের তাঁবুতে দেখা তুমিই হচ্ছ সেই হুরপুত্র।

বেনহুর অভিবাদন জানাল বালথাজারকে। তারা সেদিনকার মত পথের ধারে একটি মরুদ্যানে আশ্রয় নিল।

বালথাজার বলল, তোমার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হুরপুত্র। ঐ জায়গাটি বড় সুন্দর, ঈশ্বরের করুণার প্রতীক। এস, আমাদের সঙ্গে বসে খাও।

বালথাজার আবার বলল, একটি কণ্ঠস্বর আমাকে অধৈর্য করে তুলেছে। সে কণ্ঠস্বর আমাকে বলল, জাগো। যার জন্য অপেক্ষা করে আছ এতকাল, তিনি এসে গেছেন।

বেনহুর জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু শোনেননি ?

স্বপ্নের কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিনি।

তার পোশাকের ভিতর থেকে মালুচের লেখা একটি পত্র বার করে বালথাজারকে দেখাল বেনহুর।

সে চিঠি পড়ে বালথাজার বলল, হে ঈশ্বর, ত্রাণকর্তাকে দেখার ও তাঁকে পূজো করার সুযোগ আমাকে দাও। তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব।

আবার যাত্রা শুরু হলো। দিনের শেষে সন্ধ্যা এলে তারা এক জায়গায়

বিশ্রামের জন্য শিবির স্থাপন করল। আইরাসের সঙ্গে অনেক কথা হলো বেনহুরের।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হলো। পথে জর্ডন থেকে আসা এক যাত্রীর সঙ্গে তাদের দেখা হলে বেনহুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, নদীতীরে কোথায় সকলে মিলিত হয়েছে ?

লোকটি বলল, বেথাবারায়।

বেনহুর বলল, জায়গাটা একেবারে জনশূন্য ছিল। সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে কেন ?

লোকটি বলল, সেখানে একটি ভক্ত লোক এসে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছে। তা শুনে সকলে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলছে সে জ্যাকারিয়াসের পুত্র নাজারেথের জন, ত্রাণকর্তার বার্তাবহ। সে বলছে, 'আমি তাঁর কণ্ঠস্বর যিনি বলছেন প্রভুর পথকে সহজ করে তোল।'

তা শুনে বালথাজার বলল, তাড়াতাড়ি করো।

পরদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে তারা নদীর ধারে পৌঁছে গেল। জুডিয়ার তালবন পর্যন্ত প্রসারিত জেরিকোর তালবন দেখা যাচ্ছিল দূরে। বেনহুর বলল, আমরা পেঁছে গেছি।

আরও এগিয়ে গিয়ে তারা অনেক তাঁবু, উট আর এক বিরাট জনতা দেখতে পেল। এখন হয়ত মহাপুরুষ বাণী প্রচার করছেন। তারা তাই তাড়াতাড়ি যেতে লাগল। হঠাৎ দেখল জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে যাচ্ছে।

বেনহুর ভাবল, তাদের হয়ত পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে। এমন সময় অদূরে একটি লোককে আসতে দেখল তারা। লোকটির দেহকান্তি অপূর্ব হলেও বাইরে থেকে তার বেশভূষা দেখে কিম্ভূতকিমাকার বলে মনে হচ্ছিল। লোকটির মুখ ও গায়ের রং বাদামী, একরাশ চুল ডাইনিদের মত জট পাকানো এবং পিঠের উপর নেমে এসেছে। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। ডান দিকটা একেবারে উলঙ্গ। বাঁ দিকটা উটের লোমের শার্ট দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। কোমরে জড়ানো আছে চামড়ার এক পট্টি। পা দুটো খালি। বাঁ হাতে একটা লাঠি।

আইরাস উটের পিঠ থেকে বলল, ইনিই কি রাজার বার্তাবহ ?

বেনহুর বলল, ইনি নাজারেথবাসী।

সেই সময় নদীর ধারে আর একটি লোক এগিয়ে আসতে সমবেত

জনতাকে লক্ষ্য করে লাঠিটা বাড়িয়ে নাজারেথবাসী লোকটি বলল, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, ইনি পৃথিবীর সব পাপ হরণ করবেন। আমি জানি ইনিই ঈশ্বরপুত্র।

তখন বেনহুর ও বালথাজার দুজনেই দেখল লোকটিকে। তার দেহের উচ্চতা সাধারণের থেকে একটু বেশী। ঢেউ খেলানো লম্বা চুলের মাঝখানে সিঁথি। চুলের রং পিঙ্গল বর্ণ। কপালের নিচে কালো বাঁকা ভ্রূ। গাঢ় নীল চোখ দুটি বেশ বড় বড়। বড় বড় চোখের পাতাগুলিতে স্নিগ্ধতার এক আবেশ জড়ানো আছে যা সাধারণতঃ শিশুদের চোখেই দেখা যায়। চেহারা দেখে গ্রীক না ইহুদী বোঝাই যায় না।

বেনহুর তখন ঘোড়ার পিঠের উপর বর্শাহাতে বসেছিল। বালথাজার ও আইরাস ছিল উটের পিঠে। লোকটির দৃষ্টি কারো উপর পড়ল না, পড়ল শুধু বালথাজারের উপর। বালথাজার চোখে জল নিয়ে বলল, এই ত তিনি।

এই কথা বলেই অচেতন হয়ে পড়ল সে।

বেনহুরের মনে পড়ল লোকটিকে সে কোথায় যেন দেখেছে। তার মনে পড়ে গেল নাজারেথের কুয়োর ধারে রোমক রক্ষীরা যখন তাকে বন্দী অবস্থায় টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন এই লোকটিই তাকে জল দিয়ে বাঁচিয়েছিল। সে মুখ সে কোনদিন ভুলবে না। 'ইনিই ঈশ্বরপুত্র।' এই কথাগুলো ক্রমাগত কানে বাজতে লাগল তার।

বালথাজারের জ্ঞান তখনো না ফেরায় আইরাসের কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে জল নিয়ে এল বেনহুর নদী থেকে। তখন নবাগত চলে গেছে।

বালথাজারের জ্ঞান ফিরে এলে সে বলল, তিনি কোথায়?

আইরাস বলল, কে?

বালথাজার বলল, তিনি ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরপুত্র। আবার তাকে আমি দেখলাম।

আইরাস বেনহুরকে জিজ্ঞাসা করল, তুমিও কি একথা বিশ্বাস করো?

বেনহুর বলল, আরও অপেক্ষা করতে হবে।

পরদিন তিনজনই যখন মন দিয়ে নাজারেথবাসীর কথা শুনছিল তখন হঠাৎ এক সময় নাজারেথবাসী সম্ভ্রমভরে বলল, ঐ দেখ ঈশ্বরের পুত্র।

বেনহুর দেখল গতকালের সেই নবাগত। পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করল, লোকটি কে?

লোকটি ঠাট্টা করে বলল, নাজারেথের এক ছুতোরের ছেলে।

অষ্টম পর্ব

১

বেথাবারাতে খৃষ্টের আবির্ভাব ঘোষণার পর তিন বছর কেটে গেছে। তখন মার্চ মাস। ইতিমধ্যে পন্টিয়াস পাইলেটের কাছ থেকে তার পৈতৃক বাড়িটা কিনে নিয়েছে বেনহুর। সেটা সংস্কার ও মেরামত করার পর আগের থেকে সুন্দর আর নতুনের মত করে তুলেছে বাড়িটাকে। বর্তমানে সাইমোনাইদিস এস্তারকে নিয়ে বাড়িটার ছাদের ঘরে বাস করে। বালথাজারও আইরাসকে নিয়ে এই বাড়িরই একটি তলায় বাস করে।

সেদিন প্রাসাদের হলঘরে বালথাজার ও সাইমোনাইদিস তখন বসে কথা বলছিল। তাদের পাশে বসেছিল এস্তার। এমন সময় বেনহুর ও আইরাস ঘরে ঢুকল। বেনহুর সাইমোনাইদিসকে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ আমরাহ্ এসে ঘরে ঢুকতে বেনহুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার মা ও বোনের কোন খোঁজই পেলে না? কোন চিহ্নও পাওনি?

ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল আমরাহ্। বেনহুর সাইমোনাইদিস ও বালথাজারকে বলতে লাগল, আগামী কাল নাজারিন প্রবেশ করবেন এই শহরের মন্দিরে। ঐ মন্দিরই তাঁর পিতৃভবন। সেখানেই আত্মপ্রকাশ করবেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আছে বারোজন অনুচর—জেলে, চাষী, সরাই-ওয়ালা প্রভৃতি নিচু শ্রেণীর মানুষ।

আইরাস বলল, গ্রীকরা হলে এই লোকটিকে বলত দার্শনিক।

বালথাজার বলল, দার্শনিকরা এসব কাজ পারে না।

আইরাস বলল, এই লোকটিই যে পারে তা কি করে জানলে তুমি?

বেনহুর বলল, আমি নিজে দেখেছি তিনি জলকে মদে পরিণত করেছেন।

সাইমোনাইদিস বলল, খুবই আশ্চর্যের কথা।

বেনহুর আরও বলল, গ্যালিলিতে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম তখন একটি কুষ্ঠরোগীর কাতর আবেদনে ও কান্না শুনে তার গায়ে হাত দিয়ে নাজারিন বললেন, 'তুমি ভাল হয়ে যাও।' আমরা অবাক হয়ে দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে লোকটা একেবারে ভাল হয়ে উঠল। সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল হয়ে রোগমুক্ত হয়ে উঠল।

কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গেল আমরাহ্।

সাইমোনাইদিস বলল, ইজরায়েলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি কখনো।

বেনহুর আবার বলতে লাগল, আমি নিজের চোখে আর একটা ঘটনা দেখেছি। বেথানিতে ল্যাজারাস নামে একটা লোক বাস করত। সে নাজারিনের ভক্ত ছিল। সে রোগে মারা যাওয়ার পর তাকে একটা বড় পাথরের নিচে কবর দেওয়া হয়। চারদিন পরে নাজারিনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ল্যাজারাসের মৃত্যু খবর দেওয়া হয়। তখন কবর খুঁড়ে দেখা হয় বিকৃত হয়ে উঠেছে ল্যাজারাসের মৃতদেহটা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, নাজারিন যেমন বললেন, 'ল্যাজারাস, উঠে এস,' অমনি শবাচ্ছাদনসহ উঠে এল ল্যাজারাস সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত। সে লোক আজও বেঁচে আছে। কালই আপনারা তাকে দেখতে আসতে পারেন।

এই কথা বলে সেখান থেকে বেথানির পথে চলে গেল বেনহুর।

পরদিন সকালে আমরাহ্ একটা ঝুড়ি হাতে শহরের ফটক পার হয়ে এক কবরখানায় চলে গেল। সেই কবরের কাছেই তার মনিবগিন্নী আর টির্জা থাকত।

আমরাহ কোন কথা না শুনে তার কর্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তার জামায় চুম্বন করল। বৃদ্ধা তাকে বলল, তুই বড় অবাধ্য আর দুষ্টু আমরাহ্। তুই আমাকে ছুঁলি, তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোর মনিবের কাছে আর যেতে পারবি না।

আমরাহ্ বলল, না আমি দুষ্টু নই। তোমাদের জন্য সুসংবাদ এনেছি।

বৃদ্ধা বলল, জুডার খবর কি ?

আমরাহ্ বলল, গতকাল সে এসেছিল। তার মুখ থেকেই ত কথাটা শুনলাম। নাজারিন নামে একটি আশ্চর্য মানুষ এসেছে। সে তোমাদের রোগ সারিয়ে ভাল করে তুলতে পারবে। তাঁর কথায় রোগীর যে কোন রোগ সেরে যায়। এমন কি মৃতও জীবন ফিরে পায়। জুডা নিজে দেখেছে।

আমরাহ্ বলল, আমি তোমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাব। সময় নষ্ট করো না। আমার সঙ্গে চল।

ঝুড়ি থেকে খাবার বের করে দিয়ে বলল, এই নাও খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়। আজ সকালে তিনি একটা কাছাকাছি পথ দিয়ে যাবেন।

পথে বেরিয়ে বৃদ্ধা দেখল, দলে দলে লোক আসছে। তাদের মধ্যে কুষ্ঠ-রোগীও ছিল। বৃদ্ধা ভাবল এই মহাপুরুষই হয়ত সেই ত্রাণকর্তা যাঁর জন্মকালে অতীতে একদিন সারা জেরুজালেমের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিদেশ হতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি এসেছিলেন সেই ত্রাণকর্তাকে দেখতে।

জনবহুল পথ ছেড়ে নির্জন পাহাড়ী পথ ধরে এগোতে লাগল তারা তিনজনে। টির্জার বড় কষ্ট হচ্ছিল সে পথে যেতে।

হঠাৎ মা ও মেয়ে অবাক হয়ে দেখল পূব দিক থেকে একটি লোক তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। টির্জা বলল, সরে এস, ও নিশ্চয় আমাদের দেখে পাথর ছুঁড়ে মারবে। লোকটি আরো কিছুটা এগিয়ে এলে বৃদ্ধা মাথার কাপড় সরিয়ে আইন অনুসারে 'অচ্ছুৎ অচ্ছুৎ' বলে চিৎকার করতে লাগল।

তবু এগিয়ে এসে লোকটি তাদের চার গজ দূর থেকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি চাও ?

বৃদ্ধা বলল, দেখতেই ত পাচ্ছ আমরা কুষ্ঠরোগী, সরে দাঁড়াও।

লোকটি বলল, আমি যাঁর বার্তাবহ তিনি একবারমাত্র তোমাদের সঙ্গে কথা বললেই তোমাদের রোগ সেরে যাবে। সুতরাং আমি এতে ভয় পাই না।

তিনি কি তাহলে নাজারিন ?

লোকটি বলল, তিনি ত্রাণকর্তা।

আজ কি তিনি এই শহরে আসবেন ? বৃদ্ধা করজোড়ে একথা জিজ্ঞাসা করল।

লোকটি বলল, জান তিনি কে ?

হ্যাঁ জানি তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

তাহলে এখানেই অপেক্ষা করো। তিনি এই পথেই আসবেন। সঙ্গে অনেক লোকজন থাকবে। ঐ দূরের পাহাড়ের তলায় সাদা গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াও। যখন তিনি এই পথ দিয়ে যাবেন তখন তাঁকে যেন ডাকতে ভুলো না। তাঁকে ডাকতে ভয় করো না। আকাশে বজ্রগর্জন হলেও তিনি তোমাদের ডাক শুনতে পাবেন।

লোকটি চলে গেলে ওরা হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের গায়ে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে একটা গাছের নিচে বসল। টির্জা ঘুমিয়ে পড়ল।

জায়গাটার নিচ দিয়ে যে রাস্তা চলে গিয়েছিল তাতে ক্রমশই লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। প্রত্যেকের হাতে ছিল সদ্যকাটা একটি করে তালের ডাঁটি।

অবশেষে দেখা গেল পূর্ব দিক থেকে এক বিরাট জনতার স্রোত আসছে। জনতার মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছে একটি লোক। তার মাথাটি ছিল অনাবৃত আর গোটা দেহটি একটি সাদা কাপড়ে ঢাকা। বৃদ্ধা বুঝতে পারল, ইনিই নাজারিন। সে টির্জাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল।

টির্জার হাত ধরে মা কিছুটা এগিয়ে যেতেই জনতার মধ্য থেকে অনেকে বলতে লাগল, কুষ্ঠরোগী, পাথর ছুঁড়ে মারো।

এইভাবে চিৎকার করতে করতে একদল লোক মা ও মেয়েকে ঘিরে ধরল। এমন সময় সেই অশ্বারোহী মহাপুরুষটি মহিলাটির কাছে এসে পড়তেই জনতা শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে গেল। শান্ত সুন্দর মুখে এক স্নিগ্ধ করুণার ভাব। বড় বড় দুটি উজ্জ্বল চোখে অনন্ত আশ্বাস।

বৃদ্ধা কাতরভাবে তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, দয়া করো প্রভু। হে প্রভু. আমাদের উপর দয়া করো। আমরা তোমাকেই খুঁজছি।

ঘোড়ার উপর থেকে অশ্বারোহী মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বিশ্বাস করো, এ কাজ আমি করতে পারি ?

বৃদ্ধা বলল, মহাপুরুষরা বলেছেন তুমিই ত্রাণকর্তা।

অশ্বারোহী মহাপুরুষের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, তোমাদের বিশ্বাস অপরিসীম। তোমাদের ইচ্ছাই পূরণ হোক।

মা তখন ছুটে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। আমরা বেঁচে গেলাম টির্জা। সত্যি সত্যিই সে এক অলৌকিক ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে তার গা থেকে কুষ্ঠরোগের সব দাগ মিলিয়ে গেল নিঃশেষে। তাদের শিরায় শিরায় বইতে লাগল নতুন ও বিশুদ্ধ রক্তের স্রোত। সতেজ ও সক্রিয় হয়ে উঠল প্রতিটি অবশ অসাড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্নায়ুতন্ত্র। মা ও মেয়ে দুজনেই সম্পূর্ণরূপে হয়ে উঠল রোগমুক্ত।

আমরাহ্ কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগল সব কিছু। আনন্দে জল গড়িয়ে পড়ছিল তারও চোখ থেকে।

বেনহুরও দূর থেকে থমকে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। কিন্তু যে বৃদ্ধা মহিলা নাজারিনকে ডাকল সে যে তার মা তা বুঝতে পারেনি দূর থেকে।

এবার নাজারিন ও জনতা চলে যেতে বেনহুরের চোখ পড়ল আমরাহের উপর। সে ছুটে তার কাছে যেতেই আমরাহ্ তাকে বলল, মার সঙ্গে কথা বল। আমার গিন্নীমা ও বোন ভাল হয়ে গেছে।

বেনহুর ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর মা ও বোনের পুনর্মিলনের পর তার জোব্বা বা আলখাল্লাটা টির্জার গায়ে জড়াতে দিল।

কেড্রন নদীর পূব পাড়ে রাজকীয় কবরখানার মধ্যে এক জায়গায় দুটি তাঁবু খাটিয়ে মা ও বোনের আপাতত থাকার ব্যবস্থা করে দিল বেনহুর। সব সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিল। প্রধান পুরোহিত তাদের পূর্ণ রোগমুক্তির সুপারিশ না করা পর্যন্ত তাদের লোকালয়ের বাইরে থাকতে হবে।

২

সেদিন শহরে ছিল ইহুদীদের এক বিরাট ধর্মীয় উৎসব। চারদিকে দলে দলে লোকেরা আগুনে মাংস টোস্ট করছিল। কেড্রনের তাঁবু থেকে বেরিয়ে বেনহুর খাত্-এর দিকে চালনা করতে লাগল ঘোড়াটিকে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

পথে বেরিয়ে বেনহুর দেখল, চারদিকেই হৈ-হুল্লোড় ও গান বাজনা চলছে। সহসা সামনে তাকিয়ে সে দেখল, জ্বলন্ত মশালের এক বিরাট শোভাযাত্রা আসছে। শোভাযাত্রা যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে গান-বাজনার সব সুর ও হৈ-হুল্লোড় স্তব্ধ হয়ে গেছে। বেনহুর আরো লক্ষ্য করে দেখল শোভাযাত্রার মধ্যে ইহুদী পুরোহিতের দল ছাড়া ছিল সুতীক্ষ্ণ বর্শাধারী রোমক সৈনিক। মশাল ও বাতি নিয়ে চলেছিল চাকরের দল। তাছাড়া লম্বা দাড়ি, ঘন ভ্রূ ও খাড়া নাকওয়ালা রাব্বি বা সম্ভ্রান্ত কিছু ইহুদীও ছিল।

শোভাযাত্রার মধ্যে তিনজন বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল বেনহুরের। তারা হলো মন্দিরের প্রধান পুলিশ, প্রধান পুরোহিত আর একজন হলো নাজারিনের শিষ্য ও বহুদিনের সহচর স্ক্যারিয়ট। ম্লান মুখ, বিষণ্ণ চোখ।

পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জলপাই বাগানের সামনে এসে শোভাযাত্রা থেমে গেল। বেনহুরও শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। ধর্মীয় শোভাযাত্রায় সশস্ত্র রোমক সৈনিকদের উপস্থিতির অর্থ বুঝতে পারছিল না সে।

বাগানের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রাকারীদের অনেকে হাঁক-ডাক শুরু করে দিল।

বেনহুর দেখল বাগানের ফটকের সামনে সাদা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন নাজারিন। লম্বা চুল, সরু মুখ, ঝুঁকে পড়া ক্ষীণ দেহ। হাত দুটি আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রাখা। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ক্লান্ত, হতাশাখিন্ন এবং আত্মসমর্পণে প্রস্তুত।

নাজারিনের পিছনে তাঁর একদল শিষ্য দাঁড়িয়ে ছিল উত্তেজিতভাবে। কিন্তু নাজারিন ছিলেন আশ্চর্যভাবে শান্ত।

শোভাযাত্রার সামনে যে পুরোহিত দাঁড়িয়ে ছিল তাকে নাজারিন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি চাও?

পুরোহিত বলল, নাজারেথের যীশুকে।

আমিই সেই।

কথাটা শুনে আক্রমণকারীদের অনেকে পিছিয়ে গেল। ভীরু প্রকৃতির মানুষরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু জুডাস এগিয়ে এসে যীশুকে চুম্বন করে বলল, প্রভুর জয় হোক।

যীশু শান্ত হয়ে জুডাসকে বললেন, জুডাস, মানবপুত্রকে তুমি কি চুম্বন দিয়ে ঠকাতে চাও? কেন এসেছ তুমি?

জনতার দিকে তাকিয়ে যীশু আবার প্রশ্ন করলেন, কি চাও তোমরা?

নাজারেথের যীশুকে।

বলেছি ত আমিই সেই। আমাকেই যদি চাও তাহলে আমার শিষ্যদের ছেড়ে দাও। তাদের যেতে দাও।

এবার পুরোহিত ও রাব্বিরা যীশুকে বাঁধার জন্য তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই যীশুর শিষ্যরা এসে তাদের বাধা দিল। একজন আক্রমণকারীর কান কেটে দিল। তবু তারা যীশুকে ছিনিয়ে নিতে পারল না। সৈনিকরা যীশুকে বাঁধতে উদ্যত হলো। যীশু তবু নির্বিকারভাবে করুণা ও প্রেম বিতরণের কাজে ব্যস্ত।

কান কাটা লোকটি তাঁর শত্রু হলেও তিনি তার কানে হাত দিয়ে বললেন, তোমার আর কষ্ট হবে না।

লোকটির কানের ক্ষত ভাল হয়ে গেল। শত্রু মিত্র সকলেই অবাক হল।

যারা তাঁকে বন্দী করতে এসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে যীশু বললেন, কোষবদ্ধ করো তোমাদের তরবারি। এত অস্ত্র কিসের জন্য? তোমরা কি একটা চোরকে ধরতে এসেছ? আমার পিতা যে পানপাত্র আমাকে পাঠিয়েছেন তা পান না করে কি পারি? অন্ধকারের অশুভ শক্তি তোমরা, এই ত উপযুক্ত সময়।

সৈন্যরা এবার বিনা বাধায় বেঁধে ফেলল যীশুকে। বেনহুর দেখল যীশুর সব অনুগত শিষ্যরা চলে গেছে। তিনি সম্পূর্ণ একা।

জনতা এবার বন্দী যীশুকে নিয়ে শহরের দিকে ফিরে চলল। এবার তাদের আগে ছিল সৈন্যদল। বেনহুরও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল। সে বুঝে উঠতে পারল না কি করবে। তার ইচ্ছা হলো সে শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবে নাজারিনকে।

মাথাটা নত করে তখন ধীর পায়ে হেঁটে চলছিলেন নাজারিন। হাত দুটি পিছনে বাঁধা ছিল। মাথার ঘন চুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখের উপর। দেহটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। কোনদিকে দৃষ্টি নেই।

শোভাযাত্রা নদীখাতের সেতুর কাছে এলে বেনহুর বন্দী নাজারিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, প্রভু, আমি তোমার বন্ধু। তুমি একটা কথা বল, তুমি কি স্বেচ্ছায় এদের সঙ্গে চলেছ? বল, তোমাকে যদি উদ্ধারের ব্যবস্থা করি তাহলে তুমি কি তা গ্রহণ করবে?

শোভাযাত্রাকারীদের কয়েকজন বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি কে?

নাজারিন কিন্তু বেনহুরের কথায় কোন জবাব দিলেন না। মুখ তুলে একবার তাকালেনও না। তবু তাঁর নির্বিকার অথবা ব্যথামলিন মুখখানি দেখে বোঝা যায় তিনি বলতে চাইছেন, আমাকে থাকতে দাও, বন্ধুরা পরিত্যাগ করেছে, জগৎ তাঁকে অস্বীকার করেছে। তাই ত আমি ফিরে যাচ্ছি আমার পিতার কাছে।

এই সময় কয়েকজন বেনহুরকে ধরে বলল, একেও বেঁধে ফেল। মেরে ফেল। ও ওদেরই একজন।

বেনহুর তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে এক জায়গায় লুকিয়ে পড়ল। তার জামাটা ছিঁড়ে গেল।

ওরা চলে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে বেনহুর বাগানের পাঁচিলের উপর তুলে রাখা তার জোব্বা ও রুমালটা তুলে নিয়ে শহরের ফটক পার হয়ে খাতে ঢুকল। তারপর সেখান থেকে কেড্রনের তাঁবুতে ফিরে গেল ঘোড়ায় চড়ে।

৩

পরদিন সকালে বেনহুরের তাঁবুতে দুজন গ্যালিলিবাসী ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যস্ত হয়ে এসে হাজির হলো। বেনহুরকে বলল, হে জুডার পুত্র, প্রস্তুত হোন। দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করা হবে তাঁকে। গতরাতেই প্রধান পুরোহিত হান্নাসের বাসভবনে তাঁর বিচার হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল বেনহুর। গ্যালিলিবাসীদের একজন তাকে বললেন, এখন কোথায় যাবেন?

সৈন্য সংগ্রহ করতে।

গ্যালিলিবাসী বলল, হায়, কি দুর্ভাগ্য! আমি আর আমার এই বন্ধুটি ছাড়া দেশের সব মানুষ পুরোহিতদের দলে।

বেনহুর ঘোড়ার লাগাম টেনে বলল, ওরা কি চায়?

নাজারিনকে হত্যা করতে।

বেনহুর বুঝতে পারল, আর কোন উপায় নেই। সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ

করেছে। কোথাও কেউ তাঁর আর অনুগত নেই। সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল নাজারিনের জন্য।

এরপর ওরা গলগোথার দিকে যেতে লাগল। সেখানেই ক্রুশবিদ্ধ করা হবে যীশুকে।

বেনহুর তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখল বন্যার জলের মত জনস্রোত এগিয়ে চলেছে সেদিকে। দেখল সাইমোনাইদিস, এস্তার ও বালথাজার সেখানে উপস্থিত হয়েছে অনেক আগেই। বৃদ্ধ বালথাজার ছিল একটি পাল্কিতে।

বালথাজার বেনহুরকে দেখতে পেয়েই বলল, তাঁকে দেখতে পাব ত? হায় প্রভু! আর একটিবার যেন দেখতে পাই। আজ পৃথিবীর বড় দুর্দিন।

বেনহুর বলল, নাজারিন ত এই দিকেই যাবেন।

অবশেষে নাজারিন দেখা দিলেন। পায়ের তলা কেটে রক্ত পড়ছে। পা দুটো টলছে। মৃতপ্রায় অবস্থা। শতছিন্ন নোংরা দাগলাগা একটা গাউন কাঁধের উপর ঝুলছে। কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর মাথায়। কপাল থেকেও রক্ত ঝরছে। গায়ের রং অস্বাভাবিক রকমের সাদা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। হাত দুটি বাঁধা, তবু প্রথামত দণ্ডিত অপরাধী হিসাবে ক্রুশকাঠটিকে তাঁকেই বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। রাস্তায় অনেকবার উপুড় হয়ে পড়ে যান।

জনতার মধ্য থেকে অনেকে সুযোগ পেলেই লাঠি দিয়ে খোঁচা মারছিল। থুথু দিচ্ছিল গায়ে।

তবু চোখমুখের উপর কোন ক্রোধের ভাব ছিল না যীশুর। মুখে ছিল না কোন আর্তনাদের ধ্বনি।

সাইমোনাইদিস আবেগে কাঁপছিল। এস্তার তাকে ধরে ছিল। বালথাজার বসে পড়ল দুঃখে। বেনহুর চিৎকার করে উঠল, হে আমার ঈশ্বর! আমার ঈশ্বর!

তাঁর পাণ্ডুর মুখখানি একবার খুললেন নাজারিন। সেই নীরব, নিরুচ্চার মুখে কোন কথা না থাকলেও পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য আশীর্বাদ ঝরে পড়ছিল।

নাজারিনের পিছনে দুজন ক্রুশকাঠ বয়ে নিয়ে চলেছিল। বেনহুর গ্যালিলিবাসীকে জিজ্ঞাসা করল, ওরা কারা?

দুজন চোর। ওরাও নাজারিনের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

বেনহুর আবার জিজ্ঞাসা করল, এখানে কয়েকজন নারী রয়েছে, ওরা কারা ?

গ্যালিলিবাসী বলল, যে স্ত্রীলোকটি কাঁদছে সে প্রভু নাজারিনের মা মেরি। যার কাঁধের উপর ভর দিয়ে কাঁদছেন তিনি প্রভুর এক শিষ্যা। আর বাকি তিনজন গ্যালিলিবাসিনী।

শেষ মুহূর্তে একজন গ্যালিলিবাসীকে দেখে তাদের কাছে গিয়ে যীশুকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করল বেনহুর। কিন্তু তার কথায় তারা কান দিল না। বলল, এ ছাড়া আপনার অন্য যে কোন কথা শুনতে রাজী আমরা। আপনি প্রতারিত হয়েছেন জুডাপুত্র।

নাজারিন ইহুদীদের রাজা নয়: রাজা হবার মন তার নেই। জেরুজালেমের মন্দিরে আগে তখন আমরা তার সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ডেভিডের সিংহাসনে বসলেন না। আমাদের ও ইজরায়েলের আশা তিনি পূরণ করলেন না। তাই আজ কেউ সঙ্গে নেই তার। তবে শুনে রাখুন জুডার পুত্র, আপনার জন্য তরবারী কোষমুক্ত করে আঘাত হানতে আমরা সতত প্রস্তুত।

বেনহুর যদি সেদিন নাজারিনের মুক্তি তাদের মুক্তি হিসাবে গণ্য করে গ্যালিলিবাসীকে নিয়োজিত করতে পারত তাহলে ইতিহাস পাল্টে যেত। কিন্তু সে ইতিহাস হত মানুষের হাতে গড়া, ঈশ্বরের অভিপ্রেত হত না সে ইতিহাস।

৪

সাইমোনাইদিস বারবার ডাকতে লাগল বেনহুরকে।

সাইমোনাইদিস, বালথাজার, এস্তার ও দুজন গ্যালিলিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বেনহুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল। দেখল গোলাকার একটা ছোট পাহাড়ের ধারে নরকপালের মত একটা জায়গা রয়েছে। জায়গাটা রুক্ষ, তৃণহীন; শুধু পুঁসিপগাছের একটা ঝোপ ছিল সেখানে। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে ঘেরা আছে জায়গাটা। তার মাঝে আছে রোমক সৈনিকদের এক প্রাচীর।

অনেক লোকজন ক্রুশকাঠ তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রধান পুরোহিত তত্ত্বাবধানকারী একজন সিনেটরকে বলল, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের মৃত্যু এবং কবরস্থ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই হলো বিধান।

একজন সৈনিক যীশুর কাছে গিয়ে একটি পানপাত্র তুলে ধরল, কিন্তু তিনি তা নিলেন না।

প্রধান পুরোহিত বলল, প্রথমে নিয়ে যাও ঈশ্বরের নিন্দাকারীকে। ঈশ্বরের পুত্র নিজেকে রক্ষা করুক।

সিনেটর বলল, ক্রুশ প্রস্তুত। এবার দণ্ডিতদের পেরেক মেরে ক্রুশ-কাঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। একথা ভেবে ভয়ে শিউরে উঠল জনতা।

বালথাজার কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। বলল, দোষী বা নির্দোষ যারা আজ এ দৃশ্য দেখছে তাদের জীবন হবে অভিশপ্ত।

সাইমোনাইদিস বলল, এখনো যদি জেহোভা হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে ইজরায়েলের ও আমাদের সর্বনাশ।

বেনহুর বলল, আমি এতক্ষণ স্বপ্নের আবেগের মধ্যে ডুবে ছিলাম। স্বপ্নের মধ্যে কে যেন আমাকে বলল, যা বিধির বিধান তাই হচ্ছে। নাজারিনের এই ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা। এখন নীরবে প্রার্থনা করাই আমাদের কর্তব্য।

নিস্তব্ধ বাতাসে একটি আকাশবাণী যেন ভেসে এল তার কানে, আমিই জীবন, আমিই নবজন্ম।

সৈনিকরা নাজারিনের গা থেকে সব পোশাক খুলে নিল। তিনি তখন নগ্নদেহ। কশাঘাতের রক্তাক্ত চিহ্ন ফুটে আছে তাঁর পিঠে। প্রথমে তাঁর হাত দুখানি রাখা হলো ক্রুশকাঠের দুদিকে। তীক্ষ্ণ পেরেক দিয়ে কাঠের সঙ্গে বিঁধে দেওয়া হলো হাত দুখানিকে। তারপর তাঁর হাঁটুদুটিকে এমনভাবে তুলে ধরা হলো যাতে পায়ের পাতাগুলি কাঠের উপর ঠিকভাবে পড়ে। তখন একটি পায়ের পাতাকে আর একটি পাতার উপর রেখে একটিমাত্র পেরেক দিয়ে তা গেঁথে দেওয়া হলো।

দর্শকরা সব দেখে কম্পিত যন্ত্রণায় শিউরে উঠল। কিন্তু যাঁর উপর এত আঘাত, এত নির্যাতন তাঁর চোখে মুখে যন্ত্রণার কোন ছাপ নেই, তাঁর মুখে কোন আর্তনাদের শব্দ নেই। মজুরেরা যীশুর বিদ্ধ দেহ সমেত ক্রুশকাঠটি বয়ে নিয়ে একটি গর্তের মধ্যে বসিয়ে দিল। যীশুর দেহটি ঝুলে পড়ল। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল শুধু একটি বাণী, পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা জানে না এরা কি করছে।

ক্রুশকাঠের মাথার উপর একটি ফলকে লেখা ছিল অভিবাদন, ইহুদীদের রাজা।

সূর্য তখন মধ্য আকাশে উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিচ্ছিল। উন্মত্ত উল্লাসে ফেটে পড়ছিল জনতা। কিন্তু সহসা আকাশ থেকে একটা ছায়া নেমে এসে ঢেকে ফেলল পৃথিবীকে। যেন আকাশে সন্ধ্যা নেমে এল। ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে সে ছায়া পরিণত হয়ে উঠল অন্ধকারে। সকলের মুখ থেকে সব হাসি মিলিয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল উন্মত্ত উল্লাসের বর্বর ধ্বনি।

এস্থার ভয় পেয়ে গেল। তাকে আশ্বাস দেবার জন্য সাইমোনাইদিস বলল, এটা একটা কুয়াশা, এখনি কেটে যাবে।

বেনহুর বলল, না, এটা কুয়াশা নয়, বাতাসে মিশে থাকা সাধু সন্তদের আত্মার করুণার প্রকাশ। আপনি নিশ্চিত থাকবেন সাইমোনাইদিস, যিনি ঐ ক্রুশকাঠে ঝুলছেন তিনিই ঈশ্বরপুত্র।

বালথাজার বলল, জন্মলগ্নেই আমি তাকে দেখেছিলাম জাবনার পাত্রে। তাই আমি তাঁকে আগেই চিনতে পেরেছিলাম।

চোরদুটিকে ক্রুশবিদ্ধ করে তাদের পুঁতে দিয়ে চলে গেল রক্ষীরা। একজন সৈনিক ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি যদি ইহুদীদের রাজা হও তাহলে নিজেকে বাঁচাও।

একজন পুরোহিত বলল, তিনি যদি এখন আমাদের কাছে নেমে আসতে পারেন তবেই তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।

অন্য কয়েকজন বলল, ও নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলল ; এখন দেখা যাক ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেন কিনা।

বেনহুর সাইমোনাইদিস ও বালথাজার বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে গেল। তাদের চোখের সামনে নাজারিনের ঝুলন্ত দেহটি এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছিল।

সৈনিকরা যাবার সময় একটি পাত্রে জল মেশানো কিছু মদ রেখেছিল। কেউ ইচ্ছা করলে সে জলে স্পঞ্জ ভিজিয়ে লাঠির ডগায় করে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর তৃষ্ণার্ত মুখটা ভিজিয়ে দিতে পারে।

বেনহুর তাই করতে গেল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখল বড় দেরি হয়ে গেছে। বেনহুর দেখল, যীশুর ক্ষতলাঞ্ছিত, ধূলিধূসরিত মুখখানি সহসা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল এক অলৌকিক আলোর উজ্জ্বলতায়। দুটি আয়ত চোখের উদাস দৃষ্টি সামনে বহুদূর পর্যন্ত ছিল প্রসারিত। সে দৃষ্টিতে ছিল এক পরম শান্তি আর প্রত্যয়ের আভাস।

ক্রমে সে দৃষ্টির আলো নিবে গেল। ম্লান মুখখানি ঝুলে পড়ল বুকের

উপর। তবু অবশিষ্ট শেষ শক্তিটুকুকে সংহত করে তাঁর ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারিত হলো তাঁর শেষ বাণী, পিতা, আমি তোমারি কাছে সমর্পণ করছি আমার আত্মাকে।

বেনহুর তার বন্ধুদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, সব শেষ।

হঠাৎ এক প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাহাড়টা। ক্রুশকাঠগুলি দুলতে লাগল। বেনহুর দেখল বালথাজারের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে মাটিতে। বেনহুরের মনে পড়ল যীশুর শেষ বাণী উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি আর্ত চিৎকার কানে গিয়েছিল তার। এবার বুঝল ঠিক তখনি তার প্রভুর সঙ্গে এই মহান মিশরীয়ের আত্মা তার মরদেহ ত্যাগ করে যাত্রা করে স্বর্গলোকের পথে।

৫

যীশুখৃষ্টকে ক্রুশাবদ্ধ করার পর দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে বেনহুর এস্থারকে বিয়ে করে ইতালির অন্তর্গত মিসেনাম বন্দরের কাছে একটি সুন্দর বাড়িতে বাস করতে থাকে। টির্জাও তার কাছে থাকে।

বেনহুরের মা ও আমরাহ্ মারা গেছে। আইরাস মেসালাকে বিয়ে করে। কিন্তু মেসালা বিয়ের পর আইরাসকে এত কষ্ট দেয় যে আইরাস তাকে হত্যা করে। তবে বিধবা হবার পর আইরাস বেনহুর ও এস্থারের মত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি।

এস্থারের বাবা সাইমোনাইদিস তখনো বেঁচে ছিল। তবে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে অবসর গ্রহণ করে সে।

একদিন খবর আসে বেনহুরের কাছে, রোমের সম্রাট নীরো খৃষ্টানদের উপর দারুণ অত্যাচার করছে। তা শুনে বেনহুরকে বলল সাইমোনাইদিস, প্রভুর আলো সেখানে যেমন করে হোক জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

বেনহুর বলল, কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

সাইমোনাইদিস বলল, নীরো ও সব রোমকই মৃতের ছাই আর সমাধিক্ষেত্র এই দুটো জিনিসকে পবিত্র বলে মনে করে। তাই রোমের মাটির উপর প্রভুর মন্দির যদি আজ গড়তে না পার তাহলে মাটির নিচে তা গড়ে তোল। আর রোমের খৃষ্টানদের মৃত্যু হলে সেখানে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করো।

সাইমোনাইদিসের পরামর্শমত কাজ করার জন্য সেইদিন জাহাজে করে

রোমের পথে রওনা হয় বেনহুর। এস্তারও ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেনহুরের সঙ্গে যায়।

আজও যদি কেউ রোমে যান তাহলে তিনি বেনহুরের উজ্জ্বল কীর্তি সেই সমাধিস্থান দেখতে পাবেন। সেই সমাধিস্থান থেকে যে খৃষ্টধর্মের অভ্যুত্থান হয় তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সীজারের সাম্রাজ্যসীমাকেও স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে যায়।

ডন কুইকজোট
সার্ভেন্তেস



১

বহুকাল আগে স্পেনদেশের লা মাঞ্চা গ্রামে এক হাস্যরসিক লোক বাস করত। তার চোয়ালের হাড়গুটো লণ্ঠনের মত দেখতে ছিল বলে লোকে তাকে নাম দিয়েছিল কুইকজাড়া বা লণ্ঠনমুখো।

কুইকজাডা কোন কাজকর্ম করত না। দিনরাত শুধু যত সব যুদ্ধ আর দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী পড়ত। কোথায় কোন বীর যুদ্ধ করে একচক্ষু এক দৈত্যকে হারিয়ে দিল, কোথায় কোন রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে তেপান্তরের মাঠের উপর দিয়ে এক ঘুমন্ত রাজবাড়ি থেকে এক বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করল সেই সব কাহিনী পড়তে বড় ভালবাসত সে। এই সব কাহিনী পড়ার নেশায় সব সময় মাতোয়ারা হয়ে থাকত সে।

এই সব কাহিনী রোজ পড়তে পড়তে ও তার কথা ভাবতে ভাবতে কুইকজাডার মনে হলো সে নিজেও একজন বীরপুরুষ এবং সেও ইচ্ছা করলে অনেক দুঃসাহসিক কাজ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। এইভাবে তার মাথায় একটা খেয়াল চেপে বসল, সে দিগ্বিজয়ে বার হবে। দেশে দেশে ঘুরে বেরিয়ে সে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে বেড়াবে।

দিগ্বিজয়যাত্রার প্রস্তুতিপর্ব চলতে লাগল কুইকজাডার। প্রাচীন কালের এক বর্ম যোগাড় করল সে। সেই সঙ্গে যোগাড় করল মাথা ঢাকার এক শিরস্ত্রাণ, ঢাল, তরোয়াল আর বর্শা।

কিন্তু দিগ্বিজয়ের জন্য একটা ঘোড়া চাই। কুইকজাডার একটা রোগা হাড় বার করা ঘোড়া ছিল। কুইকজাডা ভাবল ওই ঘোড়াতেই চলবে। শুধু ঘোড়াটার একটা ভাল নাম রাখতে হবে। অনেক ভাবনা চিন্তা করে সে ঘোড়াটার নাম রাখল রোজিনান্তে।

এরপর সে ভাবল, তার নামটা ভাল নয়। তার নামটাও পাল্টাতে হবে, কারণ একজন দিগ্বিজয়ী বীরের পক্ষে কুইকজাডা নামটা মোটেই উপযুক্ত নয়। তার বীরত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যতে হয়ত কথা কাহিনী ও ইতিহাস লেখা হবে।

আবার অনেক ভাবনা চিন্তা করতে লাগল কুইকজাডা। তারপর তার এক নতুন নাম ঠিক করল। সে নাম হলো, মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোট। নামটা তার বেশ মনঃপূত হলো। এক দিগ্বিজয়ী মহাবীরের পক্ষে এ নামটাই উপযুক্ত হবে।

অবশেষে একটা দিন ঠিক করল কুইকজোট। জুলাই মাসের একদিন সকালে বর্ম টর্ম এঁটে ঢাল তলোয়ার ও সড়কি নিয়ে রোজিনান্তের পিঠে চড়ে দিগ্বিজয়ে বার হলো ডন কুইকজোট।

২

পথে বার হয়ে যাত্রা শুরু করতেই কুইকজোটের একটা কথা মনে পড়ে গেল। মন্ত্র পড়ে এখনো মহাবীর-ব্রতে দীক্ষা নেওয়া হয়নি তার। এই দীক্ষা না নিলে দিগ্বিজয়ীর মহান কর্তব্য পালন করতে পারবে না সে।

অবশেষে ঠিক করল পথে যেতে যেতে প্রথমেই যার দেখা পাবে তার কাছ থেকেই দীক্ষাটা গ্রহণ করবে। কিন্তু সারাদিনের মধ্যেও পথে কারো দেখা পেল না। ক্রমে দিন গত হয়ে সন্ধ্যা হলো। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল ডন কুইকজোট। পথের ধারে একটা সরাইখানা দেখতে পেয়ে তার সামনে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়লো।

সরাইখানার সামনে দুটি মেয়ে বসে ছিল। ডন কুইকজোট ভাবল, ওই সরাইখানাটা হলো একটা দুর্গ আর মেয়ে দুটি হলো দুর্গের অধিপতির মেয়ে।

কিন্তু মেয়েদুটি ডন কুইকজোটের বর্ম চর্ম ও অদ্ভুত পোশাক আশাক দেখে ভয় পেয়ে পিছন ফিরে চলে যেতে লাগল। ডন কুইকজোট তখন তার চোখের ঢাকনাটা তুলে তাদের বলল, আপনারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবেন না। কারণ যারা নিরীহ, যারা শিষ্ট আমি তাদের রক্ষা করে চলি। ভয়ের কোন কারণ নেই।

মেয়ে দুটি এবার আশ্বস্ত হলো। আগন্তুকের পোশাক-আশাক দেখে আর অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে তারা হাসতে লাগল।

সরাইখানার মালিক সেখানে এলে কুইকজোট ভাবল, ইনিই দুর্গের অধিপতি। সরাইখানার মালিককে সে বলল, হে দুর্গাধিপতি, আজ রাতে আমি আপনার অতিথি হিসাবে এখানে অবস্থান করব। আমার জন্য ভাবতে হবে না আপনাকে। আপনি শুধু দেখবেন, আমার এই বলশালী ঘোড়া রোজিনান্তের যাতে কোন কষ্ট না হয়।

হোটেলমালিক বলল, না না। কিছু ভাববেন না আপনি।

এই বলে সে ঘোড়াটাকে নিয়ে আস্তাবলে চলে গেল।

ফিরে এসে দেখল মেয়ে দুটি নতুন অতিথির গায়ের বর্ম চর্ম খুলে ফেলছে

আর সে বসে আছে। কিন্তু মাথায় শিরস্ত্রাণের সঙ্গে ফিতে দিয়ে আঁটা চোখের ঢাকনাটা খুলতে পারল না তারা। সেটা না খুললে কুইকজোট খেতে পারবে না। তবু সে বলল, খাবার নিয়ে এস। যা করে হোক খাব।

খাবার আনলে একটি মেয়ে চোখের ঢাকনাটা তুলে ফেলল আর অন্য মেয়েটি তাকে খাইয়ে দিতে লাগল। তার খাওয়া হয়ে গেলে সরাইমালিক একটা নল এনে কুইকজোটের মুখে পুরে দিয়ে জল ঢেলে তাকে জল খাওয়ালো।

খাওয়া সেরে ডন কুইকজোট সরাইখানার মালিকের সামনে নতজানু হয়ে আবেগের সঙ্গে বলল, হে মহাবীর, আমার প্রার্থনা, আপনি আমাকে মহাবীর ব্রতে দীক্ষা দিন। আজ সারারাত আপনার এই দুর্গপ্রাঙ্গণে আমার বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র পাহারা দেব। কাল সকালে আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন। তারপর আমি সারা পৃথিবী ঘুরে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে এমন সব কীর্তি রেখে যাব যাতে ভবিষ্যতের মানুষ চিরকাল আমাকে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করতে পারে।

সরাইমালিক রাজী হয়ে গেল তার কথায়। কিন্তু বুঝতে পারল লোকটার মাথা খারাপ। পরে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সঙ্গে যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে ত ?

ডন কুইকজোট হেসে বলল, আমার কপর্দকও নেই। মহাবীরদের সঙ্গে টাকাকড়ি থাকে তা ত বইয়ে পড়িনি।

সরাইমালিক বলল, টাকাকড়ির ব্যাপারটা এত জরুরী যে তার কথাটা লেখার কোন প্রয়োজনই মনে করেন না কেউ। তাছাড়া প্রচুর টাকাকড়ি দামী পোশাক পরিচ্ছদ প্রত্যেক মহাবীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। তার উপর সঙ্গের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন অনুচরও চাই।

ডন কুইকজোট আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই নাকি! তাহলে আবার আমাকে বাড়ি ফিরে গিয়ে একজন অনুচর নিয়ে আসতে হবে।

সরাইমালিক বলল, অনুচর না হলে মহাবীরকে মানায় না। আপনি তাহলে সারারাত অস্ত্রগুলো পাহারা দিন। কাল সকালে দীক্ষা হবে আপনার।

এর পর ডন কুইকজোট তার বর্মচর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র সব আস্তাবলের জলের চৌবাচ্চার উপর রেখে মাথার শিরস্ত্রাণ পরে ও বাঁ হাতে ঢাল আর ডান হাতে বর্শা নিয়ে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে করতে পাহারা দিতে লাগল।

সরাইখানার লোকজন দূর থেকে তার কাণ্ড আর ভাবভঙ্গি দেখে হাসাহাসি করতে লাগল। কুইকজোটের কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না।

এইভাবে ঘণ্টা দুই কেটে যাবার পর একটি লোক তার গাধাকে জল খাওয়াবার জন্য আস্তাবলের চৌবাচ্চার কাছে গেল। সে গাধাটাকে পাশে রেখে চৌবাচ্চার উপর থেকে কুইকজোটের রাখা অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মচর্মগুলো সরাতে লাগল।

কিন্তু তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বর্শা উঁচিয়ে গম্ভীর গলায় গর্জন করে উঠল কুইকজোট, যেই হও একথা জেনে রেখো যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবীরের বর্ম ও অস্ত্রে যে হাত দেবে তার মৃত্যু অনিবার্য। খুব সাবধান !

কিন্তু লোকটি এ কথার মানে বুঝতে না পেরে বা তাতে কান না দিয়ে অস্ত্রগুলো সরিয়ে রাখতে লাগল, কারণ অস্ত্রগুলো না সরালে তার গাধাকে জল খাওয়ানো যাবে না।

কুইকজোট তখন আর কোন কথা না বলে তার হাতের বর্শার বাঁট দিয়ে একটা ঘা বসিয়ে দিল লোকটির মাথায়। লোকটি পড়ে গেল।

এর পর আর একটি লোক সেইখানে তার গাধাকে জল খাওয়াতে এলে কুইকজোট এবার কোন কথা না বলে তারও মাথায় তেমনি করে বসিয়ে দিল তার বর্শার ঘা। লোকটার মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। তার আর্ত চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এল। অনেকে কুইকজোটকে গাল দিতে লাগল। অনেকে মারতে গেল তাকে।

রাগে আগুন হয়ে উঠল কুইকজোট। বলল, এত বড় স্পর্ধা ! মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোটের গায়ে হাত দেবে !

এই বলে সে কোমরের খাপ থেকে তরোয়াল খুলে হুঙ্কার দিয়ে এক লাফে তেড়ে গেল সবাইকে। তখন চারদিক থেকে সবাই ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে লাগল তাকে লক্ষ্য করে। কুইকজোট ঢাল ঘুরিয়ে নানা কায়দা করে ইঁট পাটকেলগুলো ঠেকাতে লাগল আর তরোয়াল ঘুরিয়ে যেতে লাগল।

হৈ চৈ শুনে সরাইওয়ালা ছুটে এসে 'থাম' 'থাম' বলে চিৎকার করতে লাগল। ক্রমে লোকজন সবাই চলে গেল। ডন কুইকজোট এবার শান্ত হয়ে চৌবাচ্চার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। সরাইখানার মালিক ডন কুইকজোটের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে মহাবীরব্রতে দীক্ষা দিল। খুশি হয়ে সরাইখানা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ডন কুইকজোট।

৩

সরাইখানা থেকে বার হয়েই মাঞ্চার পথ ধরল ডন কুইকজোট। সে ভাবল, সরাইখানার মালিক ঠিকই বলেছে, সঙ্গে টাকাকড়ি, ভাল পোশাক আশাক আর অনুচর না থাকলে মহাবীর হওয়া যায় না। কেউ তাহলে তাকে মহাবীর বলে মানবে না। তাই বাড়ি গিয়ে এসব তাকে যোগাড় করতেই হবে।

কিছুদূর যাবার পর সে দেখল উল্টো দিক থেকে একদল অশ্বারোহী ব্যবসায়ী আসছে। তাদের আসতে দেখে কি মনে করে ঘোড়া থামিয়ে লাগাম ধরে পথের উপর দাঁড়িয়ে রইল। অশ্বারোহীরা কাছে এলে সে বলল, হে বিশ্ববাসী, আপনারা একবাক্যে স্বীকার করুন যে আমার ভাবী পত্নী ডানসিনিয়া বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তা না হলে আপনাদের আর এক পাও যেতে দেব না।

ব্যবসায়ীরা ডন কুইকজোটের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। তাদের মধ্য থেকে একজন রসিকতা করে বলল, হে মহাবীর, আমাদের দুর্ভাগ্য যে আপনার স্ত্রীকে আমরা দেখিনি। দেখলে আপনার কথা নিশ্চয়ই মেনে নিতাম।

আর একজন বলল, বেশ ত, আপনি আপনার স্ত্রীর একখানি ছবি অন্ততঃ আমাদের দেখান। তাহলেই আমরা মেনে নেব তিনি পরমাসুন্দরী। সে ছবিতে তাঁকে দেখতে বাঁকা, ট্যারা, কুঁজো যাই দেখাক না কেন।

ডন কুইকজোট রেগে গেল। সে ব্যবসায়ীর শেষের কথাটা অন্যভাবে নিল। বলল, কী? আমার স্ত্রী কুঁজো? আমার ভাবী স্ত্রী ডানসিনিয়াকে তুই কুঁজো বললি? শোন দুষ্টমতি, তোর এই অন্যায় বাক্য আমি সহ্য করব না। তার সমুচিত শাস্তি তোকে এখনি দেব।

এই বলে বর্শা উঁচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কুইকজোট। তার এই প্রবল আক্রমণের ফল কি হত তা বলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ তার ঘোড়া রোজিনান্তে পড়ে গেল পা হড়কে আর ডন কুইকজোটও মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তা দেখে হো হো করে হেসে উঠল অশ্বারোহী ব্যবসায়ীর দল। ঘোড়ার পা দানিতে আটকে পড়ে ঝুলছিল ডন কুইকজোট।

সেই অবস্থাতেই আরো রেগে গিয়ে গর্জন করতে লাগল কুইকজোট। সে গর্জন করতে করতে বলল, পাপিষ্ঠ শয়তান, দেখছিস না, আমার কোন

দোষ নেই, আমার অশ্বই বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। একবার যদি উঠে দাঁড়াতে পারতাম তাহলে তোদের সবার মাথা কেটে মাটিতে তা লুটিয়ে দিতাম।

তার এই কথা শুনে ব্যবসায়ীরা চলে গেল। তাদের মধ্যে একজন কুইকজোটকে শিক্ষা দেবার জন্য এগিয়ে এসে ডন কুইকজোটের বর্শাটা ভেঙ্গে দু'টুকরো করে তার বাঁট দিয়ে ডনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পিটতে লাগল। তার দেহের হাড়গোড় ভেঙ্গে গেল।

সেই অবস্থায় সেইখানে পড়ে রইল ডন কুইকজোট। ঘোড়ায় চড়া ত দূরের কথা। তার ওঠার শক্তি ছিল না। কোথায় রইল তার দিগ্বিজয়।

এমন সময় সেই পথ দিয়ে মাঞ্চার এক লোক গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছিল। সে ডনকে চিনতে পেরে তাকে তার গাধার পিঠে চাপিয়ে আর তার বর্ম ও অস্ত্রগুলো খোঁড়া রোজিনান্তের পিঠে চাপিয়ে অনেক কষ্টে কুইকজোটকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

৪

গায়ে ব্যথা নিয়ে ঘরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইল ডন কুইকজোট। তার অবস্থা দেখে গ্রামবাসীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে ভাবতে লাগল। তারা ভাবল, ডনের বাড়িতে যে সব বই আছে সেই সব বই পড়েই তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তার লাইব্রেরি ঘরের বইগুলো সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর লাইব্রেরি ঘরের দরজাটা ইট দিয়ে গেঁথে দিতে হবে। তাহলে কুইকজোট সেরে উঠে আর সেই সব বই পড়তে পারবে না। ফলে যত সব আজে বাজে খেয়াল খুশি তার মাথায় ঢুকবে না।

যে কথা সেই কাজ। গ্রামবাসীরা ডন কুইকজোটের লাইব্রেরি ঘরের সব বইগুলো পুড়িয়ে দিল। সে ঘরের দরজাটা একেবারে ইট গেঁথে বন্ধ করে দিল। সেরে উঠে ডন গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করল, আমার লাইব্রেরি ঘরটা কোথায় গেল?

গাঁয়ের সবাই বলল, তুমি যখন বাড়ি ছিলে না, যখন দিগ্বিজয়ে গিয়েছিলে তখন কোথা হতে মেঘের ভিতর থেকে এক মস্ত বড় সাপের মাথায় চড়ে এক যাদুকর এসে তোমার লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল। আমরা ত সবাই অবাক। যাদুকরটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আগুন লেগে গেল।

সব শুনে ডন কুইকজোটের মনেও খটকা লাগল। ভাবল, তা হয়ত হতে পারে। মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে দিল ডন। দিন পনের এই

ভাবে চুপচাপ বসে বসে কাটাল সে। তারপর দিগ্বিজয়ের সেই বাতিকটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার মনে।

তার বাড়ির কিছু আসবাবপত্র বিক্রি করে ভাল পোশাক পরিচ্ছদ কিনল ডন। তার শিরস্ত্রাণটা মেরামত করাল। এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা পুরনো বর্শা চেয়ে আনল। এবার শুধু একজন অনুচর যোগাড় হলেই হয়।

মাঞ্চা গ্রামে একটি বেকার লোক বাস করত। লোকটি সরল প্রকৃতির। তার অনেকগুলি ছেলে পুলে ছিল। কোন কাজকর্ম না থাকায় অতি কষ্টে দিন কাটাত সে। তার নাম ছিল সাঙ্কো পাঞ্জা।

একদিন সকাল না হতেই সাঙ্কো পাঞ্জার বাড়িতে গিয়ে তাকে ডাকতে লাগল ডন কুইকজোট।

সাঙ্কো বাইরে এসে ডন কুইকজোটকে খাতির করে বলল, হুজুর, কি ব্যাপার ?

ডন বলল, তুমি জান, আমি একজন মহাবীর ?

সাঙ্কো বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তা শুনেছি।

তাহলে বুঝছ ত ? এভাবে ঘরে বসে থাকা আমার মত এক মহাবীরের শোভা পায় না। আমাকে দিগ্বিজয়ে বার হতে হবে।

সাঙ্কো বলল, তা ত বটেই। আপনি দিগ্বিজয়ে গেলে খুব ভাল হবে।

তাকে চুপ করতে বলে ডন কুইকজোট বলল, সব জানাজানি হয়ে যাবে। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

আবার আমাকে টানছেন কেন হুজুর ?

কিন্তু আমার মত দিগ্বিজয়ী মহাবীরের একজন অনুচর না হলে কি মানায় ?

সাঙ্কো বলল, তা মানায় না বটে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি গেলে আমার ছেলেমেয়েরা কি খাবে ? আমার সংসার চলবে কি করে ?

ডন কুইকজোট বলল, তুমি একটা আস্ত বোকা। এখন তুমি অনুচর থাকবে। তারপর আমি প্রথম যে দেশ জয় করব তোমাকেই তার শাসনকর্তা বানিয়ে দেব।

সাঙ্কো অবাক হয়ে দুচোখ বড় বড় করে বলল, তাই নাকি। একেবারে শাসনকর্তা, মানে রাজা, সারা দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা।

ডন কুইকজোট বিজ্ঞের মত বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, শাসনকর্তা। তখন আর তোমার ছেলেমেয়েদের কোন ভাবনা থাকবে না। বুঝেছ ?

হ্যাঁ হুজুর, বুঝেছি।

তাহলে আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছ ত?

যখন বলছেন রাজা-রুজির ব্যাপার, তখন নিশ্চয় রাজী আছি।

তবে আর কোন কথা নেই। তুমি তৈরি হয়ে থেকো। ঠিক সময়ে খবর দেব।

কিন্তু ডন কুইকজোট একটা বিষয়ে মুস্কিলে পড়ল। তার ঘোড়া ত মাত্র একটি। সাঙ্কো কি করে যাবে? অনেক ভাবনা চিন্তা করে অবশেষে ঠিক করল সে. সাঙ্কো গাধার পিঠে চেপে যাবে।

কথাটা ঠিক মনঃপূত হলো না সাঙ্কোর। সে অনুযোগের সুরে বলল, আপনার মত দিগ্বিজয়ী বীরের অনুচর কি গাধায় চড়ে যাবে?

ডন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি ভাবছ কেন? পথে যেতে যেতে যে বীরকে আমি সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করব তার ঘোড়াটা আমি তোমায় দিয়ে দেব।

তাহলে ভালই হবে।

যাত্রা শুরু করার একটা দিন ঠিক করে ফেলল ডন। গাঁয়ের কেউ যাতে এ খবর জানতে না পারে তার জন্য কাউকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে গভীর রাতে সাঙ্কো'কে নিয়ে যাত্রা শুরু করল দিগ্বিজয়ের পথে।

আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে চলতে লাগল ডন কুইকজোট। আর তার পিছু পিছু একটা গাধার পিঠে চড়ে যেতে লাগল সাঙ্কো। ডন স্বপ্ন দেখছিল দিগ্বিজয়ের আর সাঙ্কো স্বপ্ন দেখছিল রাজা হবার।

সাঙ্কো একবার কথাটা মনে করিয়ে দিল ডন কুইকজোটকে। কোন রাজ্য জয় করে সাঙ্কোর কথা যেন সে ভুলে না যায়।

ডন বলল, যারা মহাবীর, তারা তাদের অনুচরদেরই এক একটা রাজ্যের শাসন পাটে বসিয়ে দেয়।

সাঙ্কো বলল, আমি রাজা হলে আমার স্ত্রী তেরেসা রাণী হবে ত?

ডন বলল, রাজার স্ত্রী রাণী হবে আর তার ছেলেরা রাজপুত্র হবে—এটা তো সহজ স্বাভাবিক কথা। এতে আর সন্দেহের কি আছে?

সাঙ্কো বলল, তাহলে কোন চিন্তা নেই।

এই বলে নীরবে যেতে লাগল সে।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা বড় মাঠের সামনে এসে হাজির হলো তারা। সেই মাঠে চল্লিশটা হাওয়া কল ছিল। পাশাপাশি সারি দিয়ে

সাজিয়ে রাখা হাওয়াকলগুলো দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল ডন কুইকজোটের। সে বলল, দেখ সাঙ্কো, আমাদের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশটা দানব ?

সাঙ্কো আশ্চর্য হয়ে বলল, সেকি হুজুর ! ওগুলো ত হাওয়াকল।

খাপ থেকে তরোয়াল বার করে ডন কুইকজোট বলল, না, ওগুলো দানব। কিন্তু তোমার কোন ভয় নেই। আমার এই তরবারির আঘাতে সব দানবগুলোই মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হবে।

সাঙ্কো তবু বলল, ওগুলো হাওয়াকল হুজুর। যেগুলো হাতের মত দেখাচ্ছে সেগুলো হাওয়াকলের পাখা। বাতাসে ঐ পাখাগুলো ঘোরে আর কল চলতে থাকে।

ডন রেগে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, তুমি দিগ্বিজয় বা দৈত্যদানবের কথা কিছু জান ? জানবে কি করে, তুমি ত বইপত্র কিছু পড়নি ! ওগুলো হলো দানব। তুমি ভয় পেয়ে থাক ত এখানেই থাক। আমি একা গিয়ে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আসি।

সাঙ্কো বাধা দিলেও তা শুনল না ডন কুইকজোট। হাওয়াকলগুলোকে লক্ষ্য করে মুক্ত তরবারি হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে।

কাছে গিয়ে সে গর্জন করে হাওয়াকলগুলোকেই সম্বোধন করে বলল, আরে, আরে দুষ্ট দানবের দল, বীর ডন কুইকজোটের সঙ্গে যুদ্ধ করার মানসে দাঁড়িয়ে আছিস ? দাঁড়া, তোদের রণ-পিপাসা মিটিয়ে তোদের যমের বাড়িতে পাঠাব অবিলম্বে।

এই কথা বলেই বর্শা উচিয়ে হাওয়াকলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডন। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াকলের পাখায় তার বর্শাটা আটকে গেল। আর ঘোড়াসহ ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেল ডন।

ব্যাপারটা দেখে গাধার পিঠে চড়ে ছুটে এল সাঙ্কো। ডন তখন উঠতে পারছিল না। সাঙ্কো তাকে তুলে ধরে ঘোড়ার উপর বসিয়ে দিয়ে বলল, একি হুজুর ? কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে হাওয়াকলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়নি ত ?

ডন ধমক দিয়ে বলল, থাম, চেঁচিও না। ব্যথা আমি পেয়েছি ঠিক। কিন্তু আমি দিগ্বিজয়ী বীর। সে কথা আমার মত মহাবীরের পক্ষে মুখ ফুটে বলা শোভা পায় না।

সাঙ্কো হাসতে হাসতে বলল, বুঝেছি হুজুর।

ডন বলল, আমাকে এবার ধরে ঘোড়ায় তুলে দাও। তারপর এগিয়ে চল। দুই বীর আবার এগিয়ে যেতে লাগল।

৫

দিন গত হয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসতেই পথের ধারে একটা সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় নিল দুজনে।

সরাইখানায় তখন ছিল লোকের খুব ভিড়। থাকার জায়গা ছিল না। তাই সরাইখানার মালিক ডনকে ছাদের উপর একটা ভাঙ্গা খাটে রাতটার মত শুতে দিল। মালিকের স্ত্রী ও মেয়ে বড় ভাল মানুষ। ডনের দেহের ক্ষতগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

সকাল হতেই ডন কুইকজোট আর সাঙ্কোর অদ্ভুত পোশাক মূর্তি দেখার জন্য অনেকে ভিড় করল। সরাইখানা ছেড়ে যাত্রা করার জন্য মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে কুইকজোট বলল, কেউ যদি কখনো আপনার উপর কোনরূপ অত্যাচার করে তাহলে মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোটকে স্মরণ করবেন। আমি তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে অত্যাচারীকে সমুচিত শাস্তি দান করব।

সরাইখানার মালিক বলল, হে মহাবীর, অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আপনাকে দরকার হবে না। দয়া করে আপনি আমার টাকাটা মিটিয়ে দিন।

ডন বিস্মিত হয়ে রাগের সঙ্গে বলল, কিসের টাকা?

সরাইমালিক বলল, আপনি আর আপনার অনুচর একটা রাত একটা ঘোড়া আর গাধাসহ এখানে থাকলেন খেলেন তার টাকা।

তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে ডন বলল, এটা সরাইখানা? আমি ত ভেবেছিলাম এটা একটা দুর্গ আর আপনি এ দুর্গের অধিপতি। আপনি একটা সামান্য সরাইওয়ালা? কিন্তু টাকা আপনি পাবেন না।

কেন পাব না?

কারণ মহাবীরব্রতে যারা দীক্ষা নেয়, জগতের কল্যাণের জন্য যারা দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে বেড়ায় তারা কোথাও থাকা খাওয়ার জন্য দাম দেয় না। যে কোন জায়গায় আহার ও বাসস্থানে তাদের ন্যায্য অধিকার আছে।

সরাইওয়ালা এবার চীৎকার করে বলল, আমি ওসব মহাবীরব্রত বুঝিনা, আমি আমার পাওনা টাকা চাই।

ডন তাকে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, আপনি একটি মহামূর্খ।

এই বলে সে তার রোজিনান্তের পিঠে এক লাফে উঠে বর্শা উঠিয়ে সরাইখানার সীমানা পার হয়ে গেল।

অনেকে হৈ চৈ করতে করতে তার পিছু পিছু গেল। কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারল না।

সরাইওয়ালা এবার সাঙ্কোকে ধরল। সাঙ্কো চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সরাইওয়ালা তাকে বলল, তুমি টাকা না দিয়ে যেতে পারবে না।

সাঙ্কো বলল, আমি ওর সঙ্গে এসেছি মাত্র। আমি টাকা পয়সার কিছু জানি না।

তখন একদল লোক এসে একটা কম্বলের উপর সাঙ্কোকে চাপিয়ে কম্বলের চার কোণ ধরে শাটলকক খেলতে লাগল। তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার কম্বলের মধ্যে ধরে নিল।

সাঙ্কোর চিৎকার শুনে পথে যেতে যেতে ফিরে এল ডন কুইকজোট। যতই হোক সে বীর। কোন বীর কখনো আশ্রিত বা অনুচরকে বিপদের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায় না।

কিন্তু ডন ফিরে এসে দেখল, সরাইখানার দরজা বন্ধ। ঢুকতে না পেরে সে দেখল সাঙ্কোকে নিয়ে বলের মত কারা লোফালুফি করছে।

অনেকক্ষণ ধরে সাঙ্কোকে নিয়ে এইভাবে খেলা করার পর তাকে তার গাধাসহ ছেড়ে দিল।

সাঙ্কো বাইরে এসে ডনকে দেখে বলল, আমাকে ওরা টাকার জন্য আটকে রেখেছিল। আমি টাকা দিইনি।

ডন খুশি হয়ে বলল, সত্যিই তুমি বাহাদুর।

সাঙ্কো বলল, আর দিগ্বিজয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে বাড়ি ফিরে চলুন। এরপর আরও বীরত্ব দেখাতে গেলে প্রাণে মরতে হবে হুজুর।

ডন বলল, এখন ত চলো, পরে দেখা যাবে।

৬

বিকালের দিকে পথে যেতে যেতে ডন কুইকজোট দেখল, সামনের দিকে একটা যেন ধুলোর মেঘ এগিয়ে আসছে।

তা দেখে সে বলল, আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন সাঙ্কো। ধুলোর মেঘ নয়, আসলে একদল সৈন্য আসছে এই দিকে।

ডন বলল, সামনে পিছনে দুটো সৈন্যদল আসছে। একদল আক্রমণকারী আর একদল আত্মরক্ষাকারী। আমি আত্মরক্ষাকারীর দলে যোগদান করে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

কিন্তু আসলে কোন সৈন্যদল নয়, ভেড়ার পাল আসছে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে।

ডন এ কথা মানল না। সে বলল, তুমি ভয় পেয়ে গেছ। আমি একাই যাচ্ছি যুদ্ধ করতে।

সাঙ্কোর কোন কথা শুনল না ডন। কিন্তু তরোয়াল উঁচিয়ে সে ভেড়ার দলকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা সবাই মিলে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। ঢেলার আঘাতে ডনের কপাল কেটে গেল। নাক ফেটে গেল। রক্ত ঝরতে লাগল। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ডন।

ব্যাপার দেখে রক্ষীরা ভেড়ার দল নিয়ে পালিয়ে গেল। সাঙ্কো তখন ছুটে এসে ডাকাডাকি করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল ডনের। জ্ঞান ফিরলে সাঙ্কো তাকে বলল, কেমন আছেন হুজুর ?

ডন বলল, ভাল আছি। মহাবীর কখনো মন্দ থাকতে পারে না।

সাঙ্কো খুব জোর হেসে উঠলে ডন বলল, হাসছ কেন ?

সাঙ্কো হাসতে হাসতে বলল, হুজুর, আপনাকে একটা নতুন নাম দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে নাম হবে বেদনার্ত সিংহ মহাশয়।

কেন ও নাম দিলে ?

সাঙ্কো বলল, ক্ষুধায় ও আঘাতে এখন আপনার যা অবস্থা হয়েছে তাতে এই নামই মানায়।

এই বলে সাঙ্কো হাসতে লাগল আবার। ব্যথায় কাতর হলেও শেষে ডনও সে হাসিতে যোগ দিল।

৭

এরপর ডন আর সাঙ্কো পথে যেতে যেতে দেখল একদল সশস্ত্র প্রহরী কয়েকজন বন্দীকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্র তীরের দিকে।

ডন কুইকজোট বন্দীদের থামিয়ে বিজ্ঞের মত গম্ভীর গলায় নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। বন্দীদের কথা শুনে ডন কুইকজোটের ধারণা হলো এইসব দুঃখী লোকদের জোর করে অকারণে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে একজন মহাবীর ; নিপীড়িত মানুষের ত্রাণকর্তা। সে কখনই এইসব

নিরীহ নিপীড়িত মানুষদের উপর এইরকম অন্যায় অবিচার হতে দেবে না কখনই।

ডন প্রথমে প্রহরীদের অনুরোধ করল বন্দীদের ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু প্রহরীরা কিছুতেই রাজী হলো না ডনের কথায়। ডন তখন প্রহরীদের আক্রমণ করল।

ডনের আক্রমণে প্রহরীরা যখন ব্যস্ত হয়ে উঠল আত্মরক্ষায় তখন সেই সুযোগে বন্দীরা হাতকড়া ভেঙ্গে ফেলে ডনের সঙ্গে যোগ দিয়ে একযোগে প্রহরীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগল। প্রহরীরা তখন সে আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে মার খেয়ে পালিয়ে গেল।

বন্দীরা তখন ডনের চারদিকে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলল, হে প্রভু, আপনি আমাদের ত্রাণকর্তা। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি আমরা?

ডন বলল, একটা কাজ তোমরা আমার জন্য করতে পার। তোমরা চল আমার সঙ্গে, তোমাদের নিয়ে যাব আমার ভাবী স্ত্রী সুন্দরী ডানসিনিয়ার কাছে। তার কাছে গিয়ে তোমরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বীরত্বের কথা তাকে শুনিয়ে আসবে।

কিন্তু ডন কুইকজোটের এই অদ্ভুত কথায় রাজী হলো না বন্দীরা। তাতে রেগে গেল। সে তাদের বারবার একই অনুরোধ করতে লাগল। শেষে রাগের বশে তরোয়াল খুলে বন্দীদের আক্রমণ করল ডন। বন্দীরাও তাকে ঢেলা ছুঁড়তে লাগল। ডন ঢেলার ঘায়ে আহত হতে পুলিসের ভয়ে পালিয়ে গেল বন্দীরা।

মারপিটের জন্য স্পেন সরকারের পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে এই ভয়ে ডন ও সাঙ্কো শহরের দিকে না গিয়ে সিয়েরা মোরেনা পর্বতশ্রেণীর দিকে যেতে লাগল। বন্দীরা দূর থেকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

সিয়েরা মোরেনার মাঝখানে ছিল সেব্‌ল্‌ পাহাড়। সেই পাহাড়ের একটা গুহায় সেদিন রাতটা কাটিয়ে দিল ওরা। কারণ পাহাড়ের কাছে যেতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ডন আর সাঙ্কো। সারাদিনের পথক্লান্তি আর যুদ্ধবিগ্রহে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা দুজনে যখন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিল তখন বন্দীদের একজন এসে সাঙ্কোর গাধাটা চুরি করে নিয়ে যায়। গাধাটার নাম ছিল ড্যাপ্‌ল্‌।

সকালে উঠে তার গাধাকে দেখতে না পেয়ে গাধাটার নাম ধরে

আকুলভাবে ডাকতে লাগল সাঙ্কো। কিন্তু তার কোন সাড়া না পেয়ে কাঁদতে বসল সে। কাঁদতে কাঁদতে কথা বলতে লাগল সে। 'ওরে আমার ড্যাপল্, কোথায় গেলি রে, জন্মের পর থেকে তুই আমাদের ঘরে আছিস। তোকে বড় ভালবাসতাম আমরা। তুই কত বোঝা বয়েছিস আমাদের। তোকে ছেড়ে কি করে থাকব আমরা?'

অবশেষে ডন ঘুম থেকে উঠে তাকে অনেক বুঝিয়ে বাড়ি ফিরে তিনটে গাধার বাচ্চা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্ত করল তাকে।

এরপর পাহাড়ের নিচে ঘুরতে ঘুরতে খাড়া পাহাড়ের ধারে একটা বাড়ির ধারে গিয়ে উপস্থিত হলো তারা। চারদিকে শুধু গাছপালা, বন আর বন। সে বন প্রসারিত হয়ে দূরে দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে।

জায়গাটা বড় ভাল লেগে গেল ডনের। সে এক জায়গায় বসে পড়ে আবেগের সঙ্গে বলল, সাঙ্কো, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমি এখানেই বসে সুন্দরী ডানসিনিয়ার জন্য তপস্যা করব।

সাঙ্কো অনেক করে বোঝাল ডনকে। কিন্তু ডন কোন কথা শুনবে না। আর কোথাও যাবে না।

ডন শেষে সাঙ্কোকে বলল, তোমার সঙ্গে আমি দুটি চিঠি লিখে দেব। একটি চিঠিতে থাকবে তুমি কি করে তিনটি গাধার বাচ্চা পাবে তার নির্দেশ। আর একটি চিঠি ডানসিনিয়াকে দেবে। সে যদি আমার ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে এসে আমাকে ডাকে তাহলেই আমি দেশে ফিরব। তা না হলে এখানেই আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব।

সাঙ্কোকে দেশে ফেরার জন্য তার ঘোড়াটা দিয়ে দিল ডন। অবশেষে রোজিনান্তের পিঠে চড়ে ডনের দুটো চিঠি নিয়ে যাওয়ার পথে রওনা হলো সাঙ্কো।

কিছুদূর যেতেই পথে মাঞ্চা গ্রামের পুরোহিত আর নাপিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সাঙ্কোর।

পুরোহিত বলল, যে কোন উপায়েই হোক ডন কুইকজোটকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তা নাহলে পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে প্রাণটা হারাবে ডন।

এরপর পুরোহিত এক পরিকল্পনা করল। সে বলল, চল আমরা তিন জনে সেবল্ পাহাড়ে যাই। সেখানে গিয়ে সাঙ্কো ডনকে বলবে সুন্দরী ডানসিনিয়া অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে তাকে।

সাঙ্কো বলল, কিন্তু হুজুর যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে ?

তখন নাপিত বলল, তাহলে আমি এক রাণী সেজে তার তপস্যা ভাঙ্গিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে বলব। তারপর তাকে ভুলিয়ে মাঞ্চা গ্রামে নিয়ে যাব।

এইভাবে যুক্তি পরামর্শ করে তারা সেব্‌ল্‌ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু পথে যেতে যেতে এক মহিলাকে পেয়ে গেল তারা। ফলে নাপিতকে আর রাণী সাজতে হলো না।

তারা দেখল একদল যাত্রীর মধ্যে একজন মহিলা রয়েছে। যাত্রীদলের সঙ্গে তাদের পরিচয় হলো। ক্রমে সেই যাত্রীদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল সাঙ্কোরা। যাত্রীদলের সেই মহিলাটি ডন কুইকজোটের যতসব আজেবাজে খেয়াল খুশির কথা শুনে সে নিজেই রাণী সেজে ডনের মন ভোলাতে রাজী হয়ে গেল।

অন্য সবাইকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে সাঙ্কো একাই চলে গেল তপস্যারত ডনের কাছে। সে ডনকে বলল, আপনাকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছে ডানসিনিয়া। কিন্তু ডন বলল, না সুন্দরী ডানসিনিয়া নিজে এখানে না এলে বা না ডাকলে আমি আমার তপস্যার আসন ছেড়ে কোথাও যাব না।

তখন অগত্যা সেই মহিলাকে এক রাণী সাজানো হলো। সাঙ্কো সেই রাণীকে ডনের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, হুজুর, ইনি হলেন ইথিওপিয়ার অন্তর্গত মিকো মিকোন রাজ্যের অধিশ্বরী রাণী মিকো মিকোনা। ইনি বড়ই বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন।

ডন মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলল, কি বিপদ ?

মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, হে মহাবীর, আপনার বীরত্বের খ্যাতি শুনে অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। এক দুষ্ট দানব আমার রাজ্য কেড়ে নিয়ে প্রাসাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আপনি সেই দানবকে পরাজিত করে আমার রাজ্য উদ্ধার করে আমাকে ফিরিয়ে দিন। এই হলো আমার প্রার্থনা।

ডন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি প্রস্তুত। আমি মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোট, মহাবীরব্রতে দীক্ষা নিয়েছি। দুষ্টের দমন করে বিপন্নকে উদ্ধার করাই আমার কাজ। চলুন, আপনার দেশে আমি যাব। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

মহিলা বলল, কিন্তু তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে আপনাকে।

আমার রাজ্য উদ্ধার না করা পর্যন্ত আপনি অন্য কোন কাজে হাত দিতে পারবেন না। আর আমি আপনাকে যে পথে নিয়ে যাব আপনি বিনা প্রতিবাদে সেই পথে যাবেন।

ডন আনন্দের সঙ্গে এ কথায় রাজী হলো। সাঙ্কো তাকে বর্শা ও ঢাল তরোয়াল দিয়ে সাজিয়ে দিল।

তিনজন পাহাড় থেকে নেমে এল। মাঞ্চা গ্রামের পুরোহিত ও নাপিত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ডনের সঙ্গে তাদের দেখা হতে ডন বলল, এখন আমার সময় নেই। এখন আমাকে যেতে হবে মিকোমিকোন রাজ্যে। চলুন সুন্দরী।

পুরোহিত বলল, আমরাও ত ঐ পথেই যাব। এখান থেকে সোজা মাঞ্চা গ্রামের ভিতর আমরা যাব কার্থেজেনা। তারপর সেখান থেকে জাহাজে চেপে আমরা যাব মিকোমিকোন রাজ্যে।

আর কোন কথা না বলে ডন মাঞ্চা গ্রামের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল। কিছুদূর যেতেই দেখা গেল বেদের পোশাক পরা একটা লোক গাধায় চড়ে আসছে। সাঙ্কো তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, বেটা চোর, আমার গাধায় চড়ে আসছে। ঐ ত আমার গাধা ড্যাপ্‌ল্।

সাঙ্কোর চিৎকারে লোকটা গাধা ছেড়ে পালিয়ে গেল। সাঙ্কো ছুটে গিয়ে তার গাধাটার গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। অনেক আদর করতে গাধাটা ডেকে উঠল। সকলে হাসতে লাগল।

৮

রাতটা কাটাবার জন্য তারা একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠল। সেই সরাইখানায় মহিলাটি তার সঙ্গীদের দেখতে পেয়ে গেল। সে বলল, সেখান থেকেই সঙ্গীদের সঙ্গে চলে যাবে।

এবার ডনকে কি করে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে তা নিয়ে মহা বিপদে পড়ল পুরোহিত, নাপিত আর সাঙ্কো। অবশেষে নাপিত এক মতলব আঁটল।

তারা বলদে টানা একটি গাড়ি ভাড়া করল। সেই গাড়ির উপর কাঠের খাঁচা বসাল। গভীর রাতে ডন ঘুমিয়ে পড়লে তারা তিনজনে একটা করে আলখাল্লা আর মুখোস পরল।

তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় ডনকে বেঁধে ফেলল তারা আষ্টেপৃষ্ঠে। ডনের ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে দেখল আলখাল্লাপরা মুখোসধারী তিনটে লোক তাকে

বেঁধে ফেলেছে এমন করে যে সে নড়তে পারছে না। সেই অবস্থায় তাকে খাঁচায় ভরে খাঁচার দরজা এঁটে গাড়িতে চাপিয়ে দেওয়া হলো। গাড়ি চলতে লাগল।

পথে হঠাৎ এক দৈববাণী শুনতে পেল ডন। দৈববাণী বলল, হে মহাবীর, খাঁচায় বন্দী হয়েছ বলে দুঃখ করো না। যে মহান ব্রত তুমি গ্রহণকরেছ তা যাতে আরো ভালভাবে সাধিত হয় তার জন্য এই বন্দীত্বের প্রয়োজন আছে।

এরপর সেই দৈববাণী সাঙ্কোকে বলল, হে চিরবিশ্বস্ত অনুচর, তুমিও তোমার প্রভুর অনুগামী হও। তোমরা যেখানে যাবে সেখানে উভয়েই সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে।

দৈববাণী শুনে নিশ্চিত হলো ডন। সে ভেবেছিল কতকগুলো দুষ্ট প্রকৃতির লোক তার মহাবীরব্রতে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য তাকে বেঁধে অন্য জায়গায় চালান করছে। সে দৈববাণী শুনে খুশি হয়ে শুয়ে পড়ল খাঁচার ভিতরে।

খাঁচাটার দুদিকে সশস্ত্র প্রহরী যেতে লাগল আর তার পিছু পিছু যেতে লাগল গাধার পিঠে চড়ে সাঙ্কো। পুরোহিত আর নাপিত আলখাল্লা আর মুখোস পরে থাকায় তাদের চেনা যাচ্ছিল না।

এইভাবে দুদিন ধরে শোভাযাত্রা পথ চলার পর মাঞ্চা গ্রামে ঢুকল ডন।

মহাবীর ডন কুইকজোট খাঁচায় বন্দী হয়ে গাঁয়ে ফিরেছে এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে ছেলে বুড়ো সবাই ভিড় করতে লাগল ডনের বাড়িতে।

৯

বাড়িতে এসে একমাস চুপচাপ কাটাল ডন কুইকজোট। তারপর সে লোকের মুখে মুখে শুনতে পেল আরাগণ রাজ্যের সারাগোসা শহরে অল্প দিনের মধ্যে সেণ্ট জর্জের উৎসব উপলক্ষে এক সামরিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

সেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল ডনের মন। সে কারো কোন বিধিনিষেধ শুনল না। সে গোপনে সাঙ্কো পাঞ্জাকে বলে যাবার দিন ঠিক করে ফেলল।

একদিন সন্ধ্যার পর গোপনে সাঙ্কোকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল ডন কুইকজোট। সে চাপল ঘোড়ার পিঠে আর সাঙ্কো আগের মতই চাপল গাধার পিঠে। এইভাবে আবার যাত্রা শুরু করল তারা সারাগোসার পথে।

সারাগোসার পথে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর ভিয়েগো নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল ডনদের। ডন কুইকজোটের দিগ্বিজয়ের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে সেদিন দুপুরে তাদের দুজনকে নেমতন্ন করে খাওয়াল ডন ভিয়েগো।

দুপুরে ডন ভিয়েগোর বাড়ি পৌঁছবার আগেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। পথে সামনের দিক থেকে একটা গাড়ি আসতে দেখল। সেই গাড়িতে দুটো বড় খাঁচা ছিল। খাঁচার উপর কয়েকটা রাজকীয় পতাকা ছিল।

ডন কুইকজোট সাঙ্কোকে বলল, আমার শিরস্ত্রাণ আর বর্ম দাও সাঙ্কো। নিশ্চয় ঐ গাড়িতে কোন মহাবীর আসছে। যুদ্ধের জন্য এখনি তৈরি হতে হবে আমাকে।

গাড়িটার কাছে এসে দেখা গেল, দুটি খচ্চরে গাড়িটা টানছে। গাড়ির উপর দুটো বড় খাঁচা রয়েছে আর দুটো লোক বসে আছে। একটা লোক গাড়ি চালাচ্ছে আর একটা লোক বসে আছে।

ডন কুইকজোট গাড়ির সামনে গিয়ে গম্ভীর গলায় গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, এ গাড়ি কার? কি আছে এতে এবং এই নিশানগুলোই বা কিসের?

গাড়োয়ান বলল, এই গাড়ি আমার। এতে আছে দুটো সিংহ। আরাগনের রাজা স্পেনের মহামান্য মহারাজকে উপঢৌকন হিসাবে পাঠাচ্ছেন। আমরা স্পেনের রাজ দরবারে যাচ্ছি।

ডন আবার জিজ্ঞাসা করল. সিংহদুটো বড়?

গাড়িতে বসে থাকা লোকটি বলল, বড় মানে? এর থেকে বড় সিংহ আফ্রিকা থেকে স্পেনে আসেনি কখনো। এখন পথ ছেড়ে দিন। সিংহদুটোর এখনো খাওয়া হয়নি। রেগে গেছে। এখন বিপদ ঘটাতে পারে।

ডন হেসে বলল. বিপদ মানে? আমাকে সিংহের ভয় দেখাচ্ছেন? এখনি সিংহদুটোকে ছেড়ে দিন। দেখুন, খোলা মাঠে সিংহদুটোকে কিভাবে পরাভূত করি আমি।

ডন ভিয়েগো নামে সেই ভদ্রলোক কাছেই ছিল। সে ডনের কথা শুনে সাঙ্কোকে জিজ্ঞাসা করল, সেকি! তোমার প্রভু সিংহদুটোর সঙ্গে লড়াই করবেন নাকি? উনি কি পাগল?

সাঙ্কো বলল, পাগল নয়, তবে একগুঁয়ে।

ডন ভিয়েগো ডন কুইকজোটকে অনেক করে বোঝাল। কিন্তু ও জবাব দিল, আপনি আপনার কাজ করুন, আমার কাজ আমাকে করতে দিন।

এরপর ডন বর্শা উঠিয়ে গাড়োয়ানের মুখের উপর তুলে ধরে বলল, এখনি যদি খাঁচার দরজা খুলে সিংহদুটোকে ছেড়ে না দাও ত তোমাকে গাড়ির সঙ্গে গেঁথে ফেলব।

গাড়োয়ান গাড়ি থেকে খচ্চরদুটিকে খুলে সরিয়ে দিল। গাড়ির উপর বসে থাকা লোকটি বলল, সিংহদুটোকে আমিই দেখাশুনো করি। আপনারা সবাই সাক্ষী, আমি খাঁচা খুলে সিংহ ছেড়ে দিচ্ছি। এতে যদি কোন অঘটন ঘটে বা আমার চাকরি যায় তাহলে এই ভদ্রলোক দায়ী।

সাঙ্কো চোখে জল নিয়ে অনেক মিনতি করল এ কাজ না করার জন্য। কিন্তু ডন কারো কোন কথা শুনবে না। সে বলল, এই দুঃসাহসিক অভিযানে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে তুমি ডানসিনিয়াকে এই সংবাদটা দিও। আর আমি কিছু চাই না।

ডন বর্শা নিয়ে খাঁচার সামনে দাঁড়াল। লোকটি ধীরে ধীরে খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে সরে গেল। অন্য সবাই দূরে গিয়ে একটা ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে লাগল।

খাঁচার মধ্যে সিংহটা উঠে দাঁড়াল। লাল মুখ, সোনালি কেশর, আগুনের মত চোখ। লম্বা জিভটা বার করে মুখটা একবার চেটে নিল সিংহটা। তারপর খাঁচার বাইরে মুখটা বাড়িয়ে কি একবার দেখে নিল।

তার আগুনের মত চোখদুটোর পানে তাকাতেও যে কোন বীরের বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু ডন কুইকজোট একেবারে নির্বিকার। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সিংহের চোখের দিকে। ভাবছিল একবার সিংহটা লাফ দিলেই সে তার গায়ে বর্শাটা গেঁথে দিয়ে তাকে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবে।

সিংহটা কিন্তু লাফ দিল না। সে মহাবীর ডনের দিকে না তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে শান্তভাবে শুয়ে পড়ল খাঁচার মধ্যে।

ডন তবু ছাড়ল না। সিংহের পালক সেই লোকটিকে বলল, সিংহটাকে খুঁচিয়ে বার করে দাও।

লোকটি বলল, আমি তা পারব না। তাছাড়া তার কোন দরকার নেই। আপনি যা করেছেন তা যে কোন মহাবীরের গর্বের বস্তু। খাঁচার খোলা দরজার সামনে আপনি নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সিংহটারই লজ্জা পাওয়া উচিত। যুদ্ধ না করেও আপনি বিরাট গৌরব লাভ করেছেন।

ডন বলল, ঠিক আছে, তুমি ঠিকই বলেছ। খাঁচার দরজা এবার বন্ধ করে দাও।

এই কথা বলে সে তার বর্শার মাথায় রুমাল বেঁধে সেটাকে তুলে ধরে বর্শাটা নাড়াতে লাগল। এটা হলো যুদ্ধজয়ের সংকেত।

লোকটি খাঁচার দরজা বন্ধ করে ডনকে বলল, আমি আপনার এই বীরত্বের কথা স্পেনের রাজাকে বলব।

ডন খুশি হয়ে বলল, আরো বলবে, আজ হতে আমি নতুন উপাধি ধারণ করলাম, মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোট মহাবীর সিংহাসন সিংহ বাহাদুর।

সবাই হাসতে লাগল ডনের কথা শুনে। ডন যোগ দিল সে হাসিতে।

১০

ডন কুইকজোট ও সাঙ্কো পাঞ্জা ঘুরতে ঘুরতে মস্ত বড় এক জমিদারের বাড়িতে আশ্রয় নিল। জমিদার আর জমিদারগিন্নী দুজনেই ছিলেন খুব ভাল মানুষ। দুজনেই খুব আমোদপ্রিয়। ডন কুইকজোট আর সাঙ্কো পাঞ্জার নিত্য নতুন অভিযানের কাহিনী এর আগেই শুনেছিলেন তাঁরা। হঠাৎ একদিন তাদের দেখে তাদের খুব ভাল লেগে গেল জমিদার দম্পতির। খাতির করে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেখানেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন জমিদার। ঝি চাকরদের বলে দিলেন তারা যেন সবাই ডন কুইকজোটকে মহাবীরের উপযুক্ত সম্মান দান করে চলে।

এত খাতির ও সম্মান পেয়ে খুশি হলো ডন। সে একদিন সাঙ্কোকে বলল, কেমন বুঝছ।

সাঙ্কোও খুশি হয়ে বলল, হুজুর, সত্যিই আপনি একজন মহাবীর। কী খাতির যত্ন! এ যেন রাজসম্মান।

লাটসাহেব হবার খুব সাধ ছিল সাঙ্কোর। সে সখ তার এখনো মেটেনি। একটা দেশের শাসনকর্তা, সর্বেসর্বা হবে সে। একদিন জমিদারকে কথায় কথায় তার মনের বাসনাটা জানিয়ে দিল।

তা শুনে জমিদার বললেন, এ আর এমন বেশী কথা কি! আমার বহু জায়গায় জমিদারী আছে। একটা দ্বীপে এক শাসনকর্তার পদ খালি আছে। তুমি হবে সেই দ্বীপের লাটসাহেব।

জমিদারগিন্নী বললেন, সাঙ্কো, তুমি প্রজা শাসন করতে পারবে ত?

সাঙ্কো হেসে বললেন, দেখে নেবেন, আমি হচ্ছি ভালর ভাল মন্দের মন্দ। শাসন কাকে বলে দেখিয়ে দেব।

এক শুভদিন দেখে জরির পোশাক আর মাথায় পাগড়ি পরে খচ্চরের

পিঠে চড়ে রওনা হলো সাঙ্কো। তার গাধা ড্যাপলকেও সিল্কের পোশাক পরানো হয়েছিল। ড্যাপল চলতে লাগল সাঙ্কোর পিছু পিছু।

জমিদারের নির্দেশে নতুন দেশের শাসনকর্তা সাঙ্কোকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। পাত্রমিত্র ও সভাসদরা সবাই এগিয়ে এসে সসম্মানে অভিবাদন জানাল সাঙ্কোকে। তারপর তাকে গির্জায় নিয়ে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে শহরের চাবি দেওয়া হলো হাতে।

পরদিনই বিচারসভা বসল। সাঙ্কো যে আসনে বসেছিল তার পিছনে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল সেনর ডন সাঙ্কো পাঞ্জা আজ দ্বীপের অধিকারী হলেন।

সাঙ্কো তার নামের আগে সম্মানসূচক পদগুলো দেখে রেগে গেল। তার কর্মচারিদের বলল, এ সব আবার কি? আমার বাপ ঠাকুর্দার নামের আগে ত এ সব ছিল না।

কর্মচারিরা তার কথা ঘাড় নেড়ে মেনে নিলে বিচার শুরু হলো।

প্রথমে একজন দর্জি আর একজন লোক বিচারপ্রার্থী হয়ে এল।

দর্জি হাতজোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হুজুর, এই লোকটি দিনকতক আগে কিছুটা কাপড় নিয়ে এসে আমাকে একে একে জিজ্ঞাসা করে সেই কাপড়ে পাঁচটি টুপি তৈরি হবে কি না। আমি বলি, হবে। তখন সে আমাকে পাঁচটি টুপি তৈরির অর্ডার দিয়ে যায়। কাপড় খুবই কম থাকায় আমি তাতে ছোট ছোট পাঁচটি টুপি তৈরী করি তার কথামত। কিন্তু এখন সে গোলমাল করছে। প্রথমতঃ সে আমাকে টুপি তৈরির মজুরি দিতে চাইছে না। দ্বিতীয়তঃ সে তার কাপড় ফেরৎ চাইছে। কাপড় ফেরৎ দিতে না পারলে কাপড়ের দাম দিতে বলছে।

সাঙ্কো তখন লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, এ কথা কি সত্যি?

লোকটি উত্তর করল, হ্যাঁ হুজুর। তবে ও কিরকম টুপি তৈরি করেছে তা বার করে সবাইকে দেখতে বলুন।

সাঙ্কো লোকটিকে টুপি দেখাতে বলল। তখন লোকটি তার বাঁ হাতটি পকেট থেকে বার করল। দেখা গেল তার হাতের পাঁচটি আঙুলে পাঁচটি টুপি পরানো আছে।

তা দেখে সভার সকলেই হেসে উঠল।

দর্জি বলল, হুজুর, ওর কথামত অল্প কাপড়ে আমি পাঁচটি টুপিই তৈরি করেছি। তার থেকে এক সুতো কাপড়ও চুরি করিনি।

নতুন শাসনকর্তা সাঙ্কো একটু ভাবল। তারপর বলল, দেখ, এই মামলার আপোষ মীমাংসা হওয়াই ভাল। আমি বলি কি, দর্জি তার টুপি তৈরির কাজের জন্য কোন মজুরি পাবে না। আর লোকটিও তার কাপড়ের দাম পাবে না। তাহলেই সব ঝামেলা চুকে যাবে।

সবাই এ বিচারে সন্তুষ্ট হলো।

এর পর দুজন বয়স্ক লোক এসে বিচার প্রার্থনা করল। একজনের হাতে একটা মোটা লাঠি ছিল। যে লোকটির হাতে লাঠি ছিল না সে অভিযোগ করল, হুজুর, এই লাঠিধারী লোকটি কিছুদিন আগে আমার কাছ থেকে দশ মোহর ধার নেয়। কথা ছিল আমি চাইলেই সে মোহরগুলি শোধ করে দেবে। কিন্তু এখন সেগুলি ফেরৎ চাইলে বলছে সে দিয়ে দিয়েছে আমাকে। এখন সমস্যা হয়েছে এই যে এই ঋণ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে দলিলপত্র বা সাক্ষী নেই। আমার প্রার্থনা এই যে লোকটি যদি হুজুরের সামনে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলে সে সত্যি সত্যিই মোহরগুলি আমায় ফেরৎ দিয়েছে তাহলে আমি ওকে ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেব।

সাঙ্কো লাঠিধারী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এ বিষয়ে কি বলতে চাও?

লাঠিধারী লোকটি সাঙ্কোর কাছ থেকে বিচারের ন্যায়দণ্ডটি চেয়ে নিয়ে তা স্পর্শ করে শপথ করে বলল সে ঋণ শোধ করেছে।

অগত্যা বাধ্য হয়ে অভিযোগকারী লোকটি শপথবাক্য মেনে নিল। লাঠিধারী লোকটি তার লাঠিটি হাতে তুলে নিয়ে বিচারসভা থেকে বেরিয়ে গেল।

সাঙ্কো মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবতে লাগল। তারপর লাঠিধারী লোকটিকে ডেকে পাঠাল। অভিযোগকারী তখন সভাকক্ষেই ছিল।

সাঙ্কো লাঠিধারী লোকটির কাছ থেকে তার লাঠিটা চেয়ে নিয়ে অভিযোগকারীর হাতে তা দিয়ে বলল, এবার খুশি মনে তুমি বাড়ি যেতে পার, কারণ তুমি তোমার পাওনা পেয়ে গেলে।

অভিযোগকারী লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি হুজুর! এই লাঠিটা দশ মোহরের সমান হলো?

সাঙ্কো বলল, হ্যাঁ তা হলো। তা না হলে বুঝব আমার মাথায় গোবর আছে। এই বলে সে লাঠিটা ভেঙে দু টুকরো করল সবার সামনে। আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই অবাক হয়ে দেখল সেই ফাঁপা লাঠিটার ভিতর থেকে দশটি মোহর বেরিয়ে এল।

সাঙ্কোর বুদ্ধি দেখে সভার সব লোক ধন্য ধন্য করতে লাগল। সবাই একবাক্যে বলতে লাগল, আমাদের নতুন লাটসাহেব দ্বিতীয় সলোমন।

লাটসাহেব হিসাবে সাঙ্কোকে অনেক ভাল ভাল খাবার দেওয়া হত রোজ। কিন্তু তার চিকিৎসক খাবারগুলো গুরুপাক, হজম হবে না এই অজুহাতে সেই সব ভাল ভাল খাবার খেতে দিত না। সাঙ্কো তাই তার সেই চিকিৎসককে বরখাস্ত করে তাড়িয়ে দিল।

ভাল ভাল খাবার খেত আর পালকের মত নরম গদিতে শুতো সাঙ্কো। তার দিনগুলো বেশ ভালই কাটছিল। তার স্বপ্ন এতদিনে সফল হয়েছে। কিন্তু এক রাতের এক ঘটনায় সব কিছু মাটি হয়ে গেল।

রাত্রি তখন গভীর। সাঙ্কো ঘুমোচ্ছিল তার বিছানায়। হঠাৎ শহরের বিপদঘণ্টা বেজে উঠল জোরে। সঙ্গে সঙ্গে ভেরী, তুরী, জয়ঢাক প্রভৃতি যত সব রণবাদ্য বেজে উঠল।

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সাঙ্কো। জানালা দিয়ে মুখ বার করে দেখল, শহরের সব লোক রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে। মশাল হাতে ছোটাছুটি করছে।

এমন সময় তরোয়াল আর মশাল হাতে সভাসদরা এসে সাঙ্কোকে ডাকাডাকি করতে লাগল। কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারল না সাঙ্কো।

সভাসদরা একবাক্যে সাঙ্কোকে বলল, হুজুর, প্রাসাদদ্বারে শত্রু এসে পড়েছে। আমাদের শহর আক্রান্ত। শীগ্গির অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসুন। আপনি আমাদের বীর সেনাপতি, আমাদের পরিচালিত করুন।

যুদ্ধের নাম শুনে চমকে উঠল সাঙ্কো। দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে সাঙ্কো বলল, আমি ত যুদ্ধ জানি না। যুদ্ধ জানে আমার প্রভু ডন কুইকজোট।

কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। কয়েকজন সভাসদ রণসাজে সাজিয়ে দিল সাঙ্কোকে। তার বুকে আর পিঠে দুটো ঢাল বেঁধে দিল। হাতে দিল বর্শা। তারপর সবাই সমস্বরে বলে উঠল, হুজুর চলুন এবার যুদ্ধযাত্রায়।

কিন্তু বর্মটর্ম আর ঢালের ভারে একপাও চলতে পারছিল না সাঙ্কো। কিছুটা এগিয়ে যেতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

এমন সময় বাইরে জনতার বিজয়োল্লাস শোনা গেল। সভাসদরা ছুটে এসে সাঙ্কোকে বলল, হুজুর, আমাদের জয় হয়েছে।

সাঙ্কো উঠে বসে বলল, যাই হোক, আমাকে তুলে ধরুন।

সাঙ্কোর গা থেকে বর্ম ও ঢাল খুলে ফেলা হলো। সাঙ্কো বিছানায় শুয়ে পড়েই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

সাঙ্কোর ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে গেল রাজ্যের সভাসদরা। আসলে কোন আক্রমণ হয়নি। তারা চেয়েছিল সাঙ্কোর বীরত্ব ও সাহসের বহরটা দেখে একটু আমোদ করতে। তাই আক্রমণের ঘটনাটা সাজিয়ে তুলেছিল তারা। কিন্তু যুদ্ধের নাম শুনে সাঙ্কো যে এতখানি ভেঙ্গে পড়বে তা বুঝতে পারেনি তারা।

যাই হোক, একটু পরেই সাঙ্কোর জ্ঞান ফিরে এল। সে চোখ মেলে চাইল। তারপর উঠে বসল। তারপর একজনকে জিজ্ঞাসা করল, এখন কটা বাজে ?

এখন ভোর হয়ে হয়ে এসেছে।

সহসা যে লাটগিরির একদিন কত স্বপ্ন দেখেছিল সাঙ্কো সেই লাটগিরির সব সাধ সব বাসনার অকালে অবসান ঘটল তার। সে বুঝতে পারল, এ কাজের মোটেই উপযুক্ত নয় সে। সে একজন সামান্য গ্রাম্য চাষী। তার নিজের কাজে বা পেশাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

নিজের স্বরূপটাকে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্কো ঠিক করল আর এক মুহূর্ত থাকবে না এখানে।

সাঙ্কো তাই তার লাটের দামী পোশাক ছেড়ে যে পোশাক সে পরে প্রথমে এসেছিল তা পরে সোজা আস্তাবলে চলে গেল। সেখানে তার গাধা ড্যাপলের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করে বলল, যতদিন তুমি আমার সাথী ছিলে ততদিন কত সুখে ছিলাম আমি। যেদিন থেকে তোমাকে ছেড়ে লাটসাহেবের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম সেদিন থেকে কপালে জুটল যত দুঃখ দুর্দশা। এবার ফিরে চল। খুব হয়েছে।

পাত্র মিত্র ও সভাসদরা তখন সাঙ্কোর চারদিকে জড়ো হয়েছিল। তাদের বলল সাঙ্কো, আমি ফিরে যাচ্ছি আমার দেশে। যার যা কাজ তাকে তাই সাজে। আমার কাজ হলো চাষ করা আর ফসল কাটা। লাটসাহেব আমার সাজে না। জমিদারবাবুকে জানিয়ে দেবেন আমি শুধু হাতে এসেছিলাম। শুধু হাতেই ফিরে যাচ্ছি। দুদিনের লাটগিরিতে আমার লাভ লোকসান কিছুই নেই। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

সাঙ্কোকে থাকার জন্য সবাই অনুরোধ করল। কিন্তু সাঙ্কো কারো কথা শুনল না।

১১

সে দেশ থেকে বেরিয়ে সাঙ্কো গাধার পিঠে চড়ে সোজা ফিরে গেল সেই জমিদারের প্রাসাদে। সেখানে ডন কুইকজোট অস্বস্তি বোধ করছিল। কোন দুঃসাহসিক অভিযান নেই। শুধু শুধু চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতে কোন মহাবীরের ভাল লাগে না।

সাঙ্কো ফিরে আসতেই ডন জমিদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাঙ্কোকে সঙ্গে করে সারাগোসা শহরের দিকে যাত্রা শুরু করল।

পথে বার্সিলোনা শহরের এক ভদ্রলোকের বাড়িতে দিনকতকের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করল ডন কুইকজোট। সেখানে একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটল যা তার জীবনের গতি পাল্টে দিল একেবারে।

একদিন সকালবেলায় ডন তার রোজিনান্তের পিঠে চড়ে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় সে দেখল একজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তার দিকে। অশ্বারোহীর সারা দেহ বর্ম দিয়ে ঢাকা। তার ঢালের উপর সাদা রঙের একটা চাঁদ ছিল।

নবাগত অশ্বারোহী ডনের সামনে এসে বলল, হে বিশ্ববিখ্যাত মাঞ্চার ডন কুইকজোট, আমার কথা শুনুন। আমার নাম মহাবীর চন্দ্রকেতন। আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই। সেই সঙ্গে আপনাকে স্বীকার করতে বাধ্য করব যে আমার ভাবী স্ত্রী আপনার ডানসিনিয়ার থেকে দশগুণ বেশী সুন্দরী। বলুন, আপনি এ যুদ্ধে রাজী আছেন কি না?

ডন গম্ভীরভাবে বলল, নিশ্চয় রাজী আছি।

নবাগত বলল, কিন্তু এ যুদ্ধের একটি শর্ত আছে। এ যুদ্ধে আপনি যদি পরাজিত হন তাহলে আপনাকে বর্মটর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে সারাজীবন বিশ্রাম নিতে হবে আপনার বাড়িতে। জীবনে আর আপনি কখনো যুদ্ধ করতে পারবেন না। আর যদি আমি পরাজিত হই তাহলে আমার এই অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র আপনি পাবেন। এখন আমার কথার জবাব দিন।

ডন বলল, আপনার এ প্রস্তাব সত্যিই বিস্ময়কর। তবু তা আমি মেনে নিলাম।

এদিকে তখন সমুদ্রের ধারে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে তাদের লড়াই দেখার জন্য। ডন যে বাড়িতে থাকত অতিথি হিসাবে সে বাড়ির মালিক সেই ভদ্রলোকও ক্রমে হাজির হয়েছেন সেখানে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

ডনের ঘোড়া রোজিনান্তের কোন ক্ষমতা ছিল না। অথচ নবাগত অশ্বারোহীর ঘোড়াটি ছিল খুব বলবান আর তেজী। ফলে নবাগত এক লাফে এগিয়ে এসে ডনকে এমন আঘাত করল যে সে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। তখন মহাবীর চন্দ্রকেতন তার ঘোড়া থেকে নেমে এসে ডনের বুকের উপর চেপে বসে তার বর্শার মুখটা তার গলায় ছুঁইয়ে বলল, এইবার আপনার পরাজয় স্বীকার করুন মহাবীর ডন কুইকজোট। আর এই মুহূর্তে আপনার প্রতিশ্রুতি মত সোজা চলে যান আপনার গ্রামে। তা না হলে আমার এই বর্শা আপনার গলদেশকে বিদ্ধ করে আপনার জীবনান্ত ঘটাবে।

ডন তখন উত্থানশক্তিরহিত। শিরস্ত্রাণে তার মুখটা ঢাকা থাকলেও তার ভিতর থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি পরাজিত এবং আমার জীবন আপনার হাতে ঠিকই, তবু কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি ডানসিনিয়া হচ্ছে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী আর আমি হচ্ছি সবচেয়ে হতভাগ্য মহাবীর। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় ত হোক। মান যখন গেছে তখন আমার প্রাণ গেলেও ক্ষতি নেই।

মহাবীর চন্দ্রকেতন তখন নরম সুরে বলল, দেখুন ডন কুইকজোট, আমি চাই, আপনি বেঁচে থাকুন। বেঁচে থাক আপনার গৌরব আর সুন্দরী ডানসিনিয়ার খ্যাতি। আমি শুধু চাই, যুদ্ধের শর্ত অনুসারে আপনি মাঞ্চা গ্রামে ফিরে যান।

ডন কুইকজোট বলল, তাই হবে। যুদ্ধে পরাজিত যখন হয়েছি তখন শর্ত ভঙ্গ করে লজ্জা বাড়াব না।

এর পর ডন সাঙ্কোকে বলল, আমাকে তুলে ধর। আমাকে মাঞ্চায় নিয়ে চল।

সাঙ্কো বলল, কিন্তু হুজুর, আপনার শরীরের যে অবস্থা তাতে এখনি ত এতদূর পথ যাওয়া সম্ভব হবে না। তার চেয়ে এই শহরেই কয়েকটা দিন থেকে বিশ্রাম নিন। তারপর সুস্থ হলে গাঁয়ে যাবেন।

মহাবীর চন্দ্রকেতন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। ডন সাঙ্কোকে বলল, তাই হবে।

ডনকে তখন সবাই ধরাধরি করে শহরের দিকে নিয়ে চলল।

একদল কৌতূহলী লোক মহাবীর চন্দ্রকেতনের পরিচয় জানার জন্য তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। চন্দ্রকেতন একটি সরাইখানার সামনে

থামলে সেই লোকটিও তার কাছে গিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইল। চন্দ্রকেতন বলল, আমি মহাবীর নই। আমার নাম স্যামসন কারাস্কো, মাঞ্চা গ্রামেই আমার বাড়ি। আসলে গাঁয়ের লোক ডন কুইকজোটকে বড় ভালবাসে। তাই ফন্দী করে তার পাগলামি ছাড়িয়ে তাকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে তারা।

লোকটি বলল, কিন্তু যেরকম পাগলাটে মানুষ, সুস্থ হলেই আবার মতিগতি পাল্টে যাবে না ত ?

কারাসকো বলল, না। কুইকজাডা কখনো কথার খেলাপ করে না।

কথাটা ঠিক। সাতদিন পর ডন সুস্থ হতেই সে সাঙ্কোকে নিয়ে মাঞ্চার পথে রওনা হলো।

পথে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ডন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমার দুর্ভাগ্য আর দুর্বলতার জন্যে যশের দেবী আমায় ছেড়ে গেছেন। আমার গৌরবের যে সূর্য অস্ত গেছে এখানে সে সূর্য আর উঠবে না কখনো।

১২

সাঙ্কো পাঞ্জাকে সঙ্গে করে ডন মাঞ্চা গ্রামে ঢুকতেই ছেলে বুড়ো সব মানুষ আনন্দে উল্লাস করতে লাগল। নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল ডনকে। কিন্তু ডনের মুখে কোন কথা নেই। তার গায়ে তখন দারুণ জ্বর। সে সোজা বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ডনের অসুখ বেড়ে চলল দিনে দিনে। ডাক্তার ডাকা হলো। অনেক ওষুধ খাওয়ানো হলো। কিন্তু ডনের জ্বরের ঘোর কাটল না। দুদিন একটানা জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে রইল ডন। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকতে লাগল।

দুদিন পর জ্ঞান ফিরে পেয়েই ডন বলল, যারা ভুল পথে চলে না জেনে, ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করুন।

সাঙ্কো তার পাশেই ছিল। ডন আবার সাঙ্কোকে বলতে লাগল, এতদিনে আমি ফিরে পেয়েছি আমার সহজ জ্ঞান আর বিচারবুদ্ধি। এতদিন শুধু অলীক স্বপ্ন দেখে এসেছি। পাগলামি করে এসেছি মিথ্যা আশার পিছনে ছুটে। সে পাগলামি আমার কেটে গেছে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। আমার সময় হয়ে এসেছে।

ডনের ঘরে তখন মাঞ্চা গ্রামের অনেকে জড়ো হয়েছে। পুরোহিত, নাপিত, কারাসকো ও আরো অনেকে।

ডন তাদের সবাইকে বলল, আজ আমি আর মহাবীর ডন কুইকজোট নই, আজ আমি এ্যালেঙ্গো কুইকজাডা, তোমাদের ভাই। কারাসকো, তুমিই আমার ভুল ভেঙ্গেছ। ঈশ্বর যেন সে ভুল ক্ষমা করেন।

ডন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। আমি চললাম। আমার মৃত্যুর পর আমাকে যেন ভুলো না তোমরা।

উপস্থিত সকলের চোখে জল এল। সকলে একবাক্যে বলে উঠল, 'আমেন।'

গালিভারস্ ট্রাভেলস্



গালিভারস্ ট্রাভেলস্

জোনাথান সুইফট

প্রথম ভাগ

লিলিপুটদের দেশে

১

আমার বাড়ি ছিল নটিংহামশায়ারে। সেখানে আমার বাবার কিছু জমি জায়গা ছিল। আমার বাবার পাঁচ ছেলের মধ্যে আমি ছিলাম তৃতীয় সন্তান। আমার বয়স যখন চোদ্দ তখন আমার বাবা আমার পড়াশুনোর জন্য কেমব্রিজের এমানুয়েল কলেজে পাঠান। তিন বছর সেখানে থেকে মন দিয়ে লেখাপড়া করি। কিন্তু আমার বাবা এই সময় অর্থাভাবে পড়ায় আমার পড়ার খরচ চালাতে পারলেন না।

আমার কলেজের পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আমি তখন বাধ্য হয়ে লণ্ডনের বিখ্যাত সার্জেন মিঃ বেটসের কাছে শিক্ষানবিশি করতে থাকি। বাবা আমাকে মাঝে মাঝে কিছু করে টাকা পাঠাতেন। আমি সেখানে বার বছর থাকি। বাবা আমাকে যে টাকা পাঠাতেন সেই টাকায় আমি জাহাজ চালানো শিখতাম।

ছোট থেকেই সমুদ্রযাত্রা ও দেশভ্রমণে দারুণ আগ্রহ ছিল আমার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এইভাবেই ভাগ্য ফিরবে আমার। আমি আরো ভাল করে জাহাজ চালানোর বিদ্যা শেখার জন্য বেটস্-এর কাজ ছেড়ে দিয়ে আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাড় করে লাইডেনে চলে গেলাম।

লাইডেন থেকে ফিরে এসে আমার পুরনো মনিব মিঃ বেটস্-এর সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমাকে সোমালা জাহাজের ক্যাপ্টেন আব্রাহাম প্যানেলের কাছে পাঠান। ঐ জাহাজে তখন সার্জেনের পদ খালি থাকায় বেটস্-এর সুপারিশের ফলে ঐ পদটি আমি পাই।

ঐ জাহাজে আমি তিন বছর ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে আমি কয়েকটি বন্দরে ও দেশে যাই। তারপরে দেশে ফিরে এসে লণ্ডনে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করলাম। বেটস্ কিছু পেনি যোগাড় করে দিলেন। হোসিয়ারী ব্যবসায়ী এডমণ্ড বার্টন-এর মেয়ে মিস্ মেরি বার্টনকে বিয়ে করলাম।

কিন্তু বছর দুইএর মধ্যে মিঃ বেটস্ মারা যেতে আমার রোগীর সংখ্যা কমতে লাগল। আমার ব্যবসায় ভাটা পড়ল।

তখন বাধ্য হয়ে আমি আবার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম। পরপর দুটো জাহাজে সার্জেনের কাজ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিজ ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দেশ-

গুলোতে ঘুরে বেড়ালাম। আসার সময়ে আমি নামকরা লেখকদের লেখা ভাল ভাল ভ্রমণের বই পড়তে লাগলাম। কিছু টাকাও সঞ্চয় করলাম।

আমি সমুদ্র যাত্রাকালে যখন যে দেশে যেতাম সেই দেশের ভাষা, রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালী শিখে নিতাম। আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকায় আমি সব কিছু মনে রাখতে পারতাম।

কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় বিরক্তি বোধ হতে লাগল আমার। ঠিক করলাম আবার আমি চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করব। এই উদ্দেশ্যে আমি বাসা পরিবর্তন করে ওল্ড জুরি পাড়া থেকে বেটার লেনে উঠে গেলাম। সে অঞ্চলে অনেক নাবিক বাস করত। কিন্তু এখানেও আমার চিকিৎসা ব্যবসায় পশার জমাতে পারলাম না।

এইভাবে তিন বছর কাটাবার পর আবার এক চাকরী পেয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম রিচার্ড তাঁর 'এ্যান্টিলোপ' জাহাজ নিয়ে সাউথ সী যাচ্ছেন। ১৬৯৯ সালের ৪ঠা মে ব্রিস্টল থেকে আবার সমুদ্রযাত্রা করলাম আমি।

কিন্তু এ যাত্রা আমাদের শুভ হলো না। ইস্ট ইণ্ডিজ পার হতেই প্রবল ঝড়ের কবলে পড়লাম আমরা। ঝড় আর ঢেউএর টানে ভ্যান ডাইমেন আইল্যাণ্ড পার হয়ে দেখলাম ৩০ ডিগ্রী অক্ষাংশ অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে ভেসে চলেছি।

তখন ছিল নভেম্বর মাস। কিন্তু ওখানে নভেম্বর মাসেই গরম পড়ে। দারুণ গরম, কঠোর পরিশ্রম আর খারাপ খাদ্য খেয়ে আমাদের জাহাজের বারো জন নাবিক মারা যায়। বাকিরা দুর্বল হয়ে পড়ে।

একদিন হঠাৎ একটা পাহাড় দেখতে পাওয়া গেল। পাহাড়টাকে পাশ কাটিয়ে জাহাজ চালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল নাবিকরা। কিন্তু ঝড়ের বেগ তখনো প্রবল ছিল এবং ঝড়টা সেই দিকেই বইছিল বলে পাহাড়টাকে এড়ানো গেল না। পাহাড়টাকে সজোরে ধাক্কা মারল আমাদের জাহাজটা। পাঁচজন নাবিকের সঙ্গে আমি একটা নৌকোয় উঠে পড়লাম। কিন্তু ঝড়ের আঘাতে নৌকোটাও উল্টে গেল। আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়লাম অকূল জলে। আমি একা একা সাঁতার কাটতে লাগলাম। কিন্তু ক্রমে হাত-পা অবশ হয়ে এল আমার।

স্রোতে ভাসতে ভাসতে একসময় হঠাৎ পায়ের তলায় মাটি ঠেকল। তারপর জলে জলে প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পর ডাঙ্গা পেলাম। ডাঙ্গার

উপর উঠেও হাঁটতে লাগলাম। কোন মানুষ বা ঘরবাড়ি চোখে পড়ল না আমার। হয়ত তখন দেহে ক্লান্তি থাকার জন্য ভাল করে লক্ষ্যও করিনি।

ক্লান্তিতে পথ চলতে আর না পেরে সেই ডাঙ্গার ঘাসের উপরেই শুয়ে পড়লাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে পড়ল আমার চোখে। ন ঘণ্টা ধরে সমানে ঘুমোলাম। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু উঠতে গিয়েও উঠতে পারলাম না। দেখলাম কারা আমার হাত-পা ও মাথার লম্বা চুলগুলো জমির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। আমার বুকের উপরেও বাঁধন রয়েছে। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলাম। পাশ ফিরতে পারছিলাম না। তাই আকাশ ছাড়া আর কিছু নজর হচ্ছিল না। আমি শুনতে পেলাম আমার কাছে আশেপাশে কারা কথা বলাবলি করছে।

আমি একটু চাপ দিয়ে আমার বাঁ হাতের বাঁধনটাকে ছিঁড়ে ফেললাম। আমার মাথাটাকেও একটু আলগা করলাম। এমন সময় আমি অনুভব করলাম, আমার বাঁ পায়ের উপর একটা জীবন্ত প্রাণী চলে বেড়াচ্ছে। ক্রমে সেই প্রাণীটা আমার বুকের উপর দিয়ে উঠে এসে আমার চিবুকের কাছে এসে দাঁড়াল। তখন দেখতে পেলাম ছয় ইঞ্চি লম্বা ক্ষুদ্রাকৃতি একটা মানুষ। তার হাতে আছে তীর ধনুক আর পিঠে একটা তূণ।

প্রথম ক্ষুদে মানুষটা'র পিছু পিছু আরো প্রায় চল্লিশ জন আমার বুকের উপর এসে উঠল। আমি একটা চিৎকার করে উঠতেই ভয়ে তারা নেমে পড়ল আমার বুক থেকে। অনেকে আবার লাফাতে গিয়ে আহত হয়।

একজন আবার এগিয়ে এসে আমার মুখটা ভাল করে দেখে 'হেকিনা দেউল' বলে চিৎকার করে উঠল। আমি সেকথার মানে বুঝতে পারলাম না। এবার আমি নিজেকে মুক্ত করার জন্য জোর একটা টান দিতেই যে সব গোঁজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল সেই সব গোঁজগুলো উপড়ে গেল। আমি উঠে বসতেই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে লাগল তারা। সেই সব তীরগুলো ছুঁচের মত বিঁধতে লাগল। কিছু বোমার মত ফাটাতে লাগল। কিন্তু সেগুলো খুব হালকা লাগল। এরপর তারা বর্শা দিয়ে আমাকে আক্রমণ করল। কিন্তু আমার গায়ে তখন পুরু রাফ জার্কিন ছিল বলে বর্শার ফলাগুলো আমার গায়ে লাগল না মোটেই।

আমি তখন ভাবলাম ঐ সব ক্ষুদে মানুষগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করা আমার পক্ষে কঠিন না হলেও এখন আপাততঃ শুয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের

কাজ হবে। তাই আমি চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। ওদের আক্রমণও বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর ওরা এক মঞ্চ তৈরি করে তাতে ওঠার জন্য মই লাগিয়ে দিল। ওদের মধ্যে লম্বা একজন লোক আমাকে উদ্দেশ্য করে একটা বক্তৃতা দিল। আমার মনে হলো, সেই বক্তা ওদের দলপতি বা রাজা। আমি তার বক্তৃতা এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না।

বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জন ক্ষুদে মানুষ আমার বাঁ হাতের ও মাথার বাঁধন কেটে দিল। ওদের হাবভাব ও কথাবার্তা থেকে আমার প্রতি ওদের শুভেচ্ছার পরিচয় পেলাম।

আমি এবার ওদের বললাম, জাহাজডুবি হয়ে আমি ওদের এই দেশে এসে পড়েছি। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় দারুণ কাতর।

ওদের রাজার হুকুমে তখন অনেক লোক অনেক মাংস আর পাঁউরুটি এনে দিল আমাকে। মাংসের টুকরো খুব ছোট এবং সেগুলো বিভিন্ন প্রাণীর আর পাঁউরুটিগুলো বন্দুকের বুলেটের মত। আমি একসঙ্গে অনেক মাংস-টুকরো আর রুটি মুখে পুরে দিতে লাগলাম। তা দেখে অবাক হয়ে গেল ওরা।

খাওয়ার পর পানীয় চাইলাম। ওরা দুটো মদের পিপা এনে দিল। আমি দুটো পিপেই শেষ করে ফেললাম। সে মদের পরিমাণ হবে মোট এক পাঁটের মত। তবে খেতে বেশ সুস্বাদু, অনেকটা বার্গাণ্ডির মত। আমি আবার শুয়ে পড়লাম।

এরপর আমার বুকের উপর উঠে নৃত্য করতে লাগল ওরা। আবার 'হেকিনা দেগুল' বলে চিৎকার করতে লাগল ওরা।

এবার আমি আমার সব বাঁধন কেটে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু ওদের সম্রাট বলল, আমার বাঁধন খোলা হবে না। এমন সময় একজন রাজকর্মচারী পা দিয়ে আমার বুকের উপর উঠে আমার বুকের কাছে এক বক্তৃতা শুরু করল। বক্তৃতা দেবার সময় মাঝে মাঝে সে হাত বাড়িয়ে দূরে কি দেখাচ্ছিল।

পরে বুঝলাম ওরা আমায় ওদের রাজধানীতে নিয়ে যেতে চায়। রাজধানী সেখান থেকে আধ মাইল দূর। ওরা আমাকে যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় দেবে।

আমি ওদের রাজধানীতে যেতে চাইলে ও ওদের ইচ্ছামত কাজ করতে চাইলে ওরা আমার বাঁধন খুলে দিল। তখন আমি বহুক্ষণ ধরে আটকে রাখা

মূত্রত্যাগ করলাম। সেটা ওদের বন্যাস্রোতের মত মনে হচ্ছিল এবং ওরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

এর পর ওরা আমার মুখে ও হাতে যেখানে যেখানে তীর বিঁধেছিল এবং জ্বালা করছিল সেখানে মলমের মত কি একটা জিনিস লাগিয়ে দিল ওরা। ফলে আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল মুহূর্তে।

পরে জেনেছিলাম আমি যখন এই দ্বীপে এসে ঘুমোচ্ছিলাম তখনই ওরা আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের সম্রাটকে খবর দেয় এবং সম্রাটের আদেশে আমাকে বেঁধে ফেলে ওরা। তখনই ওরা আমার খাদ্য ও পানীয় যোগাড় করতে থাকে।

এবার ওরা আমাকে ওদের রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। ওরা জানিয়ে দিল আমায় আমাকে বন্দী অবস্থাতেই নিয়ে যেতে চায় ওরা। আমি হেঁটে যেতে পারব না।

আমাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য চাকাওয়ালা এক গাড়ি বানাবার ব্যবস্থা করা হলো। তার জন্য পাঁচশো জন মিস্ত্রী ও এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হলো। তারা চার ফুট চওড়া ও সাত ফুট লম্বা এবং মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঁচু একটা গাড়ি তৈরি করা হলো। তাতে বাইশটা চাকা লাগানো হলো।

এর মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে শুনেছিলাম আমার মদে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাতে আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যেতে কোন বেগ পেতে না হয়। আমার গলা ও হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে হুক লাগিয়ে গাড়িতে তোলা হয় আমাকে। আমাকে রাজধানী নিয়ে যেতে দেড় দিন সময় লাগল।

রাজধানীর ভিতরে একটা প্রাচীন মন্দিরের সামনে গাড়িটা থেমে গেল। মন্দিরের গেটটা চার ফুট উঁচু আর ছ ফুট চওড়া। এই মন্দিরে একবার এক হত্যাকাণ্ড হওয়ার পর মন্দিরটা খালি পড়ে ছিল। আমি গুড়ি মেরে ভিতরে ঢুকলাম। গেটের দুপাশে দুটো জানালা ছিল। সেই জানালায় শিকল লাগিয়ে সেই শিকল দিয়ে আমার বাঁ পাটা বেঁধে দিল। তারপর অনেকগুলো তালা লাগিয়ে দিল যাতে আমি পালিয়ে যেতে না পারি।

সেই মন্দিরের উল্টো দিকে পাঁচ ফুট উঁচু একটা গম্বুজ ছিল। সম্রাট তার মন্ত্রীদের নিয়ে সেই গম্বুজের উপর উঠে আমাকে দেখতে লাগল। আমাকে দেখার জন্য প্রায় একলক্ষ লোক ভিড় করেছিল। অনেকে মই বেয়ে আমার দেহের উপর উঠেছিল। কিন্তু সম্রাট এক ঘোষণার দ্বারা আমার উপর ওঠা নিষিদ্ধ করে দিল।

আমার বাঁ পায়ে ছ গজ লম্বা একটা শিকল লাগিয়ে জানালার সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়েছিল বলে এবার আমার দেহের অন্য সব বাঁধনগুলো কেটে দেওয়া হলো। কারণ ওরা বুঝল আমার পক্ষে পালানো অসম্ভব।

২

পরদিন সকালে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম গোটা দেশটা একটা বাগানের মত। পটে আঁকা ছবির মত। তবে সবচেয়ে বড় গাছগুলোর উচ্চতা সাত ফুটের বেশী হবে না।

সম্রাট আমার জন্য প্রচুর খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করলেন। একটা চাকাওয়ালা ঠেলা গাড়িতে করে সব খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে আমার কাছে ঠেলে দেওয়া হত।

সেদিন সম্রাট ঘোড়ায় চেপে আমার দিকে এগিয়ে আসতেই আমাকে দেখে ক্ষেপে উঠল ঘোড়াটা। আমাকে দেখে ঘোড়াটা ভেবেছে একটা চলন্ত পাহাড়।

আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় ঘোড়াটা। কিন্তু সম্রাট কুশলী অশ্বারোহী বলে ছিটকে পড়ে গেলেন না। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা ছুটে এসে ঘোড়াটাকে ধরে শান্ত করল।

এর পর রাণী রাজকুমার ও রাজকন্যাদের নিয়ে দেখতে এল আমাকে। তাদের সঙ্গে কয়েকজন অভিজাত মহিলাও ছিল।

আমি দেখলাম সভাসদদের থেকে সম্রাট বেশ লম্বা। সুগঠিত দেহ। অলিভের মত গায়ের রং। ধনুকের মত নাক। উন্নত কপাল। বয়স প্রায় তিরিশ। সবে মাত্র যৌবন পার হয়েছে। এই সম্রাট সাত বছর ধরে রাজ্য-শাসন করে আসছে গৌরবের সঙ্গে।

সম্রাট আমার কাছ থেকে তিন গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাকে ভালভাবে দেখার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়ে তার দিকে পাশ ফিরলাম। রাজার পোশাক বেশ সাদাসিধে প্রকৃতির। সে তুলনায় রাজপরিবারের অন্যান্য লোকদের পোশাক অনেক জমকালো। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানটায় সোনা রুপোর কাজকরা দামী কাপড় পেতে দেওয়া হয়েছিল।

আমি রাজা ও রাজপরিবারের সঙ্গে ডাচ, লাতিন, ইতালীয়, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষায় কথা বললাম। কিন্তু তারা এই সব কোন ভাষাই বুঝতে পারল না।

এরপর রাজা আমার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। তবু অনেক লোক জ্বালাতন করতে লাগল আমায়। অনেকে তীর ছুঁড়তে লাগল।

তখন সেনাবাহিনীর কর্নেল ছ জন অপরাধীকে ধরে আমার হাতে এনে দিল, ভাবল আমার হাতেই তারা সমুচিত শাস্তি পাবে।

আমি কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি না করে হাতের উপর তুলে নিলাম। তারপর তাদের ভয় দেখাবার জন্য পকেট থেকে একটা ছুরি বার করলাম। তা দেখে দেশের সাধারণ মানুষ ও রক্ষীবাহিনীর সকলেও ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তাদের আমি কিছুই না করে আমার হাত থেকে নামিয়ে ছেড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে গেল তারা। আমার উদারতা ও সদাশয়তা দেখে অবাক হয়ে গেল সকলে।

এদিকে আমাকে নিয়ে কি করা হবে তা নিয়ে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে জোর পরামর্শ করতে লাগল রাজসভায়। এত খাওয়া তারা জোটাতে পারবে না। তাদের দেশের অসংখ্য লোকের খাবার আমি একা খেয়ে নিই। আমাকে ওখানে রাখতে গেলে ওদের খাদ্যভাণ্ডার সব শেষ হয়ে যাবে দিনকতকের মধ্যে। আমি যাতে শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে না পারি তার জন্য আমি যেখানে থাকতাম তার পাশে রক্ষীবাহিনীর শিবির স্থাপন করা হলো।

আমার খাদ্য জোটানোর সমস্যার কোন সমাধান না করতে পেরে রাজা একসময় আমাকে না খাইয়ে অথবা খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আমাকে মেরে ফেলার কথাই ভাবে এবং সেকথা আলোচিত হয় রাজসভায়। পরে তাতেও সমস্যা দেখা দেয়। কারণ আমি মরে গেলে আমার বিশাল মৃতদেহের সৎকার করবে ওরা কিভাবে? সে মৃতদেহ পচে গেলে শহরে মড়ক আর মহামারী দেখা দেবে। সারা রাজ্যে সে মড়ক ছড়িয়ে যেতে পারে।

এমন সময় সেনাবাহিনীর এক অফিসার আমার সদাশয়তার কথা রাজাকে জানায়। আমি কয়েকজন অপরাধীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিই। আমি কত উদার প্রকৃতির, কত সদাশয়, এইসব রাজাকে বললে রাজা তার মনোভাবের পরিবর্তন করে।

তখন রাজা এক ঘোষণা জারী করে জানিয়ে দেয় প্রজাদের, আমি রাজার এক সম্মানিত অতিথি এবং আমার খাওয়ার ভার রাজ্যের সব প্রজাদের গ্রহণ করতে হবে। রাজধানীর আশেপাশে যে সব গ্রাম আছে সেই সব গ্রামের অধিবাসীদের রোজ ছয়টি করে গরু, চল্লিশটি ভেড়া, অন্যান্য খাদ্য, রুটি, মদ প্রভৃতি সরবরাহ করতে হবে।

দেশের ফ্যাশান অনুযায়ী আমার ভাল পোশাক তৈরির জন্য তিনশো দর্জি নিযুক্ত করা হলো। আমাকে ওদের ভাষা ও লেখাপড়া শেখাবার জন্য সম্রাট দেশের মধ্যে বাছাই করে ছয়জন সেরা পণ্ডিতকে নিযুক্ত করলেন।

পরদিন সম্রাট নিজে এসে আমার কাছে তরোয়াল ছুরি প্রভৃতি যে সব অস্ত্র ছিল সেগুলি চেয়ে নিল। কারণ তাতে ওদের ক্ষতি হতে পারে। আমি তা দিয়ে দিলাম স্বেচ্ছায়। তারপর সরকারী দুজন অফিসার এসে আমার জামা প্যাণ্টের সব পকেট তল্লাসী করে যা যা পেল তার একটা তালিকা তৈরি করে নিয়ে গেল।

সবচেয়ে ওরা আশ্চর্য হলো আমার চেনওয়ালা ঘড়িটি দেখে। ঘড়ির মধ্যে যে টিক টিক শব্দ হচ্ছিল শুনে ওদের সম্রাট ভাবল ঘড়িটার মধ্যে নিশ্চয় কোন দেবতা আছে।

আমি তালিকায় লেখা সব জিনিস মিলিয়ে সম্রাটের সামনে তুলে ধরলাম। সব জিনিস তার ভাণ্ডারে তুলে রাখতে আদেশ দিল।

আমার জামার মধ্যে আর একটা গুপ্ত পকেটে একটা দূরবীণ ও কিছু টুকিটাকি জিনিস ছিল। সেগুলো সম্রাটের কোন কাজে লাগবে না ভেবে তা আর বার করলাম না। অফিসারেরাও তার সন্ধান পায়নি।

৩

আমি লিলিপুটদের সকলের মন যুগিয়ে চলতে লাগলাম। আমার ব্যবহারে সম্রাট, তার সভাসদবর্গ ও সামরিক বিভাগের লোকেরা সকলেই সন্তুষ্ট হলো। আমার মনে আশা জাগল আমি হয়ত শীঘ্রই মুক্তিলাভ করব।

আমি মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ে খেলাচ্ছলে পাঁচজন লিলিপুটকে আমার বুকের উপর চলে বেড়াতে দিতাম। অনেক সময় তাদের বেশ কিছু বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে খেলা করতাম।

লিলিপুটরা খেলাধূলায় বেশ পারদর্শী ছিল। বারো ইঞ্চি উপরে ছ ফুট লম্বা একটা দড়ি টাঙিয়ে ওরা এক ধরনের খেলা করত। দড়িটিকে দেখে আমার সূতোর মত মনে হত। কোন সরকারী পদলাভের জন্য রাজকর্মচারীদের এই দড়ির খেলা দেখাতে হত। এই দড়ির খেলায় পারদর্শিতা সরকারী পদলাভের একটি আবশ্যিক যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা হত। এমন কি মন্ত্রীদেরও এই খেলা দেখাতে হত। অনেকে দড়ির খেলা দেখাতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আহত হত।

সম্রাট যখন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কোন বিশেষ অনুগ্রহ দেখাতে চাইতেন অথবা কোন সম্মানসূচক স্বীকৃতি দিতেন তখন সেই ব্যক্তিকে টেবিলের উপর রাখা নীল, লাল, সবুজ তিনটি সিল্কের সুতোর মধ্য থেকে একটি করে উপহার দিত। অনুগ্রহপ্রার্থীকে এক প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে হত।

সম্রাট নিজে একটি ছড়ি সমান করে ধরে থাকত। ইচ্ছামত ছড়িটাকে উঁচু নিচু করত আর প্রতিযোগীকে কখনো লাফিয়ে কখনো ছড়িটার নিচ দিয়ে পার হতে হত।

এই প্রতিযোগিতায় যে প্রথম স্থান অধিকার করত সে সম্রাটের কাছ থেকে পুরস্কার হিসাবে পেত নীল সুতো। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পেত লাল সুতো আর তৃতীয় স্থানাধিকারী পেত সবুজ সুতো।

সম্রাটের অশ্বশালার ঘোড়াগুলিও ক্রমে চিনে ফেলে আমাকে। ফলে আমাকে আর ভয় পেত না তারা।

একবার আমি কয়েকজন লিলিপুটকে নিয়ে এক খেলা দেখিয়ে সম্রাটকে প্রচুর আনন্দ দান করি।

একবার আমি ছ ফুট লম্বা বেতের মত ন'দশটি ছড়ি এনে দিতে বলি সম্রাটকে। সেই ছড়িগুলো আড়াই ফুট মাপের চারকোণা এক জায়গায় মাটিতে পুঁতে ফেলে তার উপর আমার রুমালটা খাঁটিয়ে দিলাম। তারপর শক্ত করে বেঁধে দিলাম রুমালটাকে ছড়িগুলোর সঙ্গে। ফলে সেটা এক মঞ্চের মত মনে হতে লাগল।

আমি এবার সম্রাটকে বাছাই করা চব্বিশ জন অশ্বারোহীকে আসতে বললাম।

অশ্বারোহীরা এলে আমি তাদের সেই মঞ্চের উপর উঠিয়ে দিলাম। তারপর তাদের ভাগ করে সামনাসামনি দাঁড়াতে বললাম। এর পর তারা আমার নির্দেশ মত তাদের তরোয়াল, তীর, ধনুক আর বর্শা দিয়ে এক নকল যুদ্ধ শুরু করল। যুদ্ধ বিদ্যায় তারা আপন আপন কৃতিত্ব দেখাতে লাগল।

খেলাটি দেখতে সম্রাটের এত ভাল লাগল যে সে তাকে সেই সামিয়ানার উপর তুলে দিতে বলল। সম্রাটকে সামিয়ানার সেই মঞ্চের উপর তুলে দিলে সম্রাট নিজেই যোদ্ধাদের নির্দেশ দিতে লাগল।

সম্রাট এবার আমাকে রাণীকে সিংহাসন সমেত তুলে ধরে থাকতে বলল যাতে রাণীও সেই নকল যুদ্ধের খেলা দেখতে পারে।

এই খেলায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। শুধু রুমালের ছোট্ট একটা ফুটোয়

একজন অশ্বারোহীর ঘোড়ার পা আটকে যাওয়ায় অশ্বারোহী যোদ্ধা পড়ে যায়। কিন্তু বিশেষ কোন আঘাত লাগেনি তার। তখন আমি ফুটোটা বন্ধ করে দিই। এই খেলা দেখে সম্রাট এত আনন্দ পায় যে দিনের পর দিন এই খেলার অনুষ্ঠান করতে আদেশ দেয়।

আমি এখানে আসার প্রথম দিন কূল থেকে ডাঙ্গার উপর যেখানে শুয়েছিলাম সেখানে আমার মাথার টুপিটা পড়ে ছিল। একদিন সেই টুপিটাকে এক অদ্ভুত জিনিস ভেবে সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সেটাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে আসে। আমি তখন টুপিটার ব্যবহার বুঝিয়ে দিই তাদের।

একদিন সম্রাটের আদেশে আমি এক ফাঁকা জায়গায় পা ফাঁক করে দাঁড়াই আর সম্রাটের তিন হাজার পদাতিক আর এক হাজার অশ্বারোহী আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে মার্চ করে যায়।

এবার আমি আমার মুক্তির জন্য বারবার দাবি জানাতে লাগলাম সম্রাটের কাছে। একদিন জনপ্রতিনিধি মণ্ডলীর সভায় সেই দাবি পেশ করল সম্রাট। আমার সেই দাবির বিরুদ্ধে কেউ কোন আপত্তি করেনি। শুধু স্কাইরেশ বলগোলাম নামে এক সভাসদ কতকগুলি শর্ত আরোপ করে। তা না মেনে আমি বিনা শর্তে মুক্তিলাভ করলাম।

রাজার প্রিয়পাত্র বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ গ্যালবেত স্কাইরেশ বলগোলামের সঙ্গে মিলেমিশে আমার মুক্তির শর্তগুলি রচনা করে। পরে তা আমার কাছে উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারিরা নিয়ে আসে।

লিলিপুটদের ভাষায় লেখা সেই শর্তগুলি অনুবাদ করে প্রকাশ করলাম।

গোলবাস্টো মোমারেণ এভলেম গুরডিলো শেফিন মুল্লি উলিগিউ লিলিপুটদের সর্বশক্তিমান সম্রাট যিনি রাজার রাজা, সারা পৃথিবীব্যাপী যাঁর সাম্রাজ্য, যাঁর পদভরে সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হয় এবং যাঁর মস্তক সূর্য স্পর্শ করে, যিনি বসন্তের মত সুন্দর, গ্রীষ্মের মত আরামদায়ক, শরতের মত ফলপ্রসূ অথচ শীতের মত ভাস্কর, সেই মহামহিম সম্রাট আমাদের স্বর্গরাজ্যে আগত পাহাড়-মানুষের মুক্তির জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি আরেপ করছেন। অনুষ্ঠানিক-ভাবে শপথ করে এই শর্তগুলি তাকে কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

১। সম্রাটের আজ্ঞাযুক্ত অনুমতি ছাড়া পাহাড়-মানুষ এই রাজ্য ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।

১। সম্রাটের অনুমতি ছাড়া পাহাড়-মানুষ আমাদের রাজধানীতে প্রবেশ

করতে পারবে না। কোন কারণে প্রবেশ করতে হলে দুঘণ্টার নোটিশ দিতে হবে আগে যাতে নগরবাসীরা সাবধান হতে পারে এবং আপন আপন বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারে।

৩। এই পাহাড়-মানুষ যেন সব সময় নগরের বড় রাস্তা দিয়ে চলে। সে যেন কখনো কোন তৃণ অথবা শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে হাঁটবে না বা সেখানে শোবে না।

৪। রাস্তা দিয়ে পাহাড়-মানুষ যখন হাঁটবে তখন সে যেন নজর রাখে কোন নাগরিক তার গাড়ি, ঘোড়া বা তার দ্বারা পদদলিত না হয়। কোন নাগরিককে যেন জোর করে বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তার হাতে তুলে না নেয়।

৫। প্রয়োজন হলে পাহাড়-মানুষ কোন জরুরি বার্তা দ্রুত বহনের মত অশ্বারোহী দূতকে পকেটে ভরে নিরাপদে তার গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে এবং আবার ফিরিয়ে আনবে।

৬। আমাদের শত্রু ব্লেফুসক্ দ্বীপের অধিবাসীরা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করলে পাহাড়-মানুষকে আমাদের মিত্র হিসাবে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের নৌবহর ধ্বংস করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

৭। পাহাড়-মানুষ অবসর সময়ে আমাদের শ্রমিকদের সাহায্য করবে। বাড়ি বা কোন রাজপ্রাসাদের দেওয়াল গাঁথার সময় ভারী ভারী পাথর তাকে তুলে দিতে হবে।

৮। দুই চাঁদের মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের রাজ্যটির একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পার হয়ে রাজ্যের ম্যাপ দাখিল করতে হবে সম্রাটের কাছে।

আমাদের বিশ্বাস পাহাড়-মানুষ এই শর্তগুলি শপথ করে মেনে নেবে এবং তা যথাযথভাবে পালন করবে। এজন্য তাকে প্রতিদিন ১৭২৮ জনের উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হবে। সে যে কোন রাজপুরুষের কাছে যেতে পারবে এবং নানারকম সুযোগ সুবিধা পাবে। আমাদের শাসনকালের একানব্বইতম ছত্রের দ্বাদশ দিনে বেলফাবোরাক প্রাসাদে এই চুক্তি সম্পাদিত হবে।

আনুষ্ঠানিক ভাবে আমি এই সব শর্তগুলি পালন করার শপথ করলাম। শপথ গ্রহণের সময় সম্রাট আমার পাশে ছিল। শপথ শেষে আমি সম্রাটের সামনে সাষ্টাঙ্গ শুয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

সম্রাট খুশি হয়ে আমার প্রশংসা করতে লাগল।

রাজসভায় আমার এক বন্ধু ছিল। আমি তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, আমার জন্য ১৭২৮ জনের খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন কেন?

সে বলল, আমাদের গণিতজ্ঞরা তোমার দেহটা কোয়াড্রান্টের সাহায্যে মেপে আমাদের দেশের মানুষের দেহের সঙ্গে তুলনা করে এই ব্যবস্থা করেছে।

৪

মুক্তিলাভের পর আমি লিলিপুটদের প্রধান নগর ও রাজপ্রাসাদ দেখার জন্য অনুমতি চাইলাম সম্রাটের কাছে। তিনি খুশি হয়ে আমায় সে অনুমতি দিলেন। আদেশ জারি হলো আমি যে রাজপথ দিয়ে যাব সে পথে যেন কোন লোক বার না হয়।

তবু কৌতূহলী বহু লোক পাশ থেকে দেখতে লাগল আমাকে। প্রাসাদ দেখার জন্য তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমায়। এর মধ্যে আমি গাছ কেটে দুটো টুল বানিয়ে একটা টুল প্রাসাদের এদিকে রেখে তার উপর পা রেখে অন্য টুলটা প্রাসাদের ধারে রেখে প্রাসাদের ছাদটা ডিঙ্গিয়ে আর একটা পা ওদিকে টুলের উপর রেখে অন্দরমহলে চলে গেল। তারপর উঠোনে শুয়ে প্রাসাদের ভিতরকার ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখতে লাগলাম।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী দুজনেই খুশি হলো। সম্রাজ্ঞী জানালা দিয়ে তার হাতটা দিল চুম্বন করার জন্য।

একদিন সম্রাটের মুখ্য সচিব আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। বলল, জরুরী কথা আছে আমার সঙ্গে। আমি তখন শুতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে আমার হাতে তুলে দিতে বলল তাকে।

আমি তাকে আমার হাতে তুলে নিতে সে বলতে লাগল, আজ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বড়ই খারাপ। ব্লেফুসকু দ্বীপের রাজা এক বিশাল নৌবহর নিয়ে আমাদের দেশকে আক্রমণ করার জন্য অনুকূল বাতাসের অপেক্ষায় আছে তার উপর আবার দেশের মধ্যে রাজনৈতিক দলের বিবাদ চলছে।

রাজাদের জুতোর গোড়ালি উচ্চতা অনুসারে মেপে হাই হিল ও লো হিল এই দুই রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। হাই হিলদের ট্রামেকসান ও লাহিলদের স্লামেকসান দলও বলা হত। বর্তমানে সম্রাট ও দলের লোকেরা লো হিল দলভুক্ত। কিন্তু বিরোধী দল হাই হিলরাই দলে ভারী। এই

হাই হিল দলের লোকেরা আবার বিগ এণ্ডিয়ান পন্থী ও রাজদ্রোহী। তারা অনেকে শত্রুরাজ্য ব্লেফুসকু দ্বীপে চলে গেছে।

আর একবার ডিমভাঙ্গা নিয়ে এক ব্যাপার হয়। এই রাজবংশের এক রাজা ছেলেবেলায় ছুরি নিয়ে ডিমের মোটা দিকটা ভাঙ্গতে গিয়ে হাত কেটে ফেলেন। তখন তাঁর বাবা আদেশ জারি করেন সকলকে ডিমের সরু দিকটা ভাঙ্গতে হবে। প্রজারা এ আদেশ মানতে রাজী না হওয়ায় তারা ছয়বার বিদ্রোহ করে। গৃহযুদ্ধ বাধে দেশে। একজন রাজাকে মুকুট হারাতে হয়। পরে রাজারা কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করলে বিদ্রোহীরা ব্লেফুসকু দ্বীপে চলে গিয়ে এ দেশ আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে সেখানকার রাজাকে। এই সব নির্বাসিত বিদ্রোহীদের বিগ এণ্ডিয়ান বলে। তাদের প্ররোচনার ফলে দুই দেশের মধ্যে একবার প্রবল যুদ্ধ বাধে। সে যুদ্ধে আমাদের চল্লিশটি জাহাজ হারাতে হয়। এখন আবার ব্লেফুসকুর রাজা এক বিরাট নৌবহর গঠন করে আমাদের দেশ আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তাই সম্রাট আপনাকে এই আসন্ন যুদ্ধে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি তাঁকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এজন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আপনার শক্তি ও আদর্শের উপর সাম্রাটের প্রচুর আস্থা আছে।

মুখ্য সচিবের কথা শুনে আমি বললাম, আমি তোমাদের দলীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে সম্রাটের জীবনে ও রাজ্য বাঁচাবার জন্য আমি আমার জীবন বিপন্ন করেও যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

৫

আটশো গজ প্রশস্ত এক প্রণালীর দ্বারা লিলিপুট আর ব্লেফুসকু দ্বীপছুটি বিভক্ত। লিলিপুটের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত ব্লেফুসকু দ্বীপ এখনো পর্যন্ত দেখিনি আমি। তবে যত দূর শুনেছি সেখানকার অধিবাসীরাও লিলিপুটদের মতই আকারে ছোট।

ব্লেফুসকু দ্বীপের রাজার নৌবহর এ দেশ আক্রমণ করলে তাদের কিভাবে প্রতিহত করব তার পরিকল্পনা সম্রাটের কাছে পেশ করলাম। সম্রাট আমার পরিকল্পনা সমর্থন করল।

এরপর আমি প্রণালীতে নেমে জল ভেঙ্গে ব্লেফুসকুর উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রণালীর মাঝখানে জলের গভীরতা ছিল ছ ফুট। অন্য জায়গায় গভীরতা আরো কম। এইভাবে আমি এগিয়ে গিয়ে একটা

পাহাড়ের আড়াল থেকে দূরবীণ দিয়ে লক্ষ্য করলাম, পঞ্চাশটা যুদ্ধজাহাজ ব্লেফুসকুর উত্তর-পূর্ব দিকে অপেক্ষা করছে অনুকূল বাতাসের জন্য।

তারপর আমি ফিরে এসে সম্রাটের কাছ থেকে অনেক মজবুত দড়ি আর লোহার রড চাইলাম। ওরা যে দড়ি আনল তা সরু সুতোর মত আর লোহার রডগুলো সুতোর মত লম্বা আর মোটা।

আমি তিনটে করে সুতো দিয়ে পাকিয়ে দড়ির মত করলাম আর রডগুলো বাঁকিয়ে হুকের মত করলাম। তারপর আমি আবার উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার কোট জামা, মোজা জুতো সব খুলে রেখে গেলাম। আমার গায়ে রইল শুধু চামড়ার জার্কিন। আটশো গজ প্রণালীর মধ্যে তিনশো গজ সাঁতার কেটে ও বাকি পায়ে হেঁটে শত্রু পক্ষের নৌবহরের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমাকে দেখে ভয় পেয়ে ব্লেফুসকুর সৈন্যরা জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে ওদের দিকের তীরে গিয়ে উঠল। আমি তখন আমার হাতের হুকগুলো এক একটা জাহাজে লাগিয়ে মাছ ধরা জালের মত টানতে লাগলাম। কিন্তু জাহাজগুলো নোঙর করা ছিল বলে তা নড়ল না। আমি তখন পকেট থেকে ছুরি বার করে নোঙরের দড়ি কেটে ধীরে ধীরে একসঙ্গে টান দিয়ে গোটা নৌবহরের সব জাহাজগুলো লিলিপুটের দিকে নিয়ে আসতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে অনেক তীর এসে আমার হাতে ও মুখে এসে বিঁধেছে। আমার চোখ দুটোকে বাঁচাবার জন্য পকেট থেকে চশমাটা খুলে চোখে পরলাম। আমি যখন জাহাজগুলো টানতে টানতে লিলিপুটের দিকে আনতে লাগলাম তখন তা দেখে ব্লেফুসকুর নৌসেনারা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তারা ভেবেছিল আমি জাহাজগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে দেব।

আমি তাদের নাগালের বাইরে চলে এসে আমার মুখ ও হাত থেকে তীরগুলো তুলে ফেললাম। তারপর এর আগে লিলিপুটরা আমাকে যে মলম দিয়েছিল সেই মলম হাতে মুখে লাগিয়ে দিলাম।

এদিকে আমাকে শত্রুপক্ষের জাহাজগুলোকে টেনে আনতে দেখে লিলিপুটের সম্রাট ও সেনারা আমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল কূলের উপর। আমি কূলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট অভিনন্দন জানিয়ে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'নারডাক' উপাধিতে ভূষিত করল।

এরপর সম্রাটের রাজ্যলিপ্সা ও প্রতিহিংসা বেড়ে চলল এবং তা চরিতার্থ করার জন্য আমাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতে চাইল। সম্রাট বুঝতে পেরেছে

আমার শক্তি আর সাহসের জন্য এই যুদ্ধজয় করা সম্ভব হয়েছে। সম্রাট তাই আমাকে একদিন বলল, তুমি একদিন ওদের দেশে গিয়ে ওদের সব যুদ্ধ জাহাজগুলো নিয়ে এস। তারপর একদিন গোটা ব্লেফুসকু দ্বীপটা জয় করে আমার করায়ত্ত করে দাও। তখন ও দ্বীপ আমারই একটা রাজ্য হবে এবং আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হবে।

আমি সম্রাটের এ প্রস্তাবে রাজী হলাম না। বললাম, ওদের আক্রমণকে প্রতিহত করেছি, এটাই যথেষ্ট। একটা স্বাধীন জাতিকে এভাবে পদানত করা ঠিক হবে না। রাজার মন্ত্রণাসভাতেও অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আমার কথা সমর্থন করে। তবে এ বিষয়ে আমার বিরোধীতাও অনেকে করতে থাকে।

এইভাবে তিন সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর একদিন ব্লেফুসকু থেকে ছ'জন রাষ্ট্রদূত অনেক উপদেষ্টাসহ শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এল লিলিপুটের সম্রাটের কাছে। শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলো আমাদের সম্রাটের অনুকূলে।

ফিরে যাবার আগে রাষ্ট্রদূতরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তারা আমায় ধন্যবাদ দিয়ে ওদের দেশে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেল। তারা আমার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল। কারণ যুদ্ধের দিন তাদের জাহাজগুলো টেনে নিয়ে এলেও তাদের সেনাবাহিনীর কোন ক্ষতি করিনি। অথচ ইচ্ছা করলে আমি ওদের সকলকে হত্যা করতে পারতাম।

একদিন রাত্রিবেলায় একদল লিলিপুট এসে চিৎকার করে ঘুম ভাঙাল আমার। বলল, রাজপ্রাসাদে আগুন লেগেছে। আমি গিয়ে এখুনি না নিভিয়ে দিলে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

আমি জ্বলন্ত প্রাসাদের কাছে গিয়ে দেখলাম ওরা অনেক দূর থেকে বালতি করে জল এনে মই দিয়ে উঠে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মোটেই আগুন নিভছে না। আমি আগুন নেভাবার জন্য কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। ওদের বালতিগুলো আমাদের দেশের দর্জিরা সেলাই করার সময় আঙুলে যে টুপি পরে তার মত।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। আমি সেদিন অনেকটা এক রকমের ভাল মদ খেয়েছিলাম। সেই মদ খেলে প্রস্রাব খুব বেশী হয়। আমি অনেকক্ষণ প্রস্রাব করিনি। আমি তখন প্রস্রাব করে আগুনটাকে নিবিয়ে দিলাম। আগুন নেবানোর অন্য কোন উপায় না দেখে আমি আগুনের উপর মূত্রত্যাগ করলাম।

তিন মিনিটের মধ্যেই আগুন নিবে গেল এবং রাজার প্রাসাদটি ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল। তখন ভোর হয়ে গেছে।

আমি আবার আমার বাসায় ফিরে এলাম। প্রাসাদের উপর মূত্রত্যাগ অশোভন এবং অশালীন কাজ। আমি বুঝতে পারলাম আমি অন্যায় এবং অবৈধ কাজ করে ফেলেছি। তাই সম্রাটের সঙ্গে দেখা করলাম না।

পরদিন দূত মারফৎ খবর পেলাম সম্রাটও মনে করেন আমার এই কাজের উদ্দেশ্য সৎ হলেও তা আইনতঃ দণ্ডনীয়। তবু বিচার বিভাগকে তিনি আমাকে ক্ষমা করার জন্য নির্দেশ দেবেন। আরো শুনলাম সম্রাজ্ঞী খুব রেগে গেছেন আমার এই কাজের জন্য। প্রাসাদের যে অংশে আগুন লাগে এবং আমি যেখানে মূত্রত্যাগ করি সে অংশ মেরামৎ করা হলেও তিনি আর ফিরে যাবেন না সেখানে।

৬

লিলিপুটবাসীদের গড় উচ্চতা ছ ইঞ্চির কিছু কম। ও দ্বীপের গাছপালা, জীবজন্তু, পাখির আকারও সেই অনুসারে। ও দেশের ঘোড়া ও বলদগুলোর উচ্চতা চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি। ভেড়াগুলো দেড় ইঞ্চি। হাঁসগুলো চড়ুই পাখির মত।

লিলিপুটবাসীদের শিক্ষাপদ্ধতির কথাও একে একে সব জেনে নিলাম। ওরা আকারে ছোট হলেও ওরা বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী। ওদের লেখার পদ্ধতিটা অদ্ভুত ধরনের। ওরা ইংলণ্ডের অনেক মহিলার মত কাগজের কোণাকুণি লেখে। ছোট থেকে বড় পর্যন্ত দেশের সব ছেলেমেয়েকেই নার্সারি স্কুলে থেকে পড়াশুনো করতে হয়। বাপ মার সঙ্গে তাদের দেখা সাক্ষাৎ খুব কম হয়। পড়াশুনো, ব্যায়াম ও খেলাধূলা ছাড়া ছেলেমেয়েদের সব সময় কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। সারাদিনের মধ্যে খেলার সময় মাত্র দুঘণ্টা।

লিলিপুটের আইনকানুন বড় কঠোর। চুরির থেকে জাল জুয়াচুরিকে অনেক বেশী অপরাধরূপে গণ্য করা হয়। জাল, জুয়াচুরি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তবে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি তার নির্দোষিতা প্রমাণ করে সব অভিযোগ খণ্ডন করতে পারে তাহলে অভিযোগকারীকে সব দেওয়া হত এবং তার কাছ থেকে টাকা আদায় করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হত। আইন শৃংখলা ঠিকমত মেনে চলার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। এতে দেশের জনসাধারণ আইন মেনে চলতে উৎসাহবোধ করে।

৭

ব্লেফুসকু দ্বীপের রাজার আমন্ত্রণে আমি যখন সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম তখন আমার বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত শুরু হয় লিলিপুটের রাজসভায়। আমি হিসাব করে দেখলাম এ রাজ্যে আমি মোট তের মাস ন দিন এসেছি। কিন্তু এতদিনের মধ্যে এই ধরণের চক্রান্ত কখনো হয়নি।

একদিন সম্রাটের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারি গোপনে আমার বাসায় এল। বলল, জরুরী কথা আছে। আমি তার কথা মন দিয়ে শোনার জন্য তাকে আমার হাতের উপর তুলে নিয়ে আমার ঘরের ভিতর টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলাম।

এরপর সে বলল, কিছু ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী লোক আপনার বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করছে। আপনার বিরুদ্ধে ওদের প্রধান অভিযোগ হলো রাজদ্রোহিতা। আপনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগপত্রের একটি নকল আমি নিয়ে এসেছি।

নৌবাহিনীর প্রধান স্কাইরেশ বলগোলাম আর কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপ সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করছে আপনার। আপনি আমার একদিন উপকার করেছেন, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। তাই আপনাকে সতর্ক করে দিতে এলাম। এই অভিযোগপত্রে তিনটি ধারা আছে।

এক নম্বর ধারায় আছে, কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন অর্থাৎ পাহাড়-মানুষ রাণীর প্রাসাদে আগুন নেবাবার অজুহাতে মূত্রত্যাগ করে যে অশোভন ও জঘন্য কাজ করেছে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক গর্হিত অপরাধ।

দু'নম্বর ধারায় আছে, পাহাড়-মানুষ যখন ব্লেফুসকু দ্বীপের রণতরীগুলি লিলিপুটের বন্দরে নিয়ে আসে তখন সম্রাট তাকে আদেশ দিয়েছিলেন ব্লেফুসকু দ্বীপের সব যুদ্ধজাহাজগুলি এখানে নিয়ে আসতে এবং ব্লেফুসকু রাজ্য জয় করে আমাদের সম্রাটের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু সে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে সম্রাটের সে আদেশ প্রত্যাখ্যান করে।

তিন নম্বর ধারায় আছে, ব্লেফুসকু রাজ্য থেকে রাষ্ট্রদূতেরা এলে পাহাড়-মানুষ তাদের সঙ্গে অবৈধভাবে মেলামেশা করে।

এই অভিযোগগুলি আমাকে পড়ে শোনাবার পর সেই ভদ্রলোক আমাকে বলল, ওদের মূল কথা হলো আপনি রাজদ্রোহী এবং আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। আপনাকে বিষ প্রয়োগ করে ও ঘুমন্ত অবস্থায় বিষাক্ত তীর মেরে হত্যা করা হোক। কিন্তু আপনার উপকারের কথা স্মরণ করে

সম্রাট এ দণ্ড দিতে চাননি। তখন অনেক তর্ক বিতর্কের পর মন্ত্রণাসভায় ঠিক হয়, ক্রমে ক্রমে আপনার খাওয়া কমিয়ে দেওয়া হবে এবং সম্রাটের কুড়িজন সার্জেন এসে আপনার চোখদুটি অন্ধ করে দেবে একেবারে।

ভদ্রলোক চলে গেলে আমি ঠিক করলাম আমার উপর অকারণে এই নির্যাতন ও অপমান সহ্য করব না আমি। আমি গোপনে ব্লেফুসক্ দ্বীপে চলে যাব।

পরদিন আমি কাউকে কিছু না বলে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ জাহাজটা বেছে নিয়ে নোঙর খুলে সেটাকে টানতে টানতে সাঁতার কেটে ব্লেফুসকুর বন্দরে গিয়ে হাজির হলাম। আমার সব পোষাক আশাক জাহাজের উপর রেখেছিলাম।

ব্লেফুসকু দ্বীপের অনেক লোক বন্দরে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। আমি সেখানে পৌঁছলে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে রাজধানীতে রাজার কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাকে।

প্রাসাদদ্বারে আমি যেতেই রাজা তার পরিবারের লোকজন ও সভাসদদের সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে এল। রাজা ঘোড়া থেকে এবং রাণী গাড়ি থেকে নামলে আমি তাদের হাত চুম্বন করার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আমি রাজাকে লিলিপুটের রাজার সঙ্গে আমার যে মনোমালিন্য চলছিল তার কথা কিছু বললাম না।

তবে ওখানে আমাকে কোন বাড়ি দেওয়া হলো না থাকার জন্য, শুধু আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। তবে আমাকে চাদর বিছিয়ে মাটিতেই শুতে হত। চাদরটা আমি এনেছিলাম পোশাকের সঙ্গে।

৮

ব্লেফুসক্ দ্বীপে আসার আমার তিন দিন পর আমি ঘুরতে ঘুরতে একসময় উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গেলাম। আমি দূরে সমুদ্রের উপর একটা নৌকো দেখতে পেলাম। আমি তখন ব্লেফুসকুর রাজাকে বলে তার দেশের কিছু নাবিক ও নৌবহরের সাহায্যে সেই ভাসমান নৌকোটাকে টেনে বন্দরে নিয়ে এলাম। রাজাকে বললাম, হয়ত কোন জাহাজ থেকে ঝড়ের সময় ছিটকে পড়েছে নৌকোটা।

এবার আমি এই নৌকোটা সাজিয়ে গুছিয়ে তাতে করে আমার দেশে ফিরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলাম আমি।

রাজা আমাকে সম্মতি দিলেন এবং সেই সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অনেক লোকের সাহায্যে নৌকোটাকে উল্টিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হলো। দেখা গেল সেটা ঠিক আছে। তারপর তাতে দাঁড় ও পাল খাটিয়ে সমুদ্র যাত্রার উপযুক্ত করা হলো। আমি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে আমি লিলিপুট দ্বীপে ফিরে যাচ্ছি না দেখে সেখানকার সম্রাট ব্লেফুসকুর রাজার কাছে দূত পাঠাল। দূতরা এসে লিলিপুটের সম্রাটের নামে আমার হাত পা বেঁধে আমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করল। তারা আমার বিরুদ্ধে লেখা অভিযোগপত্রটি দেখাল এবং বলল আমি অন্যায় করে পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু ব্লেফুসকুর রাজা বলে পাঠাল আমাকে বেঁধে জোর করে পাঠানো সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি নিজে থেকে চলে যাব আমার দেশে। একটা জলযান পাওয়া গেছে। পাহাড় মানুষ চলে গেলে দুই দেশের পক্ষেই মঙ্গল হবে। তাকে খাওয়ার জন্য এত বিরাট ব্যয়ভার আর বহন করতে হবে না।

আমি অনেক খাবার নিলাম সঙ্গে। ওদের দেশের একশো বলদ ও তিনশো ভেড়ার মাংস, অনেক রুটি ও মদ নিলাম। এছাড়া নিলাম ছয়টি জীবন্ত গরু, দুটি ষাঁড়, আর আটটি পুরুষ ও খাসী ভেড়া। ভাবলাম দেশে ফিরে ওদের দেখাব সকলকে আর সম্ভব হলে ওদের দিয়ে বাচ্চা উৎপাদন করার।

রাজা আমাকে পঞ্চাশটি থলে দিল। প্রতিটি থলিতে দুশো করে স্প্রাগ মুদ্রা ছিল। রাজা তার একটি পূর্ণাবয়ব ছবিও নিলে।

১৭০১ সালে সেপ্টেম্বর মাসের চব্বিশ তারিখে ছটায় আমি পাল তুলে রওনা হলাম। প্রথমে উত্তর দিকে চার লীগ যাবার পর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বইতে থাকা হাওয়ার প্রভাবে আমি উত্তর-পশ্চিম দিকে যেতে লাগলাম। আমার লক্ষ্য কোন এক জাহাজের দিকে। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিলাম সে বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না আমার।

এইভাবে আরো কয়েক লীগ যাওয়ার পর আমি একটা দ্বীপে উঠে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে বিশ্রাম করলাম। সে দ্বীপে কোন লোকজন বা জনবসতি ছিল না। তারপর আবার যাত্রা শুরু করলাম। এবার দূরে একটা জাহাজ দেখতে পেলাম। জাহাজটা কাছে এলে দেখলাম বৃটিশ জাহাজ। তখন আমার আনন্দের আর সীমা রইল না।

ক্যাপ্টেনকে আমার অভিজ্ঞতার কথা সব বললে তিনি ভাবলেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পরে প্রমাণগুলি দেখালে তিনি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন।

১৭০২ সালের ১৩ই এপ্রিল আমরা ইংলণ্ডের ডাউনস্‌এ পৌঁছলাম। আমি আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দুমাস থাকলাম। আমার ছেলেটি দেখলাম মন দিয়ে পড়াশুনো করছে। তার নাম জনি। মেয়ে বেটি-র বিয়ে হয়ে গেছে।

আমি সঙ্গে করে যে সব ক্ষুদ্রাকৃতি গরু ভেড়া এনেছিলাম ব্লেফুসকু দ্বীপ থেকে সেগুলি ইংলণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের দেখিয়ে কিছু টাকা রোজগার হলো। পরে সেগুলো থেকে ছয়শো পাউণ্ড পেয়েছিলাম।

কিন্তু বাড়িতে বসে থাকতে মন চাইল না আমার। আমি আমার স্ত্রীর হাতে দেড় হাজার পাউণ্ড সংসার খরচের জন্য দিয়ে আবার এক সমুদ্র যাত্রায় রওনা হয়ে পড়লাম। ১৭০২ সালের ২০শে জুন তারিখে আবার ডাউনসএ গিয়ে জাহাজে উঠলাম।

দ্বিতীয় ভাগ

ব্রবডিংনাগদের দেশে

১

জাহাজে করে আমরা প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার তলায় কেপ অফ গুডহোপ বা উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছলাম। সেখানে জাহাজ মেরামতের পর মার্চ মাসে আবার রওনা হলাম। আমাদের জাহাজ যাবে মাদাগাস্কার হয়ে ভারতের স্বরাটে। আমাদের জাহাজের নাম এ্যাডভেঞ্চার। ক্যাপ্টেনের নাম জন নিকোলাস।

১৯শে এপ্রিল থেকে বাতাসের বেগ বাড়ল। ঝড়ের কবলে পড়ল আমাদের জাহাজ। পথ থেকে পঁচিশ লীগ সরে যেদিকে সেদিকে চলতে লাগল। এদিকে আমাদের মজুত পানীয় জল ফুরিয়ে এল। কোন একটা দ্বীপে জাহাজ ভিড়িয়ে জল নিতে হবে।

সবে ঝড় থামল। সমুদ্র শান্ত হলো। জাহাজখানা মজবুত ছিল বলে এ যাত্রা বেঁচে গেল। ১৭ই জুন দূরে ডাঙ্গা দেখা গেল। কোন দ্বীপ বা মহাদেশের অংশ হতে পারে। ক্যাপ্টেন তখন একটা নৌকোয় করে

বারোজন সশস্ত্র নাবিককে জল আনতে পাঠালেন দ্বীপ থেকে। আমিও দ্বীপটা একটু ঘুরে দেখার জন্য কৌতুহলবশে তাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলাম।

কিন্তু দ্বীপে উঠে আমরা কোন নদী বা ঝর্ণা খুঁজে পেলাম না। আমি ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের খানিকটা ভিতরে ঢুকে পড়লাম। কোন মানুষ বা উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে আমি সমুদ্রের খাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলাম এক বিরাটকায় দৈত্য আমাদের নাবিকদের ধরার জন্য ছুটছে। নাবিকরা তখন তাদের নৌকোটায় উঠে প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টেনে জাহাজের দিকে এগিয়ে চলেছে। দৈত্যকার মানুষটা তখন হাঁটুভোর জলে নেমে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ডেকে তাদের ফেরানো সম্ভব নয় জেনেও আমি একবার চিৎকার করে তাদের ডাকলাম। কিন্তু কোন ফল হলো না। আমি তখন দৈত্যাকার মানুষটার ভয়ে একটা পাহাড়ের উপর উঠে লুকিয়ে পড়লাম।

আমি পাহাড়ের উপর থেকে দেখলাম চারদিকে শুধু ফসলভরা মাঠ। যবের ক্ষেত, কিন্তু যবের চারাগুলো কুড়ি ফুট উঁচু। এ এক অদ্ভুত দেশ। এখানকার গাছপালা, জীবজন্তু সব দৈত্যাকার মানুষগুলোর মতই বিরাট আকারের। দৈত্যাকার কতকগুলো চাষী একটা ক্ষেতে কাজ করছে। আমি কোথায় যাব কিভাবে বার হব এই দৈত্য-দানবের দেশ তার কিছু খুঁজে পেলাম না।

পাহাড় থেকে নেমে আমি একটা যবের ক্ষেতে গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু যে সব চাষীরা মাঠে কাজ করছিল তাদের মনিব আমাকে দেখতে পেয়ে তার হাতে করে তুলে নিল আমায়। আমি ভয়ে চিৎকার করে তার কাছে অনুনয় বিনয় করতে লাগলাম। আমার ভয় হতে লাগল সে আমাকে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য।

কিন্তু লোকটা আমায় মারল না। আমাকে সে বাড়ি নিয়ে গেল। আমার মত এক ক্ষুদ্র প্রাণীকে দেখেই তার স্ত্রী ভয়ে পালিয়ে গেল। পরে তার স্বামী তাকে বুঝিয়ে বললে সে সব বুঝল।

বাড়িতে লোক বলতে চাষী, তার স্ত্রী, তিনটি ছেলেমেয়ে আর চাষীর বুড়ী মা। চাষীর একবছরের এক বাচ্চা আমাকে দেখে খেলবার পুতুল ভেবে হাতে নেবার জন্য বায়না ধরল। তার মা আমাকে ধরে পুতুলের মত বাচ্চাটার হাতে দিতেই সে আমাকে হাঁ করে মুখে ভরতে গেল। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠতে চাষী আমাকে উদ্ধার করল।

আবার চাষী আমাকে ধরে তিরিশ ফুট উঁচু এক খাবারের টবিলের উপর আমাকে তুলে দিল। চাষীর বউ এক বিরাট ডিসে রাখা মাংসের স্তূপ থেকে খানিকটা মাংস কেটে আমাকে দিল। তারপর ওষুধ খাবার একটা গ্লাসে করে মদ দিল। খাবার টেবিলে চাষীর একটি ছেলে আমাকে বিরক্ত করতে থাকলে তার বাবা তাকে শাস্তি দিতে গেল। কিন্তু আমি চাষীকে তার ছেলেকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। চাষী তাতে সন্তুষ্ট হলো।

২

চাষীর ন'বছরের মেয়ে ছিল। সে আমার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করল নিজে তৎপর হয়ে। দেখলাম আমার প্রতি তার মমতা ও আগ্রহের সীমা নেই। সে কাউকে আসতে দিত না আমার কাছে।

কিন্তু সেই চাষী আমাকে নিয়ে এক ব্যবসা শুরু করল। একদিন আমার মনিবের এক প্রতিবেশী বন্ধু এসে তাকে পরামর্শ দিল, আমাকে শহরের বাজারে নিয়ে গিয়ে খেলা দেখালে বেশ কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। এই দৈত্যের দেশে আমি এক আশ্চর্য ক্ষুদ্র মানুষ। অথচ আকারে এদের তুলনায় নিতান্ত ছোট হলেও আমি ওদের মত সব আচরণই করতে পারি। আমি আমার নিজের মাতৃভাষা ছাড়া ওদের ভাষাও কিছু শিখেছি। তবে অবশ্য আমাকে নিয়ে খেলা দেখাবার সময় আমার নার্স অর্থাৎ মনিবের সেই মেয়েটি আমার কাছে থাকবে।

আমাকে একদিন সত্যি সত্যিই হাটে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা ঘরের মধ্যে একটা টেবিলের উপর আমাকে তুলে দেওয়া হলো। আমার খেলা দেখার জন্য এক একবারে তিরিশ জন করে লোক ঢোকানো হলো পয়সা নিয়ে। আমি টেবিলের উপর চলাফেরা করতে লাগলাম। দর্শকদের অভিনন্দন জানালাম। ওদের প্রশ্নের উত্তর দিলাম ওদের ভাষাতে। তারপর আমার একটা ছোরা আর ওদের একটা ছড়ি নিয়ে খেলা দেখালাম। দর্শকরা খুশি হলো।

এইভাবে দশ বারো বার খেলা দেখিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই রকম রোজ চলতে লাগল খেলা দেখানোর অনুষ্ঠান।

একটানা ক্লান্তি আর অবসাদে আমার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল। আমার ক্ষিদে কম হতে লাগল। কিছু খেতে ভাল লাগত না। আমার শরীর রোগা হয়ে যেতে লাগল।

এদিকে ক্রমে আমার এই খেলা দেখানোর কথাটা লোকের মুখে মুখে রানীর কানে গিয়ে উঠল। রাজা দূত পাঠাল আমার মনিবের কাছে। আমার মনিব ভাবছিল আমি হয়ত মারা যাব। তাই সে রাজী হয়ে গেল।

আমাকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো রানীকে আনন্দ দেবার জন্য। রানী আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি সামনের দিকে ঝুঁকে রানীকে অভিবাদন জানিয়ে বললাম, আমি মহারানীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য মনে করব।

আমাকে দেখে ও আমার কথা শুনে রানী বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল। আমার যাবার জন্য একটা কাঠের বাক্সঘর তৈরি করানো হলো। রানী আমাকে হাতে তুলে নিয়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল। মহারাজ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র ও গণিত বিদ্যায় পারদর্শী। তবু আমি যখন টেবিলের উপর হাঁটতে লাগলাম এবং তাদের ভাষায় কথা বলতে লাগলাম তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন তা দেখে।

একজন কুশলী কারিগর আমার থাকার জন্য বারো ফুট উঁচু ও ষোল ফুট চৌকো একটা কাঠের চেম্বার তৈরি করে দিল। আমার দেখাশোনার জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত হলো।

প্রতি বুধবার রাজা, রানী, রাজকুমার ও রাজকুমারীরা যখন একসঙ্গে ডিনার খেত তখন আমাকেও তাদের সঙ্গে পাশের টেবিলে খেতে দেওয়া হত। রাজকুমার আমার সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, শিক্ষা, শাসনকর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চাইত এবং আমিও যথাসাধ্য তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতাম। আমার দেশের কথা বলতে বলতে এক এক সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম আমি। আমার সব কথা শুনে রাজকুমার আলোচনা করত কোন কোন বিষয়ে।

রানীকে মাঝে মাঝে আনন্দ দেবার জন্য একটা বামন থাকত রাজপ্রাসাদে। বামনটা আমি আসার পর থেকে আমায় বড় হিংসা করত। প্রায় দিন বামনটা আমাকে নিয়ে বিশ্রী রকমের রসিকতা ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। অনেক সময় তা অপমানকর হয়ে উঠত। এর জন্য তাকে শাস্তিভোগ করতে হত রানীর কাছে।

একদিন মাখনভর্তি এক বিরাট বাটিতে আমাকে ফেলে দেয় বামনটা।

আমি মাখনের মধ্যে ডুবে যাই। খানিকটা মাখন আমার মুখের মধ্যে চলে যায়। এর জন্য রানী রেগে গিয়ে বামনটাকে চাবুক মেরে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

৩

মহারানী মহারাজার সঙ্গে যখন বাইরে বেড়াতে যেত তখন আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেত। এইভাবে তাদের সঙ্গে যাওয়া আসা করতে করতে আমি জানতে পারলাম এই রাজ্যটি একটি উপদ্বীপ যার তিন দিকে সমুদ্র। কোন সমুদ্র উপকূলে কোন বন্দর নেই। কতকগুলি নদী এসে এখানে সমুদ্রে পড়েছে।

এরাজ্যে সব কিছুই বড় আকারের। রাজপ্রাসাদই সাত মাইল লম্বা এবং অনেকগুলি বাড়ির সমষ্টি। বড় বড় ঘরগুলি দুশো চল্লিশ ফুট উঁচু এবং সেই অনুপাতে লম্বা চওড়া। আমার নার্সের নাম ছিল গ্লাম। গ্লামও আমার দেখাশোনার জন্য রাজপ্রাসাদেই রয়ে যায়। তার লেখাপড়ার জন্য রাজা রানী একজন গভর্নেস বা শিক্ষিকা নিযুক্ত করে। আমাদের দুজনের বেড়াবার জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ি দেওয়া হয়। আমাদের সঙ্গে সেই গাড়িতে করে গ্লামের গভর্নেসও বেড়াতে যেত।

রাজার আস্তাবলে দুশো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াগুলো এক একটা চুয়ান্ন থেকে ষাট ফুট উঁচু। তিনি যখন কোন শুভদিনে রাজধানীতে বেড়াতেন অথবা রাজধানী থেকে অন্য কোথাও যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে পাঁচশ জন অশ্বারোহীর এক বিরাট রক্ষীবাহিনী যেত। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

গ্লাম আমাকে নিয়ে প্রায়ই রাজার বাগানে বেড়াতে নিয়ে যেত। সেদিন সে আমাকে কাঠের ঘর সমেত নিয়ে যায়নি। আমার কথামত সে আমাকে নির্জন এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল তার গভর্নেসের সঙ্গে।

এমন সময় একটা মালীর বিরাটকার একটা কুকুর এসে আমাকে মুখে করে নিয়ে গিয়ে তার মালিকের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে। আলতোভাবে আমাকে তার মুখে করে ধরেছিল বলে আমার দেহে কোন আঘাত লাগেনি।

প্রাসাদের অন্তঃপুরের মাঝে রানীর স্নান করার জন্য যে চৌবাচ্চা ছিল সেই বিরাট চৌবাচ্চায় আমার চালাবার জন্য একটা নৌকোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ওরা। রানী তার সহচরীদের সঙ্গে বসে আমার নৌকো চালানো দেখত সেই চৌবাচ্চায়। রানি তা দেখে বেশ কৌতুকবোধ করত।

একদিন একটা চরম বিপদে পড়ি এবং কোনরকমে উদ্ধার পাই। রাজার এক কর্মীর এক পোষা বাঁদর ছিল। ওদের দেশের বাঁদর কুকুর সবই বিরাট আকারের।

আমি যখন আমার সেই কাঠের বাক্সঘরের মধ্যে ছিলাম তখন সেই বাঁদরটা ছাড়া পেয়ে একটা হাত আমার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে তুলে নিল হাতে করে। তারপর একলাফে আমাকে ভালভাবে ধরে ছাদের উপর উঠে গেল। রাজার কর্মচারীরা আমাকে বাঁদরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে মই আনতে গেল। ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল।

অবশেষে চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে বাঁদরটা আমাকে এক টালির ছাদের উপর নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। পাঁচশো গজ উঁচু সেই টালির ছাদের উপর আমি ভয়ে অসহায়ভাবে কাঁপতে থাকি। অবশেষে এক ছোকরা কর্মচারী এসে আমাকে উদ্ধার করে সেখান থেকে।

বাঁদরটা আমাকে যেভাবে ধরে আদর করতে থাকে, আমাকে যে সব অখাদ্য গুঁজে দেয় আমার মুখে তাতে আমি আঘাত পাই। আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা লাগে। আমি দিনকয়েকের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। রাজা অবশ্য আমার খোঁজ খবর নেয় নিয়মিত এবং আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

৪

রাজা সপ্তায় দুবার দাড়ি কামাত। দাড়ি কামানোর ক্ষুরটা ছিল আমাদের দেশের তলোয়ারের মত। রাজার দাড়ির চুলগুলোও ছিল শক্ত আর মোটা। আমি রাজার সেই দাড়িচাঁচা চুলগুলো একটা কাঠের মধ্যে ফুটো করে বসিয়ে একটা চুল আঁচড়ানোর জন্য ব্রাশ বানালাম।

রাজা রানী গান বাজনা শুনতে ভালবাসত। তাদের সঙ্গে আমিও গান শুনতাম। ওদের পিয়ানোটা খুব বড় আকারের বলে বাজাতে পারতাম না। অথচ আমি ছোটবেলায় কিছু গান বাজনা শিখেছিলাম। আমার বাজাবার মত কোন বাজনা না থাকলেও মাঝে মাঝে আমি গান শোনাতাম রাজা-রানীকে। তারা সে গান উপভোগ করত।

রাজা আমার কাছ থেকে শুনতে চাইলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, আইন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার কথা সব বলতাম একে একে। এসব কথা শুনতে ভালবাসত রাজা।

পরে একদিন রাজা আমাকে বলল, তুমি তোমার দেশের অনেক গুণগান

করেছ। কিন্তু তুমি যে সব কথা বলেছ তাতে আমার ধারণা হয়েছে চতুর ব্যক্তিরা আইনের অপব্যাখ্যা করে লোকদের ঠকায়। তোমাদের দেশের প্রচলিত আইন ও বিচারের মধ্যে কিছু ভাল কথা অবশ্য আছে, কিন্তু সেই সব কথার অনেক রকম ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়। তোমাদের দেশের ধার্মিক ব্যক্তিরা সৎপথে আদর্শ জীবনযাপন করার জন্য, পণ্ডিতরা জ্ঞানবিস্তার জন্য, সৈনিকরা শৌর্য ও সাহসের জন্য, রাজনীতিবিদরা দেশের কল্যাণসাধনের জন্য সরকারের কাছ থেকে কি উৎসাহ পায় এবং তারা তাদের বৃত্তির উন্নতির জন্য কিভাবে চেষ্টা করে তা তোমার কথা থেকে জানা যায়নি। তুমি বাইরে বাইরে আছ বলে দেশের অনেক বদ অভ্যাস থেকে বেঁচে গেছ।

৫

ওদেশের রাজার অনেক গুণ ও জ্ঞান আছে ঠিক, কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় মনটা হয়ে উঠেছে সংকীর্ণ। যাই হোক, আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার জন্য আমি ওদেশের ভাষা শিখে বিভিন্ন বিষয়ে বইপত্র পড়তে লাগলাম। ওদেশের ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষানীতি, কাব্য, গণিত সব বিষয়েই কিছু কিছু বই পড়লাম। এই কয়টি বিষয় শুধু পড়ানো হয় ওদের ছেলেমেয়েদের। তার মানে দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপযোগী বিষয় ছাড়া আর কিছু শেখানো হতো না। উচ্চস্তরের কোন ধ্যানধারণা না থাকায় ওদের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিযুক্ত হয়ে উঠেছে।

ওদেশের লোকদের বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের ধারণা প্রকৃতি আগে আরো বড় আকারের মানুষের জন্ম দিত। ওদের পূর্বপুরুষেরা নাকি আরো বড় আকারের ছিল। অতীত যুগের যে সব মাথার খুলি পাওয়া গেছে মাটির তলায় তা থেকে এটা বোঝা যায়। কিন্তু বর্তমানের মানুষদের ও জীবজন্তুদের আকৃতি ছোট হয়ে গেছে আগের থেকে এবং ক্রমশই ছোট হয়ে যাবে আরও।

রাজার ইচ্ছা আমি ওদেশেই থেকে যাই সারাজীবন। রাজা বলেছিল তাদের উপকূলে কোন জাহাজে যদি আমার আকারের নরনারী দেখা যায় তাহলে নামিয়ে এখানে রেখে দেওয়া হবে। তার ইচ্ছা আমাদের মত লোকসংখ্যা বাড়ুক ওদেশে।

রাজা রানী আমাকে যথেষ্ট ভালবাসলেও আমার এই বন্দীজীবন আর ভাল লাগছিল না আমার। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি মুক্তি একদিন

পাবই এবং আবার আমি ফিরে যাব আমার দেশে। কিন্তু কিভাবে যে মুক্তি সম্ভব হবে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না আমার।

দেখতে দেখতে এ রাজ্যে আমার আসা দুবছর হয়ে গেল।

একদিন রাজা ও রানী দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে ভ্রমণে যাবার জন্য রওনা হলো। আমি আর আমার নার্স সঙ্গী হলাম তাদের। আমাকে সেই বাক্স ঘরে করেই নিয়ে যাওয়া হলো।

রাজা সমুদ্র থেকে আঠারো মাইল দূরে একটা শহরে নামল। সেখানে রাজার একটা প্রাসাদ ছিল। এই সময় আমার নার্স গ্লামের অসুখ করল। অথচ আমি সমুদ্র দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। কারণ সমুদ্রই আমার মুক্তির একমাত্র উপায়। সমুদ্রপথেই আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।

এই সময় আমারও সর্দি করল। আমি খুব বেশী কাতরভাব দেখালাম। রাজাকে বললাম সমুদ্রের ধারে আমি গেলে সমুদ্রের তাজা হাওয়ায় আমার দেহ সুস্থ হবে। গ্লামের শরীর খারাপ থাকায় রাজা একজন বালকভৃত্যের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিল। বালকভৃত্য আমাকে সেই বাক্সঘরে করেই নিয়ে গেল। রাজার প্রাসাদ থেকে সমুদ্রের ধারে সেই জায়গাটা আধঘণ্টার পথ। বালকভৃত্যটি আমার কাঠের বাক্সঘরটা এক জায়গায় নামিয়ে রেখে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পাখির ডিম খুঁজতে গেল।

আমি বাক্সঘরের মধ্যে তক্তায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বালকভৃত্য আমার ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দিল।

সহসা আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, কে যেন উপর থেকে আমার ঘরের ছাদের আংটাটা ধরে উপরে উঠছে। একটা জানালা খুলে দেখলাম, আকাশ আর মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। বুঝলাম এক বিরাট ঈগল পাখি আমার বাক্সঘরের আংটাটা মুখে করে আকাশে উড়ছে। আমার ভয় হতে লাগল। বাক্সটা ঈগলের মুখ থেকে কোনরকমে পড়ে গেলেই আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

এইভাবে অনেকক্ষণ শূন্যে ওঠার পর হঠাৎ আমার বাক্সঘরটা একটা শক্ত জিনিসের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। আমার ঘরটা নিয়ে ঈগল যখন উড়ছিল তখন তিনটে ঈগল সেই ঈগলটাকে তাড়া করলে সে বাক্সঘরটা ছেড়ে দিয়ে উড়ে পালিয়ে যায়। ভয়ে চোখ বন্ধ করি আমি।

পরে দেখলাম, সে ভাগ্যক্রমে একটা চলমান জাহাজের উপর পড়েছে

আমার বাক্সঘরটা। আমি আমার বাক্সঘরের ছাদের জানালা খুলে মুখ বার করে চিৎকার করতে লাগলাম।

জাহাজের ক্যাপ্টেন এসে বলল, ভয় নেই। তুমি বেঁচে গেছ। এটা একটা জাহাজ। কাঠের মিস্ত্রী ডাকা হয়েছে। সে এসে খাঁচা থেকে উদ্ধার করবে তোমাকে। আমাকে বার করা হলে জাহাজের নাবিকরা ও ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে গেল বিস্ময়ে। আমি তখন আমার এই বন্দীদশার কারণ সব খুলে বললাম ক্যাপ্টেনকে। বললাম. আমি এক ইংরেজ, ঘটনাক্রমে একটা দ্বীপে এক দৈত্যপুরীতে বন্দী হয়ে ছিলাম প্রায় তিনবছর।

ক্যাপ্টেন বলল, টনকিন থেকে তার জাহাজ ইংলণ্ডে ফিরছিল। আমি বললাম, আমিও ইংলণ্ডেই ফিরতে চাই।

ক্যাপ্টেন প্রথমে আমাকে দেখে সন্দেহ করে। বলে, সামনে যে বন্দর পাওয়া যাবে সেখানেই নামিয়ে দেবে। পরে আমার সব কথা শুনে বিশ্বাস করল আমার কাহিনী। আমি তখন আমার বাক্সঘরে দৈত্যপুরীর যে সব চিহ্ন ছিল তা দেখালাম। যেমন রাজার কাটা দাড়ি থেকে বানানো চিরুণী, দেড়ফুট লম্বা ছুঁচ ও আলপিন, রানীর দেওয়া তার কড়ে আঙ্গুলের আংটি যেটা আমার গলায় পরা চলে। আমি ক্যাপ্টেনকে কিছু উপহার দিতে চাইলাম। কিন্তু সে তা নিল না।

অবশেষে ১৭০৬ সালের ৩রা জুন ইংলণ্ডের ডাউনস বন্দরে জাহাজ পৌছল। আমি জাহাজ থেকে নেমে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে পাঁচ শিলিং নিয়ে একটা ঘোড়া ও এক পথপ্রদর্শক ভাড়া করলাম। আমার মালপত্র সব নামিয়ে দেওয়া হলো।

ঘোড়ায় করে বাড়ি ফেরার পথে দুধারের বাড়িঘর, মানুষ ও গাছপালা দেখে আমার কেবলি মনে হতে লাগল আমি যেন লিলিপুটে এসেছি। মনে হচ্ছিল আমি যেন এক দৈত্যাকার মানুষ।

বাড়ি ফেরার পর এই ভাবটা কাটতে বেশ কিছুদিন সময় লাগল। দীর্ঘদিন পর আমি আবার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলিত হলাম। আমার স্ত্রী বলল, আর তোমায় সমুদ্রযাত্রায় যেতে হবে না। বারবার তুমি নানা বিপদে পড়ছ।

কিন্তু আমার মন থেকে সমুদ্রযাত্রার নেশা গেল না। সমুদ্র যেন আমায় আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

তৃতীয় ভাগ

লাপুটা, বাননিবারবি, লালনাগ গ্লাবডাবড্রিব ও জাপান ভ্রমণ

১

আমি বাড়ি ফেরার পর দশ দিন না যেতেই আমার এক পরিচিত ক্যাপ্টেন আমার বাড়িতে এসে দেখা করলেন আমার সঙ্গে। আগে তিনি যখন এক জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন আমি সে জাহাজে সার্জেন ছিলাম। আবার তাঁর একটি নিজের জাহাজেরও সার্জেন ছিলাম আমি।

এর ছমাস পরে আমার স্বাস্থ্যটা ভাল হতে তিনি একদিন বললেন, তাঁর জাহাজ এবার ইষ্টইণ্ডিয়া যাচ্ছে। আমি সে জাহাজে সার্জেন পদ গ্রহণ করতে রাজী আছি কি না। এবার আমার অধীনে একজন সার্জেন থাকবে। ফলে আমার কাজ কম করতে হবে। তার উপর এবার দ্বিগুণ মাইনে দেওয়া হবে আমায়।

আমি রাজী হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী মত না করলেও তাকে রাজী করালাম। তারপর ১৭০৬ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে আবার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম আমি।

১৭০৭ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ বন্দরে আমাদের জাহাজ পৌঁছল। নাবিকদের অসুস্থতার জন্য সে বন্দরে আমাদের থাকতে হলো তিন সপ্তাহ। তারপর সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা গেলাম টনকিন বন্দরের পথে।

সেখানে ক্যাপ্টেনকে ব্যবসার মাল কিনে বোঝাই করার জন্য কয়েক মাস থাকতে হবে। তাই তিনি আর একটা ছোট জাহাজ কিনে তাতে কিছু পণ্য বোঝাই করে চোদ্দজন নাবিককে আমার সঙ্গে দিয়ে সেই জাহাজে করে আশেপাশের দ্বীপগুলোতে সেই সব পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন আমাদের।

আমরা যাত্রাশুরু করার তিন দিন পর ঝড় উঠল সমুদ্রে। ঝড়ের আঘাতে জাহাজ পাঁচ দিন ধরে প্রথমে উত্তর-পূর্ব দিকে ও পরে পূব দিকে ভেসে চলল। এইভাবে আরো পাঁচ দিন চলার পর দুটো দস্যুজাহাজ আমাদের তাড়া করল। আমাদের জাহাজ অনেক পণ্যদ্রব্যে ভর্তি থাকায় জোরে চলতে পারছিল না। তার উপর আমাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র বেশী ছিল না আত্মরক্ষার জন্য।

দস্যুজাহাজ দুটো আমাদের কাছে এসে আমাদের জাহাজটাকে থামতে বলল। দস্যুরা এসে আমাদের বেঁধে ফেলল। ওদের দলের মধ্যে একজন ওলন্দাজ ছিল। আমি তাকে বললাম, আমি ইংরেজ তুমি হল্যাণ্ডের লোক। আমি খ্রীশ্চান এবং প্রোটেস্ট্যান্ট। আমি তোমার প্রতিবেশী। ক্যাপ্টেনকে বলে আমার প্রাণ রক্ষা করো।

কিন্তু সে আমার কথা শুনল না। দুটো দস্যুজাহাজের মধ্যে বড় জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল একজন জাপানী। সে কিছু ডাচ ভাষা বলতে ও বুঝতে পারে। আমার অনুনয় বিনয়ে তার কিছুটা দয়া হলো। সে বলল, তোমাদের মারা হবে না। কিন্তু সেই হিংসুটে ওলন্দাজটা আমার মৃত্যুদণ্ড দাবি করতে লাগল ক্যাপ্টেনের কাছে।

ক্যাপ্টেন আমাদের জাহাজের সব লোকদের দুভাগে ভাগ করে দুটো দস্যুজাহাজে পাঠিয়ে দিল। তারপর আমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে একটা নৌকোয় করে কিছু খাবার দিয়ে পাঠিয়ে দিল অজানার পথে।

আমি নৌকোয় করে কিছুদূর যাবার পর দূরবীন দিয়ে দেখলাম দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। দ্বীপটাতে অনেক পাহাড় আছে। নৌকা বেয়ে আমি সেই দ্বীপে গিয়ে উঠলাম। কোথাও কোন জনমানব দেখতে পেলাম না। পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা বেছে নিয়ে সেখানে বসে কিছু খেলাম। বাকি খাবার গুহায় রেখে দিলাম।

সেখানে অনেকগুলো গুহা ছিল। পাথরের খাঁজ থেকে কিছু পাখির ডিম যোগাড় করলাম। তারপর কিছু শুকনো শ্যাওলা আর ঘাসপাতা যোগাড় করলাম। তাতে শোয়া হবে আর আগুন জ্বালানোও হবে।

একটা গুহাতে শুয়ে রাতটা কাটালাম। কিন্তু ঘুম হলো না। যে দ্বীপে কোন মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা কিছু নেই, শুধু পাহাড় আর কিছু ঘাস লতা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না সে দ্বীপে কি করে থাকব? এই ভেবে ভয়ে ঘুম হলো না আমার।

সকালে উঠে আমি বেরিয়ে পড়লাম গুহা থেকে। এ দ্বীপে সূর্যের তেজটা বড় ভয়ঙ্কর। রোদ লাগতেই গা-টা জ্বালা জ্বালা করছিল।

হঠাৎ সূর্যকে আড়াল করে একটা বিরাট ছায়া ঘন হয়ে হয়ে উঠল মাথার উপরে। উপরে চোখ তুলে দেখলাম একটা উড়ন্ত দ্বীপ উপর থেকে নেমে আসছে আমার দিকে। দেখলাম দ্বীপটার মধ্যে মানুষ, ঘরবাড়ি, গাছপালা, পাহাড় পর্বত, জলাশয় সব রয়েছে।

সেই উড়ন্ত দ্বীপের লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে লাগলাম আমি একটা উঁচু জায়গা হতে।

দ্বীপটা আমার অনেক কাছে এসে থামল। তবু আমার উপরে একশো গজ দূরে। তাতে ওঠা সম্ভব নয়। তখন দ্বীপের লোকগুলো আমাকে ইশারা করে পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে গিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

উড়ন্ত দ্বীপের শেষ ধাপ থেকে ওরা তখন একটা লোহার শিকল নামিয়ে দিল আমার নাগালের মধ্যে। সেই শিকলে বসার মত একটা আসন ছিল। আমি তার উপর বসলে ওরা আমাকে টেনে তুলে নিল।

২

উড়ন্ত দ্বীপে উঠে গিয়ে দেখলাম ওখানকার মানুষগুলোর আকৃতি প্রকৃতি, পোশাক আশাক সবই অদ্ভুত। মানুষগুলোর আকার আমাদের মত হলেও ওদের মাথাগুলো ডান অথবা বাঁ দিকে হেলানো। একটা চোখ নিচের দিকে আর একটা চোখ উপর দিকে চেয়ে আছে। ওদের জামার উপর চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও নানারকম বাদ্যযন্ত্রের ছাপ আছে। ওরা ইতালীয় ভাষায় কথা বলছিল।

সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের আশেপাশে যে সব চাকর বাকর ছিল তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছোট লাঠির ডগায় বেলুনের মত ফোলানো একটা ব্লাডার ছিল। সেই ব্লাডার দিয়ে ওরা পরস্পরের মুখে ও কানে আঘাত করছিল প্রায়ই। তার কারণ ওরা সকলেই বড় কল্পনাপ্রবণ আর অন্যমনস্ক। তাই কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ওরা এইভাবে ব্লাডার দিয়ে আঘাত করে। প্রত্যেকেই বাড়িতে একজন করে এর জন্য ভৃত্য রাখে যাদের বলা হয় ক্ল্যাপার বা আঘাতকারী। এই ক্ল্যাপারেরা তাদের মনিবদের সঙ্গে সব জায়গায় যায়।

অবশেষে আমাকে রাজদরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। রাজা সিংহাসনে বসে ছিলেন। তাঁর চারপাশে ছিল কয়েকজন জ্ঞানী ও গুণী লোক। সামনের টেবিলের উপর ছিল গ্লোব ও বিভিন্ন আকারের যন্ত্রপাতি। পরে জেনেছিলাম এই উড়ন্ত দ্বীপের লোকেরা শুধু গণিত, জ্যামিতি আর সঙ্গীত ছাড়া আর কোন বিদ্যা জানে না বা জানার প্রতি কোন আগ্রহও নেই। আমি যখন রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম রাজা তখন কিছু গণিত বা কোন এক

বিষয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান খুঁজছিলেন। তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল।

রাজার দুপাশে দুজন ক্ল্যাপার দাঁড়িয়েছিল। রাজার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে তারা রাজার কানের কাছে মৃদু আঘাত করল ব্লাডার দিয়ে।

রাজা আমাকে যে সব প্রশ্ন করলেন আমি বিভিন্ন ভাষায় তার উত্তর দিলাম। কিন্তু রাজার ভাষা আমি যেমন বুঝতে পারিনি তেমনি আমার ভাষাও বুঝতে পারেননি রাজা। কিন্তু আমাকে দেখে রাজা বুঝতে পেরেছিলেন আমি বিদেশী, নিরাশ্রয় এবং বিশ্রাম চাই।

তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটা ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিলেন। খাবারের মধ্যে ছিল ভেড়ার মাংস, রুটি আর পুডিং।

এর পর রাজা আমাকে ওদেশের ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। তিন চারজন লোক বই খাতা নিয়ে আমাকে ভাষা শেখাতে লাগল।

আমি বুঝলাম উড়ন্ত ও শূন্যে ভাসমান দ্বীপটার নাম লাপুটা। এইভাবে অনেক শব্দ শিখে ফেললাম। আমার পোশাকটা ছেঁড়া আর ময়লা হয়ে গিয়েছিল। তাই রাজার দর্জিরা আমার মাপ নিয়ে পোশাক আশাক বানিয়ে দিল।

রাজা একদিন আদেশ দিলেন, তাঁর রাজধানী লাগাডোর দিকে এই উড়ন্ত দ্বীপটি সরে যাবে। আমরা চারদিন ধরে উড়ে চললাম রাজধানী লাগাডোর দিকে। পথে যে সব গ্রাম ও শহর পাওয়া গেল সেগুলি লাপুটার রাজারই অধিকারভুক্ত ছিল। উড়ন্ত দ্বীপটি সেই গ্রাম ও শহরের মাথায় একবার করে থামল। এক একটি গ্রামের উপর দ্বীপটা থামতেই একটা করে বড় দড়িতে ঢেলা বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। গ্রামের প্রজারা তাদের আবেদন নিবেদন-গুলি কাগজে লিখে তা সেই ঢেলার সঙ্গে বেঁধে দিতে লাগল।

রাজা ও উড়ন্ত দ্বীপের সব লোকেরা গান বাজনা খুব ভালবাসে রাজা প্রায়ই গায়কদের ডেকে গান শোনেন। গণিত সঙ্গীতবিদ্যা ছাড়া ওরা জ্যোতির্বিদ্যাও শেখে।

দেখলাম খাদ্য বা সুখসমৃদ্ধির কোন অভাবই নেই উড়ন্ত দ্বীপে। তবু ওখানকার মানুষদের মনে কোন শান্তি ছিল না। ওদের ধারণা পৃথিবী ক্রমশই সূর্যের দিকে সরে যাচ্ছে। কালক্রমে সূর্য পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবে। তা ছাড়া আছে ধূমকেতুর ভয়। এর আগের বার যে ধূমকেতু দেখা

গিয়েছিল তার হাত থেকে পৃথিবী কোনক্রমে বেঁচে গেছে, কিন্তু একত্রিশ বছর পরে আবার যে ধূমকেতু দেখা যাবে তার হাত থেকে আর রক্ষা করা যাবে না পৃথিবীকে। একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এই ভয়ে তারা রাত্রে ঘুমোতে পারে না ভাল করে। তারা সব সময় ভয় করে এই বুঝি বা সব ধ্বংস হয়ে গেল। সকালে উঠেই একজনের সঙ্গে একজনের দেখা হলে ওরা সূর্যের অবস্থা আর ধূমকেতুর কথা জিজ্ঞাসা করে।

লাপুটা দ্বীপের মেয়েরা কিন্তু ওখানে থাকতে ভালবাসে না। তারা চায় নিচের জগতে নেমে যেতে। তাই তারা বিদেশীদের খুব পছন্দ করে। একবার তারা এই দ্বীপ থেকে মুক্তি পেয়ে অন্য কোথাও গেলে আর ফিরে আসতে চায় না।

৩

দ্বীপটা ভাল করে দেখার জন্য রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে দ্বীপ দেখতে বার হলাম। আমার শিক্ষক সঙ্গে রইলেন।

আমি দেখলাম উড়ন্ত বা ভাসমান দ্বীপ লাপুটা একেবারে গোলাকার। এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাসের মাপ হলো সাড়ে চার মাইল। মোট জমির পরিমাণ দশ হাজার একর। এর উচ্চতা তিনশো গজ। এই দ্বীপে অনেক খনিজ দ্রব্য আছে। দ্বীপের মাটিতে আছে দশ ফুট নরম জমি। দ্বীপের উপরিভাগটা সমতল নয়, কিনারা থেকে কেন্দ্রের দিকটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। বৃষ্টির জল গড়িয়ে নদী হয়ে কেন্দ্রের কাছে গিয়ে চারটে বিরাট জলাশয়ে পরিণত হয়েছে।

আমি দেখলাম দ্বীপটির কেন্দ্রস্থলে একটা খাল আছে। সেই খালের মধ্যে আছে এক বিরাট গম্বুজ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেখানে উঠে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন। সেই গম্বুজে ছয় গজ লম্বা আর তিন গজ চওড়া একটি চুম্বক আছে। একটি মজবুত দণ্ডের উপর রাখা আছে চুম্বকটি। এই চুম্বকটির সাহায্যেই রাজার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই দ্বীপটিকে উপর নিচে চালনা করেন এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যান।

রাজার অধিকারভুক্ত কোন দ্বীপ বা গ্রামের প্রজারা যদি বিদ্রোহ করে রাজার বিরুদ্ধে তাহলে রাজা তাঁর উড়ন্ত দ্বীপটি সেই বিক্ষুব্ধ দ্বীপ বা গ্রামের উপর নিয়ে এসে থামিয়ে দেন। রোদ-বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। তখন ঢাকাপড়া সেই জায়গায় মহামারী ও মড়ক দেখা যায়।

এতেও যদি সেই বিক্ষুব্ধ প্রজারা জব্দ না হয় তখন সেই দ্বীপের উপর উড়ন্ত দ্বীপটা নামিয়ে এনে চেপে বসেন রাজামশাই। ফলে সেখানে বাড়িঘর সব ভেঙ্গে যায় এবং বহু মানুষও মারা যায়।

আমি ক্রমে বুঝতে পারলাম আমি ওদের ভাষা শিখলেও লাপুটার রাজা ও ওখানকার লোকেরা আমাকে কেমন একটা ঘৃণা আর ঔদাসিন্যের চোখে দেখত। তাই আমি ওদের মধ্যে স্বস্তি অনুভব করতে পারছিলাম না। তাই আমি স্থির করলাম, সুযোগ পেলেই এ দ্বীপ ত্যাগ করে চলে যাব।

রাজসভায় রাজার এক আত্মীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। আমি একদিন সেই ভদ্রলোককে বললাম, দয়া করে আপনি রাজামশাইকে বলে এখান থেকে আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি আদায় করে দিন। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

ভদ্রলোক রাজাকে একথা বলতে রাজা দুঃখের সঙ্গে অনুমতি দিলেন। অনুমতি দেবার আগে তিনি অনেক করে থাকতে বললেন তাঁদের দ্বীপে। কয়েকটি লোভনীয় প্রস্তাবও দিলেন আমায়।

অবশেষে আমি সে সব প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় রাজা আমাকে উড়ন্ত দ্বীপ থেকে নামিয়ে দেবার আদেশ দিলেন।

উড়ন্ত দ্বীপ থেকে আমাকে যেখানে নামিয়ে দেওয়া হলো সে দ্বীপের নাম বালনিবারবি। তার প্রধান নগরের নাম লাগাডো যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

আমি ওদেশের লোকের মতই পোশাক পরেছিলাম। ওদের ভাষাও আমি মোটামুটি জানি। উড়ন্ত দ্বীপ থেকে সেই বালনিবারবি দ্বীপে নেমে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

লাপুটা রাজ্যের সেই সভাসদ ভদ্রলোক এদেশের এক ভদ্রলোকের নামে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। তাঁরই বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো।

পরদিন সকালে মুনোভি আমাকে তাঁর রথে চাপিয়ে শহর দেখাতে নিয়ে গেলেন। শহরের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। পথের দুপাশের বাড়িগুলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা। মেরামত করা দরকার। পথে যে সব লোক হাঁটছিল তাদের পরনের কাপড় সব ছেঁড়া। সব পথেই শহরের মানুষগুলো খুব জোরে হাঁটছিল। যেন তারা খুবই ব্যস্ত।

শহরের শেষে মাঠে অনেক লোক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছিল, কিন্তু

ফসল দেখতে পেলাম না মাঠে। তবে ঘণ্টা তিনেক যাওয়ার পর দৃশ্য বদলে গেল। দেখলাম মাঠে মাঠে প্রচুর আঙ্গুর চাষ হচ্ছে। মাঠের কাছাকাছি চাষীদের বাড়ি রয়েছে।

মুনোভি বললেন, আগে তিনিই ছিলেন এদেশের শাসনকর্তা। কিন্তু কয়েকজন মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি লাপুটার সম্রাটের বিরাগভাজন হন। তবে সম্রাট আমার কোন ক্ষতি করেননি। আমার বিষয় সম্পত্তি আছে। গ্রামে একটা খামার বাড়ি আছে।

মুনোভি আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঠিকই পথে চলতেন। তাদের চাষ আবাদ ও জলসেচের পদ্ধতি ভাল ছিল। কিন্তু এখানকার কিছু লোক একবার লাপুটা গিয়ে সেখানে থেকে—সেখানকার সব পদ্ধতি প্রণালী জেনে এসে এদেশে তা প্রবর্তন করতে চায়। কিন্তু সেই সব নতুন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে গেলে সব ব্যর্থ হয়ে পড়ে। ফলে ফসল ফলে না। বাড়ি ঘর ভেঙ্গে যায়। জমিতে জলসেচ ও জলের অভাব মেটাতে পারে না। ফলে যে সব পুরনো পদ্ধতিতে চাষ আবাদের কাজ ও ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে ভাল পাওয়া যাচ্ছে।

৪

মুনোভির সঙ্গে আমি ওদের যোজনা ভবন দেখতে গেলাম। শহরে বড় রাস্তার ধারে কয়েকটি বাড়ি নিয়ে যোজনাভবন গড়ে উঠেছে। কয়েকজন অধ্যাপক তার মধ্যে নানারকম গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হলো যিনি মাথায় কখনো চিরুনি দেন না। মাথায় জটা পড়ে গেছে। তিনি শশা নিয়ে গবেষণা করছেন। শশা যেসব সূর্যকিরণ শোষণ করে সেই সূর্যকিরণ বার করে একটি শিশিতে ভরে রেখে দেন। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সময় অর্থাৎ সূর্যের কিরণ না থাকলে সেই শিশির কিরণ বার করে প্রয়োজনমত ব্যবহার করেন। আট বছর পর তিনি যে কোন বাগানের ফল ও মাঠের ফসলের জন্য সেই সূর্যকিরণ ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করতে পারবেন।

আর এক অধ্যাপক নানারকম রঙীন কীট দেখালেন। তিনি বললেন মাকড়সারা সেই রঙীন কীট খেয়ে তারা যে জাল বুনবে তাতে অনেক রঙ-বেরঙের সুতো পাওয়া যাবে। সেই সুতো রেশমের কাজ করবে।

আর একজন অধ্যাপক এমন এক আশ্চর্য মেসিন বা কল আবিষ্কার

করেছেন যার দ্বারা কিছু মুদ্রার বিনিময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে যে কোন মূর্খ লোক কবিতা লিখতে পারবে অথবা দর্শন, রাজনীতি, গণিত, আইন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বই লিখতে পারবে।

মেসিনটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখালেন অধ্যাপক। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এবং তার একটি নকসা এঁকে নিলাম। বললাম, এই মেশিনটি ইউরোপে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের দেখাব এবং তাঁর কথা বলব।

কিন্তু ওদের এ্যাকাডেমি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিদ্যালয় দেখে আমি তত সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমার মনে হলো সেখানকার অধ্যাপকদের মাথায় গোলমাল আছে। তাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার চেষ্টা করছেন। তাঁরা রাজাকে রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দান করার চেষ্টা করেন। কিভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে লোককে বাছাই করতে হবে, কিভাবে মানুষের কাজ ও গুণ বিচার করে তাকে পুরস্কার দিতে হবে, রাজ কুমার ও মন্ত্রীদের কি কি শিক্ষা দিতে হবে, প্রজাদের পীড়ন না করে কিভাবে তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা যায় এই সব বিষয় রাজাকে শেখায় তারা।

রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর ও সন্দেহভাজন সে সব লোকদের চিঠি ও কাগজ-পত্র আটক করা হয় সেগুলি অভিজ্ঞ লোকদের দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তারা দেখে, সেই সব চিঠি ও কাগজপত্রের মধ্যে সাংকেতিক বা গোপন ভাষায় দেশের বিরুদ্ধে কিছু লেখা আছে কিনা। যেমন এন মানে রাজনৈতিক চক্রান্ত, 'বি' মানে একদল অশ্বারোহী এবং এল মানে সামুদ্রিক নৌবহর।

আবার কয়েকটি প্রতীক চিহ্নও ব্যবহার করা হয়। যেমন টুল মানে প্রিভি কাউন্সিল। একঝাঁক হাঁস মানে সিনেট।

৫

ক্রমে আমি জানতে পারলাম লাগাডো একটি ভাল বন্দর এবং বিশাল দ্বীপ। এই দ্বীপের পূর্বদিকে একশো পঞ্চাশ মাইল দূরে আছে আমেরিকা মহাদেশ আর প্রশান্ত মহাসাগর। উত্তর অঞ্চলের ২৯ ডিগ্রি উত্তর পশ্চিমে লাগনাগ নামে একটি দ্বীপ আছে। এই লাগনাগ দ্বীপ জাপানের দক্ষিণ-পূর্বে একশো লীগ দূরে। জাপান সম্রাট ও লাগনাগ দ্বীপের রাজার মধ্যে এক চুক্তি আছে। সেই চুক্তি বলে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলে এবং এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাওয়ার সুযোগ আছে।

আমি তাই ঠিক করলাম এখান থেকে প্রথমে লাগনাগ যাব এবং পরে লাগনাগ থেকে যাব জাপানে। এইভাবে ইউরোপে ফিরে যাবার সুযোগ করে নেব।

আমার আশ্রয়দাতা মুনোভির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তিনি লাগনাগ যাবার জন্য সঙ্গে গাইড দিলেন। আমি প্রথমে গিয়ে উঠলাম মালডনাভা বন্দরে। সেখানে আমার পরিচিত দু একজনের সঙ্গে দেখা হলো।

একজন ভদ্রলোক বলল, লাগনাগ যাবার জাহাজ মাসখানেক আগে ছাড়বে না। এই সময়ের মধ্যে আমি গ্লাবডাবড্রিব নামে একটা ছোট্ট দ্বীপ বেড়িয়ে আসতে পারি।

গ্লাবডাবড্রিব কথাটির অর্থ হল যাদুকরের দ্বীপ। এক যাদুকর গোষ্ঠীর সর্দার এই দ্বীপ শাসন করে। এই উপজাতি লোকেরা নিজেদের মধ্যেই বিয়ে করে। এই শাসনকর্তা তাদের মধ্য থেকে পছন্দ মত একজনকে আহ্বান করে চব্বিশ ঘন্টা কাজ করিয়ে নেন।

আমরা দ্বীপে পৌঁছে প্রাসাদদ্বারে চলে গেলাম। তখন বেলা এগারোটা। প্রাসাদে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইতে রাজা অনুমতি দিল সঙ্গে সঙ্গে। আমরা প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। পথের দুধারে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল রক্ষীবাহিনী। সিংহাসনে বেদীর নিচে তিনটি টুলে বসতে দেওয়া হলো আমাদের।

রাজা আমাদের সঙ্গে বসে আহার করে সম্মানিত করলেন। একদল ভৃত্য হিসাবে আহার পরিবেশন করল। রাত্রিতে আমি রাজপ্রাসাদের মধ্যে থাকতে চাইলাম না। রাজার আদেশ নিয়ে আমি ও আমার দুই বন্ধু শহরের একটা বেসরকারী বাড়িতে গিয়ে রাত্রিতে থাকলাম। সকালে আবার রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

এইভাবে এই যাদুকর দ্বীপে দশদিন রয়ে গেলাম। ভূত দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। এখানকার রাজা বা শাসনকর্তা আবার ভূতদেরও রাজা। রাজা তাই ডাকলে ভূতদের আসতে হয়। রাজার বাড়ির কাজকর্ম সব করে দিতে হয়।

রাজা একদিন আমাকে বললেন, পৃথিবীর আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে কোন মৃত ব্যক্তিকে তুমি স্মরণ করলে সে আসবে তোমার সামনে এবং তুমি তাকে যে কোন প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেবে। তবে প্রশ্নটা যেন সেই মৃতব্যক্তির জীবনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

আমি তখন বসে রাজার কথা ভাবছিলাম। সেই ঘর থেকে রাজার বাগানবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। আমি বললাম, আরবেলা যুদ্ধে জয়লাভ করে আলেকজাণ্ডার তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছেন—এই দৃশ্যটি আমি দেখতে চাই।

রাজা তাঁর আঙ্গুল বিশেষ ভাবে নাড়তেই আমি দেখলাম ঘরের জানালার বাইরে মহাবীর আলেকজাণ্ডার তাঁর সেনাবাহিনীর আগে আগে ঘোড়ায় চেপে চলেছেন। তাঁকে ডাকতে তিনি ঘরে এলেন। আমি গ্রীকভাষা জানি না। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, জেনে রেখ, কেউ আমাকে বিষ খাইয়ে মারেনি। অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য আমার এক ধরনের জ্বর হয় এবং সে জ্বরেই আমার মৃত্যু হয়।

এর পর আমি ইচ্ছামত হ্যানিবলকে দেখলাম। হ্যানিবল তখন আল্পিস পর্বত অতিক্রম করছিলেন। তারপর বিজয়গৌরবে দৃপ্ত সীজারকেও দেখলাম। ব্রুটাসকেও দেখলাম। ব্রুটাস বললেন, তিনি জুলিয়াস, সক্রেটিস, এপামিনোডাস, ছোট কাটো এবং টমাস মুর প্রমুখ এই ছয়জন মহাপুরুষের সঙ্গে থাকেন।

এইভাবে অতীত যুগের কত মহান ব্যক্তি ও ঐতিহাসিক ঘটনা স্বচক্ষে দেখে আমার দুচোখ সার্থক হলো।

আর একদিন রাজাকে বললাম, আমি গ্রীক মহাকবি হোমার ও দার্শনিক এ্যারিস্টোটলকে দেখতে চাই।

হোমার ও এ্যারিস্টোটল কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের সমালোচকরাও ছিলেন। ঘরের মধ্যে সবার বসার জায়গা হচ্ছিল না। দেখলাম হোমার ও এ্যারিস্টোটলের মধ্যে হোমারের চেহারাটাই বেশী দীর্ঘ ও সুদর্শন। এ্যারিস্টোটল বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। তাঁকে লাঠি ধরে হাঁটতে হচ্ছে।

এইভাবে আমি পাঁচদিন ধরে অতীত যুগের আরও অনেক মনীষীর সঙ্গে প্রাণভরে কথাবার্তা বলে কাটালাম। ইউরোপের ও ইংলণ্ডের দুশো বছরের মধ্যে মৃত খ্যাতিমান ব্যক্তিদের আনালাম।

এর পর আমরা গ্লাবডাবড্রিব দ্বীপের শাসনকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মালডনাডায় ফিরে এলাম। সেখানে এক পক্ষকাল অপেক্ষা করার পর লালনাগের জাহাজ পেয়ে গেলাম।

১৭০৮ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে আমরা লালনাগ বন্দরে পৌঁছলাম। সেখানকার কাস্টমস এর অফিসারেরা আমায় পরীক্ষা করল।

আমি বালনিবারবি ভাষায় বললাম, আমি হল্যাণ্ডের লোক। আমি জাপান যাবার পথে জাহাজডুবি হয়ে লাপুটা দ্বীপে উঠি। এখন লালনাগ হয়ে জাপান যেতে চাই।

আমি টাকা দিয়ে একজন দোভাষী নিযুক্ত করলাম। ও দেশের রাজার সঙ্গে দেখা করার আগে আদালতের অনুমতি নিতে হলো।

রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে আমি জানতে পারলাম, আমাকে উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে হেঁটে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এইভাবে রাজার কাছে যাওয়া একটা সম্মানের ব্যাপার।

এইভাবে গিয়ে সিংহাসন হতে চার গজ দূরে নতজানু হয়ে উঠলাম। তারপর মাটিতে সাতবার মাথা ঠুকে গতরাতে শেখানো একটি স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করলাম। বাক্যটি হলো "ইকপ্লিং প্লফথ্রব স্কুটমেরাস ক্লিয়প ম্লাশপনাস্ট জুইন নোবাকগাফ স্লিওফার্ড গার্ডলাড এ্যাশট"—অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য ঈশ্বরতুল্য হে রাজাধিরাজ, আপনি সূর্য এবং এগারোটি গ্রহ ও অর্ধচন্দ্র অপেক্ষা অধিক দিন জীবিত থাকুন।

রাজা আমার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন আমার প্রতি। রাজা আমাকে তাঁর দেশে চিরদিনের জন্য থেকে যাবার জন্য সম্মানজনক এক প্রস্তাবও দেন। কিন্তু দেশে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে যাবার জন্য আমি জাপান যাবার অনুমতি চাইলাম রাজার কাছে।

লালনাগের লোকরা বিদেশীদের সঙ্গে বড় ভদ্র ব্যবহার করে। তাদের সকলের কাছ থেকে আমি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাই। ও দেশের অনেক বিশিষ্ট ও জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হলো।

একদিন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে তাঁদের দেশের অমর মানুষদের কথা বলেন। তা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাই আমি স্বাভাবিকভাবেই।

এই অমর মানুষদের ওদের ভাষায় বলা হয় স্ট্রলড ব্রাগ। মাঝে মাঝে কোন কোন পরিবারে এমন এক একটি শিশু জন্মায় যার কপালে ডান দিকে ভ্রুর উপরে বৃত্তাকার একটি ছাপ দেখা যায়। এই ছাপের আকার হয় তিন পেন্স রৌপ্যমুদ্রার মাপের। এই ছাপ কখনো মুছে যায় না। তবে জীবনের বিভিন্ন স্তরে সেই ছাপের রংটা বদলায়। শিশুর বয়স যখন বারো হয় এই ছাপটার রং থাকে সবুজ। পঁচিশ বছর পর্যন্ত এই রং সবুজ থাকে,

তারপর এই রং হয় নীল। আবার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এই রং হয় কালো। তখন ছাপটা বড় হয়ে শিলিং মাপের মত হয়ে যায়।

সেই ভদ্রলোক বললেন, তাঁদের সারা রাজ্যের মধ্যে এই অমর মানুষদের সংখ্যা হবে পঞ্চাশ জন। এই অমর মানুষদের সন্তানরাও অমর হয়। অনেক সময় কোন কোন মেয়েও অমরত্ব নিয়ে জন্মায়। এই অমর মানুষেরা কঠোর নৈতিক শৃংখলার সঙ্গে সং জীবনযাপনের পক্ষপাতী। তাই রাজসভায় তাদের স্থান হয় না। রাজসভার লোকেরা অমর মানুষদের উপদেশমত জীবন কাটাতে পারবে না বলেই রাজা তাদের রাজসভায় ডেকে কোন বিষয়ে পরামর্শ করেন না।

অমর নারী পুরুষদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিয়ে হয়। তবে রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ছোট তার বয়স আশী হলেই আপনা থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

কোন অমর মানুষের বয়স আশী হলেই এরা আইনের চোখে মৃত হয়ে যায়। তার পরেও এদের মৃত্যু হয় না যদিও এদের সব দাঁত পড়ে যায় আর চুল উঠে যায়। অমর মানুষের বয়স আশী বছর হলেই তার সব সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের দিয়ে দেওয়া হয়। তার ভরণপোষণের ভার উত্তরাধিকারীরা বহন করে। তারা গরীব হলে সরকার তাদের ভরণপোষণের খরচ দেয়। তাদের তখন কোন বৈধ অধিকারই থাকে না। তারা কোন জমি কেনাবেচা করতে পারে না, তারা মামলার সাক্ষী হতে পারে না।

দুশো বছর বয়সের একজন অমর মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এই সব মানুষদের স্মৃতিশক্তি সব লোপ পেয়ে যায়। ভালভাবে কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে না।

একজন স্ট্রলডবার্গ বা অমর মানুষ আমার কাছ থেকে স্লামসকুডাসফ বা স্মরণযোগ্য কোন উপহার চায়। এদেশে ভিক্ষা চাওয়া আইনতঃ নিষিদ্ধ বলেই হয়ত সে উপহার চায় আমার কাছ থেকে।

আমি বহু দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এই ধরণের অমর মানুষ কোথাও দেখিনি বা তার নামও শুনিনি।

৬

লালনাগ দ্বীপের রাজা যখন জানলেন, আমি জাপান হয়ে দেশে ফিরে যেতে চাই তখন তিনি জাপান সম্রাটের কাছে আমার জন্য এক পরিচয়পত্র

লিখে দিলেন। তারপর আবার রওনা হবার সময় চারশ চল্লিশটি বড় আকারের স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি লাল হীরে উপহার দিলেন। পরে বাড়ি গিয়ে আমি ঐ হীরেটি এগারশো পাউণ্ডে বিক্রি করি।

১৭০৯ সালের ৬ই মে তারিখে আমি লালনাগের রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাপান যাত্রা করি।

জাপানে দক্ষিণ পূর্ব দিকে জামোসি নামে একটি ছোট বন্দরে জাহাজ থেকে নামলাম আমরা। জাহাজ থেকে নেমে আমি কাস্টমস্ অফিসারদের লালনাগের রাজার চিঠিখানি দেখলাম।

তারা তখন আমাকে জাপান সম্রাটের দরবারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করল। আমি হল্যাণ্ডবাসী হিসাবেই নিজের পরিচয় দিলাম। বললাম, জাহাজডুবি হয়ে বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরে শেষে লালনাগে পৌঁছাই। পরে দেশে ফেরার আশায় জাপানে এসেছি। কারণ আমি জানি আমাদের দেশের অনেক লোক ব্যবসা বাণিজ্য করতে এখানে আসে।

দোভাষীর মাধ্যমে আমি আরও বললাম, আমি এখানে ব্যবসা করতে চাই না। সম্রাট আমাকে যেন নাগাসাকি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর আমার পৃষ্ঠপোষক লালনাগের রাজার খাতিরে আমাদের দেশবাসীর উপর আরোপিত পবিত্র ক্রুশ পদদলিত করার নিয়ম থেকে আমাকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়।

সম্রাট আমাকে অনুগ্রহ করলেন। কিন্তু বললেন, কথাটি গোপন রাখতে হবে। তা না হলে জাহাজে তোমার দেশবাসী তোমার গলা কেটে ফেলবে।

এরপর একদল সৈনিকের সঙ্গে আমাকে নাগাসাকি পাঠিয়ে দিলেন সম্রাট। সেখান থেকে আমস্টারডামগামী জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে আমি ভাব করলাম। তারা সবাই হল্যাণ্ডের লোক। হল্যাণ্ডের লাইডেনে পড়াশুনো করার সময় ডাচ ভাষা শিখি। তাই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে কোন অসুবিধা হলো না আমার।

জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বললাম, আমি হল্যাণ্ড যাব। ক্যাপ্টেন তখন কিছু ভাড়া চাইল। পরে যখন জানল আমি এক সার্জেন, তখন মোট ভাড়ার অর্ধেক চাইলেন।

জাহাজ ছেড়ে দিল। এ যাত্রায় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। আমরা নিরাপদে 'কেপ অফ গুড হোপ'-এ পৌঁছলাম। তারপর সেখান থেকে পানীয় জল ভরে নিয়ে আবার যাত্রা করলাম। ১০ই এপ্রিল তারিখে আমস্টারডাম

পৌঁছলাম। যেখান থেকে ইংলণ্ডগামী একটি জাহাজ পেয়ে তাতে উঠে বসলাম।

অবশেষে ১৭১০ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে ডাউনস্‌এ এবং পরদিন বিকালে পুরো সাড়ে পাঁচ বছর পর আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। আমার স্ত্রী ও সন্তানদের সুস্থ দেখে নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হলাম।

চতুর্থ ভাগ

হুঁইনহুঁমদের দেশে

১

আমি বাড়িতে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাঁচ মাস কাটালাম। তারপর আবার সমুদ্র যাত্রার জন্য মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠল। এবার আমি 'এ্যাডভেঞ্চার' নামে একটি জাহাজে ক্যাপ্টেনের কাজ নিয়ে ১৭১০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর আবার সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে।

এক সপ্তাহ পরে টেনাবিসে 'ব্রিস্টল' জাহাজের ক্যাপ্টেন পোককের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর জাহাজ কামপীচ উপসাগরে গাছ কেটে গুঁড়ি বয়ে আনার জন্য যাচ্ছে। কিন্তু দুদিন পরে এক প্রবল ঝড়ে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল জাহাজটা। পরে শুনেছিলাম তাঁর জাহাজ ডুবে যায় এবং একজন কেবিন বয় ছাড়া আর কেউ বাঁচেনি।

এদিকে রোগে অসুখে আমার জাহাজের বেশ কিছু নাবিক মারা যাওয়ায় বার্বাডোজ ও লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ থেকে কিছু নাবিক নিয়োগ করতে হলো আমায় বাধ্য হয়ে। কিছুদিনের মধ্যে এই সব নতুন নাবিকরা পুরনো নাবিকদের সঙ্গে এক বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করল।

একদিন সকালে কয়েকজন বিদ্রোহী নাবিক আমার কেবিনের মধ্যে ঢুকে আমাকে বেঁধে ফেলল। আমি তাদের কাছে বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করায় আমার বাঁধন খুলে শুধু একপায়ে শিকল দিয়ে বন্দী করে রাখল কেবিনের মধ্যে। দরজায় পিস্তল ধরে একজনকে পাহারায় বসিয়ে রাখল।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ যাওয়ার পর দূরে এক কূল দেখতে পেয়ে বিদ্রোহীরা একদিন আমাকে একটি নৌকোয় চাপিয়ে সেই কূলের বেলাভূমিতে

নামিয়ে দিয়ে এল। আমার তলোয়ার আর কিছু দরকারী জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছু দিল না সঙ্গে। তবে আমার পকেটে যা কিছু টাকা পয়সা ছিল তা কেড়ে নিল না তারা। জায়গাটার নাম তারা বলতে পারল না।

আমি তখন বেলাভূমি থেকে ডাঙ্গায় উঠে এগিয়ে যেতে লাগলাম। চারদিকে তাকিয়ে কোন জনবসতির খোঁজ করতে লাগলাম। ভাবলাম এ দ্বীপে হয়ত কোন আদিবাসী উপজাতিরা বাস করে। ভাবলাম আমার কাছে কিছু নকল গয়না, কাঁচের আংটি আর খেলনা ছিল, তা দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করব। দেখলাম মাঠে অনেক ঘাস আর ওটের ক্ষেত রয়েছে।

কিছুদূর এগিয়ে পায়ে চলার একটা পথ দেখতে পেলাম। সে পথে শুধু ঘোড়ার ক্ষুর ছাড়া আর কোন পা'য়ের দাগ দেখতে পেলাম না। সেই পথ ধরে যেতে যেতে ক্ষেতের মাঝে কয়েকটা অদ্ভুত জীব দেখতে পেলাম। তাদের চারটে পা। তবে তারা মানুষের মত বসতে পারে এবং পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেও পারে। তাদের মাথা ও বুক চুলে ঢাকা। তলপেটের নিচেটাও সব লোমে ঢাকা। তাদের শরীরে আর কোথাও লোম নেই। বাকী জন্তুগুলো পুরুষগুলোর থেকে আকারে ছোট। তাদের মাথায় লম্বা শিথিল চুল। সারা গা ছোট ছোট লোমে ঢাকা। জন্তুগুলো গাছেও উঠতে পারে। সেই অদ্ভুত জন্তুগুলো আমাকে দেখতে পেল। একটা জন্তু আমার কাছে এগিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। নানারকম বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। আমি তখন আমার তলোয়ারটা নিয়ে তার গায়ের উপর ঘা বসিয়ে দিতে সে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো জন্তু এসে আমাকে ঘিরে ফেলল। আমি একটা গাছের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তরোয়ালটা ঘোরাতে লাগলাম।

তখন তারা ভয়ে ভয়ে আমার সামনে আর না দাঁড়িয়ে গাছটার উপর উঠে আমার উপর মলত্যাগ করতে লাগল। কিন্তু আমি গাছের গুঁড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকায় আমার গায়ে তা লাগল না।

এমন সময় ক্ষেতের মাঝ দিয়ে একটা ঘোড়াকে ছুটে আসতে দেখে জন্তুগুলো একযোগে সব ভয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

ঘোড়াটা কাছে এলে আমি তার গায়ে হাত বোলাতে যেতে ডান পা তুলে আমার হাতটা নাড়িয়ে দিল। ঘোড়াটা চিঁ হিঁ হিঁ করে ডাকতে আর একটা ঘোড়া এসে হাজির হলো সেখানে।

এরপর ঘোড়াদুটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মনে হলো কি আলোচনা করছে।

মাঝে মাঝে আমার পানে একবার করে তাকাতে লাগল। আমার পোশাক-গুলো, মাথার টুপিটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

পরে একটা ঘোড়া চলে গেল আর ধূসর রঙের ঘোড়াটি মাথা নেড়ে 'হুইন' 'হুইন' শব্দ করে আমাকে ইশারায় তার সঙ্গে যেতে বলল। আমি তার পিছু পিছু যেতে লাগলাম। যেতে যেতে একসময় তাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝালাম আমি ক্লান্ত, তার মত দ্রুত হাঁটতে পারছি না। তখন সে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে চলার সুযোগ দিতে লাগল আমায়।

২

ঘোড়াটার পিছু পিছু প্রায় তিন মাইল চলার পর কাঠ দিয়ে তৈরি একটা লম্বা চালাঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরের গা গুলো বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা।

আমি ভাবলাম এই ঘোড়'গুলো কোন বুদ্ধিমান মালিকের। সেই মালিক নিশ্চয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের মানুষের মত আচরণ করতে শিখিয়েছে। অথবা কোন যাদুকর ঘোড়ার রূপ ধরে আছে।

আমি যখন এইসব ভাবছিলাম তখন সেই ধূসর রঙের ঘোড়াটি আমাকে ইশারায় ডাকতে আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম ভিতরে একটি মাদী ঘোড়া ও তিনটে বাচ্চা ঘোড়া বসে আছে। একদিকের মাটির দেওয়ালের তাকে খড় ও ঘাস রাখা ছিল।

সেই ঘরটার সামনে আরো তিনখানা ঐ ধরনের চালাঘর ছিল। আর একটি ঘরে গিয়ে দেখলাম একটি খড়ের মাদুরের উপর একটি মাদী ঘোড়া আর দুটি বাচ্চা ঘোড়া বসে আছে।

বুঝলাম আমাকে যে ঘোড়াটা এখানে পথ দেখিয়ে ডেকে এনেছে সে এ বাড়ির মালিক। বাচ্চা বা টাট্টু ঘোড়াগুলো তার হুকুম মত চলছে। মনিব ঘোড়া টাট্টু ঘোড়াদের সামনে 'ইয়াদ' এই শব্দটা উচ্চারণ করে আমাকে বাড়ির উঠোনে নিয়ে গেল। দেখলাম উঠোনের একপাশে সেই অদ্ভুত জন্তুগুলোর কয়েকটা গলায় শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা আছে। তারা মরা কোন জন্তুর মাংস খাচ্ছে।

সেই জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেখে একটাকে আমার পাশে নিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগল ঘোড়াটা। পরে বুঝলাম সেই জন্তুটা অনেকটা দেখতে মানুষের মত শুধু চুল আর নখগুলো ছাড়া। আর ওদের পায়ের নখগুলো লম্বা আর বাঁকানো।

এবার একটি ঘোড়া খাবার জন্য আমাকে একটি কন্দমূল দিল। কিন্তু আমি সেটা না নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলাম। তখন ইয়াহুদের কাছ থেকে খানিকটা কাঁচা মাংস নিয়ে আমাকে দিল। আমি তাও খেলাম না। আমি ভাবলাম এ দেশে কোন মানুষ দেখতে না পেলে আমাকে উপোস করে মরতে হবে।

এই সময় একটা গরু দেখতে পেয়ে ইশারা করে মনিব ঘোড়াকে বললাম, এর দুধ আমরা খাই।

তখন আমাকে অনেকটা গরুর দুধ এনে দেওয়া হলে তা খেয়ে আমি সুস্থ হলাম। এরপর থেকে আমি ওট খেতে চাইলে অনেক ওট এনে দেওয়া হলো। আমি সেই ওটগুলোকে আগুনে সেকে খোলা ছাড়িয়ে গুঁড়ো করে দুধ দিয়ে খেতাম রোজ।

আমি দুপুরবেলায় ঘোড়াদের খাওয়া দেখলাম। দেখলাম তারা গোল হয়ে ঘরের মধ্যে বসে দুধে গোলা ওট আর খড় ঘাস খাচ্ছে।

সেদিন রাতে ইয়াহুদের আস্তাবলের কাছে আলাদা একটি ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করল মনিব ঘোড়া। খড়ের উপর আমি শুয়ে পড়লাম। ঘোড়াগুলো সব ঘুমিয়ে পড়লে আমি পোশাক খুলে ফেললাম। আমার পোশাকের প্রতি ওদের অসংযত কৌতূহল দেখে আমি দিনের বেলায় ওদের সামনে কখনো পোশাক খুলতাম না। ওরা ভাবত আমার পোশাক আমার দেহেরই অঙ্গ।

৩

আমি এবার ওদের ভাষা শেখায় মন দিলাম। ওরা আমাকে ওদের ভাষা শেখাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। আমার মালিক ঘোড়া রোজ দুঘণ্টা করে আমাকে ওদের ভাষা শেখাতে লাগল। ওদের ভাষার কোন রূপ বা বই নেই। সব মুখে মুখে।

আমি জানলাম ওদের জাতির নাম হুঁইনহুম। হুঁইনহুম শব্দের অর্থ হলো ঘোড়া। ওরা মানুষকে বলে ইয়াহু। আমাকেও তাই বলত। আমি তিন মাসের মধ্যেই ওদের ভাষা শিখে নিলাম।

আমি দেখলাম ওদের ভাষা হাই ডাচ ও জার্মানি ভাষার সমগোত্রীয়। তা হলেও হুঁইনহুমদের ভাষা আরও সুন্দর। আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল এই প্রসঙ্গে। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস একবার বলেছিলেন যদি

কখনো তাঁর ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনবোধ করেন তাহলে সে কথা হবে হাই ডাচ ভাষায়।

ভাষা শেখায় আমার বুদ্ধি ও ওদের শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন করার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেল আমার মনিব ঘোড়া। ক্রমে সে আমার জীবন কাহিনী অর্থাৎ আমার দেশ, কি করে আমি এখানে এসেছি, কি করেছি সেই সব জানতে উৎসুক হয়ে উঠল।

আমি বললাম, সমুদ্রের ওপারে ইউরোপ নামে এক মহাদেশ আছে। সেই মহাদেশের মধ্যে ইংলণ্ড নামে এক দেশ আছে। আমি সেই দেশের মানুষ। গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি এক জলযানে করে আমি এসেছি। আমার সঙ্গীরা আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

তাদের আমি বললাম, আমাদের দেশেও হুঁইনহুম আছে। তারা সবাই শক্তিশালী ও শান্ত জীব। আমরা তাদের ভালবেসে ছোট থেকে পোষ মানাই। আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাদের পিঠে চাপে বা তাদের দিয়ে গাড়ি টানায়।

একথা শুনে আমার মনিব ঘোড়া রেগে গেল। সে বলল, কোন সাহসে তোমরা হুঁইনহুমদের পিঠে চড়। আমাদের থেকে ইয়াহুরা শত দুর্বল হলেও আমরা তাদের পিঠে চড়িনা অথবা পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলিনা।

যাই হোক, শেষে আমার মনিব বলল, ইউরোপ নামে যে ভূখণ্ড ও ইংলণ্ড নামে যে দেশের কথা বলেছি সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে চায় সে।

ওদের ভাষা শেখার সময় দু বছর ধরে আমার মনিবের সঙ্গে আমার নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। আমাদের দেশ সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমি ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের জাতির যুদ্ধের কথা বললাম। কত ইয়াহু বা মানুষ মারা গেছে, কত জাহাজ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাও বললাম।

তা শুনে আমার মনিব প্রশ্ন করল, কি কারণে দু দেশের মধ্যে ওই ধরনের যুদ্ধ হয়?

আমি বললাম, নানা কারণে যুদ্ধ বাধে দু দেশের মধ্যে। তবে সবচেয়ে বড় কারণ হলো রাজাদের রাজ্যলিপ্সা। রাজারা একটা রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। তারা অনেক রাজ্য জয় করতে চায়, আরো অনেক সংখ্যক মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে চায়।

যুদ্ধে এত লোকক্ষয়ের কথা শুনে মনিব বলল, তোমাদের বুদ্ধি আছে ঠিক,

কিন্তু তোমরা কামড়াতে পার না। তাছাড়া আমাদের ইয়াহুদের মত অত শক্তিও তোমাদের নেই। তবে কি করে এত লোক মারতে পার ?

আমি তখন আমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশাস্ত্রের কথা সব বুঝিয়ে বললাম।

সব শুনে মনিব বলল, তোমাদের বুদ্ধিই সব বিপত্তির মূলে। নদীর জলে প্রতিফলিত দেহটা যেমন বড় ও বিকৃত দেখায় তেমনি বুদ্ধির আলোতে তোমরা নিজেদের বড় ও বিকৃত দেখ।

আমি যখন আইনের কথা বললাম এবং বললাম আইনের ভয়ে একবার একদল বিদ্রোহী নাবিক দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন আমার মনিব 'আইন' কথাটা বুঝতে পারল না। বলল, যে আইন মানুষকে রক্ষা করার জন্য সে আইনের ভয়ে মানুষ দেশ ছাড়বে কেন ?

আমি বললাম. ইউরোপের প্রায় সব দেশেই ধনী গরীবের ব্যবধান আছে এবং ধনীরা গরীবদের শ্রমের ফসল ভোগ করে। প্রতি হাজার গরীবের অনুপাতে একজন করে ধনী আছে। গরীব লোকেরা প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে অল্প মাইনে পায় এবং তাতেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে।

আমার প্রভু বলল, মাটি থেকে যা কিছু ফসল উৎপন্ন হয় তাতে সব জীবেরই অধিকার আছে। তাই ধনী গরীবের ব্যবধান থাকা উচিত নয়।

এরপর আমি যে আমদানী রপ্তানি ব্যবস্থার কথা বললাম তাও বুঝতে পারল না আমার প্রভু। আমাকে তাই বলল, যে দেশে তার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় সব জিনিষ উৎপন্ন হয় না সে দেশের অবস্থা নিশ্চয় খারাপ।

আমি তখন বললাম, আমাদের দেশ ইংলণ্ডের অধিবাসীরা যত খেতে পারে তার তিনগুণ ফসল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ধনীদের বিলাসিতা ও নারীদের অহঙ্কারের খোরাক জোটাতে অনেক জিনিষ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

আমি যে সব রোগ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বললাম তাও বুঝতে পারল না আমার মনিব।

অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানব জাতির সম্মান বাড়ানোর চেষ্টা করলেও আমি বুঝতে পারলাম মানুষের সমাজের মত দুর্নীতি পশুদের সমাজে নেই। মানুষের তুলনায় পশুদের চরিত্রগুণ অনেক বেশী। আরো দেখলাম মনিব পশু হলেও তার বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ।

৪

একদিন আমি দেখলাম হুঁইনহুমদের দেশের মাঠে একটা জায়গায় মাটির নিচে অনেক রং বেরঙের পাথর আছে। ইয়াহুরা অবসর সময়ে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেই পাথরগুলো সরিয়ে অন্য এক জায়গায় গর্ত খুঁড়ে সেগুলো লুকিয়ে রাখে। সেই পাথরের অধিকার নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে মারামারিও করে। এইসব পাথরের উপর সব সময় নজর থাকে তাদের।

আমার মনিব এ বিষয়ে বলল, ওদের এই ধরণের কাজের মূলে আছে লোভ আর লালসা। মানবজাতির চরিত্রে এটা হলো সাংঘাতিক দোষ আর এই দোষের জন্যই যত সব যুদ্ধ বিগ্রহের উৎপত্তি।

আমার মনিব বলল, ইয়াহুদের আর একটা দোষ হলো চুরির প্রবৃত্তি আর হিংস্রতা। তারা সহজভাবে যা খেতে পায় তা খায়। তা ছাড়াও তারা চুরি করা জিনিস খেতে বেশী ভালবাসে। তারা অনেক সময় একে অন্যের সঙ্গে হিংস্রভাবে মারামারিও করে।

আর একদিন আমি দেখলাম ওদেশে এক ধরনের গাছের শেকড় পাওয়া যায়। সেই শেকড়গুলো রসে ভর্তি। ইয়াহুরা মাঝে মাঝে সেই সব রসাল শেকড়গুলো খেয়ে নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে। তারা তখন কখনো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, কখনো মারামারি করে. কখনো অকারণে হাসে, বকে।

আমার মনিব বলল, ইয়াহুঁ বা মানুষদের রোগের কারণ হলো লোভ আর লালসা। সে তুলনায় হুঁইনহুমদের কোন রোগ নেই। ওরা বৃদ্ধ হলে মরার আগে শুধু কিছুটা দুর্বল আর ভারী হয়ে ওঠে। এছাড়া অন্যান্য পশুদের মত ওদেরও রোগ নেই।

মনিব আরও বলল, মানুষদের সভ্যতা ও সংগঠনশক্তির যতই বড়াই করো না কেন, মানুষের বোধশক্তি কুকুরের থেকে বেশী নয়। কুকুরেরাও তাদের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী কুকুরদের কাছে কাছে থাকে, তার প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব মেনে চলে।

একদিন আমি একটা টাট্টু প্রহরীকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলাম। আমি জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা ইয়াহু ছুটে এসে জোর করে জড়িয়ে ধরল আমাকে। ইয়াহুটার দোষ নেই। সে আমাকেও তাদের জাত ভেবে জড়িয়ে ধরে রসিকতা করতে এসেছিল।

আমার চিৎকার শুনে টাট্টু প্রহরীটা ছুটে আসতেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল ইয়াহুটা।

হুঁইনহুমদের দেশে আমার থাকা তিন বছর হয়ে গেল। আমি দেখলাম হুঁইনহুমদের বিচারবুদ্ধি আমাদের মত সংকীর্ণ নয়। ওরা সব সময় নীতি ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। আবেগের বশে কোন কাজ করে না। পাপ পুণ্যের কোন সমস্যাই নেই ওদের কাছে। মতবিরোধ, তর্কবিতর্ক, দর কষাকষি এসব ব্যাপার একরকম অজানা ওদের কাছে।

একদিন আমি আমার মনিবের কাছে দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিল সে। যার নিজের বিচারবুদ্ধি আছে এমন কোন প্রাণী কেন অপরের অনুমানভিত্তিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করবে? এইভাবে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা মোটেই উচিত নয়।

পিতামাতারাই সন্তানদের শিক্ষা দেয়। আঠার বছর পর্যন্ত সন্তানরা পিতামাতার কথামত কাজ করে। সব কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে। তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়। কোন ঝগড়া, বিবাদ, ঈর্ষা কোন কিছুই দেখা যায় না। হুঁইনহুমরা ছেলেমেয়েদের খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বা পাথুরে জমির উপর দিয়ে দৌড় করিয়ে তাদের দ্রুতগতিসম্পন্ন ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলার চেষ্টা করে।

প্রতি চার বছর অন্তর সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় সারা দেশের প্রতিনিধি-দের এক সভা আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে এক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পাঁচ ছ'দিন ধরে দেশের নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে। প্রতিটি জেলা ও অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া হয়।

যদি কোন অভাব দেখা যায় কোনখানে তাহলে সেখানে সকলেই সমান পরিমাণ দান দিয়ে সে অভাব মিটিয়ে দেয়।

৫

আমি হুঁইনহুমদের দেশ থেকে চলে আসার তিন মাস আগে ওদেশের এক সাধারণ সভায় ইয়াহুদের ওদেশে রাখা হবে না নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে তা নিয়ে প্রবল তর্কবিতর্ক হয়।

একজন সদস্য ইয়াহুদের উচ্ছেদের সপক্ষে যুক্তি দেখায়। বলে তারা নোংরা, দেখতে বিকৃত। তারা তাদের গরুর বাঁট থেকে দুধ চুরি করে খায়। তাদের এদেশে রাখা ঠিক হবে না।

কিন্তু আমার মনিব আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ইয়াহুদের প্রশংসা করতে থাকে। ইয়াহুদের রাখার পক্ষে যুক্তি দেখায়। তার যুক্তিই টিকে যায় শেষ পর্যন্ত।

আমি হু ইনহুমদের কাজ করার পদ্ধতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। তারা তাদের সামনের পায়ের ক্ষুরের মাঝখানে যে ফাঁক আছে তার জোরে ক্ষুরটাকে আমাদের হাতের আঙুলের মত ব্যবহার করে। একটা বুড়ীকে আমি ছুঁচে সুতো পরাতে পর্যন্ত দেখেছিলাম। গরুর দুধ দোয়া, ফসল কাটা প্রভৃতি আমরা হাত দিয়ে যে সব কাজ করে থাকি সেই সব কাজ তারা জোড়া ক্ষুর দিয়ে করে। লোহার পরিবর্তে পাথরের উপর পাথর ঘষে এক রকমের ধারাল অস্ত্র তৈরি করে ওরা। এই অস্ত্র দিয়ে তারা মাঠে ফসল কাটে, খড় কাটে।

একদিন আমার মনিব আমায় বলল, গত সাধারণ সভায় তোমাকে নিয়ে বিরূপ আলোচনা হয়। তোমার উপরে সকলেই চটে গেছে। তারা বলছে কেন একজন ইয়াহুকে সাধারণ পশুর মত না রেখে একজন হু ইনহুমের মত রেখেছি খাতির করে।

আমি তখন মনিবকে বললাম, আমার জন্য আপনি কেন কথা শুনবেন? হয় আমাকে আপনি ইয়াহুদের মত খাটান অথবা আমাকে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিন।

শেষে ঠিক হলো, আমি আমার মনিবের ভৃত্যদের সাহায্যে গাছ কেটে একটা জলযান তৈরি করে নিয়ে তাতে চেপে আমাদের দেশে ফিরে যাব।

জলযান বানানোর পর একদিন আমি সমুদ্রের বেলাভূমির কাছে গিয়ে দূরবীণ দিয়ে তাকিয়ে একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম।

আমি বিদায় নেবার সময় আমার মনিবের সামনে শুয়ে পড়ে তার পা চুম্বন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার প্রভু তার ডান পা-টা তুলে ধরল সেজন্যভরে।

৬

১৭১৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সকাল নটায় অনুকূল বাতাস পেয়ে নৌকো ছেড়ে দিয়ে দাঁড় বাইতে লাগলাম। পশ্চিম দিকে বাতাস বইছিল। আঠারো দ্বীপ যাওয়ার পর একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে নৌকো ভেড়ালাম। নেমে চারদিকে তাকালে কোন মানুষ নজরে পড়ল না। তীরের কাছে কিছু মাছ ধরে কাঁচাই খেলাম। এইভাবে দু তিন দিন কাটিয়ে দিলাম।

একদিন সকালে হঠাৎ দেখতে পেলাম দূরে পঁচিশ তিরিশ জন আদিবাসী

এক অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে পুরুষ নারী শিশু সবই ছিল।

আমাকে দেখতে পেয়েই পাঁচজন পুরুষ তেড়ে এল। আমি ছুটে গিয়ে নৌকোয় উঠে নৌকো ছেড়ে দিলাম। একটা তীর এসে আমার বাঁ পায়ে হাঁটুর নিচে বিঁধল। আমি জোরে নৌকো চালিয়ে ওদের নাগালের বাইরে চলে গিয়ে আমার ক্ষতস্থানটা টিপে খানিকটা রক্ত বার করে দিয়ে বেঁধে দিলাম। আমার ভয় হচ্ছিল তীরটা বিষ মাখানো। যাই হোক, তাতে কিছু হয়নি। শুধু সেই ক্ষতটা আজও আমার আছে।

কি করব, কোথায় যাব তা আমি ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম উত্তর পূর্ব দিকে একটা পালতোলা জাহাজ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কিন্তু সভ্য মানুষদের প্রতি হঠাৎ আমার ঘৃণাটা এমন প্রবল হয়ে উঠল যে আমি জাহাজের দিকে না গিয়ে যে দ্বীপের তীর থেকে সকালে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেই তীরের কাছে একটা খালের পাশে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম।

এদিকে সেই জাহাজটা পানীয় জলের জন্য তীর থেকে কিছু দূরে থামল। তারপর একটা নৌকো নামিয়ে দিল। কয়েকজন সশস্ত্র নাবিক নৌকোয় করে তীরে এল জল নেবার জন্য। আমার নৌকোটা দেখতে পেয়ে তারা চারদিকে আমার খোঁজ করতে লাগল।

আমাকে দেখতে পেয়ে আমার নোংরা অদ্ভুত পোশাকের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার পরনে তখন ছিল চামড়ার কোট, কাঠের সোলওয়ালা জুতো, লোমের মোজা। তবু ওরা বুঝতে পারল আমি একজন ইউরোপীয়। ওরা ছিল পর্তুগীজ নাবিক। আমাকে পর্তুগীজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, আমি কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব ইত্যাদি।

আমিও পর্তুগীজ ভাষায় উত্তর দিলাম, আমার বাড়ি ইংলণ্ডে। পাঁচ বছর হুঁইনহুমদের দেশে ছিলাম। এখন আমি কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চাই। তোমরা আমায় একা থাকতে দাও।

কিন্তু তারা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। তারা আমার সমগ্র জীবনকাহিনী শুনতে খুবই উৎসুক ছিল। তারা তাই জল সংগ্রহ করে তাদের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে গেল আমায়।

ক্যাপ্টেন সদাশয় লোক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভাল মাংস ও মদ

দিয়ে কেবিনের ভাল বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু পাঁচ বছর ঘোড়াদের সঙ্গে থাকার পর মানুষের গায়ের গন্ধ সহ্য করতে পারছিলাম না আমি।

জাহাজের সবাই যখন খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল আমি তখন চুপিসারে জাহাজের কিনারায় গিয়ে সেখান থেকে জলে ঝাঁপ দেবার উপক্রম করতেই একজন নাবিক আমায় ধরে ফেলল।

ক্যাপ্টেন বললেন, তিনি আমাকে লিসবনে পাঠিয়ে দিয়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি যথাসম্ভব আমার উপকার করবেন।

এরপর তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি মরিয়া হয়ে পালাতে যাচ্ছিলে?

আমি তখন সমুদ্রযাত্রার প্রথম থেকে যা যা ঘটেছিল সব বললাম।

যাই হোক, আমরা নিবিঘ্নে ১৭১৫ সালের ৫ই নভেম্বর লিসবনে পৌঁছলাম। ক্যাপ্টেন ডন পেড্রো আমাকে তাঁর পোশাক পরিয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখলেন।

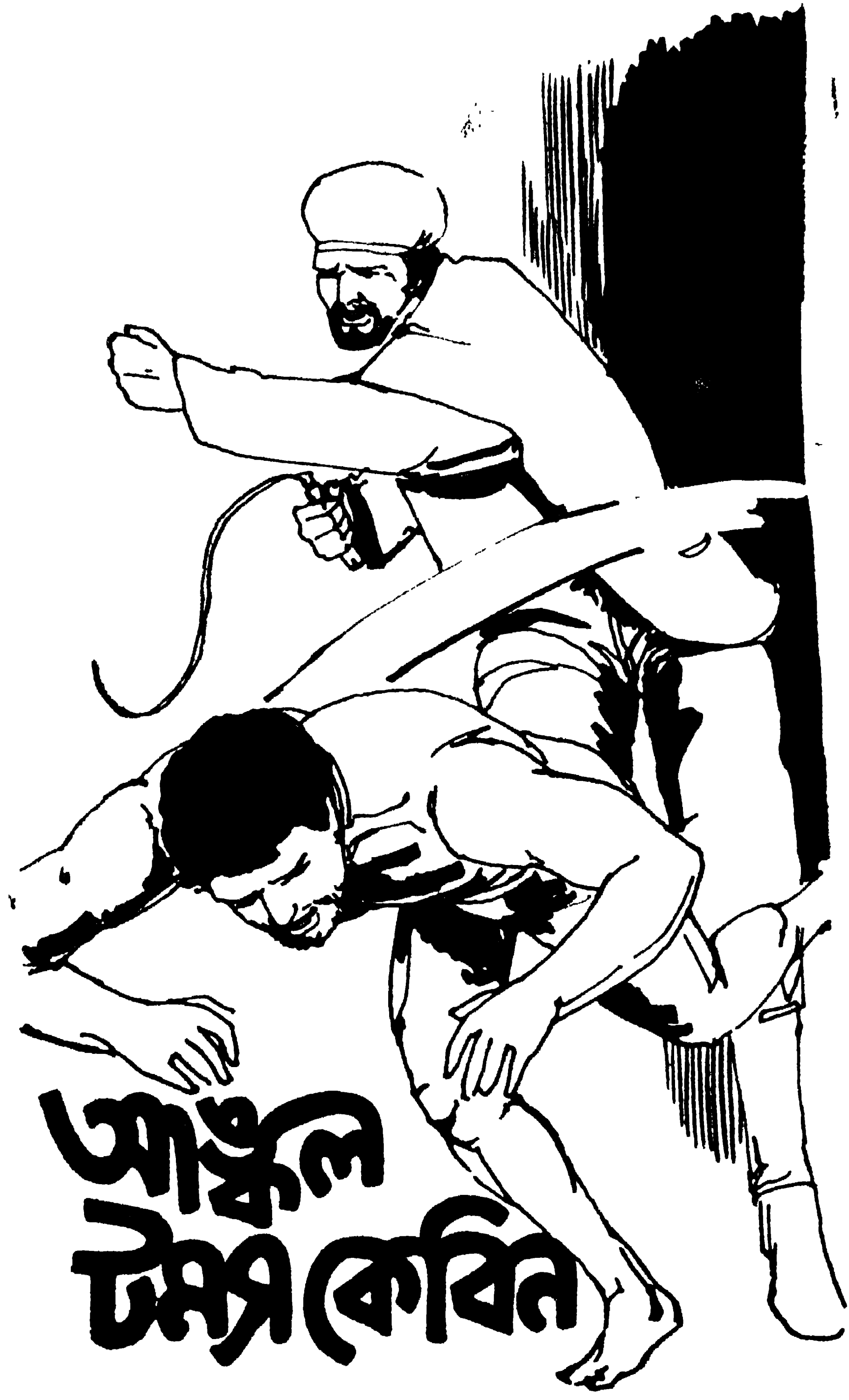
তারপর ২শে নভেম্বর একটি বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজে আমাকে তুলে দিলেন। আমাকে ২০ পাউণ্ড ধার দিলেন।

১৭১৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সকাল নটায় আমি বাড়ি পৌঁছলাম। আমার আত্মীয় স্বজনেরা ভেবেছিল আমি বেঁচে নেই। আমাকে পেয়ে তাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল তারা। কিন্তু এবার আমার মনে বাড়ি ফেরার সেই আনন্দ আর ছিল না। তখনো পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির প্রতি আমার বিদ্বেষ কাটেনি।

তাই আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের আজও আমি সহ্য করতে পারি না। আমি হুঁইনহুমদের দেশ থেকে ফেরার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। এখন আমি আমার স্ত্রীকে আমার খাওয়ার টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে খেতে অনুমতি দিই। আগে এক ঘরে বসে খেতেই পারতাম না। দুটি ঘোড়া কিনে আমি আস্তাবলে রেখেছি। আমি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি। তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমি তাদের ভালবাসি। আর সব মানুষদের মত ঘোড়াদের আমি খাটাই না। হুঁইনহুমদের কাছে শেখা গুণাবলী আমি মেনে চলার চেষ্টা করি।

তবে আমার বিশ্বাস আমার মনুষ্যবিদ্বেষ আর থাকবে না। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাটা আর কঠিন হবে না আমার পক্ষে।

আঙ্কল টমস কেবিন
হ্যারিয়েট বীচার স্টো


আঙ্কল
টম্‌স কেবিন

১

কেণ্টাকি প্রদেশের অন্তর্গত কোন এক শহরে ফেব্রুয়ারির এক শীতের বিকেলে মিষ্টার শেলবি মিষ্টার হ্যালি নামে এক অতিথির সঙ্গে তাঁর বৈঠকখানাঘরে বসে কথা বলছিলেন। ব্যবসার জন্য বেশ কিছু টাকা ধার করেছিলেন শেলবি হ্যালির কাছে। সেই টাকা তিনি শোধ করতে না পারায় সেই টাকার দায়ে শেলবির টম নামে এক নিগ্রো ক্রীতদাসকে চাইছিল হ্যালি।

শেলবি বললেন, আসল কথা, টমের মত কর্মঠ, সৎ এবং বিশ্বাসী চাকর পাওয়াই যায় না। ঋণের দায়ে বাধ্য হয়ে ওকে বিক্রি করছি আমি তোমার কাছে। তা না হলে আমি কখনই ওকে ছাড়তাম না। ও আমার খামারের কাজকর্ম সব ঠিক সময়ে করে রাখে। ও মনেপ্রাণে খৃষ্টান। একবার ও এক জায়গায় আমার একটা জমি বিক্রি করে পাঁচশো ডলার আমার হাতে তুলে দেয়।

হ্যালি মদের পাত্রটা তুলে নিয়ে বলল, নিগ্রোরা সৎ একথা কেউ বিশ্বাস করতেই চায় না।

শেলবি বললেন, আজ আমার উপায় নেই, তাই ওকে বিক্রি করছি তোমার কাছে। আমার কথা হলো টমকে নিয়েই আমার সব ঋণ তোমার মকুব করে দেওয়া উচিত।

হ্যালি বলল, এবার আমার ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। আপনার কাছে কি আর কোন নিগ্রো ছেলে বা মেয়ে নেই যাকে আপনি টমের সঙ্গে দিতে পারেন?

এমন সময় পাঁচ বছরের একটি কালো রঙের গোলগাল ছেলে ঘরে ঢুকল। তার মাথায় ছিল এক রাশ কালো কোঁচকানো চুল আর চোখ দুটো ছিল টানা।

শেলবি শিষ দিয়ে ছেলেটাকে কাছে ডাকলেন, জিম ক্রো যে।

এই সময় ঘরের দরজা ঠেলে পঁচিশ বছরের এক নিগ্রো মহিলা ঘরে ঢুকল। তার মুখ আর দেহের গঠন চমৎকার। গায়ের রংটা বাদামী, ঠিক নিগ্রোদের মত নয়। তার মাথাতেও ছিল একরাশ রেশমের মত কোঁকড়ানো চুল আর চোখদুটো টানা টানা।

মহিলাটিকে দেখলেই বোঝা যায় সে জিমের মা। দাস ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ হ্যালি বুঝল দাস দাসী কেনাবেচার হাটে এই রূপসী মেয়েটির দাম কত হতে পারে।

শেলবি মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর এলিজা ?

এলিজা বলল, আমি জিমকে খুঁজছিলাম স্যার।

শেলবি বললেন, ওকে তুমি নিয়ে যাও।

এলিজা জিমকে বুকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হ্যালি বলল, আপনার ঘরে ত বেশ একটা মূল্যবান বস্তু রয়েছে। অর্লিয়ান্সের হাটে একে বেচতে পারলে মোটা দাম পাবেন। আপনার কপাল ফিরে যাবে। আমি অনেক মেয়ে বিক্রি করেছি। কিন্তু এমন রূপসী মেয়ে দেখিনি আগে।

শেলবি বললেন, ওকে বেচে আমি কপাল ফেরাতে চাই না।

হ্যালি বলল, তাহলে আমিই ওকে কিনতে পারি। কত দাম নেবেন বলুন।

ওর সমান ওজনের সোনা দিলেও ওকে আমি বিক্রি করব না। একথা তুমি মুখ দিয়ে আর উচ্চারণ করবে না।

ঠিক আছে। তাহলে ছেলেটাকে আমায় টমের সঙ্গে দিন।

শেলবি বললেন, এই ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে তুমি কি করবে ?

হ্যালি বলল, আমার এক বন্ধু আছে। সে সুন্দর সুন্দর বাচ্চাদের কিনে খাইয়ে দাইয়ে বড় করে বিক্রি করে। তারা হোটেলে কাজ করে। আপনার এই বাচ্চাটা যেমন সুন্দর তেমনি চটপটে। ওর মাকে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া যায় না ? সেই অবকাশে ছেলেটাকে বিক্রি করে দিতে পারবেন। তারপর একটা নতুন পোশাক আর একজোড়া মাকড়ি কিনে দিলে সব ভুলে যাবে। আমি কিন্তু মেয়েদের মারধোর পছন্দ করি না।

শেলবি বললেন, শুনে খুশি হলাম আমি।

হ্যালি বলল, আমার প্রস্তাবের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত ?

শেলবি বললেন, আমি এখনি কিছু বলতে পারব না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

কিন্তু সময় আমার অল্প তা তো জানেন।

তুমি সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে এস। তখন আমার মতামত পেয়ে যাবে।

হ্যালি চলে গেলে শেলবি ভাবতে লাগলেন, লোকটার কাছে আমার ঘরবাড়ি সব দেনার দায়ে বন্ধক আছে। তা না হলে বাচ্চা জিম কেন, টমকে বেচারও কোন প্রশ্নই আসত না। এজন্য স্ত্রীর কাছেও কথা শুনতে হবে আমায়।

কেন্টাকি শহরের দাস মালিকদের মধ্যে মিষ্টার শেলবি ছিলেন সবচেয়ে

ভদ্র আর স্নেহপ্রবণ। দাস দাসীদের সুখ সুবিধার দিকে সব সময় নজর রেখে চলেন তিনি।

এদিকে এলিজা একবার ঘুরে ঢুকে এবং ঘর থেকে ছেলেকে নিয়ে বাইরে গিয়ে দরজার কাছ থেকে যা শুনেছিল তাতে তার বুঝতে বাকি রইল না যে একজন দাস ব্যবসায়ী তার মালিকের কাছ থেকে তার ছেলে জিমকে কিনতে এসেছিল।

এই কথা ভাবতে ভাবতে তার সব কাজে ভুল হতে লাগল। তার আনমনা ভাব দেখে তার গিন্নীমা বলল, তোর আজ কি হলো বল দেখি?

এলিজা বলল, বৈঠকখানা ঘরে একটা লোক এসেছিল। কর্তাবাবু বোধহয় আমার ছেলে হ্যারিকে বেচে দেবে তার কাছে।

গিন্নী বললেন, তুই কি পাগল হয়েছিস নাকি? ওইটুকু বাচ্চাকে কিনে কে কি করবে?

যাই হোক, তুমি যেন মত দিও না গিন্নীমা।

২

মিসেস শেলবির মনটাও ছিল তাঁর স্বামীর মতই নরম। তিনিও দাস-দাসীদের নিজের ছেলে মেয়ের মত ভালবাসতেন। এলিজাকে তিনি ছোট থেকে মানুষ করে জর্জ হ্যারিস নামে এক নিগ্রো যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেন তার।

নিগ্রো যুবক জর্জ হ্যারিস পাশের এক জমিদারের কাছে নিগ্রো ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করত। জমিদার তাকে একটা পাটকলে কাজ করতে পাঠাতেন।

হ্যারিস শুধু বলিষ্ঠ আর কর্মঠ ছিল না, তার একটা উদ্‌ভাবনী শক্তি ছিল। শণ পরিস্কার করার একটা যন্ত্র আবিস্কার করেছিল সে তার নিজের হাতে। কারখানার লোকেরা তাকে খুব ভালবাসত আর তার ব্যবহারের জন্য তাকে শ্রদ্ধা করত।

হ্যারিসের মনিব কিন্তু ছিল বড় নীচ আর দুষ্ট প্রকৃতির। সে বড় ঈর্ষাকাতর। জর্জ হ্যারিস যে যন্ত্রটি আবিস্কার করে ঈর্ষার বশে তা একবার চেয়ে দেখেননি।

যন্ত্রটা আবিস্কার করার জন্য হ্যারিসকে অভ্যর্থনা জানালেন কারখানার মালিক। তা দেখে ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে লাগল হ্যারিসের জমিদার মনিব।

সে হ্যারিসের দর্পচূর্ণ করার জন্য তার মাইনেপত্র মিটিয়ে কারখানা থেকে আবার খামারে কাজ করার জন্য পাঠাতে চাইল। বলল, আমি আর ওকে ভাড়া খাটাব না। ও আমার ক্রীতদাস।

হ্যারিস ক্ষুন্ন হলো। কিন্তু কোন উপায় নেই।

কারখানার মালিক চুপি চুপি হ্যারিসকে বললেন, তুমি কিছুদিনের জন্য খামারে গিয়ে কাজ করো। পরে আমি আবার তোমাকে কারখানায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব।

কারখানায় যতদিন ছিল ততদিন বেশ সুখেই ছিল জর্জ হ্যারিস। সেখানকার কর্মীরা তাকে ভালবাসত। মালিক ছিলেন উদার। সে ইচ্ছামত তার স্ত্রী এলিজার সঙ্গে দেখা করতে পারত। মিসেস শেলবি দেখেশুনে এলিজার বিয়ে দিয়েছিলেন জর্জ হ্যারিসের সঙ্গে। জর্জ ছিল প্রতিভাবান প্রিয়দর্শন ও কর্মঠ এক যুবক। এ বিয়েতে সুখী হয় তারা দুজনে।

কিন্তু কারখানা থেকে জর্জকে সরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে সুখের অবশান ঘটল। আবার তার সেই অত্যাচারী মনিবের হাতে পড়ল হ্যারিস।

কারখানার মালিক জর্জকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই রাজী করাতে পারলেন না হ্যারিসের মনিবকে। তার মন গলাতে পারলেন না, জমিদার হ্যারিসকে খামারে এনে আগাছা পরিস্কারের কাজ দিল।

হ্যারিসের মনিব স্পষ্ট জানিয়ে দিল, লোকটা আমার, আমি আর ভাড়া খাটাবো না।

সেইদিন জর্জ হ্যারিস বুঝতে পারল এক দুঃখের দিন ঘনিয়ে আসছে তার জীবনে।

৩

সেদিন বিকালে মিসেস শেলবি প্রসাধনের পরে বেড়াতে গেলে বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল এলিজা।

এমন সময় জর্জ হ্যারিস এসে তার কাঁধে হাত রাখল। এলিজা চমকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে দেখল তার স্বামী জর্জ। বলল, ও তমি? আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

বারান্দার সামনে এলিজা তার ঘরে জর্জকে নিয়ে গিয়ে বসাল। তাদের ছেলে জিম তার মাকে ধরে ছিল। এলিজা জর্জকে বলল, দেখ জিম কত বড় হয়েছে এবং দেখতে কেমন সুন্দর হয়েছে।

জর্জ হ্যারিস বলল, ও না জন্মালেই ভাল হত।

এলিজা তার স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে বলল, একথা কেন বলছ জর্জ?

আমি ঠিকই বলছি এলিজা। তোমার সঙ্গে কোনদিন দেখা না হলেই ভাল হত। তোমার মত মেয়েকে সুখী করতে পারলাম না আমি। আমার জীবনে উন্নতির আর কোন আশা নেই। আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই।

এলিজা বলল, একথা বলো না। জানি কারখানা থেকে তোমায় সরিয়ে আনায় তোমার হয়ত কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ধৈর্য ধর।

ধৈর্য আমি অনেক ধরেছি এলিজা। কিন্তু রক্ত মাংসের শরীরে এর চাইতে আর বেশী সহ্য করা যায় না। একটা ঘোড়ার চাইতেও আমি বেশী খাটি, বেশী কাজ করি। তা সত্ত্বেও উনি অকারণে আমায় অপমান ও নির্যাতন করেন। গতকাল ঘোড়ায় টানা একটা গাড়িতে করে পাথর তুলছিলাম। এমন সময় মনিবের ছেলেটা ঘোড়াটার সামনে এসে চাবুক ঘোরাতে লাগল বন বন করে। ঘোড়াটা ভয় পাবে বলে তাকে চাবুক ঘোরাতে নিষেধ করলাম। কিন্তু ছেলেটা তখন আমাকেই চাবুক মারতে শুরু করল। আমি তার হাতদুটো ধরতেই সে আমাকে লাথি মারতে লাগল। তারপর নিজেই তার বাবার কাছে গিয়ে আমি তাকে মেরেছি বলে নালিশ করল। তার বাবা তখন আমাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ছেলের হাতে চাবুক দিয়ে বলল, যতক্ষণ পার শূয়োরটাকে চাবুক মেরে যাও। ছেলেটাও তাই করল। এর প্রতিশোধ আমি নেবই।

এলিজা বলল, আমি কিন্তু মনিবকে অমান্য করার কথা ভাবতেও পারি না জর্জ।

তোমার মনিবের কথা আলাদা এলিজা। ওঁরা তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন। ওঁরা তোমায় নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন। তুমি আমায় কার্লো নামে একটা কুকুর দিয়েছিলে। একদিন আমি রান্নাঘর থেকে মাংসের ছাঁট কুড়িয়ে কুকুরটাকে খাওয়াচ্ছিলাম। তখন তা দেখে মনিব হুকুম দিল কুকুরটার গলায় পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিতে। আমি তা না করায় আমাকে চাবুক মারল আর ছেলেটা কুকুরটাকে জলে ডুবিয়ে মারল।

তার স্বামীর মনের অবস্থা দেখে তার ছেলে বিক্রির কথাটা তাকে বলতে পারল না এলিজা।

জর্জ আবার বলতে লাগল, আমার মনিব চান না আমি এখানে আসি।

উনি শেলবিদের ঘৃণা করেন। উনি চান ওঁর ক্রীতদাসী মিনার সঙ্গে আমার আবার বিয়ে দেন।

সে কি, তোমার বিয়ে ত হয়ে গেছে।

ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। মনিবরা ইচ্ছা করলে তাদের যে কোন বিয়ে বাতিল করে দিয়ে নতুন করে বিয়ে দিতে পারে। এই সব ঝামেলা এড়াবার জন্যই এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল এলিজা, তুমি কোথায় যাচ্ছ জর্জ?

কানাডায়। ইচ্ছা আছে আমি সেখানে গিয়ে তোমায় কিনে নিয়ে যাব। আশা করি তোমার মনিব তাতে অমত করবে না।

কিন্তু পালাতে গিয়ে যদি ধরা পড়?

আমি কিছুতেই ধরা পড়ব না। দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে মরব। কিন্তু ধরা আমি দেব না।

কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করল এলিজা, অন্ততঃ আমাদের মুখ চেয়ে সাবধানে থেকো জর্জ।

তোমার কোন ভয় নেই এলিজা। দু'সপ্তার মধ্যেই আমি চলে যাব এখান থেকে। আমার জন্য প্রার্থনা করো তুমি ঈশ্বরের কাছে।

দুজনেরই চোখে জল এল। চোখের জলে বিদায় নিল দুজনে দুজনের কাছ থেকে।

৪

কেন্টাকি শহরে শেলবি পরিবারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং সবদিক দিয়ে সুযোগ্য ক্রীতদাস ছিল টম। তার স্ত্রী ক্লো রান্না করত শেলবি পরিবারে। চওড়া বুক, পায়ের রঙ কালো। দীর্ঘ দেহ। পাথরে খোদাই করা বলিষ্ঠ চেহারা।

বাড়ির ছেলেরা টমকে 'টমকাকা' বলে ডাকত। শেলবিদের বাড়ির উঠোনের একধারে চাকরদের ঘরগুলোর কাছে একটা কাঠের কুঠরিতে সপরিবারে বাস করত টম। টমের ছিল তিনটি ছেলে। ছোট ছেলেটির বয়স মাত্র এক। সেদিন সন্ধ্যার সময় মিষ্টার শেলবির তের বছরের ছেলে জর্জ টমকে ইংরিজি বর্ণমালা শেখাচ্ছিল।

ঠিক এই সময় শেলবিদের বৈঠকখানায় টম আর জিমকে বেচার দলিলে সই করছিলেন মিস্টার শেলবি। হ্যালি তাঁর সামনে বসে ছিল।

টেবিলের উপর রাখা কাগজপত্রগুলো ভাল করে পড়ে দেখলেন শেলবি। হ্যালি বলল, এবার সই দিয়ে দিন।

বিক্রয় দলিলগুলোতে স্বাক্ষর করার পর সেগুলো হ্যালির হাতে ফিরিয়ে দিলেন শেলবি। হ্যালি হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল। বলল, কাজটা তাহলে মিটল।

শেলবি অন্যমনে কি ভাবছিলেন। একট গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন। তোমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখবে হ্যালি। টমকে কোথাও বিক্রি করার আগে দেখবে লোকটা কেমন।

হ্যালি বলল, নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি নিগ্রোদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করি না। যখন কথা দিয়েছি তখন টমকে যদি বেচতে হয় তাহলে কোন ভাল লোকের কাছে বেচব।

হ্যালি চলে যাওয়ার পর বিষণ্ণ মনে নীরবে চুরুট খেতে লাগলেন শেলবি। হ্যালির অশ্বাসের কথায় কোন স্বস্তি অনুভব করতে পারলেন না।

৫

সেদিন রাতে মিসেস শেলবি তাঁর স্বামীর শোবার ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের বিনুনীটা ঠিক করতে করতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ যে লোকটা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে এক দাস ব্যবসায়ী না ?

মিস্টার শেলবি বললেন, তুমি কিকরে বুঝলে ?

আজ বিকালে এলিজা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলছিল বৈঠকখানায় তুমি এক দাস ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলছিলে। তুমি নাকি ওর ছেলেটাকে তার কাছে বিক্রি করে দিতে চাইছ।

মিস্টার শেলবি চিঠি পড়ার ভান করতে লাগলেন। মিসেস শেলবি বললেন, আমি এলিজাকে বলেছি, ও বিষয়ে ভাবতে হবে না। তুমি সাধারণতঃ চাকর বাকরদের বিক্রি করো না। বিশেষ করে অমন একটা অসভ্য লোকের কাছে ত নয়ই।

মিস্টার শেলবি বললেন, আগে আমি এ কাজ করিনি। কিন্তু এখন আমার ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ এবং এমনভাবে দেনায় জড়িয়ে পড়েছি যে দু একটা চাকর বিক্রি না করে উপায় নেই।

তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। টমের মত বিশ্বাসী চাকরকে তুমি বিক্রি করে দেবে। অথচ তুমি কথা দিয়েছিলে তুমি তাকে

মুক্তি দেবে। তুমি তাহলে এলিজার একমাত্র সন্তান জিমকে বিক্রি করে দেবে।

তুমি যখন জানতে পেরেছ তখন লুকিয়ে লাভ নেই। কিন্তু তুমি আমাকে অপরাধী ভাবছ কেন?

বিক্রি যদি করতে হয় তাহলে বেছে বেছে অন্য দুজনকে বিক্রি করতে পারবে।

কিন্তু অন্য দুজনকে বিক্রি করলে অত দাম পাওয়া যাবে না। লোকটা এলিজার জন্যও অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তোমার কথা ভেবেই রাজী হইনি।

লোকটা আচ্ছা শয়তান ত।

ধন্যবাদ। কিন্তু টমের কথা ভেবে সত্যিই আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমাদের জন্য ও নিজের জীবনকেও বিসর্জন দিতে পারে।

আমি তা জানি এমিলি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার।

কিন্তু আমি কি বলব ওদের কাছে? তাহলে আমি এতদিন ওদের যে শিক্ষা দিয়েছি তা সব ভুল। ভালবাসা আর মানবতার কোন মূল্য নেই টাকার কাছে। টাকার চেয়ে মানুষ বড় একথা তাহলে ভুল বলে প্রমাণিত হবে ওদের কাছে। ওর দুধের বাচ্চাকে যদি এলিজার বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে অন্য চাকর বাকরেরা কি ভাববে? তাদের কাছে কি করে মুখ দেখাব?

মিস্টার শেলবি বললেন, হ্যালি দেনার দায়ে আমার বাড়ি ও সব বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করতে এসেছিল। এই বাড়ি ঘরের সঙ্গে সব চাকর বাকরদেরও হারাতে হত। তাই ওর প্রস্তাবে রাজী না হয়ে পারিনি। হ্যালি শুধু ওদের দুজনকেই কিনতে চায়।

ব্যথাহত কণ্ঠে মিসেস শেলবি বললেন, এমন জানলে কোন ক্রীতদাসই রাখতাম না আমি। অন্ততঃ এলিজার ছেলেটাকেও যদি বাঁচানো যেত।

আর কোন উপায় নেই এমিলি। আমার সই করা দলিল এখন হ্যালির হাতে। এখন হা হুতাশ করে লাভ নেই। কাল সকালে হ্যালি এসে ওদের দুজনকেই নিয়ে যাবে। কাল সকালে আমি কোথাও চলে যাব। তুমিও এলিজাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবে।

না না, এই বর্বরতার মধ্যে আমাকে টেনো না। আমি বরং টমের সঙ্গে

দেখা করে ওকে জানাব আমি ওদের সঙ্গে আছি। আমি ওদের ব্যথা অনুভব করি। এলিজার কথা ভাবতে গিয়ে আমার অন্তরটা কেঁপে উঠছে। আজ আমরা যে অমানুষিক অপরাধ করলাম তার জন্য ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন না।

ওঁরা যখন এই সব কথাবার্তা বলছিলেন তখন ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এলিজা সব কথা শুনছিল। সেদিন রাতে এলিজাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিলেও তার নিজের ঘরে না গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের সব কথা শুনছিল সে।

ওঁদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলিজার নম্রনরম চেহারাটা শক্ত হয়ে উঠল সহসা। এক দৃঢ় সংকল্প ফুটে উঠল তার চাপা ঠোঁটে। বারান্দা থেকে সে সোজা চলে গেল তার ঘরে। তারপর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা ছেলেটার উদ্দেশ্যে নিচু গলায় বলল, ওরা তোকে বেচে দিয়েছে। তবু তোর মা তোকে যেমন করে হোক বাঁচাবেই।

ক্ষিপ্র হাতে কাগজ কলম নিয়ে তার কর্ত্রীকে একটা চিঠি লিখল এলিজা। লিখল, আমাকে আপনি অকৃতজ্ঞ ভাববেন না বা কোনরূপ ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাদের সব কথা শুনেছি। আমার ছেলেকে বাঁচাবার জন্যই এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি। আপনার উদারতা ও ও মহানুভবতার জন্য ঈশ্বর অবশ্যই আশীর্বাদ করবেন আপনাকে।

চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে তাদের পোশাকগুলো বার করে একটা পুঁটলিতে ভরে নিল। তারপর জিমকে জাগিয়ে তার হাতে একটা খেলনা দিয়ে তাকে পোশাক পরিয়ে দিল। শেষে নিজের গায়ে একটা শাল জড়িয়ে ছেলেকে বুকে নিয়ে আর এক হাতে পুঁটলিটা নিয়ে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মা ছেলেকে সাবধান করে দিল কোন শব্দ করবে না। তাহলে ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যাবে।

বাইরে শীতের কনকনে রাত। আকাশের তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল।

ব্রুনো নামে কুকুরটা এলিজার পিছু নিলে এলিজা তাকে চুপ করতে বলল। এলিজা সোজা উঠোন পার হয়ে টমকাকার কুটিরের জানলায় টোকা দিল।

টমের স্ত্রী ক্লো জানালা খুলে এলিজাকে অসময়ে দেখে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। টম তখন প্রার্থনা করছিল।

এলিজা ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকেই বলল, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি টমকাকা। মনিব ওকে ও তোমাকে বেচে দিয়েছে। সকালেই নতুন মনিব তোমাদের নিতে আসবে।

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল টম। মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ল যেন। ক্লো বলল, ওরা ত কোন দোষ করেনি।

এলিজা তখন বলল, দোষের জন্য নয়। মনিব হ্যালি নামে একটা লোকের কাছে অনেক টাকা ধার করেছে। দেনার দায়ে ঘরবাড়ি বিষয় সম্পত্তি সব বন্ধক আছে। তাই বাধ্য হয়ে তুজনকে বেচে দিয়ে ঋণমুক্ত হচ্ছে। গিন্নীমা আমাদের জন্য অনেক বলেছে মালিককে। কিন্তু এছাড়া কোন উপায় ছিল না। না বেচলে ঘরবাড়ি, বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে সব চাকর-বাকরও চলে যেত।

টম একবার ঘুমন্ত ছেলেগুলোর পানে তাকিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তার মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল নিবিড় তুঃখে।

টমের স্ত্রী ক্লো টমকে বলল, তুমিও এলিজার সঙ্গে চলে যাও।

টম বলল, তা হয় না ক্লো। তাহলে মনিব খুব বিপদে পড়বে। সব যাবে। তোমরাও রেহাই পাবে না।

এলিজা বলল, না, আমিই চলে যাই। তোমরা বরং আমার স্বামী জর্জকে খবরটা দিও। সে আজ বিকালে এসেছিল। কিন্তু তখন এসব জানতে পারিনি বলে তাকে কিছু বলিনি। সে দিনকতকের মধ্যে কানাডায় চলে যাবে। তাকে বলবে পারি ত আমিও কানাডায় চলে যাব।

এই বলে টমদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে অজানার পথে বেরিয়ে পড়ল এলিজা।

৬

সেদিন সকালে একটু বেলা করে ঘুম ভাঙ্গল মিস্টার শেলবির। উঠেই শুনলেন, এলিজা তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছে। কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন তিনি।

মিস্টার শেলবি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ব্যাপারটা ও আগে থেকে বুঝতে পেরে পালিয়েছে। কিন্তু একটু পরেই হ্যালি এলে কি বলব তাকে?

কথাটা শুনে শেলবি খুশি না হয়ে পারলেন না। উনি যেন এটাই চাইছিলেন মনে মনে। তাই বললেন, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, উনি যেন তাকে তাকে সাহায্য করেন।

কিছুক্ষণ পর হ্যালি ঘোড়ায় চেপে এসে পড়ল। ঘোড়া থেকে নেমে কথাটা শুনেই রাগে জ্বলে উঠল সে। মিস্টার শেলবিকে সে জিজ্ঞাসা করল, কথাটা কি সত্যি ?

মিস্টার শেলবিও চাকর বাকরেরা আশেপাশে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। ওর ছেলেকে বিক্রি করা হবে এটা সে জানতে পেরে পালিয়েছে। যাই হোক, তাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে সব দিক থেকে আমি সাহায্য করব আপনাকে।

এই বলে স্যাম আর আন্তি নামে দুজন চাকরকে বার করে হ্যালির সঙ্গে যেতে বললেন মিঃ শেলবি। এলিজাকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব পড়ল স্যামের উপর।

মিসেস শেলবি স্যামকে আড়ালে ডেকে সাবধান করে দিলেন, সে যেন খুঁজতে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে বেশী না ছোটায়। স্যাম বুঝল তার গিন্নীমা চান তারা যেন পথে দেরী করে আর সেই অবসরে এলিজা যেন তাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।

স্যাম তাই তার ঘোড়াটা বার করে জিন লাগাবার সময় একটা বীচফল জিনের তলায় ঘোড়াটার পিঠে এমনভাবে রেখে দিল যাতে সে অস্বস্তিবোধ করে।

হ্যালি সেই ঘোড়াটার উপর বসতেই ঘোড়াটা ক্ষেপে গিয়ে তীর বেগে সামনের মাইলখানেক লম্বা মাঠটায় ছুটতে লাগল। স্যাম তাকে ধরার জন্য ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু। কতকগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে ঘোড়াটার পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

মাঠটার ওপারে একটা বন ছিল। ঘোড়াটা ছুটছিল সেই দিকে। অবশেষে বেলা যখন বারোটা তখন স্যাম জেরি নামে একটা ঘোড়ার উপর চড়ে হ্যালির ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন দেখা গেল ঘামে ভিজে উঠেছে তার সারা দেহ। ঘন ঘন গরম শ্বাস পড়ছে।

এমন সময় মিসেস শেলবি বারান্দা থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন হ্যালিকে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে পারল না হ্যালি।

৭

তুষারঢাকা পথে ত্রস্ত পায়ে সারারাত ধরে ক্রমাগত এগিয়ে চলল এলিজা। তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিল জিম। ক্রমে মনিবের, খামার-

বাড়ি, জমির সীমানা, জঙ্গল, মাঠ প্রভৃতি একের পর এক পার হয়ে মাইলের পর মাইল ধরে হেঁটে চলল।

অবশেষে পূব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠলে একটা পাকা রাস্তা ধরল এলিজা। আগে তার গিন্নীমার সঙ্গে একবার ওহিও নদীর ধারে একটা গাঁয়ে এসেছিল সে। নদীর ধারে সেই গাঁটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে। ক্রমে সূর্য উঠল। রাস্তা দিয়ে দু'একটা গাড়ি ও লোকজন যেতে শুরু করল। এলিজা তখন তার ছেলে জিমকে কোল থেকে নামিয়ে নিজে পোশাকটা ঠিক করে নিয়ে জিমের হাত ধরে হাঁটতে লাগল।

তার পুঁটলিতে কয়েকটা আপেল ছিল। একটা আপেল রাস্তায় গড়িয়ে দিল। জিম সেটা ধরার জন্য ছুটতে লাগল। এইভাবে অনায়াসে আরো এক মাইল পথ পার হলো। এর পর পথটা একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। অদূরে একটা পাহাড়ে নদী কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছিল। পুঁটলি থেকে একটা কেক বার করে জিমের হাতে দিল এলিজা। জিম তাকে খেতে বললে সে বলল নদীর ওপারে একটা নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি কিছু খাব না।

দুপুরে একটা চাষীর খামার বাড়িতে কিছুক্ষণ খাওয়ার জন্য আশ্রয় নেবার পর আবার পথ চলতে শুরু করল ওরা।

সূর্য অস্ত যাবার ঘন্টাখানেক আগে ওহিও নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছল। দেখল তুষারের বড় চাঁইয়ে নদীটা এমনভাবে ঢেকে রয়েছে যে তার জলধারা দেখাই যাচ্ছে চোখে। এ অবস্থায় খেয়াপারের নৌকো পাওয়া সম্ভব নয়।

কিভাবে নদীটা পার হবে তার খোঁজখবর নেবার জন্য নদীর ধারে একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠল এলিজা। সরাইখানার মালিক ছিলেন এক ভদ্রমহিলা।

এলিজা তাঁর কাছে গিয়ে বলল, নদীর ওপারে একটা গাঁয়ে আমার বড় ছেলে আছে। তার অসুখ। অবস্থা খারাপ শুনে সারারাত হেঁটে এত পথ এসেছি। কি করে নদী পার হব তাই ভাবছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, আজ রাতে একটা লোক আসবে এখানে। তার নদী পার হবার কথা আছে। সে গেলে তার সঙ্গে তুমি যেও। আপাততঃ তুমি এখানে থেকে বিশ্রাম করো।

এই বলে তিনি একটা কেক দিলেন জিমের হাতে। তারপর পাশের একটা ঘরের দরজা খুলে বললেন, এই ঘরে ছেলেটাকে শুইয়ে দাও। ওকে

ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল জিম। এলিজার মনে কিন্তু স্বস্তি নেই। সে ওহিও নদীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ধরা পড়ার আগে নদীটা কিভাবে পার হয়ে ওপারে যাবে সেইকথাই ভাবতে লাগল।

এদিকে মিস্টার শেলবি হ্যালির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর টমকে ডেকে পাঠালেন। টম কাছে এলে বললেন, আমি তোমাকে এই ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করেছি। আমি একটা খৎ লিখে দিয়েছি উনি যখন তোমাকে চাইবেন তোমাকে হাজির হতে হবে। তা না হলে এক হাজার ডলার আমাকে ক্ষতি-পূরণ দিতে হবে। আজ উনি একটা কাজে যাচ্ছেন। কাল তোমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে হবে।

হ্যালি বলল, অন্য নিগ্রোদের মত তুমিও যদি চালাকি করো তাহলে তোমার মালিককে আমি ছাড়ব না। আমি নিগ্রোদের বিশ্বাস করি না। তারা একটু আলগা পেলেই পালায়।

টম বলল, আমি যখন এ বাড়িতে আসি তখন আমার বয়স ছিল আট আর আপনার বয়স ছিল এক। সেই থেকে আপনার আদেশ কখনো অমান্য করেছি ?

মিস্টার শেলবির চোখে জল এল। ধরা গলায় তিনি কোনরকমে বললেন, না তুমি তা কখনো করনি। ঈশ্বর জানেন কেন তোমায় বিক্রি করছি।

মিসেস শেলবি বললেন, আমরা আবার যত তাড়াতাড়ি পারি তোমায় ফিরিয়ে আনব টম। মিস্টার হ্যালি, ওকে কোথায় কার কাছে বিক্রি করলেন তা দয়া করে জানাবেন আমাদের।

হ্যালি উৎসাহভরে বলল, নিশ্চয়, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ম্যাডাম।

বেলা দুটোর সময় হ্যালি, স্যাম আর আন্ডি তিনটে ঘোড়ায় করে রওনা হলো এলিজার খোঁজে। গাঁয়ের সীমানা পার হয়ে হ্যালি বলল ওহিও নদী যাবার পথটা ধরতে হবে আমাদের।

স্যাম বলল, কিন্তু স্যার, নদীতে যাবার দুটো পথ আছে। একটা কাঁচা নির্জন পথ আর একটা বড় পাকা রাস্তা। আমার মনে হয় এলিজা নির্জন কাঁচা রাস্তা দিয়েই গেছে।

হ্যালি বলল, তোদের কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

স্যাম বলল, তাহলে বড় রাস্তা ধরেই চলুন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত খারাপ কাঁচা পথটা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল হ্যালি। কাঁচা খারাপ পথে ঘোড়াগুলো ছুটতে পারছিল না। জোরে ছোটাতে না পারায় হ্যালির মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল।

অবশেষে হ্যালিরা যখন নদীর ধারে সেই সরইখানাটায় পৌঁছল তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। এলিজা তখন সরাইখানার ঘরের একটা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বাইরে থেকে স্যাম প্রথমে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে ওঠে।

এদিকে স্যামকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলিজা ঘুমন্ত জিমকে তুলে নিয়ে নদীর দিকে সরাইখানার খোলা দরজাটা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল।

হ্যালিরা ততক্ষণে সরাইখানার ভিতরে এসে পড়েছে। সরাইখানার ভিতরে এলিজাকে না পেয়ে বাইরে এসে হ্যালি দেখতে পেল এলিজা তখন ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে পৌঁছে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে জুতো খুলে ফেলে মরিয়া হয়ে নদীতে নেমে পড়ল এলিজা। একটার পর একটা তুষারের চাঁই-এর উপর পা ফেলে এগোতে গিয়ে ওপারে উঠল সে। সাধারণ অবস্থায় কোন মানুষ একাজ করতে পারত না। কিন্তু হ্যালির হাতে ধরা পড়ার ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে। একটা তুষারের চাঁইএর উপর পা দিতেই সেটা সরে যাচ্ছিল। তাই বেশীক্ষণ তার উপর পা না রেখে মুহূর্তমধ্যে অন্য একটা চাঁইএর উপর পা ফেলেছিল।

ওপারে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক এলিজার এই দুঃসাহসিক কাজটা দেখছিল। এলিজা নদীর কিনারে গিয়ে পৌঁছতেই ভদ্রলোক তার হাত ধরে উপরে উঠিয়ে নিয়ে বলল, তুমি যেই হও। খুব সাহসী মেয়ে।

এলিজা ভদ্রলোককে চিনতে পেরে বিস্ময়ে বলে উঠল, মিস্টার সাইমস?

সে ভদ্রলোককে আগে দেখেছে। শেলবির বাড়ির কাছে ওর কিছু জমি জমা ছিল। আগে উনি সেখানে যেতেন মাঝে মাঝে।

সাইমস বললেন, তুমি ত মিস্টার শেলবির বাড়িতে কাজ করতে না?

এলিজা কাতর কণ্ঠে বলল, মিস্টার শেলবি আমার ছেলেকে ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে আমি পালিয়ে এসেছি। ওরা আমাকে ধরতে আসছে। আপনি আমায় বাঁচান। কোন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখুন দয়া করে।

সাইমস বললেন, তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যিই খুশি

হতাম। কিন্তু তোমায় রাখবার মত এমন কোন জায়গা আমার নেই। তুমি বরং ঐ গাঁয়ে সাদা রঙের যে বাড়িটা রয়েছে ঐ বাড়িতে যাও। ওঁকেই বলবে আমি পাঠিয়েছি তোমায়। ওঁরা ভাল লোক। তোমায় সাহায্য করবেন।

এদিকে এলিজার কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল হ্যালি। কোন মানুষ এভাবে ভাসমান বরফের উপর দিয়ে নদী পার হতে পারে তা যে ধরণাই করতে পারেনি। সে তাই বেশ কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নদীর পাড়ে।

স্যাম ও ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। স্যাম বলে গেল, গিন্নীমা আমাদের জন্য ভাববেন। আমরা যাই। আশা করি আমাদের প্রয়োজন হবে না। আপনি পালিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছেন।

এই বলে সে অস্তিকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

৮

মিস্টার সাইমস যে বাড়িতে এলিজাকে যেতে বলেছিলেন সে বাড়িটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটার মিস্টার বার্ডের। দিনকতক অনুপস্থিত থাকার পর তখন সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছেন মিস্টার বার্ড।

মিস্টার বার্ড তাঁর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজটা যখন দেখছিলেন তখন বাড়ির পুরনো চাকর কুজো মিসেস বার্ডকে ডেকে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস বার্ড এসে তাঁর স্বামীকে ডেকে নিয়ে গেলেন রান্নাঘরে।

মিস্টার বার্ড গিয়ে দেখলেন রান্নাঘরের দাওয়ায় একটি যুবতী মেয়ে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে। মেয়েটির পায়ে জুতো নেই, ছেঁড়া খোঁড়া পোষাক, পায়ের গোড়ালি বেয়ে রক্ত ঝরছে। তাঁর স্ত্রী ও বাড়ির মেয়ে ভৃত্য ডিনা মেয়েটির জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছে। কুজো একটি শিশুকে তার কোলের উপর বসিয়ে তার হিম হয়ে যাওয়া পাগুলো ঘষছে।

ডিনা বলল, মেয়েটি কিছুক্ষণ আগে ছেলেকোলে এসে আগুন পোহাতে চায়। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর ধীরে ধীরে চোখ মেলল এলিজা। জ্ঞান ফিরে পেয়েই সে তার ছেলের জিমের খোঁজ করল। জিম তার কোলে ছুটে এলে সে মিসেস বার্ডের দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল, আপনি আমাদের বাঁচান। এই শিশুটিকে কিছুতেই ওদের ছিনিয়ে নিতে দেবেন না।

মিসেস বার্ড তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। এখানে তোমাদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এলিজা কাঁদতে কাঁদতে বলল, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

রান্নাঘরের আগুনের কাছে একটা বিছানা পেতে দেওয়া হলে তাতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল এলিজা।

এর পরে মিস্টার এ মিসেস বার্ড ভিতরে বসার ঘরে ফিরে এলেন। মিসেস বার্ড তাঁর বোনার কাজে মন দিলেন। মিস্টার বার্ড জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটি কে কিছু জানতে পেরেছ ?

মিসেস বার্ড বললেন, ওর ঘুম ভাঙ্গলে জানতে পারব।

ওর বোধ হয় কিছু গরমের পোশাক লাগবে।

যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ডিনা এসে খবর দিল মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গেছে। সে গিন্নীমাকে ডাকছে।

মিস্টার আর মিসেস বার্ড দুজনেই রান্নাঘরে গেলেন। দেখলেন, একটা টুলের উপর এলিজা আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

মিস্টার বার্ড এলিজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে আসছ ? কি চাও ?

এলিজা বলল, আমি আসছি কেণ্টাকি থেকে। কাল রাত্রিতে বেরিয়েছি সেখান থেকে। বরফের চাঁইএর উপর পা ফেলে কোনরকমে নদী পার হয়েছি।

এলিজার নদী পার হওয়ার কথায় সকলেই বিস্ময় স্তম্ভিত হয়ে গেল। এলিজা আবার বলল, ঈশ্বর আমায় সাহায্য করেছেন। আমি আমার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম।

তুমি কি ক্রীতদাসী ? তোমার মনিব কি অত্যাচার করতেন তোমার উপর ?

এলিজা বলল, আমি ছিলাম কেণ্টাকির এক ভদ্রলোকের ক্রীতদাসী। তিনি খুবই ভাল লোক। কিন্তু দেনার দায়ে আমার ছেলেকে এক নিষ্ঠুর দাস ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দিল। আমি তা জানতে পেরে পালিয়ে এসেছি। সেই লোকটা আমায় ধরতে আসছিল বলেই আমি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এইভাবে নদী পার হই।

তোমার স্বামী নেই ?

আমার স্বামী অন্য এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের ক্রীতদাস। তিনি তাকে দক্ষিণ দেশে বিক্রয় করে দেবেন বলেছেন।

এখন কোথায় তুমি যেতে চাও ?

কানাডায়। আমি জানি না জায়গাটা কোথায়।

মিস্টার বার্ড বললেন, জায়গাটা অনেক দূরে। তবে আমি যতদূর পারব সাহায্য করব। আজ রাতের মত এখানেই থাক। কাল সকালে দেখব কি ব্যবস্থা করা যায়।

মিস্টার ও মিসেস বার্ড দুজনে আবার তাঁদের ঘরে এলেন। পায়চারি করতে করতে মিস্টার বার্ড বললেন, আজ রাতের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কাল সকালেই মনে হয় ব্যবসায়ীটা দলবল নিয়ে এখানে এসে হাজির হবে মেয়েটির খোঁজে। মেয়েটিকে হয়ত লুকিয়ে রাখা যেত। কিন্তু বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়েই ভাবনা।

মিসেস বার্ড উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, তাহলে কি করবে ভেবেছ।

মিস্টার বার্ড বললেন, এখান থেকে মাইল সাতেক দূরে পাহাড়ের ওপারে ভ্যান ট্রম্প নামে আমার এক পুরনো মক্কেল আছেন। একদিন তার অনেক ক্রীতদাস ক্রীতদাসী ছিল। তিনি তাদের সবাইকে মুক্তি দিয়ে ওখানে একটা জায়গা কিনে বাস করছেন। তিনি যেমন শক্তিমান তেমনি দয়ালু। মেয়েটিকে একবার তার কাছে নিয়ে যেতে পারলে তিনি ওকে রক্ষা করবেন। আমি মনে করছি আজ রাতেই ওকে নিয়ে যাব।

মিসেস বার্ড বুঝলেন একবার কোন বিষয়ে তাঁর স্বামী মনস্থির করে নিলে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। তাই তিনি বললেন, কুজোকে নিয়ে যাও।

মিস্টার বার্ড বললেন, পথটা খুব খারাপ। তবে আমি ঘোড়ার চড়ে যাওয়া আসা করেছি বলে আমার জানা আছে। আমি নিজে গাড়ি চালাব। তবে কুজো আমার সঙ্গে যাবে। মেয়েটিকে বুঝিয়ে তুমি নিয়ে এস। কিছু গরম কাপড় দিও ওর সঙ্গে।

. মিসেস বার্ড এলিজার গায়ে একটা শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। কুজো শাড়ি বার করল। মিসেস বার্ড ওদের বিদায় দিলেন।

কৃতজ্ঞতার আবেগে চোখে জল এল এলিজার।

পিচ্ছিল পাহাড়ী পথে অতি কষ্টে এগোতে লাগল গাড়িটা। এইভাবে

কয়েক ঘণ্টা চলার পর শেষ রাতের দিকে একটা বিরাট খামার বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়াল গাড়িটা।

লণ্ঠনের আলো হাতে ভ্যান ট্রম্প নিজে দরজা খুলে দিলেন। তাঁর চেহারাটা যেমন দৈত্যের মত বিশাল তেমনি হৃদয়টাও মহৎ।

মিস্টার বার্ড তাঁকে এলিজার সব কথা খুলে বলতে ভ্যান ট্রম্প অভয় দিয়ে বললেন কোন চিন্তা নেই। আমি ওকে রক্ষা করব। আমার সাতটি ছেলে আছে। এখানে আমার অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে পায় না।

একটি ঘরে এলিজার জন্য বিছানা পেতে দেবার আদেশ দিয়ে তাকে বললেন. ভয় করবে না মা। এটা তোমার নিজের বাড়ি মনে করে থাকবে।

ভ্যান ট্রম্প মিস্টার বার্ডকে রাতটা কাটিয়ে যেতে বললেন তাঁর বাড়িতে। কিন্তু বার্ড থাকলেন না। বললেন রাতের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে তাঁকে।

৯

সেদিন তখনো ভাল করে ভোর হয়নি। কিন্তু টমকাকা ও তার স্ত্রী ক্লো দুজনেই উঠে পড়েছিল সকালে। টম বাইবেলটা খুলে বসেছিল। কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারছিল না। সে শুধু বারবার ঘুমন্ত ছেলেগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল আর একটা করে গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল তার বুকের ভেতর থেকে। ক্লো একটা জামা ইস্ত্রী করছিল।

ক্লো প্রথমে কথা বলল। ক্লো বলল, ওরা এমন একটা লোকের হাতে তোমায় বিক্রি করল যে আবার তোমায় কোথায় কার কাছে বিক্রি করবে তার কিছু বুঝতে পারছি না। তাহলেও একটা সান্ত্বনা ছিল। অবশ্য গিন্নীমা বলছেন, অবস্থাটা একটু স্বচ্ছল হলে আবার ওরা তোমায় ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তার আগে ওরা হয়ত তোমায় খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবে।

টম বলল, তুমি ভেবো না ক্লো। এখানে যেমন ঈশ্বর আছেন তেমনি যেখানেই আমায় বিক্রি করুক সেখানেও ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর যা করেন ভালই করেন। এখন আমার উপর দিয়েই গেল। তবু তুমি আর ছেলেমেয়েরা নিরাপদে থাকবে।

ক্লো বলল, মনিব কিন্তু এটা ভাল কাজ করলেন না। তোমার মত সৎ ও বিশ্বস্ত চাকরকে অনেক আগেই মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল।

এমন সময় মিসেস শেলবি এসে ঘরে ঢুকলেন। টমকে দেখা দিতে এসে

চোখে জল এল তাঁর। মিস্টার শেলবি কি একটা কাজে কোথায় বেরিয়ে গেছেন। হয়ত টমের বিদায় দৃশ্যটা দেখার মত সহ্যশক্তি ছিল না তাঁর।

মিসেস শেলবি জলভরা চোখে বললেন, আমি কথা দিচ্ছি টম। আমি তোমার খবরাখবর ঠিক নেব। অবস্থাটা একটু ভাল হলেই ফিরিয়ে আনব তোমায়।

সহসা হ্যালি এসে দরজায় বুটের লাথি মারল। টম দরজা খুলে দিল। টমকে গাড়িতে তোলার আগে তার পায়ে একটা লোহার বেড়ী পরিয়ে দিল হ্যালি।

মিসেস শেলবি বললেন, ওটার কোন প্রয়োজন ছিল না।

হ্যালি বলল, আসল কথা কি জানেন ম্যাডাম? একবার এখান থেকে পাঁচশো ডলার খুইয়েছি। আর কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।

গাড়ি ছেড়ে দিল। টম শেষ বারের মত চারদিকে একবার তাকাল। পরিচিত দৃশ্যাবলী পার হয়ে ছুটে চলল গাড়িটা। মাইলখানেক যাবার পর একটা কামারশালের সামনে গাড়িটা থামাল হ্যালি। সেখানে লোহার একটা হাতকড়া গড়িয়ে টমের হাতে পরিয়ে দিল।

হাতকড়াটা তৈরি হবার সময় টম যখন কামারশালের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসেছিল তখন শেলবির ছেলে জর্জ ঘোড়ায় করে একজায়গা থেকে আসছিল। সে টমকে দেখেই ঘোড়া থেকে নেমে টমের গলাটা জড়িয়ে ধরল।

সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি বড় হলে এই জঘন্য অপরাধ ওদের করতে দিতাম না।

এই বলে সে প্রচণ্ড রাগে ঘুঁষি পাকিয়ে হ্যালিকে তেড়ে যেতে টম তার হাতটা ধরে ফেলল। টম তাকে বলল, শান্ত হও লক্ষ্মীটি। তুমি লোকটাকে এইভাবে রাগিয়ে দিলে আমার তাতে উপকার ত হবেই না, বরং ক্ষতি হতে পারে।

জর্জ বলল, আমি লিঙ্কনদের সঙ্গে বেড়াতে না গেলে এমনটা কখনই ঘটতে দিতাম না। সমস্ত বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে ছাড়তাম।

টম বলল, যাক, ভালই হলো। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমার সঙ্গে আর হয়ত আমার কোনদিন দেখাই হবে না।

জর্জ বলল, ও কথা বলো না টমকাকা। তোমাকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমি বাবাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ব।

এই বলে এক ডলার একটা মুদ্রার ফুটোতে একটা সুতো পরিয়ে টমের গলায় বেঁধে দিয়ে বলল, এইটা দেখলেই তোমার মনে পড়বে আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

টম বলল, তুমি একদিন বড় হবে। ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করি। তোমার বাবা মা একদিন যেন গর্ববোধ করতে পারেন তোমার জন্য।

জর্জ বলল, তুমি দেখো টমকাকা, আমি বড় হবই।

টম বলল, হ্যাঁ, গুরুজনদের যেন কোনদিন অমান্য বা অশ্রদ্ধা করো না।

কিন্তু তাঁরা যদি কোন অন্যায় করেন?

তা হলেও তাঁদের অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়।

এমন সময় হ্যালি কামারশাল থেকে হাতকড়া নিয়ে এল। জর্জ হ্যালিকে বলল, আমি বাবা মাকে সব বলে দেব।

হ্যালি তাচ্ছিল্যভরে বলল, স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

জন্তু জানোয়ারদের মত মানুষ কেনাবেচা করতে তোমার লজ্জা করে না?

তোমার পূর্বপুরুষেরা যখন মানুষ কেনাবেচা করত তখন আমারই বা লজ্জা করবে কেন?

বড় হলে আমি কখনো একাজ করব না। বিদায় টমকাকা।

টম বলল, বিদায় মাস্টার জর্জ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

গাড়িতে উঠে টমের হাতে হাতকড়াটা পরিয়ে দিল হ্যালি। তারপর বলল, তুমি যদি আমার সঙ্গে কোন চালাকি বা খারাপ ব্যবহার না করো তাহলে আমিও কখনো খারাপ ব্যবহার করব না।

১০

সেদিন আবহাওয়াটা ছিল বড় বিশ্রী। হোটেলের ভিতর পানকক্ষে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। ঘরের দেওয়ালে একটা বিজ্ঞাপন অনেকে দেখছিল। এমন সময় মিস্টার উইলসন নামে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বিজ্ঞাপনটা পড়তে লাগলেন।

একজন বলল, পালিয়ে যাওয়া এক নিগ্রোর বিজ্ঞাপন।

মিস্টার উইলসন তাঁর হাতের ব্যাগ আর ছাতাটা একটা চেয়ারের উপর রেখে বিজ্ঞাপনটা মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল :

"জর্জ হ্যারিস নামে আবার একজন মূলাটো ভৃত্য পালিয়ে গেছে। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। ছ ফুট লম্বা, মাথায় হালকা বাদামী রঙের ঘন কোঁকড়ানো

চুল। অসম্ভব বুদ্ধিমান। ইংরাজি লিখতে ও বলতে পারে। যে কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের ছদ্মবেশে পালাতে পারে। তার পিঠে ও কাঁধে গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে এবং ডান হাতে উল্কিতে এই অক্ষর খোদাই করা আছে।

তাকে জীবিত ধরে দিতে পারলে চারশো ডলার পুরস্কার দেব। তাকে হত্যা করা হয়েছে, এ প্রমাণ দিলেও ঐ একই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে।"

উইলসনের পাশে একজন রোগা পশুপালক ধরনের লোক বলল, দেখে মনে হয় পালিয়ে যাওয়া ভৃত্যটি খুবই বুদ্ধিমান আর মনিবটি নিষ্ঠুর ব্যবহার করত তার সঙ্গে। তা না হলে পিঠে ও কাঁধে গভীর ক্ষতচিহ্ন হবে কি করে?

মিস্টার উইলসন বললেন, বিজ্ঞাপনে যার কথা বলা হয়েছে সে যদি জর্জ হ্যারিস হয় তাহলে আমি তাকে চিনি। সে আমার কারখানায় ছ বছর কাজ করেছে। সে শুধু বুদ্ধিমান নয়, প্রতিভাবান। ও একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে আমার কারখানায়। সে যন্ত্র আজকাল অনেক কারখানাতেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু ওর মনিব জোর করে ছেলেটাকে আমার কারখানা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চাষের কাজ করাচ্ছিল।

ঘরের ভিতরে যখন এই কথাবার্তা হচ্ছিল তখন সরাইখানার বাইরে এক্কাগাড়িতে করে এক যুবক একজন নিগ্রো চালককে সঙ্গে করে নামল গাড়ি থেকে।

আগন্তুকের চেহারাটা বেশ লম্বা। গায়ের রং স্পেনদেশীয়দের মত। মাথায় ঘন কালো একরাশ চুল। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। সরাইখানার মালিকের কাছে সে বলল তার নাম হেনরি বাটলার ওকল্যাণ্ডস্ শেলবি কাউন্টি।

আগন্তুক উপরতলায় একটা ঘর ঠিক করে তার নিগ্রো ভৃত্যকে বলল, আমার মালপত্র উপরে নিয়ে যাও। আমায় কতকগুলো দরকারী চিঠি লিখতে হবে।

আগন্তুককে দেখার পর থেকে মিস্টার উইলসনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন তাকে এর আগে কোথায় দেখেছেন।

আগন্তুকও মিস্টার উইলসনের চোখ মুখ ভাল করে লক্ষ্য করে বলল এক সময়, আশা করি, আপনিই মিস্টার উইলসন? আমি প্রথমটায় আপনাকে ঠিক চিনতে পারিনি। আমার নাম হেনরি বাটলার।

আগন্তুককে ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ একসময় উইলসন বলে উঠলেন, জর্জ তুমি?

মুখে একটুখানি ম্লান হাসি ফুটিয়ে আগন্তুক বলল, হ্যাঁ আমি জর্জ। ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আছি আমি। বাদামগাছের ছাল দিয়ে গায়ের রং হলুদ করেছি, কলপ দিয়ে চুলের রং কালো করেছি। ফলে বিজ্ঞাপনে দেওয়া চেহারার বর্ণনার সঙ্গে আমার তেমন কোন মিল নেই।

উইলসন বললেন, তুমি কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ। আমি তোমাকে এ পরামর্শ কখনই দিতাম না।

জর্জের বাবা ছিল এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক আর মা ছিল এক নিগ্রো ক্রীতদাসী। তাদের মিলনের ফলে জর্জের জন্ম হয়। তার মা ছিল রূপসী। মার কাছ থেকেই সে পেয়েছে উজ্জ্বল একজোড়া সুন্দর চোখ আর বাদামী রং। দেহের গঠন ও বুদ্ধি পেয়েছে তার অপাত পরিচয় বাবার কাছ থেকে।

উইলসন বললেন, তোমার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত জর্জ। আমি সব জানি। তবু বলব, নিজের দেশের আইন শৃংখলা ভেঙ্গে এভাবে পালিয়ে যাওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না।

জর্জ হ্যারিস ক্ষোভের সঙ্গে বলল, একমাত্র কবরখানা ছাড়া আইন আর কোথায় আছে স্যার? আমি সব জেনেই বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি।

তাহলেও বলব দেশের আইন ভাঙ্গতে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।

জর্জ বলল, আমার বাবা মারা যাওয়ার পর যখন ওরা আমাদের সব কিছু নিলাম করে নিয়ে আমার চোখের সামনে আমার সব ভাই বোনকে মার কোল থেকে ছিনিয়ে বিক্রি করে দেয়, যখন আমাকেও মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে —তখন দেশের আইন কোথায় ছিল? আইন, ঈশ্বর সব আপনাদের জন্য, আমাদের জন্য নয়। আমি আর আমার বড়দি একই মনিব হ্যারিসের বাড়িতে ছিলাম। কিন্তু আমার বড়দি হ্যারিসের অন্যায় প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় সে তাকে প্রায়ই একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে চাবুক মারত। দিদির কান্না শুনেও আমি কিছুই করতে পারতাম না বাইরে থেকে। তারপর বিয়ে করে সুন্দরী স্ত্রীর ভালবাসা পেয়ে কিছুটা শান্তি পেয়েছিলাম জীবনে। কিন্তু সে শান্তিও রইল না। আমাকে আপনার কারখানা থেকে ছাড়িয়ে এনে হ্যারিস অত্যাচার শুরু করে দিল আমার উপর। ওদিকে দেনার দায়ে আমার স্ত্রীর মনিব আমাদের শিশুপুত্রকে বিক্রি করে দেওয়ায় তাকে নিয়ে অজানার পথে পালিয়ে গেল আমার স্ত্রী।

অবশেষে উইলসন বললেন, ঠিক আছে জর্জ, আমি তোমার পথে আর

কোন বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। তবে আমার অনুরোধ সাবধানে চলবে। আর এই টাকাগুলো তুমি রেখে দাও।

পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে সেগুলো জর্জের হাতে তুলে দিতে গেলেন উইলসন। কিন্তু জর্জ বলল, আপনার কাছে আমি এমনিতেই কৃতজ্ঞ। আপনার টাকা নিতে পারব না। আমার কাছে যা টাকা আছে তাতেই চলে যাবে।

উইলসন বললেন, তুমি না নিলে আমি খুবই দুঃখ পাব। এগুলো দেব বলে ঠিক করেই রেখেছিলাম, সুযোগ পাইনি। এগুলো তোমারই প্রাপ্য।

অবশেষে টাকাটা নিল জর্জ। উইলসন বললেন, তোমার সঙ্গের ছেলেটি কে?

ও কানাডায় পালিয়ে গিয়েছিল। আমিও কানাডায় যেতে চাই। সেখানে সবাই স্বাধীন। ছেলেটির মা এখানে মনিবের খুব অত্যাচার ভোগ করছে জানতে পেরে ও মাকে মুক্ত করে নিতে এসেছে। এখনো ওর মার খোঁজ পায়নি।

উইলসন জর্জকে ভাল করে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, সত্যিই তোমাকে দেখে এখন চেনাই যায় না জর্জ। কিন্তু সরাইখানায় এলে কেন?

জর্জ বলল, আমি দিনের বেলায় পথ চলি, আর রাত্রিতে যে কোন একটা ভাল সরাইখানায় থাকি। কাল সকালেই আমি ওহিও চলে যাব। আর দেখা হবে না কখনো।

জর্জ তার পোশাকের ভিতর দুটো পিস্তল আর একটা ছোরা দেখিয়ে বলল, যদি কোনদিন ধরা পড়ি তাহলে এ জীবন আর রাখব না। ক্রীতদাস জীবন আর যাপন করব না কোনদিন।

এর পর বিদায় নেবার সময় উইলসনের হাতে একটা পিন দিয়ে জর্জ বলল, যদি কোনদিন আমার স্ত্রীর দেখা পান তাহলে এই পিনটা তাকে দিয়ে বলবেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি তাকে ভালবেসে গেছি। এই পিনটা সে আমাকে বড়দিনে উপহার দিয়েছিল। যদি ও পারে তাহলে ও যেন কানাডায় চলে যায়।

উইলসন বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলব। তোমার মত নির্ভীক নির্দোষ ছেলেকে ঈশ্বর নিশ্চয় সাহায্য করবেন। বিশ্বাস করো—ঈশ্বর আছে।

জর্জ বলল, হয়ত আছেন আপনাদের জন্য, আমাদের জন্য নয়।

উইলসন বললেন, ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলেরই। আলো অন্ধকার

জড়ানো মেঘের মধ্যে ন্যায়ের সিংহাসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখো। তিনি অবশ্যই তোমায় সাহায্য করবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। এ জীবনে না হয় পরবর্তী জীবনেও দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

১১

টম আর হ্যালিকে নিয়ে ছুটে চলেছিল গাড়িটা। হ্যালি ভাবছিল টমকে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে কত লাভ করবে। আর টম ভাবছিল তার জরাজীর্ণ বাইবেল থেকে পড়া যীশুর বাণীগুলো কিভাবে কাজে পরিণত করে চলবে। কিভাবে হতাশার গভীর অন্ধকার থেকে তার আত্মাটাকে টেনে তুলতে পারবে।

হঠাৎ কি মনে হতে পকেট থেকে একটা বিজ্ঞাপন বার করে পড়তে লাগল হ্যালি, কেন্টাকির ওয়াশিংটন শহরে কয়েকজন নিগ্রো ক্রীতদাসকে নিলামে বিক্রি করা হবে।

ওদের গাড়িটা ওয়াশিংটন শহরে পৌঁছল সন্ধ্যাবেলায়। টমকে জেলখানায় রেখে হ্যালি রাত কাটাবার জন্য চলে গেল সরাইখানায়।

পরদিন অদালত প্রাঙ্গনে গিয়ে হ্যালি দেখল মোট পাঁচজন নিগ্রো দাস-দাসীকে বিক্রি করা হবে। তাদের মধ্যে একজন ষাট বছরের অথর্ব বুড়ী ছাড়া আর সবাই কমবয়সী ক্রীতদাস। সব চেয়ে হ্যালির পছন্দ হলো আলবার্ট নামে চোদ্দ বছরের একটা ছেলেকে। হ্যানার নামে বুড়ীটা ছিল তার মা।

হ্যালি এ্যালবার্টকে নিলামে কিনে নিলে বুড়ী হ্যানার তার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। বলল, তুমি আমাকেও নাও। আমরা একসঙ্গে থাকব। আমিও কাজ করতে পারি।

কিন্তু হ্যালি তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল। বুড়ীকে কিছু বলল না। পরে অন্য একটা ভাল লোক কম দামে কিনে নিল বুড়ীকে।

এরপর দিনকতক ধরে আরো কয়েকজন ক্রীতদাস কিনল হ্যালি। তারপর টমের সঙ্গে সবাইকে একটা স্টীমারে চাপিয়ে ওরা অর্লিয়ান্সের দিকে চলল। সেখানে হাটে বিক্রি করবে ওদের।

স্টীমারটার নাম ছিল লা বেল রিভিয়ের। যেমন বড় তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্টীমারের নিচে ডেকে মালপত্রের সঙ্গে ক্রীতদাসদের রাখা হলো। উপরতলায় বসল শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা।

মাথার উপর নীল আকাশ রোদে ঝলমল করছিল। দুপাশে মনোরম

প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো পাল্টে যাচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে। উপরতলা থেকে শ্বেতাঙ্গ-যাত্রীদের আনন্দোচ্ছল কলহাস্য ভেসে আসছিল। নিচের ডেকে আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের তখন বিষাদ অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাসে বাতাসটা ভারী হয়ে উঠছিল।

পরদিন একটা ছোট শহরে স্টীমারটা কিছুক্ষণের জন্য থামল। হ্যালি একবার নেমে গিয়ে একটু পরে আবার স্টীমারে এসে উঠল। হ্যালি ফিরে আসার আগে একটি সুন্দরী যুবতী একটা শিশুপুত্র কোলে স্টীমারে ছিল। হ্যালি এসে তার কাছে গিয়ে তার কানে কানে কি বলতে মেয়েটির মুখ কালো হয়ে উঠল।

মেয়েটি বলল, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। আপনি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন।

হ্যালি বলল, আমার কথা বিশ্বাস না হয় এই কাগজটা দেখ। কোন ভদ্র লোককে দিয়ে এইটা পড়াও।

এই বলে হ্যালি তার পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বলল, আমি যে তোমাকে কিনেছি এইটা তার দলিল। তোমার মনিব এতে সই করেছেন এবং আমি তাঁকে নগদ টাকা মিটিয়ে দিয়েছি।

মেয়েটি বলল, আমার মনিব বলেছেন উনি আমাকে লুসিভিনে পাঠাচ্ছেন। সেখানে যে সরাইখানায় আমার স্বামী কাজ করেন সেখানে আমায় রাঁধুনির কাজ করতে হবে।

হ্যালি একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোককে ডেকে দলিলটা দেখাল।

ভদ্রলোক দলিলটা পড়ে শুনিয়ে দিল মেয়েটিকে। বলল, এটা জন কসাডিকের সই করা এক বিক্রয় দলিল। উনি লুসি নামে একটি ঝি আর তার বাচ্চাটিকে হ্যালি নামে এক ভদ্রলোককে বিক্রি করে দিয়েছেন।

লুকিয়ে তার ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল লুসি। তার চোখ থেকে জলের ধারা পড়তে লাগল।

একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক তার ক্রীতদাসদের তদারক করার জন্য ডেকে এসে লুসির ছেলেটাকে দেখে বলল, বাচ্চাটা দেখতে বেশ সুন্দর ত।

তারপর হ্যালিকে ভদ্রলোক বলল, আপনার সংগ্রহ ত বেশ ভাল দেখছি। ঐ মেয়েটিকে কি দক্ষিণে নিয়ে যাচ্ছেন? খামারের কাজে ওকে বিক্রি করলে ভালই দাম পাওয়া যাবে।

হ্যালি বলল, তা বটে কিন্তু অতটুকু বাচ্চাকে নিয়েও কি করে খামারে কাজ

করবে? অবশ্য সুযোগ পেলে আমি বাচ্চাটাকে অন্য কোথাও বিক্রি করে দেব। ইচ্ছা করলে আপনিও কিনে নিতে পারেন।

ভদ্রলোক বলল, স্বচ্ছন্দে কিনতে পারি।

এরপর শুরু দরাদরির পালা। অবশেষে ছেলেটাকে পঁয়তাল্লিশ ডলারে বিক্রি করতে রাজী হলো হ্যালি। এ সম্বন্ধে লুসি কিছু জানতে পারল না।

হ্যালি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথায় নামবেন?

লুসিডিনে।

ভালই হবে। তখন সন্ধ্যে হয়ে যাবে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়বে। সেই ফাঁকে গোপনে সারতে হবে কাজটা।

হ্যালি বিক্রয় দলিলে সই করলে ভদ্রলোক টাকা মিটিয়ে দিল।

স্টীমার ছুটে চলল। লুসিডিনের স্টীমারঘাটে যখন স্টীমারটি ভিড়ল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়লে লুসি তাকে দুটো প্যাকিং বাক্সের মাঝখানে নামিয়ে রেখে রেলিংএর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল তার স্বামী এসেছে কিনা। এই সময় প্যাকিং বাক্সের সামনে যাত্রীদের ভিড় জমে উঠতে এক ফাঁকে ভদ্রলোক লুসির ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে নেমে গেল স্টীমার থেকে।

স্টীমারটা আবার ধোঁয়া ছেড়ে চলতে লাগল। জেটিটা দূরে সরে গেল। লুসি তার স্বামীকে দেখতে না পেয়ে রেলিং থেকে ফিরে এসে তার ছেলেকে দেখতে পেল না। আর্তনাদ করে উঠল লুসি।

হ্যালি তখন বলল, তোমার বাচ্চাকে আমি একজন সদাশয় ভদ্রলোককে বিক্রি করে দিয়েছি। তুমি যাচ্ছ দক্ষিণ দেশে। তোমার বাচ্চা তোমার কাছে থাকার চেয়ে ভাল থাকবে। দুঃখ করো না।

অবসন্ন দেহে বসে পড়ল লুসি। একটা কথাও বলল না। কোন চিৎকার চেঁচামেচি করল না। হ্যালি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে লুসিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে লুসি বলল, আপনি আমার সঙ্গে আর একটা কথাও বলবেন না।

হ্যালি নীরবে অন্যত্র চলে গেল।

ক্রমে রাত্রি নেমে এল। টম সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল প্রথম থেকে। সে এক সময় উঠে গিয়ে ছেলের পরিত্যক্ত জামায় মুখ ঢেকে বসে থাকা লুসিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। লুসি ডুকরে কেঁদে উঠল।

রাত বাড়লে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল একে একে। টমও একটা প্যাকিং বাক্সের উপর টান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। একা শুধু লুসির চোখেই ঘুম নেই। সে

তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল। শুধু স্টীমারের জল কাটার শব্দ ছাড়া আর সব কিছু নিঝুম নিস্তব্ধ।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল টমের। দেখল মেয়েটি যেখানে বসে ছিল সেই জায়গাটা খালি। হঠাৎ জলে ভারী একটা জিনিস পড়ার শব্দ হলো। মনে হলো কে যেন স্টীমার থেকে ঝাঁপ দিল জলে।

টম বেশ বুঝতে পারল সব জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে নিজের মুক্তি নিজেই রচনা করে নিল লুসি। তার বাইবেলের কথা ব্যর্থ হলো।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই জেগে উঠল হ্যালি। তার ক্রীতদাসদের দেখতে এসে মেয়েটিকে দেখতে না পেয়ে টমকে তার কথা জিজ্ঞাসা করল।

যা যা ঘটেছিল তা সব বলল টম। তার বেশি কিছু জানে না সে।

সারা স্টীমারের সব জায়গাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজল হ্যালি। কিন্তু কোথাও মেয়েটিকে না পেয়ে একটা খাতা খুলে লুসির জায়গায় লিখে রাখল ক্ষতি।

লুসির মৃত্যুর থেকে এই ক্ষতিটাই বড় হয়ে উঠল তার কাছে।

১২

মিসিসিপি নদীতে যেখানে ওহিও নদী এসে পড়েছে সে জায়গাটা এত চওড়া যে এপার ওপার দেখাই যায় না। ক্রমে স্টীমারটা এসে পড়ল সেইখানে। অলিয়ান্স এখনো একশো মাইলেরও বেশি পথ।

নদীটা একটা উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় স্টীমার থেকে দুধারের ক্ষেত খামার সব দেখা যাচ্ছিল। তা দেখে টমের মনে পড়ল তার ফেলে আসা জীবনের কথা। তার ছেলেমেয়ের কথা। মনের দুঃখে সে তার জীর্ণ বাইবেলটা খুলে পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। বাইবেলের কথাগুলো মনে ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে সে।

বাইবেলে এক জায়গায় আছে, অকারণে তোমার মনকে কষ্ট দিও না। আমার পিতার ভবনে অনেক কক্ষ আছে। আমি তারই একটিতে তোমার জন্য জায়গা করে দেব।

স্টীমারের যাত্রীদের মাঝে সেন্ট ক্লেয়ার নামে এক অল্প বয়সী ভদ্রলোক আছেন। তাঁর পাঁচ ছ বছরের একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে আছে আর আছে এক মহিলা। মহিলাটি তাঁদের এক নিকট আত্মীয়া।

মেয়েটিকে বড় ভাল লাগে টমের। সে প্রায়ই ডেকে শৃংখলিত ক্রীত-

দাসদের কাছে আসে। মাঝে মাঝে তাদের শিকলগুলোকে ছোঁয়। তার টফি, বাদাম আর কমলা এনে তাদের ভাগ করে দেয়।

টম চেরীফলের বীজ, বুনো বাদাম দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি. অদ্ভুত অদ্ভুত মুখ বাঁশি প্রভৃতি খেলনা তৈরি করতে পারত। এ বিষয়ে তার একটা দক্ষতা ছিল।

একদিন টম যখন একটা কাঠের বাক্সের উপর বসে খেলনা বানাচ্ছিল তখন মেয়েটি তার কাছে এসে বসে নীরবে তা দেখতে থাকে। এইভাবে তাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয় এবং ভাব জমে ওঠে।

টম তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাম কি মেয়ে?

মেয়েটি উত্তর দেয়, ইভানজেলিন সেণ্ট ক্লেয়ার। আমাকে সবাই ইভা বলে ডাকে। তোমার নাম কি?

টম বলে, আমার নাম টম। কেণ্টাকিতে আমি যখন থাকতাম তখন ছোটরা আমায় টমকাকা বলে ডাকত।

আমিও তাহলে তোমায় টমকাকা বলে ডাকব। তুমি কোথায় থাক?

আমি তা জানি না ইভা। ওরা আমায় কার কাছে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে আমি তা জানি না।

আমার বাবা তোমায় কিনতে পারেন। তুমি আমাদের বাড়িতে খুব ভাল থাকবে।

ধন্যবাদ খুকুমণি।

স্টীমারটা এবার একটা জাহাজঘাটে এসে থামল। এখানে কাঠ তোলা হবে। টম খালাসীদের সাহায্য করল কাঠ তুলতে। ইভা তার বাবার সঙ্গে রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে কাঠ তোলা দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঠ তোলা হয়ে গেলে সিঁড়িটা গুটিয়ে নেওয়া হলো আর সঙ্গে সঙ্গে স্টীমারটা ছেড়ে দিল। টম নিচের ডেকে সামনের দিকে ছিল।

এদিকে রেলিংএর উপর ঝুঁকে থাকার সময় টাল সামলাতে না পেরে ইভা হঠাৎ নদীতে পড়ে গেল। তা দেখতে পেয়ে টমও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল নদীতে। ইভার বাবাও ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যাত্রীরা তাঁকে ধরে রাখল।

টম ভাল সাঁতার জানত। সে ইভার মুখটা একবার ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে স্টীমারের কাছে নিয়ে এল। স্টীমারটা তখন দাঁড়িয়েছিল। সবাই ওদের ধরে ফেলল। ইভা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সকলের মিলিত চেষ্টায় তার জ্ঞান ফিরে এল। সে সুস্থ হয়ে উঠল।

পরদিন নিউ অর্লিয়ান্সের কাছাকাছি এসে পড়ল স্টীমার। যাত্রীরা তাদের মালপত্র গুছিয়ে নামার জন্য তৈরি হতে লাগল। চুপচাপ ডেকের উপর দাঁড়িয়েছিল টম।

এমন সময় সেণ্ট ক্লেয়ার হ্যালিকে জিজ্ঞাসা করলেন, টমকে যদি আমি কিনি কত টাকায় আপনি বিক্রি করবেন ওকে ?

সুযোগ বুঝে হ্যালি বলল, খুব একটা লাভ না করে তেরশো ডলারে ওকে ছেড়ে দিতে পারি।

সেণ্ট ক্লেয়ার বললেন, দামটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে না মিস্টার হ্যালি ?

হ্যালি বলল, আপনার মেয়ে বায়না ধরেছে বলেই এই দামে দিতে রাজী হচ্ছি। তা না হলে ওর মত বিশ্বাসী, একনিষ্ঠ চেহারার ও নম্র ক্রীতদাসকে দেড় হাজারের কম করতাম না।

ইভা তখন তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে বলল, টমকে কিনে নাওনা বাপি। তোমার ত অনেক টাকা আছে।

মিস্টার সেণ্ট ক্লেয়ার হাসতে হাসতে বললেন তাকে, তুমি ওকে নিয়ে কি করবে পুসিসোনা ? গল্প শুনবে না ওর পিঠে ঘোড়ায় চড়বে ?

আমি ওকে সুখী করতে চাই বাপি।

মেয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন সেণ্ট ক্লেয়ার। বললেন, আচ্ছা তাই হবে পুসিসোনা।

সেণ্ট ক্লেয়ার রাজী হয়ে যেতেই হ্যালি দলিল করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। কেনার কাজ সব হয়ে গেলে ইভা টমের হাত ধরে তার বাবাকে দেখিয়ে বলল, দেখ ত টমকাকা, তোমার নতুন মনিবকে পছন্দ হয় ত ?

টম মুখ তুলে সেণ্ট ক্লেয়ারের সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানার দিকে তাকাল। মেয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে পেরে উনি যেন খুশি হয়েছেন। কোন অহঙ্কার নেই। টম বলল, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন হুজুর।

সেণ্ট ক্লেয়ার বললেন, আমিও তাই আশা করি। তোমার নাম কি ?

টম।

তুমি ঘোড়ার গাড়ি চালাতে পার ?

পারি হুজুর। আগের মনিবের কাছে বহুদিন ঘোড়ার গাড়ি চালিয়েছি।

আমি তোমাকে ঐ কাজই দেব। তবে সাবধান মদ খেয়ে যেন কোনদিন মাতলামি করো না।

আমি মদ খাই না হুজুর।

বাঃ, শুনে খুশি হলাম।

ইভা বলল, আমাদের বাড়িতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না টমকাকা। বাবা খুব ভাল লোক। কাউকে বকে না।

ইভাদের গাড়িটা এসে থামল প্রাসাদের মত বিরাট একটা বাড়ির সামনে। মূর আর ফরাসী স্থাপত্য রীতিতে তৈরি কারুকার্যখচিত বাড়িটা পুরনো আমলের হলেও বেশ সুন্দর।

ভিতরে প্রকাণ্ড উঠোন। উঠোনের মাঝখান দিয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে গাড়িবারান্দার তলায় গাড়িটা থামল। অনেক দাসদাসী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। তাদের মধ্যে এ্যাডলফ নামে একজন বয়স্ক চাকরকে অগাস্টিন সেণ্ট ক্লেয়ার বললেন, আমরা ভিতরে যাচ্ছি। তুমি মালপত্র গুছিয়ে রাখ। আস্তাবলের উপরকার ঘরটাতে টমের থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

অগাস্টিন ইভা ও ওফেলিয়াকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। কুমারী ওফেলিয়া তাঁর খুড়তুতো বোন। স্ত্রী দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকার জন্য ওফেলিয়াকে নিউ ইংল্যাণ্ডের ডায়মণ্ড থেকে নিয়ে এসেছেন অগাস্টিন বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনা করতে।

অগাস্টিন লুসিয়ানার এক ধনী জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁরা দুই ভাই। তাঁর ভাইও ভারমন্তের এক জমিদার। অগাস্টিন লুসিয়ানায় পৈতৃক বাসভবনে থেকে জমিদারী দেখাশোনা করেন। মেরী নামে এক রূপসী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। মেরীও তার অগাধ পৈতৃক ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

অগাস্টিন একসময় টমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি টম, আমাদের বাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে ত?

টম বলল, হ্যাঁ হুজুর।

সেদিন রবিবার সকালে টম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে ঘোড়ার গাড়িতে করে ওদের গীর্জায় নিয়ে গেল। ইভা, তার মা মেরী আর ওফেলিয়া গেল। অগাস্টিন বাড়িতেই রয়ে গেলেন।

যাবার সময় অগাস্টিন ইভাকে বললেন, ভাল না লাগলে তোমারও যাবার দরকার নেই।

ইভা বলল, আমি গির্জায় যাব বাবা। আমি সেখানে যাব সবার জন্য প্রার্থনা করতে। টমকাকাও খুব ভাল প্রার্থনা করে।

অগাস্টিন মেয়েকে চুম্বন করে বললেন, আমার জন্যও তাহলে প্রার্থনা করো।

১৩

এদিকে একদিন ছদ্মবেশী জর্জ হ্যারিস তার সহচর জিমকে সঙ্গে করে ওহিও নদীর ধারে সেই সরাইখানাটায় এসে এলিজার খবর পায়। সেই খবরের সূত্র ধরে গাঁয়ে গিয়ে বার্ডের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলের খোঁজ করতে থাকে। সেখান থেকে সে অবশেষে ভ্যান ট্রম্পের খামারবাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

জিম তার আগেই তার মাকে খুঁজে পায়। জর্জ যখন সেদিন সকালের দিকে ভ্যান ট্রম্পের খামারে আসে তখন জিমের সঙ্গে তার মাও ছিল।

স্বামীকে ছদ্মবেশে দেখে খুশী হওয়ার চেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিল এলিজা। কিন্তু খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ার জন্য তখন বেশী কথা বলতে পারেনি জর্জ। কিছু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙলে জর্জ তার পাশে বসে থাকা এলিজাকে বলল, আমরা যেভাবে হোক কানাডায় চলে যাব।

এলিজা বলল, কিন্তু ওরা যদি আমাদের ধরে ফেলে ?

জর্জ বলল, এখন আমি স্বাধীন মানুষ। এখন ওরা আর তোমাকে বা তোমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না আমার কাছ থেকে।

ওহিওর সরাইখানায় কারা পলাতক নিগ্রোদের খোঁজ করছে এই মর্মে এক খবর পেয়ে সেদিন রাত্রিতেই বৃদ্ধ ভ্যান ট্রম্প ওদের অন্য এক নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দিতে চাইলেন।

জর্জ, এলিজা, ছেলে ও জিম আর তার মা সবাই রাতের খাওয়া শেষ করেই গাড়িতে চাপল। ফিনিয়াস নামে ভ্যান ট্রম্পের এক ভৃত্য গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে। গাড়ির পিছনে পিছনে তার তেজী ঘোড়াটায় চড়ে যাবে মাইকেল। বিপদ বুঝলে, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে জানাবে। দরকার বুঝলে ভ্যান ট্রম্পকে জানাবে।

ভ্যান ট্রম্প একটা পুঁটলিতে করে এলিজার ছেলে জিম হ্যারির জন্য কিছু পোশাক আর কিছু খাবার দিল।

পাহাড়ী চড়াইএর পথ বেয়ে গাড়ি এগিয়ে চলতে লাগল। সহসা পিছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল ওরা। ফিনিয়াস পিছন দিকে তাকিয়ে বলল ও হচ্ছে আমাদের মাইকেল। আমি ওর ঘোড়ার চলার শব্দ চিনি।

কিন্তু একটু পরে মাইকেল হাঁপাতে হাঁপাতে জোর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে

খবর দিল আট দশ জন লোক ঘোড়ায় করে এই দিকেই আসছে। ওরা নিশ্চয় পলাতকদের সন্ধান পেয়েছে।

ফিনিয়াস গাড়ি থামিয়ে আরোহীদের বলল, ভয়ের কিছু নেই। আগে তোমাদের একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাব, তারপর যুদ্ধ করব ওদের সঙ্গে।

এই বলে খুব জোরে গাড়িটা চালাতে লাগল। খুব জোরে ঘোড়াগুলোকে ছোটাতে লাগল। জর্জ আর জিম দুজনে দুটো পিস্তল ধরে বসে রইল চুপ করে। এলিজা ছেলে জিম হ্যারিকে বুকে চেপে রইল। জিমের মা প্রার্থনা করতে লাগল।

অবশেষে একটা গিরিখাতের সামনে এসে গাড়ি থামাল ফিনিয়াস। তিরিশ ফুট গভীর গিরিখাতটা পার হয়ে ওদের যেতে বলল ওদিকের পাহাড়টায়। এ জায়গাটার সব ফিনিয়াসের চেনা। এর আগে কতবার শিকার করতে এসেছে সে।

ফিনিয়াস এলিজার ছেলে জিম হ্যারিকে আর জিম তার বুড়ী মাকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর খাদে নেমে খাদটা পার হয়ে একটা সরু পথ দিয়ে ওদিকের পাহাড়টায় চলে গেল। এক জায়গায় দুহাত একটা ফাটল পাহাড়টাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। ফিনিয়াস প্রথমে একটা লাফ দিয়ে ওপারে একটা চাতালে গিয়ে উঠল। পরে একে একে সকলে লাফ দিয়ে ওপারে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাদের ওপারে অনুসরণকারী অশ্বারোহীদের দেখা গেল। দলের মধ্যে টম লকার আর মার্কস নামে দুজন পুলিস ছিল। দুজন পুলিস ছাড়া আর বাকি সব ছিল ভাড়াটে লোক।

টম লকার খাদের ওধার থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আমরা পলাতক নিগ্রো ক্রীতদাসদের ধরতে এসেছি। আমাদের সঙ্গে পুলিস আর গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও আছে। ওদের মধ্যে আছে জর্জ হ্যারিস, এলিজা হ্যারিস, তাদের শিশুপুত্র জিম হ্যারি, ও জিম শেলডম আর একটা বুড়ী আছে।

এই জর্জের দিকে তাকিয়ে টম লকার বলল, তুমি কেণ্টাকির মিস্টার হ্যারিসের ক্রীতদাস জর্জ হ্যারিস না?

জর্জ ঘৃণাভরে বলল, আমিই জর্জ হ্যারিস, আগে ক্রীতদাস ছিলাম, এখন আমি মুক্ত, একেবারে স্বাধীন। আমার স্ত্রী আর ছেলেকে এখন আমি নিজের বলে দাবি করি। আত্মরক্ষা করার মত যথেষ্ট অস্ত্র আমাদেরও আছে। আপনারা যদি আসতে চান আসতে পারেন। তবে যে আমাদের গুলির আওতায় এসে পড়বে তাকেই আমরা খতম করে দেব।

জর্জের কথা শেষ হতে না হতেই মার্কস পিস্তল থেকে গুলি করল তাকে লক্ষ্য করে।

চকিতে জর্জ এক লাফে সরে গেল। এলিজা চিৎকার করে উঠল ভয়ে। গুলিটা জর্জের চুল আর এলিজার চিবুকের পাশ দিয়ে চলে গেল।

জর্জ বলল, ভয় নেই এলিজা, আমার কোন ক্ষতি হয়নি। জিম, পিস্তল দুটো ঠিক আছে ত? আমাকে একটা দাও। আমার সঙ্গে ঐ পথটার দিকে নজর রাখ।

মার্কস গুলি করার পর ওরা ভাবল, নিগ্রোদের একজন হয়ত মরেছে। তারপর টম লকার বলল, আমিও একজনকে মারতে যাচ্ছি।

একটু পরেই টম তার মোটা চেহারাটা নিয়ে খাদ পার হয়ে পাহাড়ী পথটায় উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল জর্জ। গুলিটা টমের একটা পাঁজরে লাগলেও সে গর্জন করতে করতে এক লাফে ফাটল পার হয়ে চাতালটার সামনে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ফিনিয়াস তাকে ধরে খাদের মধ্যে ফেলে দিল।

টম তিরিশ ফুট খাদটার নিচে পড়ে গেল। একটা গাছে তার পোশাকটা আটকে না গেলে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যেত সে। টম খাদের মধ্যে আর্তনাদ করতে লাগল।

ওর দলের লোকরা টমকে উপরে তুলে একটা ফাঁকা জায়গায় শুইয়ে দিল। তারপর ওরা ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল আহত টমকে একা ফেলে রেখে।

এরপর ফিনিয়াস বলল, এখান থেকে মাইল দুই পথ যেতে পারলে আমরা একেবারে নিরাপদ। পথে আবার হয়ত দেখা হতে পারে ওদের। মাইকেল লোক নিয়ে ফিরে এলে ভাল হত এই সময়।

এবার ওরা চাতাল থেকে ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে নামতে লাগল। কিছুক্ষণ নামার পর ওরা মাইকেলকে দেখতে পেল। মাইকেলের পিছনে কয়েকজন অশ্বারোহী ছিল। ফিনিয়াস বলল, আমারিয়া আর স্টিফেনকেও দেখা যাচ্ছে। যাক, আর আমাদের কোন ভয় নেই।

ওরা সবাই গাড়িতে উঠলে ফিনিয়াস গাড়ি ছেড়ে দিল। মাইকেল তার দলবল নিয়ে ঘোড়ায় করে গাড়ির পিছু পিছু যেতে লাগল। ওরা দয়া করে আহত টম লকারকে তুলে নিয়ে এল।

ঘণ্টাখানেক পরে একটা খামার বাড়িতে গিয়ে উঠল ওরা। সেখানে

খাওয়া সেরে বিশ্রাম করতে লাগল। টম লকারের সেবার ব্যবস্থা করল। তারপর আবার রওনা হয়ে পড়ল দূরের পথে।

১৫

প্রথম প্রথম টমকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হত না। সে শুধু গাড়ি চালাত। ক্রমে টম তার মনিবের বিশ্বাস অর্জন করল। মনিব অগাস্টিন বুঝতে পারলেন টম শুধু সৎ এবং বিশ্বাসী নয়, সে হিসাবী এবং বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। তাই একে একে সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা এবং সংসারের বেশ কিছুটা দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে দিলেন অগাস্টিন।

নিজের হাত থেকে ক্ষমতা টমের হাতে চলে যাওয়ায় বাড়ির পুরনো চাকর এ্যাডল্‌ফ প্রায়ই মনিবের কাছে নালিশ করত টমের নামে। কিন্তু অগাস্টিন তাতে কান দিতেন না।

ক্রমে তার মনিবকে ভাল লেগে গেল টমের। প্রথম প্রথম সে তার মালিককে বুঝতে পারত না ঠিকমত। সে দেখত তার মনিব কখনো বাইবেল পড়েন না, গির্জায় যান না। কিন্তু পরে দেখল প্রথাগত ধর্মে তাঁর মন না থাকলেও সব মানুষকে সমান জ্ঞান করেন তিনি। সবাইকে ভালবাসেন। ক্রীতদাসদের ভালবাসেন। সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করেন এবং ভাল ব্যবহার করেন। সন্ধ্যের দিকে কোন গানবাজনার জলসায় বা পার্টিতে ও ক্লাবে গেলেও বাড়ি ফিরে অনেক-রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করেন তাঁর গ্রন্থাগারে।

একদিন খুব ভোরে কফি নিয়ে গিয়ে টম দেখে মনিব তখনো জেগে জেগে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনো করছেন।

কফি দিয়ে কিন্তু চলে গেল না টম। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে।

অগাস্টিন তা দেখে তাকে বললেন, কি ব্যাপার, কিছু বলবে টম?

টম কোন জবাব দিল না দেখে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমায় কেউ কিছু বলেছে?

না হুজুর।

তবে কি হিসাব মিলছে না?

হিসাবে কোন ভুল হয়নি হুজুর।

কফি খেতে খেতে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন অগাস্টিন, তবে কি তোমার শরীর ভাল নেই?

আমার শরীর বেশ ভালই আছে হুজুর।

তাহলে কি হয়েছে টম ? তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন ?

টম শান্তভাবে বলল, আমার ধারণা ছিল মনিব সব সময় সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন।

তবে কি আমি তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেছি ?

না, আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন। হুজুর শুধু একজনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন।

আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না টম।

গত কয়েক রাত্রি ধরে লক্ষ্য করছি হুজুর নিজের প্রতি মোটেই ভাল ব্যবহার করছেন না।

টমের কথা শুনে হো হো শব্দে হেসে উঠলেন অগাস্টিন, এই ব্যাপার।

ব্যাপারটা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয় হুজুর।

চোখে জল এসেছিল টমের। মাথাটা ধরে আসছিল। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন অগাস্টিন। তারপর বললেন, ঠিক আছে টম, আমি কথা দিচ্ছি আর আমি রাত জেগে পড়াশুনো করব না।

আর কোন কথা না বলে টম খুশি হয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিন টম তার ঘরে বসে তার স্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লেখার চেষ্টা করছিল। তার ঘরখানা ছোট হলেও বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সে ঘরে একটা বিছানা, একটা চেয়ার আর একটা টেবিল।

কিন্তু চিঠি লিখতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ল টম। লেখার অভ্যাস না থাকায় জর্জের কাছে অনেক দিন আগে শেখা অনেকগুলো অক্ষর ভুলে গিয়েছিল সে। সে তাই বুঝল কারো একটু সাহায্য দরকার।

এমন সময় ইভা ঘরে ঢুকে তাকে সাহায্য করতে চাইল এ বিষয়ে। তারপর দুজনে মিলে অনেক আলোচনার পর চিঠিখানা খাড়া করল কোনরকমে। ইভা বলল, তোমার বউ আর ছেলেমেয়েরা চিঠিটা দেখলে ভালই বলবে।

টম বলল, আমার স্ত্রীকে জানিয়ে দিলাম, আমি নতুন মনিবের কাছে ভালই আছি। চিন্তার কোন কারণ নেই।

এরপর টম বলল, আমার আগের মনিব, তাঁর স্ত্রী আর ছেলে আমায় কথা দিয়েছিলেন ওরা টাকা যোগাড় করতে পারলেই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

এমন সময় অগাস্টিন দরজার কাছে এসে বললেন, কি হচ্ছে তোমাদের ?

ইভা বলল, টমকাকার চিঠি লিখছিলাম আমরা।

অগাস্টিন বললেন, আমার মনে হয় চিঠিটা আমি লিখে দিলে ভাল হত।

টমকে নিয়ে গাড়িতে করে সন্ধ্যের দিকে একটু বেড়িয়ে এসে টমের চিঠিটা অগাস্টিনই লিখে দিলেন।

একদিন টপসি নামে নয় দশ বছরের একটি নিগ্রো মেয়েকে এনে ওফেলিয়ার হাতে তুলে দিলেন অগাস্টিন।

ওফেলিয়া বলল, তোমার বাড়িতে চাকর বাকর ত অনেক আছে। আবার কেন ওকে নিয়ে এলে ?

অগাস্টিন বললেন, আসল কথা কি জান ? মেয়েটি আগে একটা হোটেলে থালা বাসন ধোয়ার কাজ করত। ওর মালিক মাতাল অবস্থায় প্রায়ই ওকে মারধোর করত। ও কিন্তু ভাল নাচগান করতে পারে। আমি দেখলাম ওকে এখানে নিয়ে আসা ছাড়া ওকে বাঁচানর কোন উপায় নেই।

টপসি ছিল দারুণ দুষ্টু মেয়ে। ওর গায়ের রঙের মত চুলগুলোও ছিল খুব কাল। দাঁতগুলো ছিল ঝকঝকে সাদা। কোঁকড়ানো চুলগুলো ছিল বিনুনী বাঁধা।

ওর বেশভূষা খুব নোংরা থাকায় ওফেলিয়া তাকে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে ভাল পোশাক পরিয়ে দিল।

টপসি নাচগান ও মূকাভিনয়ে বেশ পটু হলেও সে সুযোগ পেলেই চুরি করত। অথবা এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় রেখে দিয়ে লোককে খুঁজিয়ে মজা পেত। সে ছিল বড় খেয়ালী। এক একসময় ইচ্ছা হলে খুব ভাল কাজ করত। জিনিসপত্র ঠিকমত গুছিয়ে রাখত। আবার এক একসময় কোন কাজ না করে গান করত আপন মনে। সব জিনিসপত্র অগোছালো অবস্থায় ফেলে রাখত।

ওফেলিয়া মাঝে মাঝে বলত, এমন মেয়ে নিয়ে কি যে করি তা বুঝতে পারছি না।

টপসি বলত, আমাকে চাবুক মারা উচিত মিসিস। আগেকার মনিব আমাকে চাবুক মারত। চাবুক না মারলে আমি ভাল কাজ করতে পারি না।

টপসি অনেক ভুল ত্রুটি করলেও তার এই অকপট সরলতার জন্য তাকে ভাল না বেসে পারত না ওফেলিয়া।

১৬

তখন গ্রীষ্মকাল। একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে মিস্টার শেলবি রাতের খাওয়ার পর তাঁর বৈঠকখানায় বসে একটা চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে চুরুট পাকাচ্ছিলেন আরাম করে। দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে মিসেস শেলবি সেলাই করছিলেন।

এমন সময় মিসেস শেলবি বললেন, শোন আর্থার, টম ক্লোকে একটা চিঠি দিয়েছে।

মিস্টার শেলবি বললেন, তাই নাকি? তাহলে ওখানে চিঠি লিখে দেওয়ার নিশ্চয় কেউ আছে। ও কেমন আছে?

একজন ভদ্রলোক ওকে কিনেছেন। ওর নতুন মনিব ভাল লোক। খুব ভাল ব্যবহার করেন ওর সঙ্গে।

শুনে খুশি হলাম। আমার মনে হয় দক্ষিণ দেশটা টমের ভালই লেগেছে। আর হয়ত এখানে ও ফিরে আসতে চাইবে না।

না না। ও জানতে চেয়েছে কবে নাগাদ ওকে ফিরিয়ে আনার টাকাটা যোগাড় হবে।

তা ত বলা কঠিন। ব্যবসা একবার খারাপ হতে শুরু করলে তাকে ভাল করা খুব কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু আর্থার, আমার মনে হয় এ বিষয়ে কিছু একটা করা উচিত। আমরা যদি সব ঘোড়াগুলো অথবা একটা খামারবাড়ি বেচে দিই।

সেটা ঠিক হবে না। তুমি বুদ্ধিমতি হলেও ব্যবসার কিছু বোঝ না।

তুমি যদি তোমার দেনার একটা তালিকা দাও ত আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ব্যাপারটা তত সহজ হলে আমি অনেক আগেই চেষ্টা করে দেখতাম।

স্বামীর সঙ্গে এনিয়ে তর্ক করার কোন ইচ্ছা ছিল না মিসেস শেলবির। কিন্তু কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রাখতে না পারাটা সত্যিই বেদনাদায়ক ওঁর পক্ষে।

মিস্টার শেলবি বললেন, আমি দুঃখিত এমিলি। আমার মনে হয় প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা ঠিক হয়নি আমাদের। এখন থেকে বরং ক্লোকে শক্ত হতে বলা উচিত যাতে ও টমের আশাটা ত্যাগ করতে পারে।

না না আর্থার, তা হয় না। টমকে ফিরিয়ে আনার টাকাটা যদি কোন ভাবে সংগ্রহ করতে না পার তাহলে আমি গান শিখিয়ে তা সংগ্রহ করব।

না না এমিলি, নিজেকে এভাবে ছোট করার অনুমতি আমি দিতে পারি না।

কিন্তু অসহায় মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেটা রাখতে না পারাটাকে তার চাইতে বেশী ছোট কাজ বলে ভাবি।

তবু আশা করব কাজটা করার আগে ভাল করে ভেবে দেখবে।

ঘর থেকে কফির কাপগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে ক্লো ওদের কথা বার্তার শেষ অংশটা শুনেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল আলোচনা তাদের সম্পর্কেই হচ্ছে তাই কাজ হয়ে গেলেও ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ক্লো।

ওকে দাঁড়াতে দেখে মিসেস শেলবি বললেন, তুমি কিছু বলবে ক্লো?

ক্লো বলল, আমি বলছিলাম অনেকেই ত তাদের দাসদাসীদের ভাড়া খাটিয়ে বাড়তি পয়সা রোজগার করে।

মিসেস শেলবি জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে তুমি ভাড়া খাটানোর কথা বলছ ক্লো?

আমি অন্য কাউকে ভাড়া খাটানোর কথা বলছি না। তবে স্যাম বলছিল, লুসিডিনের একজন লোক তার মিষ্টির দোকানে ভাল কেক আর প্যাস্ট্রি তৈরির জন্য একজন দক্ষ লোক চাইছে। সপ্তাহে চার ডলার করে দেবে এই কাজের জন্য।

তাতে তোমার কি ক্লো?

আমি বলছিলাম, আমাকে যদি বছরকতকের জন্য ঐ কাজ করার অনুমতি দেন ত টাকা যোগাড়ের ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য হয়। স্যালি ত আমার কাজকর্ম সব শিখে নিয়েছে। তাছাড়া আমার ছোট ছেলেটাকে ও দেখতে পারবে। বাকি ছেলেরা ত বড় হয়ে গেছে, ওরা নিজেরাই থাকতে পারবে।

কিন্তু লুসিডিন ত এখান থেকে অনেক দূর।

তবে টম যেখানে আছে সেখান থেকে জায়গাটা কাছে।

জায়গাটা কাছে না হলেও তুমি যেতে পার। তোমার মাইনের প্রতিটি কপর্দক তোমার স্বামীকে কিনে নেবার জন্য সঞ্চয় করে রাখা হবে।

ক্লো খুশি হয়ে বলল, আমাকে তাহলে কত বছর কাজ করতে হবে?

এই চার পাঁচ বছর। তবে তোমাকে অতদিন হয়ত কাজ করতে হবে না। আমরাও তার সঙ্গে কিছু টাকা যোগান দিতে পারব।

না না মিসিস। আমি চাই না আপনি গান শিখিয়ে টাকা রোজগার করুন। তাতে পরিবারের অসম্মান হবে।

মিসেস শেলবি হেসে বললেন, তোমাকে ভাবতে হবে না। পরিবারের সম্মানের দিকে নিশ্চয় নজর রাখব।

স্যাম বলছিল কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে ও কাল নদী পর্যন্ত যাবে। যদি অনুমতি দেন ত কালই ওর সঙ্গে রওনা হতে পারি। সঙ্গে নেবার জিনিস-পত্র তেমন কিছু নেই। আপনি দয়া করে একটা ছাড়পত্র লিখে দেবেন।

ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আমি কর্তার সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। পরে আমি নিজে গিয়ে তোমায় জানিয়ে আসব।

১৭

দেখতে দেখতে ইভাদের বাড়িতে দুবছর কেটে গেল টমের। একদিন তার আগেকার মনিবের ছেলে জর্জ শেলবির একটা চিঠি পেয়ে খুশিতে ফেটে পড়ল টম। জর্জ জানিয়েছে, ক্লো লুসিভিনের একটা খাবারের দোকানে কাজ করছে, এবং তাকে কিনে নেবার জন্য মাইনের টাকাটা জমিয়ে রাখছে। টমের দুটি ছেলে মস আর পিট বড় হয়েছে। স্যালি ঘর সংসারের কাজকর্ম আর ছোটদের দেখাশোনা করছে। আর একটা সুখবর দিয়েছে জর্জ। স্বামীর সঙ্গে মিলন হয়েছে এলিজার। পলাতক অবস্থাতেই এলিজার খোঁজ পেয়ে যায় জর্জ হ্যারিস। দুজনেই কানাডা চলে যায়।

এদিকে ইভার সঙ্গে টমের বন্ধুত্বটা গাঢ় হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। ইভার নিষ্পাপ মমতাময়ী মুখখানাকে দেখলেই টমের মনে হত ও যেন স্বর্গের কোন দেবী। রোজ সকালে বাজারে গিয়ে ইভার জন্য ফুলের তোড়া কিনে আনত টম।

এই ফুলের বিনিময়ে ইভা মিষ্টি সুরে বাইবেল পড়ে শোনাবে তাকে।

এই সময় সেন্ট ক্লেয়ার পরিবারের সবাই সমুদ্রের ধারে তাদের লেক ভিলার বাড়ীতে গ্রীষ্মকালে চলে আসে। সেই বাড়ির বাগানের এক ধারে লতা-চিতানের নিচে শ্যাওলা ঢাকা পাথরের বেদীর উপর বসে টম আজকাল প্রায়ই বাইবেল পড়ে আর ইভা তা শোনে।

আজকাল ইভার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তার গলার ব্যাথা আর কাশিটা একেবারে যাচ্ছে না। একটু একটু করে জ্বর হচ্ছে। শরীটা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। গায়ের রংটা হয়ে যাচ্ছে ফ্যাকাশে।

ওফেলিয়া অগাস্টিনকে এটা জানাল। কিন্তু অগাস্টিন মেয়েকে দারুণ ভাল-

বাসলেও কথাটা তেমন গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, এমনি ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। দু একদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ইভার জ্বর যখন খুব বেড়ে গেল, যখন সে বিছানা থেকে উঠতে পারল না তখন অগাস্টিনের টনক নড়ল। তিনি বড় ডাক্তার ডাকলেন। কিন্তু ইভার অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে লাগল।

একদিন ইভার মা একটা গয়নার বাক্স দেখিয়ে ইভাকে বলল, তুই বড় হলে এই সব গয়নাগুলো তোকে দেব। তার মধ্যে ছিল একজোড়া হীরের হার এবং আরো অনেক দামী গয়না।

ইভা গম্ভীরভাবে বলল, এগুলোর দাম কি অনেক ?

নিশ্চয়ই।

এগুলো যখন আমার তখন আশা করি এগুলো দিয়ে আমি যা খুশি করতে পারব।

তুমি কি করতে চাও ইভা ?

আমি এগুলো বিক্রি করে ফ্রি স্টেটে একটা জায়গা কিনব। তারপর আমাদের বাড়িতে যত দাসদাসী আছে তাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাব। তাদের পড়াশুনার জন্য মাস্টার রাখব। ওরা যাতে নিজেরাই চিঠি লিখতে বা পড়তে পারে তার জন্য লেখাপড়া শেখার বিশেষ দরকার।

ইভার কথাগুলো আর সহ্য করতে পারল না মা মেরি। বলল, চুপ করো ইভা। আমার মাথার যন্ত্রণা বেড়েছে।

এর মধ্যে অগাস্টিনের ভাই আলফ্রেড তার ছেলে হেনরিককে নিয়ে ইভাদের লেকভিলার বাড়িতে বেড়িয়ে গেল দিনকতকের জন্য। কিন্তু আলফ্রেড ও তার ছেলে হেনরিক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। দয়া, মায়া, মানবতা, চিত্তের উদারতা এসব দিক দিয়ে তাদের কোন মিল নেই অগাস্টিন আর ইভার সঙ্গে।

আলফ্রেডরা বাড়ি থেকে চলে যাবার পর ইভার অসুখটা আরো বেড়ে গেল।

এই অসুখের মাঝেই টমের কাছে মাঝে মাঝে যেত ইভা। হয় সে টমকে বাইবেল পড়ে শোনাত নয়ত টম পড়ত আর সে শুনত।

একদিন বাইবেল পড়তে পড়তে ইভা হঠাৎ টমকে জিজ্ঞাসা করল, যীশু কেন আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন আমি তা বুঝতে পারছি টমকাকা!

কেন মিস ইভা ?

কেন আমি তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে আমি তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। সেদিন স্টীমারে করে আসার সময় তোমার সঙ্গে হতভাগ্য দাসদাসীদের যে দলটাকে দেখেছিলাম তাদের কথা ভুলতে পারিনি আমি। আমি নিজের চোখে দেখেছি তাদের মধ্যে কেউ মাকে হারিয়ে, কেউ তার ছেলেকে হারিয়ে, কেউ তার স্বামীকে আবার কেউ তার স্ত্রীকে হারিয়ে কাঁদছে। আর যারা নির্যাতনের ফলে মারা গেছে তাদের যন্ত্রণা কী ভয়ঙ্কর। আমার জীবন দিলে যদি এদের দুঃখের শেষ হয় তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে আমার জীবন ত্যাগ করব।

এই বলে সে তার শীর্ণ হাতখানা টমের হাতের উপর রাখল।

এই সময় অগাস্টিন ইভাকে ডাকতেই সে চলে গেল। টমের চোখে জল এল। সে আপন মনে বলে উঠল, আমি বেশ বুঝতে পারছি ওকে আর এ জগতে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। ওর কপালে আমি দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরের ভালবাসার চিহ্ন।

একদিন ইভা তার বাপকে স্পষ্ট ভাবায় বলল, তোমাকে ছেড়ে আমার চলে যাবার সময় হয়েছে বাপি। আমি চলে যাব, আর কোনদিন ফিরে আসব না।

মেয়েকে বুকের মধ্যে আরো নিবিড় করে চেপে ধরলেন সেণ্ট ক্লেয়ার। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ওকথা বলতে নেই মা।

একদিন ইভা তার মাথার কিছু চুল কেটে ফেলল। তারপর বাড়ীর সব দাসদাসীদের ওফেলিয়াকে দিয়ে তার ঘরে ডাকিয়ে সবাইকে এক গোছা করে চুল দিল। বলল, আমি শীগ্‌গির যাব স্বর্গে। আর দেখা হবে না। তোমরা সবাই আমাকে ভালবাস। তাই আমার এই চুলগুলো রেখে দেবে। এগুলো দেখলে আমার কথা মনে পড়বে তোমাদের।

টম কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি স্বর্গে গেলে আমি কি করে বাঁচব খুকুমণি?

রাত্রিবেলায় ইভার কাছে থাকত ওফেলিয়া। টম ঘরের বাইরে বারান্দায় শুত যদি হঠাৎ কোন দরকার হয়।

একদিন মাঝরাতে ঘুমন্ত ইভার মুখখানা দেখে ভয় পেয়ে গেল ওফেলিয়া। তার ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখখানায় এক স্বর্গীয় জ্যোতির অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠল সহসা। বাড়ির সবাইকে জাগাল ওফেলিয়া। টম ডাক্তার ডাকতে গেল।

কিন্তু ডাক্তার আসতে না আসতেই সব শেষ হয়ে গেল। বাড়ির সবাইকে কাঁদিয়ে স্বর্গে চলে গেল ইভা।

সমুদ্রের ধারে সেই লেক ভিলার বাগানের একধারে ইভাকে কবর দেওয়া হলো।

১৮

ইভার মৃত্যুর পর আবার নিউ অর্লিয়ান্সের বাড়িতে সপরিবারে ফিরে এলেন সেন্ট ক্লেয়ার। আবার যথারীতি কাজকর্মে মন দিলেন। অন্তরের মধ্যে সমস্ত শোকের আবেগকে স্তব্ধ করে রেখে বাইরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন তিনি।

একদিন মেরি ওফেলিয়াকে বলল, যে লোক মেয়েকে এত ভালবাসত, যাঁর মেয়ে-অন্ত প্রাণ ছিল সে এত তাড়াতাড়ি কি করে ভুলে গেল সেই মেয়েকে তা বুঝতে পারছি না মিস ওফেলিয়া।

ওফেলিয়া বলল, ওঁর অন্তরের মধ্যে শোক ঠিকই আছে। শুধু বাইরে তা বোঝা যায় না।

ইভার কাছে একদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেন্ট ক্লেয়ার, টমকে অবিলম্বে মুক্তি দেবেন তিনি। তাই নিউ অর্লিয়ান্সে ফিরে এসেই টমের মুক্তির জন্য আইনমত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। আদালতে আবেদন করলেন।

আদালতে আবেদন জানানোর পরেই একদিন টমকে ডেকে বললেন সেন্ট ক্লেয়ার, তুমি তোমার মালপত্র গুছিয়ে নাও। কেন্টাকি যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

মুক্তির আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল টমের মুখখানা। খুশির আবেগে বলে উঠল, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন প্রভু।

টমের আনন্দ দেখে মনে মনে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেন সেন্ট ক্লেয়ার। বললেন তুমি ত কোন দুরাবস্থার মধ্যে ছিলে না। তবে চলে যাবার জন্য এত উন্মুখ হয়ে উঠেছ কেন বুঝতে পারছি না।

টম বলল, ঠিক তা নয়। তবে স্বাধীন মানুষ হবার আনন্দ চেপে রাখতে পারিনি।

কিন্তু তুমি ত স্বাধীন মানুষের মতই ছিলে। তোমার পোশাক পরিচ্ছদ, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার ত কোন ত্রুটি ছিল না। যাই হোক মাসখানেকের মধ্যেই তুমি যেতে পারবে।

আপনি দয়ালু। আপনি আমায় সুখেই রেখেছিলেন। কোন জিনিসের অভাব ছিল না। কিন্তু পরের শত ভাল জিনিসের থেকে নিজের জিনিস ভোগ করাতেই আছে প্রকৃত সুখ।

তা অবশ্য ঠিকই বলেছ। ঠিক আছে তুমি মুক্তি পেয়ে চলে যাবে।

কিন্তু আপনি এখন মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। আপনি যতদিন চাইবেন আমি এখানেই থাকব।

না না, আমার জন্য তোমাকে ধরে রেখে দিতে চাই না। তুমি বরং তোমার ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের আমার ভালবাসা জানাবে।

ইভার মৃত্যুতে ওফেলিয়া আর সবার মত দুঃখ পেলেও একটা শিক্ষা পেয়েছে ইভার কাছ থেকে। যে টপসিকে ও কোনমতে ভাল করে তুলতে পারেনি, সেই টপসিকে শুধু অন্তরের ভালবাসা দিয়ে ভাল করে তোলে ইভা। তার মন জয় করে শুধু ভালবাসা দিয়ে।

ওফেলিয়া একদিন অগাস্টিনকে বলল, আচ্ছা, চাকরবাকরদের সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?

অগাস্টিন বললেন, ভেবেছি একে একে ওদের মুক্তি দেব। শুধু মুক্তি দিলেই হবে না। ওদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া শুধু মুক্তি নিয়ে ওরা কি করবে? টপসির কথাই ধরো। ও মুক্ত হয়ে কি করবে? কিভাবে জীবিকা অর্জন করবে?

আমি শুধু এতদিন ওদের ভালবেসেই এসেছি। কিন্তু ওদের ভবিষ্যতের কথা ভাবিনি।

খুশি হয়ে ওফেলিয়া বলল, সত্যিই অগাস্টিন, তুমি এখন অনেক বদলে গেছ আগের থেকে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বারান্দায় চাঁদের আলোয় বসে ছিল টম। সে তার বাড়ির কথা, ইভার কথা ভাবছিল। এমন সময় সে দেখল অগাস্টিন ছড়ি হাতে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

টম গিয়ে তার মনিবকে বলল, আমিও আপনার সঙ্গে যাব মনিব?

অগাস্টিন বললেন, না, তোমার যাওয়ার দরকার হবে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব আমি।

ঘণ্টাখানেক পর বাড়ির বাইরে অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ আর কথাবার্তা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল টম। দেখল একটা তক্তার উপর শোয়া চাদর ঢাকা একটি লোককে কারা বয়ে আনছে।

তক্তাটা নামাতেই মুখখানা দেখে আর্তনাদ করে উঠল টম। এ কি হলো তার মনিবের ?

সেদিন সন্ধ্যায় ঘুরতে ঘুরতে সেণ্ট ক্লেয়ার সান্ধ্যপত্রিকা পড়ার জন্য একটা কাফেতে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ দুটো মাতাল মারামারি লেগে যায়। একজনের হাতে একটা বড় ধারাল ছোরা ছিল।

সেণ্ট ক্লেয়ার ও কয়েকজন ভদ্রলোক লোকটার হাত থেকে ছোরাটা কাড়তে যান। তখন সেই লোকটা তার প্রতিপক্ষকে মারতে না পেরে ছোরাটা আমূল বসিয়ে দেয় সেণ্ট ক্লেয়ারের পাঁজরে।

গুরুতরভাবে আহত সেণ্ট ক্লেয়ারকে বাড়িতে আনার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার রোল পড়ে যায় সারা বাড়িতে। টম ডাক্তার ডেকে আনে ছুটে গিয়ে।

কিন্তু ডাক্তার এসে কিছুই করতে পারেন না। ডাক্তারের মুখ দেখে বোঝা গেল কোন আশা নেই। ওফেলিয়া ও টম ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিল।

সেণ্ট ক্লেয়ারের তখনো জ্ঞান ছিল। তিনি টমের হাতে একটা হাত রেখে বললেন, আমি চলে যাচ্ছি। প্রার্থনা করো টম। তুমি নিজে প্রার্থনা করো। তোমাদের জন্য কিছুই করে যেতে পারলাম না।

ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সেণ্ট ক্লেয়ারের চেতনা। ঘুমন্ত শিশুর মত সুন্দর মনে হতে লাগল তাঁর মুখখানা। আর সে চেতনা ফিরল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সেণ্ট ক্লেয়ার।

সেণ্ট ক্লেয়ারের মৃত্যুতে সবচেয়ে অসহায় হয়ে পড়ল বাড়ির দাসদাসীরা। স্বামীর মৃত্যুর পর মেরী হলো বাড়ির মালিক, সর্বময় কর্ত্রী। সে ঠিক করল, সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে সে তার বাবার কাছে চলে যাবে। সব কিছু ব্যবস্থা করার জন্য সে তার স্বামীর ভাই আলফ্রেডকে চিঠি দিল।

আলফ্রেড তার উত্তরে জানাল, উকিলের পরামর্শমত বাড়ির সব আসবাব-পত্র আর ক্রীতদাসদের নীলামে বিক্রি করতে পারবে। বাড়িটা আপাততঃ থাকবে উকিলের জিম্মায়।

মেরি চিরদিনই বাড়ির দাসদাসীদের প্রতি নির্দয় নির্মম ব্যবহার করত। সে কাউকে দেখতে পারত না। কিন্তু স্বামীর জন্য কাউকে বিশেষ কিছু বলতে বা করতে পারত না। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার নিষ্ঠুরতা চরমে উঠল। সে কোন দাসদাসীর কাছে কিছুমাত্র ত্রুটি বিচ্যুতি দেখলেই চাবুকঘরে পাঠিয়ে দিত তাকে। যাকে যত ঘা চাবুক মারার নির্দেশ কাগজে লিখে দিত তাকে তত ঘা চাবুক মারা হত।

ওফেলিয়া অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তার কথাও টিকত না। সে চলে যাবে ঠিক করল।

সবচেয়ে মুস্কিলে পড়ল টম। তার মুক্তির জন্য মালিক নিজে আবেদন করেছিলেন। এখন মালিকের অবর্তমানে যা করার একমাত্র তার স্ত্রীই করতে পারে।

টম একদিন ওফেলিয়াকে ধরল। ওফেলিয়া মেরিকে টমের কথা বলল। কিন্তু মেরি নির্মম। সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সব দাসদাসীর মধ্যে সব চাইতে যোগ্য ও বিশ্বাসী টমের দাম সব চাইতে বেশি। ওকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

অবশেষে একদিন সেণ্ট ক্লেয়ারের বাড়ির সব ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের নিলামে তোলা হলো। দাসদাসীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল এ্যাডল্ফ, টম, সুমান আর এমিলিন। মেয়েদের মধ্যে জুমান আর এমিলি ছিল সবচেয়ে ভদ্র, দেখতে সুন্দর; একটি পরিবার থেকে এক সঙ্গে দুজনকে কেনা হয়েছিল তাদের।

সাইমন লেগ্রি নামে বেঁটে কদাকার একটা লোক টমকে কিনে নিল। অন্য এক ভদ্রলোক কিনল সুমানকে।

সুমান কাঁদতে কাঁদতে সেই ভদ্রলোককে বলল, হুজুর, আপনি আমার মেয়েকেও কিনে নিন। ও খুব কাজের।

ভদ্রলোক তার কথা শুনে চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিলামে এমিলিনের যা দাম উঠল তা দেবার সাধ্য ভদ্রলোকের ছিল না। ফলে সাইমন লেগ্রি নামে সেই অভদ্র লোকটাই এমিলিনকে কিনে নিল।

মা ও মেয়ে দুজনেই কাঁদতে লাগল।

১৯

রেড নদীর ধারে তুলো চাষের অনেক জমি ছিল সাইমন লেগ্রির। সে টমকে আর দুজন ক্রীতদাসের সঙ্গে কিনে নেয় নিলামে। কেনা দাসদাসীদের নিয়ে জাহাজঘাটে গিয়ে স্টীমার ধরল সাইমন লেগ্রি।

এই চারজন ছাড়া তার সঙ্গে ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে কেনা আরও চারজন ক্রীতদাস। এক একটা হাতকড়া দুজন করে ক্রীতদাসের হাতে পরানো ছিল।

স্টীমারে উঠেই সব দাসদাসীদের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে

লাগল লেগ্রি। দেখল সব ক্রীতদাসদের মধ্যে টমের পরনেই ছিল দামী আর পরিচ্ছন্ন পোশাক। তার পরনে ছিল ভাল প্যাণ্ট, ইস্ত্রি করা লিনেনের শার্ট। প্যাণ্টের রঙের কোট। পায়ে পালিশকরা বুট জুতো।

অন্য সব ক্রীতদাসদের হাতে ছিল একটা করে পুঁটলি, কিন্তু টমের কাছে ছিল একটা বাক্স। লেগ্রি বাক্সটা খুলে দেখল তার মধ্যে পুরনো একটা পায়জামা আর একটা ছেঁড়া কোট। আস্তাবলে কাজ করার সময় এই পোশাকটা পরত সে।

টমের পোশাক দেখে লেগ্রি বুঝতে পারল এর আগে টম ছিল এক ধনী অভিজাত পরিবারে।

লেগ্রি টমকে তার ভাল পোশাক আর জুতো ছেড়ে সেই পুরনো পায়জামা, ছেঁড়া কোট আর পায়ে ছেঁড়া জুতো পরতে বলল। পোশাক পাল্টানোর জন্য তার হাতকড়াটা খুলে দিয়ে তাকে আড়ালে এক জায়গায় যেতে বলল।

পোশাক পাল্টাবার সময় তার জীর্ণ বাইবেলখানা পকেটে ভরে নিয়েছিল টম। কিন্তু টমের ছেড়ে দেওয়া পোশাকের পকেট থেকে একটা নিগ্রোর রুমাল আর একটা প্রার্থনা সঙ্গীতের বই পেল। রুমালটা লেগ্রি নিজের পকেটে করে নিল।

প্রার্থনার বইটা দেখে টমের হাতে হাতকড়াটা পরিয়ে দিয়ে লেগ্রি বলল। তুই দেখছি খুব ধার্মিক, গির্জায় যাস। কিন্তু আমার ওখানে গানটান চলবে না। এবার থেকে আমিই তোর গির্জা আমিই তোর ঈশ্বর ভাববি।

এরপর টমের ভাল পোশাক আর বাক্সটা লেগ্রি নাবিকদের কাছে নিয়ে গিয়ে নিলামে বিক্রি করে এল। বিক্রির পয়সাটা নিজের পকেটে রেখে দিল। পরে টমকে বলল, আমার কাছে একটা পোশাকে এক বছর চালাতে হবে।

টমের অদূরে এমিলিন মুখ ভার করে বসে ছিল। লেগ্রি তা দেখে রেগে গিয়ে বলল, কি তুই মুখ গোমড়া করে বসে আছিস কেন?

এমিলিন কোন উত্তর না দেওয়ায় লেগ্রি আবার বলল, কিরে কথা কানে যাচ্ছে না?

এরপর চোখ বড় বড় সব ক্রীতদাসদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল সে, তোদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি, যদি তোরা আমার সঙ্গে বদমায়েসি করিস ত ঘুঁষি মেরে তোদের মুখ ভেঙ্গে দেব। আমি কোন কথা বললেই সঙ্গে

সঙ্গে উঠে দাঁড়াবি, কিছু করতে বললেই করবি। তাহলেই বুঝব মানিয়ে চলতে পারবি আমার সঙ্গে।

রেড নদীর উপর দিয়ে স্টীমারটা ছুটে চলল।

অবশেষে একটা শহরের ঘাটে স্টীমারটা থামতেই মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ল লেগ্রি।

স্টীমার থেকে মালপত্র ও তার দাসদাসীদের নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসল লেগ্রি।

নির্জন পাইনের বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল গাড়িটা। পথটা যেমন নির্জন তেমনি বিপদসঙ্কুল। সমস্ত বনভূমি জুড়ে গাছের মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। পাশের জলার উপর হেলেপড়া প্রকাণ্ড সাইপ্রাস গাছের ডালপালায় মোকাসিন সাপগুলো জড়িয়ে ছিল। টাকা দিলেও এ পথে গাড়ি নিয়ে কেউ আসতে চায় না।

প্রায় অন্ধকার বনভূমির মধ্য দিয়ে গাড়িটা যাবার সময় ক্রীতদাসদের ভারাক্রান্ত মনগুলো আরো ভারী হয়ে উঠেছিল এক অজানা ভয়ে।

লেগ্রি মাঝে মাঝে তার পকেট থেকে একটা মদের পাত্র বার করে দু এক চুমুক করে মদ খাচ্ছিল আর ক্রীতদাসদের হাঁক দিয়ে বলছিল, কিরে তোরা পেঁচার মত মুখ করে বসে আছিস কেন? গান গা!

কিন্তু গান গাওয়ার মত মানসিকতা কারো ছিল না।

লেগ্রি একসময় এমিলিনের কানটা ধরে বলল, কিরে তুই কানে কিছু পরিস না?

এমিলিন ভয়ে ভয়ে বলল, না হুজুর।

তুই যদি ভালভাবে থাকিস আর আমার কথা শুনে চলিস ত একজোড়া মাকড়ি কিনে দেব তোকে।

এমিলিন ভয়ে তার পাশের মহিলাকে জড়িয়ে ধরলে সবাই হেসে উঠল। লেগ্রি বলল, আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই! আমি কাউকে কিছু বলি না। তুই ভালভাবে থাকলে তোকে শক্ত কাজ কিছু দেব না। আমার কাছে কাছেই বেশীক্ষণ থাকবি।

এরপর বেশী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে লেগ্রি নিজেই গান গাইতে লাগল।

অবশেষে চাষের মাটি সংলগ্ন একটা বিশাল পুরনো বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে থামল। বাড়িটার জীর্ণ দশা দেখলে মনে হয় ভুতুড়ে পরিত্যক্ত বাড়ি। বাড়িটার চারদিকেই বারান্দা। অনেক জায়গায় চুন সুরকি খসে

গেছে। জানালার খড় দড়ি নেই, কোনটার আবার পাল্লা নেই। বাড়িটার উঠোনে চারদিকে ভাঙ্গা তক্তা, খড়ের টুকরো, কাঠের পিপো, টিনের বাক্স প্রভৃতি পড়েছিল।

গাড়িটা বাড়ির সামনে রাখতেই তিন চারটে বড় বড় কুকুর ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করতে করতে ছুটে এল। ছেঁড়া পোশাকপরা কয়েকজন নিগ্রো সামলে রাখল কুকুরগুলোকে।

লেগ্রি টমদের দিকে তাকিয়ে বলল, পালিয়ে যাওয়া নিগ্রোদের খুঁজে বার করার জন্য শিক্ষা দেওয়া আছে কুকুরগুলোকে। এদের চেহারাগুলো দেখছিস ? পালাবার চেষ্টা করবি ত তোদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে এরা।

তারপর কানাহীন টুপি পরা একটা নিগ্রোকে লেগ্রি জিজ্ঞাসা করল, কি খবর সাম্বো, এদিককার খবর সব ভাল ত ?

সাম্বো বলল, ভাল হুজুর।

আর একজন নিগ্রোকে বলল, কিরে কুইম্বো, তোকে যা যা বলেছিলাম করেছিস ত ?

হ্যাঁ হুজুর।

সাম্বো আর কুইম্বো নামে এই দুজন নিগ্রো লেগ্রির তুলো চাষের সব কাজ দেখাশোনা করে। লেগ্রির সব দুষ্কর্মের শরিক তারা। কিভাবে বর্বর আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে হয় লেগ্রি তাদের দীর্ঘদিন ধরে শিখিয়ে এসেছে।

লেগ্রি সাম্বোকে তার কিনে আনা ক্রীতদাসীকে দেখিয়ে বলল, একে তুই নিয়ে যা আর এমিলিন নামে এই মেয়েটা থাকবে আমার কাছে।

ক্রীতদাসী মহিলাটি করুণ কণ্ঠে বলল, কিন্তু হুজুর নিউ অর্লিয়ান্সে আমার স্বামী আর ছেলেমেয়ে আছে।

লেগ্রি চাবুক উচিয়ে বলল, কোন কিন্তু নেই। তুই ওর সঙ্গে থাকবি।

টম লক্ষ্য করল, বারান্দার উপর থেকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা লেগ্রিকে কি বলতে লেগ্রি বলল, তুমি চুপ করে থাক। আমার যা খুশি তাই করব।

দুধারে সারবন্দী চালাওয়ালা ক্রীতদাসদের আস্তানাটা বাড়ি থেকে একটু দূরে চাষের জমিগুলোর কাছে। চালার ভিতরে কোন আসবাব নেই, মাটির উপর খড় পাতা। ক্রীতদাসদের তুলনায় ঘরের সংখ্যা কম বলে এক একটা ঘরে কয়েকজনকে থাকতে হয়।

টম ভেবেছিল একটা ঘরে সে একা থাকতে পাবে। কিন্তু তা হলো না।

সে ভেবেছিল সারাদিনের খাটুনির পর সে অন্ততঃ নির্জনে বসে তার বাইবেলটা খুলে একটু পড়তে পারবে।

সাম্বো একটা থলেতে করে কিছু গম দিয়ে টমকে বলল, এতে এক সপ্তাহ চালাতে হবে।

কিন্তু গম ভাঙ্গার জাঁতা একটা বলে সন্ধ্যে থেকে সব ক্রীতদাস-দাসীরা একে একে গম ভাঙ্গত। গম ভাঙ্গতে অনেক রাত হত। তারপর রুটি করত। তাও পেট ভরে সবাই খেতে পেত না। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট গম ছিল না।

সেদিন রাতে গম ভাঙ্গতে গিয়ে টম দেখল দুজন বৃদ্ধার তখনো গম ভাঙ্গা হয়নি। টম নিজে তাদের গম ভেঙ্গে দিয়ে নিজের গম ভাঙ্গল। কৃতজ্ঞ বৃদ্ধা দুজন টমের রুটি করে দিল।

বৃদ্ধারা যখন রুটি তৈরি করছিল টম তখন রান্নাঘরে বাইবেলখানা নিয়ে পড়তে বসল।

একজন বৃদ্ধা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি?

টম বলল, বাইবেল।

কেণ্টাকিতে থাকাকালে বইটার কথা শুনেছি। কিন্তু এই জঘন্য পরিবেশে ও নাম আর শোনা যায় না।

আমি তোমাদের পড়ে শোনাতে পারি তোমরা যদি চাও।

হ্যাঁ পড়।

টম পড়তে লাগল, তোমরা যারা শ্রমের ভারে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, আমার কাছে এস। আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।

আর একজন বৃদ্ধা বলল, কথাগুলো বেশ। কে বলেছে?

প্রভু যীশু।

তিনি কোথায় থাকেন?

তিনি সব জায়গাতে, সব মানুষের মধ্যে আছেন, এমন কি এখানেও আছেন।

বৃদ্ধা বলল, এখানে তিনি নেই। থাকলে আমাদের বিশ্রামের কথা বলতেন না।

টম দেখল, আত্মবিশ্বাসহীন অনিশ্চিত এই সব মানুষগুলো শুধু সারাজীবন পশুর মত খেটে চলেছে আর সব অত্যাচার, অবিচার মুখ বুজে সহ্য করে চলেছে। এদের মধ্যে বিশ্বাস জাগানো কঠিন।

খাওয়ার পর তারা রান্নাঘরে গিয়ে খড়ের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। সমস্ত ঘরখানা লোকে ভরা।

২০

তুলো তোলার কাজ এমন কঠিন না হলেও সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। রোদে পুড়ে জলে ভিজে। লেগ্রি লক্ষ্য করল, টম লোকটা যেমন কর্মঠ তেমনি বিশ্বস্ত। সব কাজেই ও দক্ষ। নিজে কোথাও গেলে টমের উপর চাষ আবাদের কাজ দেখাশোনার ভার দিয়ে নিশ্চন্ত হতে পারবে।

কিন্তু টমের মনটা উদার আর মহৎ। সে পরের দুঃখ দেখতে পারে না। কাউকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া ত দূরের কথা। তাই লেগ্রি সংকল্প করল মনে মনে যেমন করে হোক নিষ্ঠুর করে তুলতে হবে টমের মনটাকে।

একদিন টম দেখল লুসি নামে যে নিগ্রো মহিলাটিকে সাম্বোর হাতে তুলে দিয়েছিল সেই মহিলাটি তুলো তুলছে তার পাশে লেগ্রি। সেদিন তাকে খুব দুর্বল অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তাকে দেখে মমতা হলো টমের। টম কিছু তুলো নিজের থলি থেকে লুসির থলেতে ভরে দিল।

লুসি ভয়ে ভয়ে বলল, না না দিও না, ওরা দেখতে পেলে আমাদের দুজনকেই মারধর করবে।

এমন সময় চাবুক দোলাতে দোলাতে সাম্বো এসে তা দেখতে পেয়ে লুসিকে আর টমকে হাতেনাতে ধরতে পেরে লুসির পেটে লাথি মারল আর টমের মুখে চাবুকের একটা ঘা বসিয়ে দিল।

লুসি সাম্বোর কথা শুনত না এবং তাকে দেখতে পারত না বলে সাম্বো তার দোষ ধরার জন্য সব সময় সজাগ থাকত। প্রথম থেকে রাগ ছিল তার উপর।

সাম্বোর লাথি খেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লুসি। নিষ্ঠুর সাম্বো তখন তার গায়ে একটা পিন ফুটিয়ে দিয়ে বলল, ওঠ বলছি, শয়তানি করে পার পাবি না আমার কাছে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে পড়ল লুসি। দেহের সব শক্তি প্রয়োগ করে কাজ করতে লাগল। সাম্বো চলে যেতে টম আবার সাবধানে কিছু তুলো লুসির থলেতে ভরে দিল।

সেদিন বিকালে দাস-দাসীরা সবাই আপন আপন তুলোর গাঁটটি জমা দিল। সকলের তুলো ওজন করে প্রতিটা নামের পাশে তুলোর পরিমাণগুলো

লিখে রাখা হলো। সব শেষে লেগ্রি টম আর লুসিকে পাশে দাঁড়াতে বলল। বাকি সবাইকে যেতে বলল। দেখা গেল টম আর লুসির তোলা তুলোর ওজন অন্য দিনকার মত ঠিকই আছে। তবু লেগ্রি লুসিকে বলল, তুই আবার কম তুলো তুলেছিস?

এবার লেগ্রি টমকে বলল, এদিকে আয়, সাধারণ কাজকর্মের জন্য তোকে কিনিনি এত টাকা দিয়ে। তোকে আমি সর্দার করব। আমি চাই আজ থেকেই কাজ শুরু করে দে। প্রথমে আমার কথামত লুসিকে চাবুক মার। আশা করি এত দিন দেখে দেখে কাজটা শিখে ফেলেছিস।

টম কিন্তু বিনীতভাবে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন হুজুর। ও কাজ আমি কখনো করিনি। কখনো করতে পারব না।

টমের গায়ে সজোরে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিয়ে লেগ্রি বলল, এখন তোকে এ কাজ করতে হবে।

টম বলল, আমি খাটতে পারি, আপনি যা কাজ দেবেন আমি ঠিক করে দেব। সারা দিনরাত পরিশ্রম করব। কিন্তু কারো উপর নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ করতে পারব না।

লেগ্রি রেগে গিয়ে কিল চড় ঘুষি মারতে লাগল টমকে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুই কি বলিস ঐ মেয়েটাকে চাবুক মারা অন্যায়?

টম বলল, হ্যাঁ হুজুর, ও অসুস্থ দুর্বল। আমাকে মেরে ফেললেও ওর গায়ে হাত তুলতে পারব না।

লেগ্রি বুট দিয়ে টমকে আবার একটা জোর লাথি মেরে বলল, তোকে আমি বারোশো ডলার গুনে দিয়ে কিনিনি? তুই দেহ মনে আমার নস?

টম তেমনি শান্তকণ্ঠে বলল, আমার দেহটা আপনি কিনেছেন ঠিক, কিন্তু আমার আত্মা কোনদিন কিনতে পারবেন না। সে আত্মা আমি রেখে দিয়েছি ঈশ্বরের জন্য।

লেগ্রি তখন সাম্বো আর কুইম্বোকে ডেকে বলল, এই কুকুরটাকে নিয়ে গিয়ে এমন চাবুক মারবি যাতে এক মাস ও উঠতে না পারে।

সাম্বো আর কুইম্বো টমকে নির্মমভাবে চাবুক মারার পর গুদাম ঘরের এক কোণে ফেলে রাখল। অসহ্য যন্ত্রণায় অন্ধকারে আর্তনাদ করতে লাগল টম। ক্ষতবিক্ষত দেহে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে বসায় যন্ত্রণা বেড়ে গেল আরো। তার উপর তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

এমন সময় লণ্ঠনের আলো হাতে কেসি নামে এক মূলাটো মহিলা এসে টমকে জল দিল।

আকণ্ঠ জলপান করে তৃষ্ণা মিটিয়ে টম বলল, ধন্যবাদ মিসিস।

কেসি বলল, আমাকে মিসিস বলো না, আমিও তোমার মত একজন হতভাগ্য ক্রীতদাসী।

কেসির টানা টানা চোখওয়ালা সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল টম। মনে হলো কোথায় যেন দেখেছে সে মুখ। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। বছর চল্লিশ বয়স।

কেসি বলল, আমার নাম কেসি। বৈঠকখানার জানালার ফাঁক দিয়ে আমি সব দেখেছি। মনে হলো এখানে মানুষ বলতে একমাত্র তুমিই আছ।

একটা তুলোর গাঁটকে খুলে সেটা গদির মত পেতে কেসি বলল, এইখানে গড়িয়ে শুয়ে পড় টমকাকা।

চমকে উঠল টম। মাস্টার জর্জ আর ইভা ছাড়া এ নামে আর কেউ ডাকেনি তাকে।

কেসি বলল, তুমি ওদের চেন না টমকাকা। আমি পাঁচ বছর আছি এখানে। ওই শয়তান লোকটাকে আমার দেহ মন সব বিলিয়ে দিয়েছি। তবু আমি সব থেকে ঘৃণা করি। তুমি বরং ওর কথা মেনে চল। তা না হলে ও তোমাকে ছাড়বে না। দরকার হলে হত্যা পর্যন্ত করবে। এমিলিও তোমার মত প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কি লাভ তাতে?

টম বলল, কিন্তু কি করে তা সম্ভব? হা ভগবান!

মিছিমিছি ভগবানকে ডেকে লাভ নেই। তিনি আমাদের কথা শুনতে পান না। আমার বিশ্বাস ঈশ্বর নেই। থাকলেও তিনি আমাদের বিরুদ্ধে। আমাদের কেউ নন তিনি।

টম বলল, একদিন আমারও সব ছিল। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ঘরবাড়ি, দয়ালু মনিব। পরে আমাকে যেখানে বিক্রি করা হয় সে মনিবও খুব দয়ালু ছিলেন। তিনি আর মাত্র দিনকতক বেঁচে থাকলে আমি মুক্তি পেতাম। তিনি নিজে থেকে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সব আশা নির্মূল হয়ে গেল। তবু আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইনি।

কেসি নীরবে তাকিয়ে রইল টমের মুখপানে।

টম বলল, জেনে রাখো মিসিস, ঈশ্বর আমাদের বিরুদ্ধে নন। ঈশ্বরের আপন সন্তানের জীবনে কি ঘটেছিল তা একবার ভেবে দেখ। তাঁকে

কি কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে আস্তাবলে জন্মাতে হয়নি? তিনি কি সারাজীবন গরীব ছিলেন না আমাদের মত? তাকে ভেড়ার চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতে হয়নি সারাজীবন? তাঁকেও কি আমাদের মত নির্যাতন সহ্য করে মরতে হয়নি? আমরা যদি চাই তাহলে উনি নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন।

কেসি বলল, কিন্তু কেন আমাদের এমন জায়গায় এনে ফেললেন, যেখানে পাপ করতে বাধ্য হতে হয় আমাদের?

আমরা বাধ্য নাও হতে পারি। মরতে হয় মরব তবু আমি পাপ করব না। ঈশ্বর আমাকে শক্তি দেবেন।

কেসি টমের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, একদিন তোমার মত আমিও ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম। আমার বাবা ছিল শ্বেতাঙ্গ, মা ক্রীতদাসী। জন্মের পর স্বচ্ছলতা আর প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হই। একটু বড় হলে আমাকে কনভেন্টে ভর্তি করে দেওয়া হয়। পড়াশুনোয় আমি ছিলাম ক্লাসের সবার উপরে। আমাদের বাড়ি ছিল নিউ অর্লিয়ান্সে। কিন্তু আমার বাবা হঠাৎ কলেরায় মারা যাওয়ায় একমাত্র আমাকে ছাড়া সব চাকর বাকরদের ও বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হয়। হেনরি নামে এক সুদর্শন তরুণবয়স্ক উকিল প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ি। আমি তাকে ভালবাসি। সেও আমাকে ভালবেসে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল আমায়। কিন্তু সে আমাকে বিয়ে করেনি। আমাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়। হেনরি আমাকে বলল, আমি নাকি লুসিয়ানার সবচেয়ে রূপসী মহিলা।

বেশ কিছুকাল সুখেই কাটল আমার। পরে হেনরি একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তার এক খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেয় আমায়। ছেলেমেয়েদুটি আমার সঙ্গেই গেল। আমি সেই লোকটাকে ঘৃণা করতাম। তবু তার বিরোধিতা করার সাহস পেতাম না। কারণ ভয় দেখাত তার কথা না শুনলে আমার ছেলেমেয়েকে বিক্রি করে দেবে। কিন্তু এত করেও কিছু হলো না। আমাকে না জানিয়েই ছেলেমেয়েদুটোকে বিক্রি করে দিল লোকটা। আমি তখন বাঘিনীর মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলাম। তখন সে আমাকে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট নামে একটি লোকের কাছে বিক্রি করে দেয়। স্টুয়ার্ট আমাকে অবশ্য সহানুভূতির চোখে দেখত। সে আমার ছেলেমেয়ের খোঁজ করে। তারই কাছে জানতে পারি আমার মেয়ে এলিজাকে কেণ্টাকির এক ভদ্র পরিবারে বিক্রি করা হয়েছে এবং সে ভালই আছে। কিন্তু স্টুয়ার্টের কাছে থাকলেও সে সুখ আমার সইল না। এক মড়কে স্টুয়ার্ট মারা যেতেই লেগ্রি

নামে এই জঘন্য লোকটা স্টুয়ার্টের সব সম্পত্তির সঙ্গে আমাকেও কিনে নেয়। স্টুয়ার্ট আমাকে কেনার আগে আমার আর একটি সন্তান হয়েছিল হেনরির ভাই-এর কাছে থাকার সময়। কিন্তু আমি তাকে দাসত্ব থেকে চিরতরে মুক্তি দেবার জন্য নদীর জলে ভাসিয়ে দিই।

এর পরেও কে বলবে টমকাকা ঈশ্বর আছেন ?

হ্যাঁ কেসি, আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আছেন।

তবে কেন এই সব অত্যাচারীদের শাস্তি দেন না তিনি ?

টম শান্তকণ্ঠে বলল, শেষ বিচারের দিন উনি সব অপরাধীদেরই শাস্তি দেবেন।

কেসির চোখদুটো আগুনের মত জ্বলতে লাগল। সে বলল, একদিন আমিও প্রার্থনা করতাম। আমার হৃদয়টাকে পাষাণ করে দিয়েছে এই শয়তানটা। এক এক সময় মনে হয় গলা টিপে খুন করে ফেলি লোকটাকে।

টম বলল, একথা বলো না। তুমি শুধু একটিবার ক্ষমা চাও ঈশ্বরের কাছে।

কেসি বলল, আর কথা বলতে হবে না তোমায় টমকাকা। তুমি ঘুমোও।

এই বলে সব জলটুকু খাইয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কেসি ঘর থেকে।

২১

সেদিন সাইমন লেগ্রি তার বৈঠকখানা ঘরে একটা চেয়ারে বসে আর একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে চুরুট টানছিল। কেসি তার পাশে দাঁড়িয়েছিল মুখ ভার করে।

কেসির উপর মাঝে মাঝে অত্যাচার করলেও তাকে ভয় করত লেগ্রি। একমাত্র কেসিই তার মুখের উপর প্রতিবাদ করতে পারত কোন বিষয়ে।

সেদিন কেসি লেগ্রির কাছে আবেদন জানাতে এসেছিল টমের জন্য।

কেসির কথা শুনে লেগ্রি বলল, তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ।

কেসি বলল, টম ছিল তোমার সবচেয়ে ভাল কর্মী। কিন্তু তুমি ওকে মেরে শয্যাশায়ী করে ফেলে দিলে। বলত এই তুলোর মরশুমে কত ক্ষতি হলো তোমার। তা যদি করবে তবে বারোশো ডলার দিয়ে কিনে আনলে কেন ?

সেটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ও যদি মিথ্যা গোঁ বজায় রাখার চেষ্টা করে তাহলে আমি সে গোঁ ভেঙ্গে দেবই।

ওর গোঁ তুমি ভাঙ্গতে পারবে ?

না পারি ওর সব হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

এমন সময় সাম্বো টমের গলায় যে ফুটো করা ডলারটা বাঁধা ছিল এবং যার মধ্যে ইভার একগাছি লম্বা চুল ছিল সেইটা এনে লেগ্রিকে দিল।

লেগ্রি তা হাতে নিয়ে লাফিয়ে উঠে সাম্বোকে বলল, ওটা ফেলে দে। চুলটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দে। এই কুকুর, আর কোনদিন এসব জিনিস আনবি না আমার কাছে।

চুলের গাছিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে ওঠে লেগ্রি। কারণ অতীতের একটা দুঃসহ স্মৃতি ছবিতে ভেসে ওঠে তার মনের সামনে। ছেলেবেলা থেকেই সাইমন লেগ্রি ছিল তার বাবার মত দুর্বার ও দুরন্ত প্রকৃতির। তার স্বভাবটা ছিল বরাবরই নিষ্ঠুর। বড় হয়ে সে মদ ধরে। সে প্রায়ই মাতাল হয়ে উঠত মদ খেয়ে। মাঝে মাঝে কাউকে কিছু না বলে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়ত। আবার হঠাৎ একদিন ফিরে আসত। তার মা তার স্বভাবের পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করত ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি তাতে। একদিন বাড়ি থেকে চলে যাবার অনেক দিন পরে হঠাৎ ফিরে আসে লেগ্রি। তখন সে মাতাল অবস্থায় ছিল। তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে। একদিন আবার সমুদ্রে যেতে চায় লেগ্রি। তার মা তাকে নিষেধ করে, তার হাত ধরে অনুনয় বিনয় করে। কিন্তু লেগ্রি মাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে জাহাজে গিয়ে ওঠে। দিন কতক পর জাহাজে একটা খামের চিঠি পায় লেগ্রি। খাম খুলে দেখে ছোট কাগজের সঙ্গে একগাছি সোনালি চুল। কাগজে লেখা ছিল তার মা মারা গেছে। মৃত্যুকালে তার মা তাকে ক্ষমা করে গেছে।

এতদিন পরে একগাছি মেয়েমানুষের মাথার চুল দেখে হঠাৎ লেগ্রির মনে হলো মা তাহলে হয়ত তাকে ক্ষমা করেনি। তাই সেই চুলটা আবার ফিরে এসেছে তার কাছে।

সেদিন তখনো ভাল করে ভোর হয়নি। শুকতারাটা তখনো জ্বলজ্বল করছিল মাথার উপরে। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল টম। এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল লেগ্রি।

টমকে একটা লাথি মেরে লেগ্রি বলল, কিরে, তোর শিক্ষা হয়েছে ? তোর সাধ মিটেছে না আমাকে আবার জ্ঞান দিতে আসবি ?

টম কোন জবাব দিল না।

লেগ্রি আবার একটা লাথি মেরে বলল উঠে দাঁড়া।

টম তখনো যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছিল। তার উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। সে ওঠবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছিল না।

লেগ্রি তা দেখে হেসে বলল, কিরে উঠতে পারছিস না ?

টম কোনরকমে শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ায় তার মনিবের সামনে।

লেগ্রি এবার খুশি হয়ে বলল, এবার হাঁটু মুড়ে বসে গতকালের সকালের জন্য ক্ষমা চা।

টম একটুও নড়ল না। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

লেগ্রি বলল, এই কুকুর বস।

টম শান্তভাবে বলল, ক্ষমা চাইতে আমি পারি না হুজুর। যা ন্যায় বলে আমার মনে হয়েছে তাই করেছি আমি। ভবিষ্যতেও তাই করব। যাই ঘটুক, আমি কোন অন্যায় কাজ করতে পারব না।

কিন্তু এর ফল কি হবে ভাবতে পারছিস না। তুই ভেবেছিস এই শাস্তিই যথেষ্ট। কিন্তু এ কিছুই নয়। ধর, তোকে যদি গাছের গুড়ির সঙ্গে বেঁধে চারপাশে আগুন লাগিয়ে দিই তাহলে কি হবে ?

টম তেমনি শান্ত ও নির্বিকারভাবে বলল, আপনি এর থেকে ভয়ঙ্কর কিছু করতেও পারেন। কিন্তু আপনি শুধু আমার দেহটাকে খুন করবেন। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। আমি মিশে যাব অনন্তের সঙ্গে।

'অনন্ত' কথাটা শুনে লেগ্রির পাথরের মত শক্ত বুকটাও একটু কেঁপে উঠল। সে কোনরকমে নিজেকে সামলে রাখল দাঁতে দাঁত চেপে।

টম বলল, হুজুর, আপনি আমায় কিনেছেন। আমি চিরকাল আপনার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চাই। আপনি আমায় যা কাজ দেবেন যথাশক্তি করব। কিন্তু আমার হৃদয় আমার আত্মা পৃথিবীর কোন মানুষকে দিতে পারি না। আমি তা তুলে রেখেছি ঈশ্বরের কাছে। আমি তা ঈশ্বরের কাছেই উৎসর্গ করব। হুজুর, আপনি আমায় যত খুশি চাবুক মারতে পারেন, জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে পারেন, কিন্তু কোন কিছুতেই ভয় পাই না। আপনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি মেরে ফেলবেন তত তাড়াতাড়ি আমি ইশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব।

প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে লেগ্রি বলল, আমি তোকে হার মানাবই।

আপনি তা কোনদিন পারবেন না হুজুর। ঈশ্বর আমায় সাহায্য করবেন।

আমি দেখিয়ে দেব ঈশ্বর তোকে কি করে সাহায্য করে। এই কুকুর বল।

এই বলে ঘুঁষি মেরে টমকে ফেলে দিল লেগ্রি।

ঠিক এমন সময় কার একটা হাতের স্পর্শে চমকে উঠল লেগ্রি। মুখ ঘুরিয়ে দেখল কেসি।

কেসি বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ? মাঠে এখন তুলো তোলার সময়। আর তুমি কাজের লোকটাকে আধমরা করে রাখতে চাইছ।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বুঝতে পারল লেগ্রি। তাই সে কেসিকে বলল, আজ তুমি ছিলে তাই এ যাত্রায় বেঁচে গেল ও। তা না হলে আজ আমি মেরে ফেলতাম ওকে।

এর পর টমকে বলল, এখন কাজের চাপ। লোক দরকার। তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমি পরে দেখব তুই আমার কথা মেনে চলিস কিনা।

এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লেগ্রি।

কেসি বলল, আমি বলিনি টমকাকা, ও আবার আসবে। কিছুতেই ছাড়বে না।

টম বলল, স্বর্গ থেকে দেবদূত এসে সিংহের মুখ বন্ধ করে দিল।

কিন্তু সে শুধু এ বারের জন্য। শিকারী কুকুরের মত ও তোমার টুঁটি কামড়ে ধরে তোমার দেহের রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষে নেবে।

টম বলল, ঈশ্বর আমায় সাহায্য করবেন।

টম যতই বুঝতে পারছিল তার অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে ততই সে দুঃসাহসী হয়ে উঠছিল। ততই মনে হচ্ছিল সে সব অত্যাচার বুক পেতে হাসি মুখে সহ্য করতে পারবে।

টমের দেহের ক্ষতস্থানগুলি ভাল শুকোতে না শুকোতে তাকে তুলো তোলার কাজে পাঠিয়ে দিল লেগ্রি। এখন হাতের কাজের চাপ এত বেশী যে রাত্রিতে ফিরে বাইবেলটা নিয়ে একবার বসতেও পারে না। সমস্ত দেহ এক নিবিড় অবসাদে ভরে যায়। কোনরকমে রুটিটা তৈরি করেই খেয়ে শুয়ে পড়ে।

আঘাতে আঘাতে টমের ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তিটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। চোখের সামনে কত অত্যাচার কত নির্যাতন নিপীড়ন সে দেখেছে। কিন্তু ঈশ্বর ত অত্যাচারীকে কোন শাস্তি দিচ্ছেন না। তিনি ত নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে কোন সাহায্য করছেন না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল সেই একই ভাবে। সেন্ট ক্লেয়ারের বাড়ি থেকে ওফেলিয়াকে দিয়ে মিসেস শেলবির কাছে একটা

চিঠি পাঠিয়েছিল সে। তার ধারণা ছিল ঈশ্বর অবশ্যই তাকে উদ্ধার করার জন্য কাউকে পাঠাবেনই।

কিন্তু তার পরও ত কতদিন কেটে গেল। মাসের পর মাস ব্যাকুল প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কেউ তাকে উদ্ধার করতে এল না।

সেদিন রাত্রিতে কাজ থেকে ফিরে রুটি তৈরি করার পর উনোনের আগুনের স্বল্প আলোয় বাইবেলটা নিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল টম। কিন্তু ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। এমন সময় লেগ্রি এসে বলল, বইখানা কেন ধরে রেখেছিল? দেখলি ত ওতে কোন কাজ হবে না। জঞ্জালের মত ওটাকে আগলে না রেখে ফেলে দে।

টম বলল, না হুজুর, ওটা আমি ফেলতে পারব না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বিশ্বাস হারাব না।

আমিও দেখব তুই হারাস কি না।

এই বলে টমের গায়ে থুতু ফেলে চলে গেল লেগ্রি।

সেদিন গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন টম জানালা দিয়ে চাঁদের আলোভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল স্তব্ধ হয়ে।

এমন সময় হঠাৎ কেসি এসে সরাসরি তাকে বলল, তুমি মুক্তি চাও ত টমকাকা?

চাই বৈকি কেসি। কিন্তু ঈশ্বরের কবে যে সময় হবে তা তিনিই জানেন।

কেসি বলল, তুমি চাইলে আজ রাতেই মুক্তি পেতে পার। এস আমার সঙ্গে।

টম কিছু বুঝতে না পেরে ইতস্তত করতে লাগল।

কেসি বলল, কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এস এখন গাড়ির ভিতরটা ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। আজ ওর মদে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি। ঘরের দরজা খোলা। খিড়কির দরজাও খোলা আছে। ঘরে আছে একটা ধারাল কুড়ুল। আমার হাতজুটো দুর্বল বলে পারব না। তুমি এস টমকাকা।

পাথরের প্রতিমূর্তির মত নিথর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে টম। বলল, না, তা আমি পারব না।

কেসি বলল, শুধু তুমি আমি নই, সব দাসাদাসীই মুক্তি পাবে। এই জলাভূমির ওপারে ছোট ছোট নির্জন কতকগুলী দ্বীপ আছে। আমরা সেখানে গিয়ে বাস করতে পারি।

টম বলল, না এই ধরনের রক্তক্ষয়ী কোন অশুভ উপায়ে কোন ভাল কাজ

শুভ কাজ হতে পারে না। ঈশ্বরের কোন সন্তানের রক্তপাত আমি করতে পারব না।

আমি তাহলে একাই করব।

এই বলে কেসি যাবার জন্য উদ্যত হতেই টম তার হাত দুটো ধরল। বলল, না মিসিস, একাজ করো না। যাতে তাঁর সন্তানদের গায়ে রক্ত না ঝরে তার জন্য প্রভু নিজের গা হতে রক্ত ঝরিয়েছেন। তাঁর প্রাণ দিয়েছেন। আমরা তাঁর মত শত্রুকে ভালবাসব।

হেসে উঠল কেসি।

টম বলল, তার থেকে এক কাজ করো। রক্তপাত না ঘটিয়ে তুমি বরং এমিলিনকে নিয়ে চলে যাও।

কেসি বলল, কিন্তু তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে?

টম বলল, ঈশ্বর আমাকে এই সব হতভাগ্য মানুষদের মাঝে পাঠিয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই থাকব। এদেরই সঙ্গে আমি যন্ত্রণার ক্রুশকাঠটাকে তুলে বেড়াব। তোমাদের কথা আলাদা। তোমরা যেতে পার।

টম একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, তোমার মেয়ে এলিজা যখন জানতে পারে মনিব তার ছেলেটাকে বিক্রি করে দিয়েছে তখন সে কোন এক রাতে পালিয়ে যায়।

কেসি আশ্চর্য হয়ে বলল. এলিজাকে তুমি চিনতে?

চিনতাম মানে? সে ছিল আমার সন্তানের থেকে বড়। আমি ছিলাম তার আদরের টমকাকা। অবশ্য আমাদের মনিব দেনার দায়েই আমাদের বিক্রি করতে বাধ্য হন। এলিজা তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কানাডায় চলে যায়। সে এখন সুখেই আছে।

অবশেষে কেসি টমের হাতদুটো ধরে বলল, তাহলে কি আমি সত্যিই চলে যাব টমকাকা?

টম জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করুন।

২২

কেসি আর এমিলিনের পালিয়ে যাবার খবরটা জানাজানি হয়ে যেতে সব ক্রীতদাসরা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। যে সব ক্রীতদাস নিজে থেকে লেগ্রির হয়ে পলাতকদের খোঁজ করতে লাগল, লেগ্রি দেখল টম তাদের দলে নেই। সে আরো লক্ষ্য করল খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টমের মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল

হয়ে উঠল। সে দুহাত উপরে তুলে ঈশ্বরের কাছে যেন করুণা ভিক্ষা করল।

সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসার পর হতাশার থেকে টমের প্রতি ঘৃণায় অন্তরটা ভরে উঠল তার।

পরদিন সকালে আশপাশের অঞ্চলের অনেক মালিক তাদের চাকরবাকর নিয়ে লেগ্রিকে সাহায্য করতে এল। অনুসন্ধান কারীদের একটা দল বন্দুক আর সেই ভয়ঙ্কর কুকুরগুলো নিয়ে পলাতকদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। লেগ্রিও তাদের সঙ্গে গেল।

কিন্তু সারাদিন খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না তাদের। সন্ধ্যায় ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে লেগ্রি সোজা বৈঠকখানায় চলে গেল। ক্রুদ্ধস্বরে বলল, টমকে এখানে নিয়ে আয়। এই ঘটনার মূলে আছে শয়তানটা। আমি ওর কাছ থেকে জানতে চাই আসল ব্যাপারটা কি।

সাম্বো আর কুইম্বো পরস্পরকে ঘৃণা করত। কিন্তু টমকে ওরা হিংসা করত দুজনেই। তাই বিপুল উৎসাহের সঙ্গে টমকে ধরে নিয়ে এল ওরা।

ব্যাপারটা আগে হতেই অনুমান করতে পেরেছিল টম। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। কে যেন তার ভিতর থেকে বলে দিল, ওদের তুমি ভয় করো না টম। ওরা শুধু তোমার দেহটা খুন করতে পারে। তার বেশী কিছু করতে পারবে না।

টম বুঝতে পারল তার অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে।

টম কাছে আসতেই তার জামার কলারটা ধরে লেগ্রি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, এই কুকুর। যদি না বলিস ওরা কোথায় পালিয়েছে তাহলে তোকে আজ খুন করে ফেলব।

টম কোন জবাব দিল না।

কিরে কুকুর, শুনতে পাচ্ছিস না?

আমার বলার কিছু নেই হুজুর।

টম শান্ত ও নিস্পৃহ কণ্ঠে কথাটা বলায় আরো রেগে গেল লেগ্রি। বলল, বল তুই কিছু জানিস না?

হয়ত কিছু জানি হুজুর। কিন্তু বলব না।

টমকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লেগ্রি বলল, সেবার ছেড়ে দিয়েছি, আজ ছাড়ব না। হয় আমি জিতব না হয় তোকে খুন করব।

টম শান্ত কণ্ঠে বলল, হুজুর, আপনি অসুস্থ হলে আপনাকে বাঁচাবার

জন্য আমি আমার দেহের সব রক্ত দান করতাম। কিন্তু আপনি এই জঘন্য পাপ কাজটা করবেন না। তাতে আপনার কষ্টই বেশী হবে। অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি পাবেন না আপনি।

টমের কথা বলার ভঙ্গিতে প্রথমে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় লেগ্রি। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। এর পর লেগ্রি, সাম্বো আর কুইম্বো পালা করে তিনজনে সমানে চাবুক মেরে যেতে লাগল টমকে।

একসময় সাম্বো বিচলিত হয়ে লেগ্রিকে বলল, শেষ হয়ে এসেছে, এবার ওকে ছেড়ে দিন হুজুর।

লেগ্রি বলল, যতক্ষণ না ও নিজের মুখে স্বীকার করছে ওকে চাবুক মেরে যা।

মাটিতে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে একবার চোখ মেলে টম বলল, সত্যিই হতভাগ্য হুজুর। আপনি আর আমার কিছুই করতে পারবেন না। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ক্ষমা করে গেলাম আপনাকে।

এই কথাটা বলেই অচৈতন্য হয়ে পড়ল টম।

লেগ্রি টমের মুখের উপর ঝুঁকে বলল, যাক আপদটা এতক্ষণে বিদায় হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ওর মুখটা অন্তত বন্ধ হলো।

মুখে একথাটা বললেও জীবনে আজ প্রথম পরাজয়ের একটা দুর্বিসহ গ্লানি অনুভব করল লেগ্রি।

টমের কথাগুলো সাম্বো আর কুইম্বোর মত বর্বর নিষ্ঠুর মানুষদুটোকে গভীরভাবে নাড়া দিল। লেগ্রি উপরে উঠে গেলে তারা টমের অচেতন দেহটার কাছে নতজানু হয়ে বলল, আমরা সত্যিই অন্যায় করেছি। ওর কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

এর পর ওরা দুজনে টমের ক্ষতস্থানগুলো পরিস্কার করে তুলোর বস্তা আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে একটা বিছানা পেতে শুইয়ে দিল টমকে। তারপর ব্রাণ্ডির বোতল থেকে কিছুটা ব্রাণ্ডি নিয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে টমের মুখটা খুলে ঢেলে দিল তার মধ্যে।

টমকে ডাকাডাকি করতে ধীরে ধীরে চোখ মেলল টম। ওরা বলল, আমরা সত্যিই তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি টম। আমাদের ক্ষমা করো।

টম বলল, আমি তোমাদের ক্ষমা করে গেলাম। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

সাম্বো বলল আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন বিশ্বাস করি তুমি বললে আমাদের ক্ষমা করবেন ঈশ্বর।

ওদের চোখে জল এল।

২৩

এই ঘটনার দুদিন পর তরুণ যুবক জর্জ শেলবি একটা এক্কা গাড়িতে করে বাড়ির সামনে এসে বাড়ির মালিকের খোঁজ করতে লাগল।

ওফেলিয়ার চিঠিটা দেরিতে পান মিসেস শেলবি। মিস্টার শেলবি তখন মৃত্যুশয্যায়। জর্জ তখন বড় হয়ে সব কাজ কারবার দেখাশোনা করছে। ক্লো কাজ করে যা টাকা পেয়েছিল সব এনে স্বামীর মুক্তির জন্য তুলে দেয় মিসেস শেলবির হাতে। তার সঙ্গে আরো কিছু টাকা দিয়ে জর্জকে তিনি পাঠিয়ে দেন টমকে মুক্ত করে আনার জন্য। টমের খোঁজ পেতে দেরি হয়ে যায়। জর্জ প্রথমে নিউ অর্লিয়ান্সে যায়। সেখানে শুনতে পায় হাটে জর্জকে বিক্রি করা হয়েছিল। তারপর তার নতুন মনিব রেড নদীর উপর দিয়ে স্টীমারে করে কোথায় নিয়ে যায় তা জানতে পারল না। অবশেষে টাকা দিয়ে লোক লাগিয়ে অনেক চেষ্টার পর সাইমন লেগ্রির বাড়িতে আসে জর্জ।

লেগ্রি তখন মাতাল অবস্থায় বৈঠকখানায় বসেছিল। জর্জ এসে তাকে বলল, টম নামে এক ক্রীতদাসকে আপনি কিনেছিলেন। সে আগে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। আমি তাকে কিনে নিয়ে যেতে এসেছি।

লেগ্রি সোজা হয়ে বসে বলল, হ্যাঁ, আমি তাকে কিনেছিলাম ঠিক, কিন্তু পাজী কুকুরটার জন্য আমার দুজন ক্রীতদাসীকে হারাতে হয়েছে যার দাম হাজার ডলার। ও সব জানত। কিন্তু শয়তানটা বলল, জানি, কিন্তু বলব না। তখন রাগের মাথায় ওকে এমন চাবুক মারলাম যে ও এখন নড়তেই পারছে না।

জর্জ বলল, ও কোথায়? আমি কি একবার দেখা করতে পারি ওর সঙ্গে?

একটি ছেলে বলল, ঐ চালাঘরটায়।

লেগ্রি ছেলেটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল। জর্জ সোজা সেই চালাঘরে চলে গেল।

জর্জ দেখল টমের তখন শেষ অবস্থা। সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত। নড়বার শক্তি নেই। কোনরকমে প্রাণটা টিকে আছে দেহের মধ্যে। চোখ বন্ধ করে অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে আছে।

টমের পাশে বসে জর্জ ডাকল, টমকাকা! প্রিয় টমকাকা আমার। একবার চোখ মেলে দেখ তোমার সেই আদরের মাস্টার জর্জ এসেছে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল টম, মাস্টার জর্জ।

তারপর বিহ্বলতা কাটিয়ে বলল, ঈশ্বর আমায় করুণা করেছেন। আমি জানতাম ওরা আমায় ভোলেনি। আজ আমার খুব ভাল লাগছে। এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব।

জর্জ বলল, তুমি মরবে না টমকাকা। আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে মাস্টার জর্জ। ঈশ্বর আমায় কিনে নিয়েছেন।

জর্জের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কাঁদ কাঁদ গলায় সে বলল, না না, তুমি মরো না টমকাকা। তাহলে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে।

টম বলল, ক্লোকে এই সব কথা বলো না। ও বড় কষ্ট পাবে। তাকে বলবে স্বর্গ আমায় নিতে এসেছে। ঈশ্বর সবসময় আমার পাশে ছিলেন। মাস্টার, মিসিস, ওখানকার সবাইকে আমার ভালবাসা দিও। ওদের বলবে পৃথিবীর সব মানুষকে আমি ভালবাসি।

জর্জ বলল, ওঃ, শয়তান লেগ্রিটাকে আমি যদি গলা টিপে মারতে পারতাম।

জর্জের হাত দুটো অতি কষ্টে ধরে টম বলল, ওকথা বলো না মাস্টার জর্জ। ও আমার উপকার করেছে। স্বর্গের দুয়ারটাকে তাড়াতাড়ি খুলে দিয়েছে আমার সামনে।

এবার টমের শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। মুখের সব দীপ্তিটুকু মুছে গিয়ে মৃত্যুর ছায়া নেমে এল। টম শুধু একবার অস্ফুট স্বরে বলল. হা ঈশ্বর।

তারপরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে গভীর অন্তহীন ঘুমে ঢলে পড়ল।

প্রচণ্ড ঘৃণা আর রাগে কাঁপতে কাঁপতে লেগ্রির কাছে ফিরে গেল জর্জ। সে বলল, টমের মৃতদেহটার জন্য কত দিতে হবে? আমি ওকে ভদ্রভাবে কবর দিতে চাই। লেগ্রি বলল, মরা মানুষকে আমি বেচি না। আপনি যা খুশি করতে পারেন।

এই সরল নিষ্পাপ মানুষকে খুন করার জন্য আদালতে আমি মামলা করব আপনার নামে।

লেগ্রি তখন দাঁড়িয়ে চুরুট টানছিল। সে তাচ্ছিল্যভরে বলল, আদালতে কিছু হবে না। কারণ এ অঞ্চলের কোন শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী দেবে না। নিগ্রোদের সাক্ষীতে কিছু হবে না।

জর্জ এবার লেগ্রির মুখে জোর একটা ঘুঁষি মারতেই সে ঘুরে পড়ে গেল। সে উঠতে পারল না মাটি থেকে। ওর নিগ্রো ক্রীতদাসরা কেউ এগিয়ে এল না তার সাহায্যে। তারা বরং জর্জকে খাতির করতে লাগল। টমের দেহটা গাড়িতে চাপাতে সাহায্য করল। জর্জ তার কোটটা খুলে চাপিয়ে দিল টমের উপর।

এক্কা গাড়িতে করে টমের মৃতদেহটা নিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল। কয়েকজন ক্রীতদাস তার সঙ্গে কবর দেওয়ার কাজে সাহায্য করতে গেল।

শহরের বাইরে চাষের জমিগুলোর শেষ প্রান্তে ছায়াঘেরা বালির একটা টিলা দেখতে পেল জর্জ। জায়গাটা বেশ শান্ত এবং নির্জন। জায়গা পছন্দ হলো জর্জের। নিগ্রোরা টমের মৃতদেহটা নামাল। জর্জ কোদাল নিয়ে নিজে খুঁড়তে লাগল। কবরের মধ্যে মৃতদেহটা শুইয়ে দিয়ে তার উপর কোটটা চাপা দিয়ে দিল।

কবর দেওয়ার কাজ হয়ে গেলে জর্জ নিগ্রোদের প্রত্যেককে কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে বলল, তোমাদের বিশ্বস্ততার পুরস্কার।

এরপর টমের কবরের সামনে নতজানু হয়ে বসে জর্জ বলল, তোমার জন্য প্রতিজ্ঞা করছি, দেশ থেকে অভিশপ্ত দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্য একটা মানুষের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব আমি তা করব।

জর্জ সব কাজ সেরে বাড়িতে তার মাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল কোন তারিখে কখন সে বাড়ি পৌছবে। শুধু একটা লাইন ছাড়া আর কিছুই লেখেনি।

মিসেস শেলবি ভাবলেন জর্জ বোধহয় টমকে নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। কিন্তু টমের কথা চিঠিতে কিছু লেখা ছিল না বলে ক্লোর মনে সন্দেহ হলো। মিসেস শেলবি বাইরে প্রকাশ না করলেও তাঁর মনেও সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটেছে।

ক্লো একবার জিজ্ঞাসা করল, মাস্টার জর্জ টাকা নিয়ে গেছে ত ?

মিসেস শেলবি বললেন, তোমার জমানো টাকা ছাড়াও আমি আরো বেশী টাকা দিয়েছিলাম।

এমন সময় জর্জ ফিরে এসে সব টাকা টেবিলের উপর নামিয়ে দিল। তারপর ক্লোর হাত ধরে জর্জ কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি আমাকে ক্ষমা করো ক্লোকাকি, টমকাকাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছে।

ক্লো বলল, এমনটা হবে আমি জানতাম।

মিসেস শেলবি সান্ত্বনা দিতে লাগলেন ক্লোকে।

মিস্টার শেলবির মৃত্যুর পর জর্জই কাজ কারবারের অনেক উন্নতি করেছে। দাসদাসীরা তার অধীনে ভালই আছে।

একদিন জর্জ তার খামারের কাজে নিযুক্ত সব দাসদাসীদের ডাকিয়ে তাদের হাতে এক একটি মুক্তিপত্র তুলে দিল।

কিন্তু দাসদাসীরা নিজে থেকে বলল, আমরা স্বাধীনতার থেকে অনেক ভাল আছি হুজুর। এত ভাল মনিবকে ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না।

জর্জ বলল, তোমরা যেমন কাজ করছ তেমনিই করবে, শুধু কাজের বিনিময়ে মজুরী পাবে এখন থেকে। আমি তোমাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করব। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে।

দাসদাসীরা একবাক্যে বলল, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন হুজুর।

জর্জ বলল, হে আমার বন্ধুগণ, টমকাকার কবরের সামনে নতজানু হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমার অধীনে আর কোন ক্রীতদাস রাখব না। সবাইকে মুক্তি দেব। আমার জন্য আর যেন তোমাদের কাউকে পুত্রপরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না হয়। তোমরা যেন কোনদিন টমকাকাকে ভুলো না। যখনি টমকাকার কবরটার দিকে তোমাদের চোখ পড়বে তখনি তার কথা মনে করে সেই মানুষটার মত সৎ ও বিশ্বাসী হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে, তার মত সুন্দর হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে।



রবিনসন ক্রুসো

ড্যানিয়েল ডিফো

আমার আসল নাম হলো রবিনসন ক্রুৎজেনার। কিন্তু ক্রুৎজেনার নামটা উচ্চারণ করা সুবিধা হবে না বলে সবাই বলত ক্রুসো। তাই লোকের মুখে মুখে আমার নামটা দাঁড়ায় রবিনসন ক্রুসো। আমার জন্ম হয় ১৬৩০ সালে ইয়র্কের এক বনেদী পরিবারে।

আমার বাবা আগে থাকতেন ব্রিটেনে। পরে ইয়র্কে এসে বিয়ে করে বসবাস করতে থাকেন। আমার বাবা ছিলেন প্রাচীনপন্থী মানুষ। বাল্যশিক্ষা শেষ করে আমি আইন নিয়ে পড়াশুনো করতে থাকি। কিন্তু পড়াশুনায় আমার মন বসল না কিছুতেই। সমুদ্র আমাকে সব সময় ডাকতে লাগল দুর্বার বেগে। আমি ঠিক করে ফেললাম কোন এক জাহাজের নাবিক হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াব। সীমাবদ্ধ বর্তমান জীবন বড়ই একঘেয়ে লাগছিল আমার।

অবশেষে কথাটা বাবা মার কানে তুলতে দুজনেই বাধা দিলেন। বাধা দেওয়ার কারণও ছিল। আমার আগে দুটি ছেলেকে হারিয়েছেন তাঁরা। আমার বড় দাদা ইংরেজ পদাতিক বাহিনীর কর্ণেল ছিল। স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ডানকার্কের কাছে এক জায়গায় মারা যায়। মেজ ভাইও বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। কোন যোগাযোগ নেই। বর্তমানে পরিবারের একমাত্র ছেলে আমি। আমাকে তাই ছাড়তে চাইছিলেন না বাবা মা।

আমিও কোনও সুযোগ পাচ্ছিলাম না। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। অবশেষে একটা সুযোগ জুটে গেল। হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বলল, আমাদের জাহাজ লণ্ডন যাবে। যাবি আমার সঙ্গে? ভাড়া লাগবে না।

সেদিন ছিল ১৬৫১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। বাবা মাকে না বলেই বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। দারুণ উৎসাহ আর উত্তেজনার সঙ্গে জাহাজে উঠে বসলাম। পরে বাবা মাকে খবরটা জানিয়ে দিলাম।

জাহাজ ছেড়ে দিল। জীবনে সমুদ্রযাত্রা এই প্রথম বলে ভয় করতে লাগল। ঢেউএর দোলায় জাহাজটা দুলতে থাকায় আমার শরীরটা খারাপ খারাপ মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল বাবা মার নিষেধ শুনিনি বলে হয়ত বিপদে পড়ব।

হাম্বার পার হতেই ঝড় উঠল সমুদ্রে। অসংখ্য উত্তাল ঢেউ আমাদের গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছিল। ক্রমে ঝড় আরো বাড়তে লাগল। প্রায় সারা রাত এইভাবে চলল। ভোরের দিকে শান্ত হলো সমুদ্র।

সকালে রোদ উঠল। আমার মনের সব ভয় কেটে গেল। আমার বন্ধু এসে বলল, আমরা এমন ঝড় বহু দেখেছি। তুই প্রথম দেখছিস বলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলি।

এরপর কয়দিন জাহাজটা ভালই চলল। ছয়দিনের দিন ইয়ারমাউথে পৌঁছলাম আমরা। আবহাওয়াটা ছিল চমৎকার। সমুদ্র ছিল শান্ত। তবে বাতাসটা বিপরীত দিক থেকে বইতে থাকায় বন্দর থেকে রওনা হতে পারল না কোন জাহাজ। ছ'সাতদিন অপেক্ষা করতে হলো আমাদের। আমাদের হাতে কোন কাজ ছিল না। চুপচাপ বসে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

কিন্তু পাঁচ দিনের দিন আবার ঝড় উঠল। আট দিনের দিন প্রচণ্ড হয়ে উঠল ঝড়ের বেগ। ঢেউগুলো উঁচু হয়ে উঠল পাহাড়ের মত। মনে হলো আমাদের জাহাজের নোঙর ছিঁড়ে জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অকূল সমুদ্রে। ক্যাপ্টেন ৭৬ নোঙর নামাতে বলল। ক্যাপ্টেন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগল। সারেংরা পাল আর মাস্তুল নামিয়ে দিল। ঝড়ের আঘাতে দুটো জাহাজ আমাদের জাহাজের কাছে এসে পড়েছে।

রাত গভীর হলে একদল নাবিক আবার চিৎকার করে বলল, আমাদের জাহাজটা ফুটো হয়ে গেছে। খোলের মধ্যে চারফুট জল। জল পাম্প করে বার করে দিতে হবে। ক্যাপ্টেন কামান দেগে বিপদের কথা সবাইকে জানাতে বলল। আমি নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলাম। ঝড় একটু কমলেও খোলের মধ্যে জল বেড়ে যেতে লাগল।

কামান দেগে সাহায্যের আবেদন জানাতে একটা নৌকো নিয়ে কয়েক-জন নাবিক আমাদের জাহাজটার কাছে এসে ভিড়ল। আমরা নৌকোটাতে উঠে পড়লাম। ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করতে করতে নৌকোটা ইয়ারমাউথ বন্দরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

আমরা জাহাজডুবি নাবিক বলে ইয়ারমাউথে পৌঁছতে সবাই খাতির করে আমাদের থাকতে জায়গা দিল। খাবার দিল। টাকা দিয়ে বলল, এই টাকা নিয়ে তোমরা স্থলপথে লণ্ডন চলে যাও।

আমি লণ্ডনে গিয়ে বাবা মার কাছে ফিরে গেলে ভাল করতাম। সুখে থাকতাম। কিন্তু ফিরে যেতে পারলাম না।

আমার যে বন্ধু প্রথমে আমাকে ডেকে জাহাজে করে নিয়ে যায়, আমাকে প্রথম ঘরছাড়া করে, ইয়ারমাউথে আসার পর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। মাঝখানে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। সে হলো ক্যাপ্টেনের ছেলে।

সে তার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, আমার এই বন্ধুর সমুদ্রযাত্রার বড় সখ।

তার বাবা ক্যাপ্টেন আমাকে বলল, সমুদ্রযাত্রা তোমার ঠিক হবে না। প্রথমেই বিপদ দেখা দিল। তুমি বড় অপয়া, অলুক্ষণে। তুমি যে জাহাজে চাপবে সে জাহাজে আমাকে হাজার পাউণ্ড দিলেও তাতে কাজ করব না।

আমার মনটা দমে গেল। আমি বাধ্য হয়ে স্থলপথে লণ্ডনের পথে রওনা হলাম। ভাবতে লাগলাম, কোথায় যাব? বাড়ি ফিরে যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আমি সমুদ্রযাত্রায় গিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারিনি। জাহাজডুবি হয়ে ফিরে এসেছি। এইভাবে দেশে ফিরে গেলে আমার ও আমার বাবার পক্ষে সেটা হবে দারুণ লজ্জার বিষয়।

এই সব ভাবতে ভাবতে সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছাটা আবার প্রবল হয়ে উঠল আমার মনে। আবার সমুদ্রযাত্রায় গিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের আশাটা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারলাম না আমি। তাই লণ্ডন থেকে একটা আফ্রিকা-গামী জাহাজে আবার চড়ে বসলাম জাহাজের কাজ নিয়ে। কিন্তু আমি শুধু মাস্তুলের কাজ ছাড়া আর কিছু শিখতে পারিনি। নাবিক হওয়া আমার দ্বারা হবে না।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে থাকাকালে জাহাজের একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। আমি যখন তাঁকে বলি, সমুদ্রপথে পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখার আমার খুব সখ, তখন তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। বলতেন, চলো আমার সঙ্গে। কোন খরচ তোমার লাগবে না। বরং দু একটা জিনিসও সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। আফ্রিকায় গিয়ে সুযোগ পেলে ব্যবসা করে কিছু পাবে।

এর আগে ইয়ারমাউথে জাহাজ ডুবি নাবিক হয়ে যে টাকা পেয়েছিলাম তাতে কিছু খেলনা কিনে বিক্রি করে চল্লিশ পাউণ্ড পেয়েছিলাম। তার উপর আত্মীয় স্বজনদের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠানোয় কিছু টাকা পাঠিয়েছিল। আমি খেলনা বেচা টাকা ও বাড়ি থেকে পাঠানো টাকা থেকে পৌনে ছ পাউণ্ড ওজনের সোনা কিনলাম।

ঠিক করলাম আফ্রিকায় গিয়ে ব্যবসা করব। হঠাৎ একদিন সেই সদাশয় ক্যাপ্টেন মারা গেলেন। আমার মনে হলো আমি আমার একজন পরম বন্ধুকে হারালাম।

ক্যাপ্টেনের স্ত্রীও আমাকে স্নেহ করতেন। সব মিলিয়ে আমার কাছে

ছিল তিনশো পাউণ্ড। তার মধ্যে নিজের কাছে একশো পাউণ্ড রেখে দুশো পাউণ্ড ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর কাছে রেখে এলাম।

কিন্তু আমার ভাগ্যটা সত্যিই খারাপ। আবার এক দুর্ঘটনা ঘটল। যার ফলে আফ্রিকা যাওয়া আমার আর হলো না। আমাদের জাহাজটা তখন চলছিল ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের দিকে। তার একদিকে ছিল আফ্রিকা আর একদিকে ছিল কতকগুলো দ্বীপ। অনুকুল বাতাসে জাহাজটা আমাদের ভালই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সালের দিক থেকে তুর্কীদের একটা দস্যু-জাহাজ তীর বেগে এগিয়ে আসছে আমাদের জাহাজের দিকে।

জাহাজটা কাছাকাছি এলে দেখলাম তুর্কীদস্যুদের হাতে আছে আঠারোটা বন্দুক, অথচ আমাদের কাছে আছে মাত্র বারোটা বন্দুক। তাদের জাহাজে ছিল দুশো জন লোক।

দুপক্ষেই গুলি বিনিময় হলো। আমাদের তিন জন লোক মারা গেল। আটজন জখম হলো। এমন সময় আট জন তুর্কীদস্যু আমাদের জাহাজে ঢুকে পড়ল। জীবিতদের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে গেল তাদের জাহাজে। বন্দীদের সঙ্গে আমিও ছিলাম।

তুর্কীদের জাহাজটা যেতে লাগল মুরদের আস্তানা সালের দিকে। তবে তুর্কীদস্যুদের সর্দার কোন অত্যাচার করেনি আমাদের। আমাদের জাহাজের বন্দী বণিকদের সকলকে ক্রীতদাস হিসাবে নিয়ে গেল। সর্দার আমাদের তার বাড়িতে কাজ করার জন্য নিয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে মনে আশা হলো। ভাবলাম সর্দার হয়ত দস্যুদল নিয়ে আবার জাহাজে করে যাবে স্পেন অথবা পর্তুগালে। হয়ত আমাকেও নিয়ে যাবে আর আমি সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাব একসময়।

কিন্তু সর্দার সত্যি সত্যিই একদিন সমুদ্রযাত্রায় গেলেও আমাকে নিয়ে গেল না। রেখে গেল তার বাড়িতে। আমার প্রধান কাজ ছিল বাগান দেখাশোনা করা। তাছাড়া কিছু বাড়ির কাজও করতে হত।

সর্দার ফিরে এসে বন্দরে ভেড়ানো তার একটা জাহাজ দেখাশোনার কাজ দিল আমায়। বলল, এখন থেকে তোকে আর আমার বাড়ির কাজ করতে হবে না। তুই জাহাজেই থাকবি।

গৃহবন্দীর দশা আমার ঘুচল। এখন আমার শুধু একটা চিন্তা কিভাবে আমি পালাতে পারি। তখন একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

সর্দার সপ্তাহে তিন দিন আমাকে নিয়ে একটা ডিঙ্গিতে করে মাছ ধরতে

যেত সমুদ্রে। আমাদের সঙ্গে থাকত মারেস্কো নামে কমবয়সী এক ক্রীতদাস। আমার হাতে ভাল মাছ উঠত বলে সর্দার সব সময় আমাকেই নিয়ে যেত সঙ্গে। মাঝে মাঝে সর্দার নিজে না গিয়ে আমাকে ও মারেস্কোকে পাঠাত মাছ ধরতে।

একদিন আমি, মারেস্কো আর একজন নিগ্রো মাছ ধরতে গিয়ে কুয়াশার কবলে পড়ি। ধোঁয়ার কুণ্ডলির মত কুয়াশায় পথ ভুলে চার ক্রোশ দূরে গিয়ে পড়ি। সারারাত সমুদ্রেই ঘুরে বেড়ালাম। সকাল হতে দেখি আমরা আমাদের কূল থেকে চারক্রোশ দূরে গিয়ে পড়েছি।

অবশেষে অনেক কষ্টে কূলে গিয়ে পৌঁছলাম। সর্দারকে সব কথা বলতে সে কাঠের মিস্ত্রী ডেকে ডিঙ্গিটার উপর একটা ঘর বানাতে বলল। সেই ঘরের মধ্যে একটা কম্পাস থাকবে। তাহলে আর দিকভুল হবে না। উপরে সারেং বসারও ঘর থাকবে। যাকে বলে একটা বজরা।

সর্দারের কথামত বজরা তৈরি হয়ে গেল। উপরের কেবিন ঘরে ঘুমানোর ব্যবস্থাও হলো। রসদ হিসাবে অনেক পরিমানে চাল, রুটি, কফি মজুত করারও ব্যবস্থা হলো।

একদিন সর্দার বলল, কয়েকজন গণ্যমান্য অতিথি তার সঙ্গে বজরায় করে মাছ ধরতে যাবে সমুদ্রে। তাদের জন্য অনেক ভাল খাবার ও মদ যোগাড় করা হলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে খবর এল অতিথিরা মাছ ধরতেযাবে না রাত্রিতে সর্দারের বাড়িতে যাবে তারা। সর্দার তখন এক ভোজসভার আয়োজন করতে লাগল। সর্দার আমাকে একসময় বলল, তুই মারেস্কো আর নিগ্রোকে নিয়ে মাছ ধরতে যা। ভাল মাছ নিয়ে আসবি। মাছ পেলেই তাড়াতাড়ি চলে আসবি।

আমি তখন সেই বজরা, জুরি ও একজন নিগ্রো আর তিনটি বন্দুক নিয়ে মাছ ধরতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বজরাতে অনেক রসদ মজুত করা ছিল। ভাবলাম, এই সুযোগেই পালাতে হবে আমাকে। তবে আরো কিছু রসদ চাই।

আমি নিগ্রোকে বললাম, বজরায় যা খাবার আছে তা মালিকদের খাবার। আমরা তা খাব না। আমাদের জন্য অন্য কিছু খাবার নিয়ে এস।

নিগ্রো তখন একঝুড়ি বিস্কুট, আরো কিছু ফল ও খাবার নিয়ে এল। তারপর কয়েক বোতল মদ আর কয়েক বোতল জল আনানো হলো। তাছাড়া আমি কিছু মোমবাতি, সুতো, হাতুড়ি, কুড়ুল, করাত যোগাড় করে বজরায় তুললাম।

এরপর নিগ্রো ইসমাইলকে বললাম, বন্দুক আছে, কিন্তু গুলি তেমন নেই। তুমি বরং জাহাজ থেকে এক বাক্স গুলি নিয়ে এস।

সরল বিশ্বাসে তাই নিয়ে এল ইসমাইল।

অবশেষে বজরা ভাসিয়ে দিলাম নোঙর তুলে। প্রথমে ভাবলাম সোজা চলে যাব স্পেনে বা কাদিজের কাছাকাছি। কিন্তু আবার ভাবলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাব, তারপর যেখানে হোক চলে যাব। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেব নিজেকে।

তার আগে আমার সঙ্গীদের ধোঁকা দেবার জন্য মাছ ধরতে শুরু করলাম কিন্তু ছিপ ফেলার পর ইচ্ছে করে ছিপ তুললাম না। বললাম, আজ আমাদের ভাগ্য খারাপ। মাছ উঠছে না। আরো কিছু দূরে যেতে হবে।

এইভাবে দাঁড় বাইতে বাইতে কূল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে আমি একসময় আচমকা নিগ্রো ইসমাইলকে বজরা থেকে ফেলে দিলাম জলে। সে বজরায় উঠতে চেষ্টা করলে আমি বন্দুকটা তার বুকের উপর লক্ষ্য করে বললাম, ওঠার চেষ্টা করলেই তোর জান নিয়ে নেব।

নিগ্রোটি তখন সাঁতার কাটতে কাটতে কূলের দিকে চলে গেল। তার পর জুরিকে বললাম, তুই আল্লার নামে শপথ করে বল, আমার কথা শুনবি কি না। তা না হলে তোরও ওই দশা হবে।

জুরি শপথ করে বলল, সে আমার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

সন্ধ্যের দিকে বজরার মুখ ঘোরালাম দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। ওরা তাহলে ভাববে আমি গেছি অন্য দিকে। আমি ঠিক করলাম মরক্কোর সম্রাটের অধিকৃত এলাকার বাইরে চলে যাব। কূলের কাছাকাছি থাকায় পালে প্রচুর বাতাস পেয়ে তীরবেগে ভেসে চলল আমাদের বজরা।

এইভাবে একটানা পাঁচদিন যাবার পর একটা ছোটনদীর মুখে এক জায়গায় নোঙর করলাম। এখান থেকে কিছু খাবার ও জল ভরে নিতে হবে। নদীর পাড়েই বিরাট বিস্তীর্ণ জঙ্গল। জঙ্গলে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের গর্জন শুনে বজরা থেকে নামতে সাহস হচ্ছিল না আমাদের।

সারারাত জেগে বজরাতেই বসে রইলাম। ঘুম হলো না ভয়ে। এক সময় দেখি ভয়ঙ্কর আকৃতির একটা জন্তু সাঁতার কেটে আমাদের বজরার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তখন তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম। জন্তুটা ভয়ে পালিয়ে গেল। গুলির শব্দে জঙ্গলের মধ্যে সব জন্তু জানোয়ারগুলো ভয়ঙ্কর গর্জন করতে লাগল।

সকাল হতেই সব গর্জন থেমে যেতে জুরি একটা বন্দুক নিয়ে জল আনতে গেল ডাঙ্গায়। আমি মাঠটার ধারে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে জুরি একটিন জল আর খরগোসের মত একটা জন্তু শিকার করে নিয়ে এল। সে বলল, মাঠের ওপ্রান্তে কুয়ার মত একটা গর্ত থেকে জল উঠছে আপনা থেকে।

জায়গাটা চিনতে পারলাম না আমি। তবে মনে হলো এর পাশেই আছে ক্যানারী দ্বীপমালা। এই দ্বীপপুঞ্জ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ড থেকে অনেক জাহাজ আসে। তার একটাতে উঠে পড়ব। মনে হলো এই জায়গাটা মরক্কোর সম্রাটের রাজ্য আর নিগ্রোদের রাজ্য-এই দুইএর মধ্যবর্তী কোন এলাকা। এই জঙ্গলে চিতা, নেকড়ে, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি অনেক হিংস্র জন্তু আছে। এখানে মানুষের কোন বসতি নেই। নিগ্রোরা মাঝে মাঝে শিকার করতে আসে এই জঙ্গলে।

আমাদের কূলের কাছেই একটা খাড়াই পাহাড় ছিল। এত খাড়াই যে চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না তার চূড়ায়। চূড়ায় উঠতে পারলে চারদিকে কি আছে তা দেখতে পেতাম।

একদিন সকাল নটার সময় জুরি পাহাড়ের চূড়ার উপর একটা সিংহ দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে তা দেখাল। আমি আমার হাতের বন্দুক ছাড়া আরো দুটো বন্দুক বার করে তাতে গুলি ভরে কাছে রেখে দিলাম। সিংহটাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করলাম। তাতে তার ড'ন পাটা ভেঙ্গে গেল। সে উঠতে পারল না। ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগল। এর পর তার কপাল লক্ষ্য করে আর একটা গুলি করলাম। তখন সিংহটা উল্টে ডাঙ্গার উপর পড়ে গেল। তখনো ছটফট করছিল।

জুরি একহাতে বন্দুক আর এক হাতে জল নিয়ে সাঁতরে ডাঙ্গায় গিয়ে সিংহটার কপালের কাছে একটা গুলি করতেই সব শেষ হয়ে গেল। পরে আমি অনুশোচনা করতে লাগলাম। শুধু শুধু ছটা গুলি খরচ করে মারলাম সিংহটাকে। অথচ তার মাংস খাওয়া যাবে না। কোন কাজ হবে না। জুরি তখন আমার কাছে কুড়ুল চেয়ে তা দিয়ে সিংহটার একটা পা আর তার চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে এল। চামড়াটা শুকিয়ে বিছানায় পেতে দিলাম। শুয়ে খুব আরাম বোধ হতে লাগল।

আবার বজরা ভাসিয়ে দিয়ে একটানা চলা শুরু হলো। আমরা চললাম দক্ষিণ মুখে। আমার উদ্দেশ্য ছিল গাম্বিয়া বা সেনেগাল নদীর নাগাল।

পাওয়া। যে কোন একটা নদী ধরে ভার্দ্ অন্তরীপে যাওয়া যাবে। সেখানে ইউরোপের যে কোন একটা বাণিজ্য জাহাজ পেয়ে গেলে বুঝিয়ে বললে আমাদের তুলে নেবে। আমাদের সঙ্গে রসদ ফুরিয়ে গিয়েছিল।

বারো দিন পর এমন একটা অঞ্চলে পৌঁছলাম যেখানে ছিল মানুষের বসতি। কূলের কাছে এক জায়গায় নোঙর ফেললাম। ডাঙ্গার উপর অনেক কালো উলঙ্গ মানুষ এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল। তাদের হাতে ছিল বর্শা। আমি নামতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু জুরি বলল, ওদের বর্শার, ফলকে ভীষণ ধার আর অব্যর্থ ওদের লক্ষ্য। যাবেন না।

আমরা ঈশারা করে কিছু খাবার চাইতে তাদের মধ্যে একজন কিছু মাংস আর যব নিয়ে এল। আমরা বজরাটা এগিয়ে দিলাম। ওরা তাতেই মাংস আর যব দিল।

আমরা মাংস খেয়ে ওদের হাত বাড়িয়ে ধন্যবাদ দিলাম। দুপুরের দিকে বজরার পাটাতনের উপর শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ কোলাহল শুনে উঠে পড়লাম। সেখানে কূলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো ভয়ে পালাচ্ছে চিৎকার করতে করতে। দেখলাম বিরাট আকারের দুটো চিতাবাঘ কূল থেকে তাড়া খেয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। একটা চিতা আমাদের বজরার দিকে সাঁতার কেটে আসতে লাগল। আমি চিতা বাঘটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম। গুলি খেয়ে চিতাবাঘটা রক্তাক্ত মাথা নিয়ে ডুবে গেল।

বন্দুক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না ওদের। গুলির শব্দ পেয়ে আদিবাসীরা ভয় পেয়ে গেল। তারপর চিতাবাঘটা যেখানে ডুবে গিয়েছিল সেই জায়গাটা আমি ইশারা করে দেখাতে কয়েকজন লোক ডুবে মরা চিতাবাঘটাকে টেনে তুলে নিয়ে গেল। তারপর কাঠের খোন্তার মত একটা জিনিস নিয়ে ছালটা ছাড়িয়ে বাঘটার কাঁচা মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল।

ছালটা ওরা আমাদের বজরায় দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে ওদের হাতে গড়া কত খাবার দিয়ে গেল। আমি তখন খালি টিনটা দেখিয়ে খাবার জলের জন্য ইশারা করতে ওদের মেয়েরা কলসীতে করে জল এনে আমাদের টিনগুলো ভরে দিয়ে গেল।

এইভাবে দিনকতক সেখানে থাকার পর আমাদের নিগ্রো বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার রওনা হয়ে পড়লাম আমরা। তখন আমাদের সঙ্গে ছিল প্রচুর রসদ আর দুটিন জল।

তখন সমুদ্রের বুকটা ছিল শান্ত। আবহাওয়া ছিল ভাল। কূল ঘেঁষে বজরা চালাতে লাগলাম আমরা। এগার দিন যাওয়ার পর কতকগুলো দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়লাম। আমাদের ডানদিকে ছিল মালার মত ছড়ানো কতকগুলো দ্বীপ। ঐগুলোই হয়ত ভার্দ্ দ্বীপপুঞ্জ।

একটা দ্বীপে যাওয়ার বড় ইচ্ছা হলো। কিন্তু চারক্রোশ দূর। হাওয়া অন্য দিকে বইতে থাকায় সাহস পেলাম না। আমি যখন এইসব ভাবছিলাম তখন হাল ধরে থাকতে থাকতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জুরি। বলল, ঐ দেখ জাহাজ।

জুরি ভাবছিল সর্দার হয়ত জাহাজে করে ধরতে আসছে আমাদের। কিন্তু আমি দেখলাম ওটা এক পর্তুগীজ জাহাজ। আমাদের কাছ থেকে অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন বজরার উপরে উঠে নানারকম ইশারা করতে লাগলাম হাত নেড়ে। জাহাজের ক্যাপ্টেন তখন দূরবীণ দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে জাহাজের গতি কমিয়ে দিল একেবারে।

আমরা তখন মরীয়া হয়ে জোর দাঁড় বেয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে চললাম। দারুণ কষ্ট করে সেই জাহাজের কাছে পৌঁছতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগল। ওরা আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু আমার ইংরিজি ভাষা বুঝতে পারছিল না। ওরা পর্তুগীজ। পর্তুগীজ ছাড়া ওরা জানে শুধু ফরাসী আর স্পেন দেশের ভাষা। তখন ওদের জাহাজে স্কটল্যাণ্ডের যে এক নাবিক ছিল তাকে ডেকে আনা হলো আমার কাছে। আমি তার কাছে ইংরেজিতে আমাদের দূরবস্থার কথা সব বুঝিয়ে বললাম। তখন ক্যাপ্টেন আমাদের জাহাজে তুলে নিল।

আমি ক্যাপ্টেনকে বললাম, আমাদের বজরায় যা যা আছে সব নিয়ে নিন। আমরা শুধু মুক্তি চাই।

ক্যাপ্টেন খুব ভাল লোক। তিনি বললেন, তার কোন প্রয়োজন নেই। বজরা জাহাজের সঙ্গে বাঁধা থাকবে। ব্রাজিলে গিয়ে তোমাদের যা আছে সব পেয়ে যাবে। জানবে, আমরা তোমাদের শুধু মানবতার খাতিরেই উদ্ধার করেছি, অন্য কোন স্বার্থের বশে নয়। আমরা তোমাদের ব্রাজিলে নামিয়ে দিলে দেশে ফিরে যেতে প্রচুর পথখরচ লাগবে। তখন জিনিসগুলো বিক্রি করে বরং কিছু টাকা পাবে।

পরে ক্যাপ্টেন দেখলেন বজরা থেকে আমার জিনিসপত্র চুরি হয়ে যেতে

পারে। তাই তিনি সব জিনিস জাহাজে তুলে তার একটা তালিকা আমার হাতে আর একটা নিজের কাছে রেখে দিলেন।

এরপর বজরার ব্যাপারে আমাকে বললেন, তোমাদের যদি এটা আর কোন কাজে না লাগে তাহলে এটা আমাকে বিক্রি করে দিতে পার। জাহাজের কাজে লাগবে। আমি দাম নিতে চাইছিলাম না। বললাম, ওটা নিয়ে নিন এমনি। কিন্তু উনি ছাড়লেন না। ছশো চল্লিশ তঙ্কার একটা হুণ্ডি লিখে দিলেন। ব্রাজিলের জাহাজ অফিসে এটা দেখালেই আমাকে টাকা দিয়ে দেবে। জুরিকেও উনি কিনে নিতে চাইলেন চারশো আশী তঙ্কা দিয়ে।

কিন্তু তাকে বিক্রি করতে চাইলাম না। নিজে মুক্তিলাভ করে ওকে আমি ক্রীতদাস বানাতে পারব না কিছুতেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন বললেন, তার জন্য ভেবো না তুমি। ও জাহাজে কাজ করে মাইনে পাবে। জাহাজে ওর দাসত্ব কেবল মাত্র দশ বছরের জন্য। এর মধ্যে যদি সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে তাহলে যে কোন সময়েই ও মুক্তি পাবে।

জুরিকে সব বুঝিয়ে বলতে ও রাজী হয়ে গেল।

অবশেষে আমরা নিরাপদে ব্রাজিলের অন্তর্গত সালভাদোরে পৌছলাম। আমাদের কোন জাহাজ ভাড়া নিলেন না ক্যাপ্টেন। আমাদের জিনিসপত্র টাকাকড়ি সব বুঝিয়ে দিলেন। এমনকি চিতাবাঘ ও সিংহের চামড়া দুটোর জন্য আরো ষাট তঙ্কা দিলেন।

আমি তখন দুটো বন্দুক, মোম আর শিশিবোতলগুলো বেচতে চাইলে উনি তা সতেরোশ ষাট তঙ্কা দিয়ে কিনে নিলেন।

বিদায় নেবার সময় একটা পরিচয়পত্র লিখে দিলেন ক্যাপ্টেন।

সালভাদোর শহরে কি করব অথবা সেখান থেকে কোথায় যাব এইসব যখন ভাবছিলাম তখন হঠাৎ সেখানকার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকার জায়গা দিলেন। তাঁর ছিল আখের চাষ আর চিনির কারবার।

তখন আমি ঠিক করলাম এই ব্যবসা আমিও করব।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে যা টাকা ছিল তাই দিয়ে জমি কিনে দিলেন ভদ্রলোক। আমি প্রথমে আখ আর তামাক চাষ শুরু করলাম। চিনির কল করতে আরো টাকা লাগবে।

এমন সময় আমার ক্যাপ্টেন বন্ধুটি এসে বললেন তিনি সমুদ্রপথে লণ্ডন

যাবেন। যার কাছে আমি দুশো পাউণ্ড জমা রেখেছি তার কাছে একশো পাউণ্ড চেয়ে চিঠি লিখে দিলে তিনি সেই টাকাটা নিয়ে এসে আমাকে দেবেন। কিন্তু নগদ টাকা না এনে তিনি কিছু ব্যবসার মালপত্র নিয়ে আসবেন। সেগুলো বিক্রি করলে কিছু লাভ হবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে দিলাম। টাকার কেন দরকার তাও লিখে দিলাম। সেই সঙ্গে আমার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ, দস্যুদলের আক্রমণ, আবার বন্দীদশা, পলায়ন, সদাশয় পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় সব লিখলাম।

যথাসময়ে ক্যাপ্টেন ব্যবসার মালপত্র নিয়ে এসে দিলেন আমাকে। চাষের সরঞ্জাম ছাড়াও তিনি এনেছেন কাপড়, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, বাসন প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডে তৈরি জিনিসগুলো। এখানকার বাজারে বিক্রি করে বেশ দাম পেলাম। কিছু নগদ টাকাও দিলেন। চাষের কাজে মজুর দরকার। আমি একজন নিগ্রো ও ইউরোপীয় ভৃত্য রাখলাম।

সেবার চাষ খুব ভাল হলো। জমিতে প্রচুর আখ ও তামাক ফলল। তামাক বিক্রি করে অনেক টাকা পেলাম। ব্রাজিলে এইভাবে চার বছর আমার কাটল। তারপর আবার সমুদ্রযাত্রার জন্য মনটা উন্মুখ হয়ে উঠল আমার। এক জায়গায় বেশীদিন মন আমার টিকতে চাইল না। পৃথিবীকে ঘুরে বেড়িয়ে দেখার অদম্য বাসনা জাগল আবার আমার মনে।

একদিন তিনজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা এসে এক প্রস্তাব দিলেন আমার বিবেচনার জন্য। তাঁরা আফ্রিকা যাবেন নিগ্রো লোক আনতে। চাষের কাজে অনেক লোক দরকার। আমি তাঁদের সঙ্গে যাব কিনা। ফলে আমিও কিছু নিগ্রো পাব আমার চাষের কাজের জন্য। নিগ্রো কেনাকাটার সব দায়িত্ব তাদের।

আমি বললাম, একশো পাউণ্ড নিয়ে কাজ কারবার করে আমার সম্পত্তির মূল্য দাঁড়িয়েছে এখন চার হাজার পাউণ্ড। আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে হলে আমার বিষয় সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে যেতে হবে। আমার ফিরতে দেরী হতে পারে। আবার নাও ফিরতে পারি। অথবা আমার মৃত্যু হতেও পারে ঘটনাক্রমে। এমত অবস্থায় আমাকে এক দলিল করে যেতে হবে।

আমি একটি দলিল করে আমার সব বিষয়সম্পত্তির ভার আমার ক্যাপ্টেন বন্ধুকে দিয়ে গেলাম। তিনি আমার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির আয় উপস্বত্ব ভোগ করবেন। দরকার বুঝলে তিনি সব সম্পত্তি বিক্রি করে তার অর্ধেক

টাকা নিজে রেখে বাকি অর্ধেক আমার বাবা মাকে পাঠিয়ে দেবেন। দলিলে আমার বাবা মার ঠিকানা দিলাম।

সব ব্যবস্থা করার পর ১৬১৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জাহাজে উঠলাম। আজ হতে আট বছর আগে এই দিনই প্রথম সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিলাম আমি। দিনটা ভাল নয়। সেবার অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম।

জাহাজ আগে হতেই তৈরি হয়েছিল। একশো কুড়ি জনের মালবাহী জাহাজ। চোদ্দজন নাবিক, ছটা বন্দুক, সারেং আর তার ছেলে। আমাদের সঙ্গে মালপত্র তেমন ছিল না। শুধু নিগ্রোদের কেনার মত পুঁতির মালা, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি কিছু জিনিস।

প্রথম দিনেই পাল তুলে জাহাজ ছাড়া হলো। জাহাজ চলল উত্তরমুখে। আমাদের সামনে আফ্রিকার ম্যাপ খোলা। আমরা চলেছি দশ ডিগ্রী দ্রাঘিমা ধরে।

এরপর আমাদের যেতে হবে উত্তর-পূর্ব দিকে। বারো দিন যাবার পর হঠাৎ ঝড় ও তুফান উঠল সমুদ্রে। দিনকতক পরে ঝড় তুফান কমলে আমাদের জাহাজ চলতে লাগল উত্তর-পশ্চিম দিকে। ইংল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের মুখে। আমাদের বিশ্বাস যে কোন একটা দ্বীপে পৌঁছতে পারলে সংকট থেকে মুক্তি পাব আমরা।

কিন্তু কিছুদূর যেতেই আবার শুরু হলো তেমনি ঝড় তুফান। কূলে জনবসতি দেখা যাচ্ছিল। আমাদের জাহাজটা ঘুরপাক খাচ্ছিল অনবরত। ঝড়ের আঘাতে ঢেউএর গতিতে জাহাজটা কোন অজানা দ্বীপে গিয়ে ভিড়বে কে জানে। সেখানে যদি বর্বর নরখাদক মানুষ থাকে তাহলে আমাদের ধরে জ্যান্ত কেটে খাবে।

হঠাৎ এক বালিয়াড়ির মধ্যে আটকে গেল জাহাজটা। দূরে ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছিল। ঝড়ের বেগ একটু কমলেও বিরাট এক একটা ঢেউ এসে জাহাজের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমাদের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। জাহাজের সঙ্গে দুটো নৌকো বাঁধা ছিল। একটা নৌকো ঢেউএ ভেসে যায়। আর একটা নৌকো ছিল মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা।

সারেং মাস্তুলে উঠে দড়ি কেটে দিতে নৌকোটা ধরাধরি করে সবাই নামাল। আমরা মোট এগারো জন তখন জাহাজ ছেড়ে নৌকোয় চাপলাম। কূলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল নৌকোটা ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করতে

করতে। পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড এক একটা ঢেউ। ঢেউএর তালে তালে ওঠানামা করছিল নৌকোটা।

এইভাবে প্রায় তিন মাইল যাবার পর প্রকাণ্ড একটা ঢেউএর আঘাতে উল্টে গেল নৌকোটা। কে কোথায় ছিটকে পড়ল কিছুই দেখতে পেলাম না। জলের নিচে ডুবে গেলাম আমি। তারপর আবার উঠে পড়লাম। সাঁতারে আমি ভাল হলেও ঢেউএর সঙ্গে কি করে লড়াই করব ?

একসময় একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে ডাঙ্গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল আমায়। কিন্তু আমার শরীর এমনই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে আমি উঠে ডাঙ্গার দিকে ছুটে পালাতে পারলাম না। পরমুহূর্তেই আর একটা ঢেউ এসে আবার সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল আমায়। তারপর আর একটা ঢেউএর আঘাতে আমি ডাঙ্গায় গিয়ে পড়লাম। এবার আমি কোনরকমে উঠে ছুটতে লাগলাম ডাঙ্গার দিকে। মাঝখানে একটা বড় পাথর পেয়ে সেটাকে ধরে ফেললাম। আবার একটা ঢেউ এল। কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে পারল না।

তারপর আবার ছুটতে লাগলাম ডাঙ্গার দিকে। অবশেষে ঢেউদের নাগালের বাইরে চলে গিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়লাম আমি। এবার আমি বিপদ থেকে একেবারে মুক্ত।

সেখান থেকে ডাঙ্গার দিকে আরও এগিয়ে গেলাম। মনে হলো একটা দ্বীপে এসে উঠেছি আমি। সেখানে পাহাড় আছে, বন আছে। কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় কোন মানুষ বা প্রাণী চোখে পড়ল না। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের জাহাজটা তেমনি কাত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আমাদের এগারো জন লোকের মধ্যে একা আমি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। হয়ত সবাই ডুবে গেছে। তলিয়ে গেছে জলের তলায়।

আমার পোশাক ভিজে। কিন্তু ছাড়ার উপায় নেই। আমার তখন দারুণ ক্ষিদে পেয়েছিল। কিন্তু কোন খাবার নেই। এমনকি পিপাসা মেটাবার একটু জল পর্যন্ত নেই।

একা একা ভীষণ ভয় করছিল আমার। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে কোন হিংস্র জন্তু অথবা কোন বন্য বর্বর নরখাদক মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। আত্মরক্ষা করব কাছে একটা অস্ত্রও নেই। শুধু পকেটে ছিল একটা ছুরি।

তখন ক্রমেই দিনের আলো নিভে আসছিল। রাতটা কাটাবার জন্য একটা বড় গাছে উঠে একটা ডালের সঙ্গে আমার জামা খুলে তাই দিয়ে বেঁধে

ফেললাম নিজেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম গাছের উপর। এক ঘুমেই সকাল হয়ে গেল।

উঠে দেখলাম আকাশ পরিষ্কার। উজ্জ্বল রোদ উঠেছে। আমাদের জাহাজটা ঢেউএর আঘাতে কূলের দিকে সরে এসেছে আরো কিছুটা। তা হলেও ডাঙ্গা থেকে অনেকখানি জলে জলে যেতে হবে। প্রায় মাইলখানেক। আমাদের নৌকোটা আছে আরও দূরে। চরের উপর পড়ে আছে। জল সরে গেছে।

এখন বুঝলাম, তখন নৌকোয় না নেমে জাহাজে থাকলেই ভাল করতাম। সবাই বেঁচে যেতাম। কারণ জাহাজটা ঐখানেই আটকে আছে বরাবর। ঐ জাহাজে হয়ত এখনো রসদ আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে, পোশাক আছে।

এই সব ভেবে আমি জাহাজের দিকে এগিয়ে চললাম জল ভেঙ্গে। জাহাজের কাছে গিয়ে দেখলাম পাটাতন অনেক উঁচুতে। গা-টা মসৃণ। ওঠা মুস্কিল। অবশেষে একটা দড়ি ঝুলতে দেখে সেটা ধরে উঠে পড়লাম জাহাজে।

উঠে দেখি সব ঠিক আছে। ভাঁড়ার ঘরে অনেক রুটি ও বিস্কুট ছিল। খাবার জলে ভর্তি অনেক বোতল ছিল। বেশ কিছু মদও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটো রুটি ছিঁড়ে খেয়ে ফেললাম। জাহাজটা কাত হয়ে থাকলেও কেবিন ও পাটাতনে জল ঢুকতে পারেনি।

কিন্তু এত জিনিস নিয়ে যাব কি করে? ভাঁড়ার ঘরে অনেক দড়ি, কাছি, চেরাকাঠ, আর ছুটো মাস্তুল ছিল। তাই নিয়ে বুদ্ধি করে একটা ভেলার মত করলাম। তার উপর যতটা সম্ভব জিনিসগুলো চাপিয়ে সেটা ভাসিয়ে নিয়ে যাব। একবারে হবে না। কয়েকবার আসতে হবে আমার সব দরকারী জিনিসগুলো নিয়ে যেতে।

ভেলার উপর প্রথমে চেরাকাঠগুলো তুললাম। তিনটে কাঠের খালি পেটিতে রুটি, চাল, শুকনো মাংস, বিস্কুট, যন্ত্রপাতি আর জলের বোতল ভর্তি করে ঢাকনা দিয়ে পেরেক মেরে আটকে দিলাম। এবার কিছু অস্ত্রশস্ত্র চাই।

কেবিনে গিয়ে দেখলাম ছুটো পিস্তল আর ছুটো বন্দুক টাঙানো রয়েছে। তাছাড়া আছে অনেকটা বারুদ আর একবস্তা টোটা। বারুদের আর একটা পাত্র জলে ভিজে গেছে। সেগুলোও ভেলার উপর চাপিয়ে নিলাম। তখন দেখলাম জল একটু বেড়েছে। তবে সমুদ্রের বুকটা ছিল শান্ত। বাতাস তখন বইছিল কূলের দিকে। জাহাজের ডেকে একটা ভাঙ্গা দাঁড় ছিল। সেটা নিলাম ভেলাটা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

সব ঠিক করে দড়ি দিয়ে ভেলাটা নামিয়ে দিলাম জলে। তারপর দড়ি বেয়ে নামলাম জাহাজ থেকে। অনুকূল বাতাসে তীরবেগে ডাঙ্গার দিকে যেতে লাগল আমার ভেলাটা। তারপর সমুদ্রের জল যেখানে একটা নদীর মুখে ঢুকছিল সেইখানে গিয়ে স্রোতের টানে নদীর ভিতর ঢুকে পড়ল ভেলাটা। তীরবেগে ছুটে চলল। নদীর ওপারেই সেই ডাঙ্গা আর জঙ্গল।

আমি দাঁড় বেয়ে তীরের কাছে নিয়ে গেলাম ভেলাটা। কাদায় লগি পুঁতে থামালাম ভেলাটাকে। তারপর জোয়ারের জল বাড়লে আমি আগে ডাঙ্গায় নেমে ভেলাটাকে টেনে ডাঙ্গায় তুললাম।

কিন্তু কোথায় গিয়ে উঠব। থাকার ও মালপত্র রাখার একট আস্তানা চাই। মাইল খানেক দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। পাশে ছিল গোটাকতক টিলা। দূরে ঘর বাড়ি ছিল। কিন্তু আসলে জায়গাটা কোন মূল মহাদেশের অংশ না বিচ্ছিন্ন কোন এক দ্বীপ তা বুঝতে পারলাম না কিছুতেই। ভাবলাম ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে চারদিক দেখা যাবে।

যাই হোক, অতি কষ্টে গিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম চারদিকে শুধু জল আর জল। নদী আর সমুদ্র। এটা একটা দ্বীপ। দূরে সার দেওয়া কতকগুলো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জঙ্গল। দ্বীপটা মোটেই বড় না। লোকবসতি একেবারেই দেখা গেল না।

শুধু বনমোরগ, কিছু পাখি আর এক আধটা বনবেড়াল ছাড়া আর কোন জীবজন্তু নজরে পড়ল না আমার যাওয়ার পথে। পাহাড় থেকে ফেরার পথে আমার হাতের বন্দুক দিয়ে মস্ত বড় একটা পাখি মারলাম। পাখিটা দেখতে অনেকটা বাজপাখির মত।

ডাঙ্গার উপর যেখানে মালপত্র রেখে গিয়েছিলাম সেখানে আবার ফিরে এলাম আমি। একা থাকার জন্য একটা জায়গা বাছাই করে আস্তানা গড়তে হবে। আপাততঃ মাল বোঝাই পেটি তিনটে তিনদিকে সাজিয়ে রেখে শোবার মত একটুখানি জায়গা করে নিলাম মাঝখানে। ত্রিপল না থাকায় তাঁবু খাটাতে পারলাম না। ভাবলাম পরদিন জাহাজ থেকে পালের কাপড়গুলো এনে তাঁবু খাটানো হবে।

পরদিন আবার জাহাজে গেলাম। ভেলাটা আর নিয়ে গেলাম না। গিয়ে আবার একটা ভেলা বানিয়ে তাতে নিলাম পেরেক আর আংটার তিনটে থলি, একটা যাঁতা, অনেকগুলো কুড়ুল, স্ক্রু ড্রাইভার, পাখি মারা একটা বন্দুক সীসার একটা বিরাট পাত আর সাতবাক্স টোটা। মালগুলো টানতে টানতে

জাহাজের কিনারে এসে ভেলায় তুললাম অতি কষ্টে। কয়েকটা বাড়তি পাল আর একবাক্স পোশাকও নিলাম। ভাঁজকরা একটা খাটও নিলাম। খাটের সঙ্গে একপ্রস্থ তোষক বালিশও নিলাম। সব নিয়ে ভেলা ভাসিয়ে নদী বেয়ে ডাঙ্গায় এসে উঠলাম।

এসে দেখলাম আমার মালপত্র যা রেখে গিয়েছিলাম তা সব ঠিক আছে। কেউ হাত দেয়নি। শুধু দেখলাম বুনো বেড়ালের মত একটা জীব বসে আছে। বন্দুকটা তার দিকে এগিয়ে দিলেও সে ভয় পেল না। তখন একটা বিস্কুট দিলাম। সেটা চিবিয়ে খেয়ে আবার একটা পাবার লোভে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু আর না পেয়ে ধীরে ধীরে বনের দিকে চলে গেল।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা জায়গায় পেলাম। পাহাড়ের ঢালে অনেক উঁচুতে সমতল মত একটা জায়গা ছিল। পিছনের পাহাড়টাও বেশ খাড়া। অর্থাৎ পিছন থেকে হঠাৎ বিপদ আসার কোন সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের গায়ে একটা গুহাও ছিল। গুহার মুখে একটা দরজা বসাতে পারলে একটা নিরাপদ আস্তানা গড়ে উঠতে পারে।

সেই গুহার সামনেই তাঁবু খাটালাম খুটি তার দিয়ে আর পালের মোটা কাপড় দিয়ে। তারপর গুহার ভেতরটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে গুহার মুখে দুটো খুঁটি গেড়ে চওড়া চেরা কাঠ দিয়ে পাঁচ ফুট উঁচু একটা দরজা বানালাম। আসলে তাঁবুর চারদিকে অর্ধ বৃত্তাকারে তার দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘিরে দিলাম। তারপর একটা মই তৈরি করলাম। নিচে থেকে মই দিয়ে গুহায় উঠে মইটা তুলে নেব। তাহলেই আমি একেবারে নিরাপদ। তাঁবুর ভিতরে তারের বেড়ার মধ্যে মালপত্র সব গুছিয়ে রাখলাম।

এর পর মাটি কেটে ভিজিয়ে কাদা করে তাল তাল কাদা দিয়ে তারের বেড়া বরাবর একটা উঁচু পাঁচিল তৈরি করলাম। পাঁচিলটা দেড়ফুট চওড়া হলো। বাইরে থেকে আমার গুহাটা বা মালপত্র কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না। শক্ত মাটির দেওয়াল ভেদ করে কেউ ঢুকতে পারবে না তাঁবুর ভিতর।

একদিন হঠাৎ বৃষ্টি এসে আমার খানিকটা বারুদ ভিজিয়ে দিল। তবে আরো অনেক বারুদ অবশ্য আমার অবশিষ্ট ছিল।

এরপর এখনো দুটো কাজ আমায় করতে হবে। দ্বীপটাকে ঘুরে ভাল করে দেখতে হবে। আর ছোটখাটো জীবজন্তু মেরে খাদ্যের সংস্থান করতে হবে। তবে ঘুরতে ঘুরতে দেখেছি জঙ্গলে অনেক ছাগল আছে। আর আছে বনমুরগী। ছাগলগুলো ভীষণ দ্রুতগতি। চোখের পলকে উধাও হয়ে যায়।

আর একবার জাহাজে গিয়ে আরো কিছু দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে এলাম। যেমন কালি, কলম, কাগজ, বই, একখানা বাইবেল, কম্পাস, নকসা ও জাহাজ চালানো সংক্রান্ত কয়েকটি বই।

জাহাজ থেকে যে নকসা বা মানচিত্র এনেছিলাম তা মিলিয়ে দেখলাম এ দ্বীপের কোন নাম নেই। নয় ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখায় তার অবস্থান। আমি এখানে এসেছি ৩০শে সেপ্টেম্বর। আজ বারো দিন হলো। একটা বড় গাছের উপর ছুরি দিয়ে লিখলাম ১৬৫৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর।

এখন আমি পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি অনেকখানি। মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি কোন জাহাজ আসছে কি না। ভয়ঙ্কর নির্জন দ্বীপে আটকে আছি আমি। জীবনে কোনদিন উদ্ধার পাব এ আশা আমি করিনি। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে আমিই একমাত্র জীবিত আছি এইটাই হল বড় কথা। এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সঙ্গে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি বা কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। সারা জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন একেবারে।

আমার কালি, কলম আর কাগজ থাকায় আমার দৈনন্দিন জীবনের বিবরণী লেখা শুরু করলাম আমি।

রোজ সকাল হলেই বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়ি জঙ্গলের দিকে। শুধু বৃষ্টির দিন যাই না। ফেরার সময় কিছু না কিছু শিকার আনি সঙ্গে। একদিন জঙ্গলে মস্তবড় একটা গাছ দেখলাম। লোহার মত শক্ত গাছটা। এ অঞ্চলে এই গাছের কাঠকে লোহা কাঠ বলে। কুড়ুল দিয়ে কেটে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এলাম আমার বাসায়। সেই গাছের কাঠ থেকে অনেক যন্ত্রপাতি সাজ সরঞ্জাম তৈরি করলাম। তাতে কাজ করার সুবিধা হবে।

গুহার ভিতরটা বাড়িয়ে মেঝের মধ্যে খুঁটি পুঁতে তার মাথায় চেরা কাঠের পাড়ন দিয়ে ছাদটাকে মজবুত করলাম। গুহার ভিতর খুঁটির সঙ্গে কাঠ দিয়ে পার্টিশান করে গুহাটাকে দুভাগ করে রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর করলাম। তার একটা কারণও ছিল। একদিন হঠাৎ পাহাড় থেকে একটা ধস নেমে গুহার মধ্যে পড়ল। একটা পাথর পড়ল মেঝেতে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সে রাতে ঘুম হলো না। এর পরই কাঠ আর খুঁটি দিয়ে ছাদটাকে মেরামত করি।

রোজ সকালে আর বিকালে দুবার করে বাইরে বেরোতাম। দুপুরটা শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমোতাম। বাকি সময়ে কোন না কোন কাজ নিয়ে থাকতাম।

একদিন বাইরে মই নিয়ে উঠে পাঁচিল থেকে তাঁবুর ভিতরে নামতে না নামতে দেখি একটা বিরাট পাথর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে আমার গুহার সামনে তাঁবুর উপর পড়ল। তাঁবুর একদিকের কাপড় ছিঁড়ে গেল এবং দুটো খুঁটি ভেঙে গেল। অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম আমি। আমি বাইরে গিয়ে মাটির উপর দাঁড়াতে দেখি মাটিটা দুলছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি ভীষণ তোলপাড় চলছে সমুদ্রে। ঢেউগুলো ফুলে ফুলে উঠে কূলে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে প্রচণ্ড বেগে। বুঝলাম জোর ভূমিকম্প হচ্ছে। আমি মাটি ধরে বসে রইলাম।

ভূমিকম্প শেষ হতেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো। গুহাতে ঢুকতে ভয় হচ্ছিল আমার। আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। তবু বৃষ্টির ভয়ে গুহাতেই গিয়ে ঢুকতে হলো। আমি বুঝলাম ভূমিকম্পের ফলেই এই ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে।

একদিন হঠাৎ আমার নজরে পড়ল উঠোনে কতকগুলো গমের চারা বেরিয়েছে। তখন আমার মনে পড়ল ওগুলো একদিন আমার থলের মধ্যে কতকগুলো ইঁদুরে খাওয়া গম যবের মধ্যে ছিল। সেগুলো আমি ফেলে দিয়েছিলাম উঠোনে। তা দেখে আমি ঠিক করলাম কিছু গম যবের দানা জমিয়ে রেখে বর্ষাকাল এলে ছড়িয়ে দেব মাটি খুঁড়ে। তার সঙ্গে কিছু ধানের বীজ ছড়াব। তাহলে যা ফসল হবে তাতে আমার সারা বছরের খোরাক হয়ে যাবে।

কিন্তু ভূমিকম্পের পর থেকে আমার মনে যে আতঙ্ক ঢুকল সে আতঙ্ক গেল না কিছুতেই। আমার কেবলি মনে হতে লাগল আবার যে কোন দিন ভূমিকম্প হতে পারে, আবার ধস নামতে পারে। তাহলে জীবন্ত সমাধি হবে আমার। ভয়ে সারারাত ঘুম হত না আমার। রাত্রিবেলায় বিছানায় চুপ-চাপ শুয়ে থাকতাম আমি।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোন ফাঁকা একটা জায়গায় নতুন করে এক আস্তানা গড়ব।

অনেক খুঁজে পাহাড় থেকে দূরে চারধার ঘেরা একটা জায়গা নির্বাচন করলাম। ঠিক করলাম আগে জায়গাটাকে চারদিকে কাঠের খুঁটি পুঁতে মাথায় পালের কাপড়গুলো ত্রিপলের মত চাপিয়ে দিয়ে তাঁবুর মত করব। তারপর সেই কাঠের বেড়ার উপর কাদা চাপিয়ে চওড়া দেওয়াল দেব। কিন্তু মাটি কেটে কাদা ভিজিয়ে দেওয়াল দিতে সময় লাগবে। আপাতত: তাঁবুর মধ্যেই থাকব ঠিক করলাম।

কিন্তু তাঁবুটা ঠিক করে সেখানে থাকার উদ্যোগ করতেই খুব জোর বৃষ্টি এল। পালের কাপড় বৃষ্টির বেগ সামলাতে পারল না। তখন বাধ্য হয়ে গুহার মধ্যেই ফিরে গেলাম।

বৃষ্টিতে ভেজার জন্য পরদিন থেকেই জ্বরে পড়লাম। পরদিন সকালেও জ্বর ছাড়ল না। দারুণ একটা দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলাম সারা দেহে। বাইরে থেকে জল আনা, রান্না করার বা শিকার করার কোন কাজই করতে পারলাম না। দেহটা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ল। সারাদিন কিছু খেতে পারলাম না। রাত্রে কটা কাছিমের ডিম আগুনে ঝলসে খেলাম। রাত্রে ঘুম না আসায় বাইবেলটা নিয়ে পড়তে লাগলাম। মনে প্রশ্ন জাগল অনেক। ভয়ও করছিল। জ্বর যদি না সারে, তাহলে এই নির্জন দ্বীপে কোথায় ওষুধ পাব, কে আমার সেবা করবে?

হঠাৎ যেন অন্ধকারের মধ্যে আলো পেয়ে গেলাম। বাইবেল পড়তে পড়তে বুঝলাম ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর তিনিই অধিকারী, তিনিই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি মঙ্গলময়। তিনি যা কিছু করেন জীবের মঙ্গলের জন্যই করেন।

তা যদি হয় তাহলে কোন কিছুই অজানা থাকতে পারে না তাঁর। আমার এই অসহায় নির্বাসিত অবস্থার কথা তিনি নিশ্চয় জানেন। আমার এই নির্বাসনের পিছনেও কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি না কে জানে। কিন্তু কাল যদি আবার জ্বর বাড়ে, যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি তাহলে কে আমায় দেখবে?

হঠাৎ ব্রাজিলের একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেখানে অসুখ করলে লোকে তামাক খায়। তাতেই নাকি রোগ সেরে যায়। রোগযন্ত্রণার উপশম হয়।

আমার কাছেও তামাক ছিল। জাহাজ থেকে এনেছিলাম। কিছু শুকনো, কিছু কাঁচা। পেটি থেকে বার করে একটা কাঁচা তামাক পাতা চুষতে লাগলাম। মাথা ঘুরতে লাগল। এর আগে কখনো তামাক ব্যবহার করিনি আমি। খানিকটা তামাক বোতলের জলে ভিজিয়ে রাখলাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি আমি পুরোপুরি সুস্থ। বন্দুক নিয়ে যথারীতি বেরিয়ে পড়লাম। শরীরে আর কোন ক্লান্তি নেই। পথে একটা মুরগী পেয়ে মেরে নিয়ে এলাম। কিন্তু তার মাংস রান্না করে খেতে গিয়ে ভাল লাগল না। আবার কাছিমের ডিম খেলাম।

এর পর তামাকের জল আর মদ মিশিয়ে একটা ওষুধ করেছিলাম। রোজ একটু করে খেতাম। আমার ভয়টা অনেক কেটে গেল। বাইবেল পড়ে আমার কাজ হয়েছিল। বাইবেলের একটা লাইন আমার প্রায়ই মনে পড়ত —আমিই তোমার পরিত্রাতা। এই লাইনটা মনে হতেই একদিকে আমার মনের ভয় যেমন দূর হত, অন্যদিকে তেমনি আশা জাগত মনে। আমি সব সংকট হতে একদিন উদ্ধার পাবই। ঈশ্বরই আমাকে ত বারবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার করেছেন।

শরীরটা আমার সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও মনের দিক থেকে মুক্ত হলাম আমি। শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও আগের থেকে একটু বল পেয়েছি। নিয়মিত শিকারে বার হতে লাগলাম। তবে বৃষ্টির জলে ভেজা আমার সহ্য হত না। বৃষ্টিটা এড়িয়ে যেতাম।

দশ মাস হলো আমি এই দ্বীপে এসেছি। আমার আগে কোন মানুষ আসেনি এখানে। আমিই প্রথম মানুষ যার ছাপ পড়ল এ দ্বীপের মাটিতে। ঠিক করলাম গোটা দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখব কোথায় কি আছে।

জুলাই মাসের প্রথম থেকেই মাইলের পর মাইল হাঁটতে লাগলাম। গেলাম সমুদ্রের খাড়ির দিকে। নদীটা এখানে সংকীর্ণ এবং স্রোতও কম। হাঁটুসমান জল। মাঠের ধারে ঘাসেঢাকা উন্মুক্ত এক বিশাল প্রান্তর। মাঝে মাঝে বিচিত্র রকমের গাছ। এক এক জায়গায় আখ আর তামাক গাছ গজিয়ে উঠেছে আপনা থেকে। কেউ চাষ করেনি।

পরদিন আরও এগিয়ে গেলাম। দেখলাম সেখানে গাছ কম, কিন্তু ফলের গাছ প্রচুর। আঙ্গুর, বাতাপী আর মৌসুমি লেবুর গাছই বেশী। প্রচুর ফল ধরে আছে গাছে।

আর একদিন চলে গেলাম দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। এদিকটায় পাহাড় বেশী। মাঝে মাঝে নির্মল জলের ঝরণা। শুধু পাহাড় আর উপত্যকা। মাঝে মাঝে গাছ। মনে হয় গাছগুলো কারা সাজিয়ে বসিয়েছে। এ দিককার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। যত পারলাম থলে ভরে ফল নিয়ে এলাম।

মনে একটা তৃপ্তি অনুভব করলাম। কেবলি মনে হতে লাগল এই সব পাহাড় উপত্যকা, নদীঝরণা, মাঠ বনসমন্বিত গোটা দ্বীপটার আমি এক ক্ষুদ্র অধিপতি। ইংলণ্ডের যে কোন সামন্ত বা জমিদারের থেকে আমার ঐশ্বর্যের পরিমাণ কম নয়।

আমার সাম্রাজ্য আবিস্কারের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমার নতুন

আস্তানা গড়ার কাজে মন দিলাম। কাঠের বেড়া আগেই দেওয়া ছিল। এবার পুরু করে চওড়া দেওয়াল দিতে লাগলাম। রোদে শুকিয়ে বেশ শক্ত ও মজবুত হলো মাটির দেওয়াল।

ইতিমধ্যে কোন রাতে এক দুঃস্বপ্ন দেখলাম আমি। দেখলাম এক বিরাট আকারের ভয়ঙ্করদর্শন লোক হাতে একটা বর্শা নিয়ে আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় ঘুমটা আমার ভেঙ্গে গেল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের ভয়ঙ্কর আবেশটা গেল না আমার মন থেকে।

ঘর তৈরির জন্য আরো অনেক জিনিসপত্র লাগবে। আমি তাই আবার জাহাজে গেলাম। জাহাজ থেকে করাত, কাঠের খুঁটি লোহার পাত নিয়ে এলাম ভেলায় করে। তাই দিয়ে ঘরটা গড়ে তুললাম।

তবে এই দ্বীপের প্রকৃত অবস্থানটা কোথায় তা আমি অনুমান করতে পারিনি। একবার মনে হলো এটা আমেরিকার অংশবিশেষ এবং স্পেনের কাছাকাছি। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে যে সব মানুষ এর নিকটবর্তী স্থলভাগে বাস করে তারা হবে আদিম প্রকৃতির। সভ্যতার আলো তারা পায়নি।

তবে এটা যদি স্পেনের উপকূলভাগের কোন দ্বীপ হয় তাহলে জাহাজ আমি একদিন না একদিন দেখতে পাবই। স্পেনের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের জন্য জাহাজ আনাগোনা করে। কিন্তু একটা জাহাজও নজরে পড়েনি এ পর্যন্ত।

আবার ভাবলাম এটা হয়ত স্পেন আর ব্রাজিলের মধ্যবর্তী কোন দ্বীপ? কিন্তু শুনেছি এই ধরনের দ্বীপে বাস করে যত সব নরখাদক বর্বর মানুষ। ভীষণভাবে নৃশংস। তবে এ দ্বীপটা সেই জাতীয় দ্বীপ নয় বলেই মনে হয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে সেদিন আমি এগিয়ে চলেছি পশ্চিম থেকে পুবে। জায়গাটা বড় মনোরম। এখানে রাশি রাশি বিচিত্র রকমের ফুলের গাছ। কত পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা কাকাতুয়ার ছানা নিলাম সঙ্গে। তার নাম দিলাম পোল। সে আমার পোষ মানল। কত খরগোস ও শেয়াল দেখলাম।

কদিন আমি আর বাসায় ফিরে গেলাম না। দ্বীপের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি এলাকা ঘুরে দেখার জন্য আমি রোজ ছ মাইল করে পথ হাঁটতে লাগলাম। ধীরে ধীরে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে থাকি যেখানেই যাই। সন্ধ্যা হলে কোন একটা গাছের উপর উঠে রাত কাটাই। আবার সকাল হলেই হাঁটতে শুরু করি।

হাঁটতে হাঁটতে একদিন সমুদ্রের ধারে পৌঁছলাম। এদিকটার দৃশ্য এত সুন্দর যে আমার মনে হলো এত ভাল জায়গা থাকতে আমি একটা শুকনো পাহাড়ী এলাকায় বাস করছি কেন। তথাপি আমার আস্তানা ছেড়ে এখানে উঠে আসতে মন চাইল না। যতই হোক আমার বাসা, কত কষ্ট করে গড়ে তুলেছি সে বাসা।

এবার বাসায় ফেরার জন্য মন আমার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কিন্তু ভাবলাম অন্য পথে ফিরব। যে পথে এসেছি সে পথে নয়। এই ভেবে অন্য একটা পথ ধরে এগোতেই একটা পাহাড়ী উপত্যকা পেলাম। সেখানে বনও আছে।

কিন্তু সেই উপত্যকায় এসে পথ ভুল করলাম আমি। কোন পথে এখান থেকে বার হব তা ঠিক করতে না পেরে ঘুরপাক খেতে লাগলাম সারা উপত্যকা জুড়ে। আকাশে মেঘ থাকায় সূর্য দেখে দিক ঠিক করতে পারলাম না। পর পর তিন দিন আকাশ মেঘলা রইল। ফলে তিনদিনই সেই উপত্যকায় কেটে গেল আমার।

তারপর আবার পিছিয়ে গিয়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথ ধরে ফিরে এলাম আমার বাসায়। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। খুব আরাম পেলাম। পর পর সাত দিন আর বার হলাম না। শুয়ে বসে বিশ্রাম করে কাটালাম।

বর্ষাকাল এগিয়ে আসছে। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর এই দ্বীপে আমার দুবছর পূর্ণ হবে। এখন আমার এই নির্বাসন জীবনটা কেমন গা-সওয়া হয়ে গেছে। এখান থেকে সভ্য জগতে ফিরে যাওয়া বা দেশে ফিরে যাওয়ার আর কোন তাগিদ নেই আমার। আমার জীবনের উদ্দেশ্যটাই পাল্টে গেছে একেবারে। এখন আর ভবিষ্যতের কথা ভাবি না।

আমি মনকে বোঝালাম, এই দ্বীপেই হয়ত সারাজীবন কেটে যাবে আমার। এই গোটা দ্বীপটাই যেন এক বিশাল কারাগার। এর চারদিক সমুদ্রের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

দেখতে দেখতে সেপ্টেম্বর গিয়ে নভেম্বর এল। ডিসেম্বর মাস এলেই ফসল তোলার সময় হবে। এবার বর্ষায় সার দিয়ে ভাল করে চাষ করেছিলাম। সব মিলিয়ে এক বস্তার কিছু কম ধান পাব। কিন্তু নিজের খোরাক বাদে পরের বছরের চাষের জন্য কি করে বীজ জমিয়ে রাখব সেটাই হলো সমস্যা।

যাই হোক, অতিশয় যত্নের ফসল রক্ষা করে চলি আমি। কত বনমোরগ

আর খরগোস আমার ফসল খেতে এলে তাদের তাড়িয়েছি, মেরেছি। একদিন দেখি অসংখ্য পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে আমার ফসলের গন্ধ পেয়ে উড়ে আসছে তা খাবার জন্য। আমি বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক দিয়ে গুলি ছুঁড়লাম ঝাঁকের মধ্যে। অনেক পাখি মরল তার ফলে। একটা মরা পাখিকে খুঁটিতে বেঁধে টাঙ্গিয়ে দিলাম অন্য পাখিদের ভয় দেখাবার জন্য।

অবশেষে ফসল পাকল। কিন্তু কাস্তে নেই, কি করে কাটব তা বুঝতে পারলাম না। পরে জাহাজ থেকে আনা একটা তরোয়াল দিয়ে ফসল কাটলাম। আন্দাজ করে দেখলাম দশ সের মত গম যব আর দশ সের মত ধান পেলাম। কিন্তু ধান পেষাই করার জন্য যন্ত্র নেই, তার থেকে কি করে খাবার রুটি বা ভাত তৈরি করব তা খুঁজে পেলাম না।

তখন ভাবলাম এ বছর যব, ধান কিছুই খাব না। সব বীজ হিসাবে রেখে দেব। এই বীজ দিয়ে পরের বছর বড় করে চাষ করব। ততদিনে যব ধান পেষাবার ও রুটি তৈরি করার যা হোক একটা উপায় নিশ্চয় খুঁজে পাব।

অবশেষে কাঠের একটা হামালদিস্তার মত বানালাম। তাতে দেখলাম যব ও ধান পেষাই হলো। তারপর বানালাম মাটির একটা তাওয়া। রুটি বেলার জন্য চাকা বেলনা না থাকলেও ময়দার খণ্ডটা হাতে কিছুটা চাপড়িয়ে তাওয়ায় দিয়ে তার উপর একটা কিছু ঢাকা দিতাম। ভাপে রুটি সেঁকা হয়ে যেত এবং খেতেও বেশ মিষ্টি লাগত।

এরপর চাষের জন্য একটা বড় জায়গা দেখলাম। তিন একর মত। সেই জায়গাটাকে কোদাল দিয়ে জমি করলাম।

ক্রমে এখানে আমার তিন বছর হয়ে গেল। একদিন কি মনে হলো আমাদের যে নৌকোটি চড়ায় আটকে গিয়েছিল সেই নৌকোটি দেখতে গেলাম। কিন্তু সেটা বালিতে আধখানা পোঁতা থাকায় বালি সরিয়ে কোন-মতেই তুলতে পারলাম না আমি।

তখন সে আশা ত্যাগ করে একটা ভাল বড় সেগুন গাছ কেটে তার থেকে বড় ডোঙ্গা বানালাম। তাতে প্রায় ছাব্বিশ জন লোক বসতে পারে। কিন্তু ডোঙ্গাটাকে কিভাবে নদী বা সমুদ্রে নিয়ে যাব সেটাই হলো সমস্যা।

অবশেষে যেখানে আমার ডোঙ্গা ছিল সেখান থেকে সমুদ্রের মুখ পর্যন্ত ছয় ফুট চওড়া আর চার ফুট গভীর একটা খাল কাটলাম। একটা নালার মত। এই নালা কাটতে লাগল আমার পুরো পাঁচটি বছর। তার মাঝে চাষের

কাজ ও আমার ঘর সংসারের কাজও করেছি। নালাটা হলো কয়েক মাইল লম্বা।

এরপর ঠিক করলাম এই ডোঙ্গাটা নিয়ে জলপথে দ্বীপটার চারদিকে ঘুরে দেখব। তাই ডোঙ্গার উপরে একটা মাস্তুল খাটালাম। একটা বড় কাঠের বাক্স বানিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে একদিন ডোঙ্গাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেটা ছিল নভেম্বর মাসের ছ তারিখ। দ্বীপে আসার ছয় বছর পর।

ঈশ্বরের নাম করে পূব দিক ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি দ্বীপের পাহাড়টা সোজা নেমে এসেছে সমুদ্রে। তার কিছুটা জলে ডুবে আছে আর কিছুটা ভেসে আছে। দ্বীপটা ঘুরে দেখতে বেশীদিন লাগল না। ঘুরে এসে একদিন সেই পাহাড়ের তলায় নোঙর করে ডোঙ্গাটা রেখে পাহাড়ে উঠে যতদূর দেখা যায় দেখতে লাগলাম। পাহাড়ের কাছে স্রোত প্রবল। স্রোত চলেছে পূব দিকে।

তারপর আস্তানায় ফিরে যাবার জন্য সমুদ্রে ডোঙ্গা ভাসালাম। সমুদ্র তখন শান্ত থাকলেও আমার ডোঙ্গাটা অনেক দূর চলে গেল। আমার ভয় হলো ডোঙ্গাটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন দুপুর বেলা। আমি যখন অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম তখন হঠাৎ অনুকূল বাতাস এসে লাগতেই আমি পাল খাটিয়ে দিলাম। আমার ডোঙ্গাটা তখন তর তর করে এগিয়ে যেতে লাগল কূলের দিকে।

আমি আস্তানায় ফিরে আসতেই আমার পোষা কাকাতুয়াটা আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। আমি বিশ্রাম করতে লাগলাম নিশ্চিন্ত মনে।

তবে একটা চিন্তায় বিব্রত হয়ে পড়লাম আমি। বারুদ কমতে শুরু করেছে। বারুদ একবার ফুরিয়ে গেলে মাথা খুঁড়লেও পাব না এই দ্বীপের মধ্যে। শিকার আর খাদ্য সংগ্রহের জন্য বারুদ আমার দরকার। খাদ্য সংগ্রহের বিকল্প হিসাবে আমার এখন পশুপালন দরকার। একটা খামারের মধ্যে অনেক ছাগল থাকবে। তাদের হবে অসংখ্য বাচ্চা। তাহলে আমার আর খাবারের অভাব হবে না। তখন ভেবে ঠিক করলাম বারুদ ফুরিয়ে গেলে ফাঁদ পেতে শিকার ধরব। এরপর ধরলাম তিনটে ছাগল।

ছ বছরের মধ্যে তিনটে ছাগল থেকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তাদের সংখ্যা দাঁড়াল মোট তেতাল্লিশ। মাঝে মাঝে তাদের মেরে খাই। দুধ দুইয়ে অনেক দুধ পাই। ছাগলের চামড়া দিয়ে একটা টুপি তৈরি করেছি। এক-

ফালি চামড়া দিয়ে আমার পিঠটা ঢেকে রেখে রোদের তাপ আর বৃষ্টি থেকে রক্ষা করি নিজেকে। চামড়া দিয়ে তৈরি একটা জ্যাকেটও পরি জামার মত।

সমুদ্রের কূলে যেখানে ডোঙ্গাটা রেখে এসেছিলাম সেইখানে মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম। একদিন কূলের কাছে বালিয়াড়ির উপর মানুষের পায়ের ছাপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। একটা দুটো নয়, অনেকগুলো ছাপ। ভয়ে চমকে উঠলাম আমি। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কোন মানুষ নেই। এতদিন দ্বীপে আছি, কোনদিন কোথাও মানুষের পায়ের ছাপ দেখিনি।

ভয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। কেবলি মনে হতে লাগল কোথাও হয়ত ওৎ পেতে বসে আছে মানুষ। হয়ত লক্ষ্য করেছে আমাকে। হয়ত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যে কোন মুহূর্তে।

তখন আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম বাসার দিকে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কেউ আমায় অনুসরণ করছে কিনা।

এসেই মই বেয়ে আমার আস্তানার ভিতর ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ভিতরে গিয়েও ভয় গেল না আমার। ভাবলাম আমার ডোঙ্গাটা হয়ত দেখতে পেয়েছে। এবার আমাকে এসে ঠিক ধরবে। আমার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করবে। সব ছাগলগুলোকে ধরে নিয়ে যাবে। আর ওরা নিশ্চয় দল বেঁধে আসবে। ওরা যদি নরখাদক হয় তাহলে আমাকে ধরে খাবে। চারদিকে সমুদ্রের অগাধ জলরাশি আর গহন অরণ্য দিয়ে ঘেরা এই নির্জন দ্বীপে আমি একা। তার উপর অচেনা মানুষের পায়ের ছাপ। এই চিন্তা আর আতঙ্ক সব সময় অশান্ত ও বিচলিত করে তুলল আমায়।

এই দুশ্চিন্তার মাঝে হঠাৎ একদিন বাইবেলের কথাটা মনে পড়ে গেল আমার। তাতে নির্দেশ আছে—বিপদের দিনে স্মরণ করো আমায়। আমি তোমার পরিত্রাতা। তুমি গৌরবান্বিত করবে আমায়।

একথা মনে করে নতুন আশা জাগল আমার মনে। আমার হৃদয় জুড়িয়ে গেল। আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস বেড়ে গেল। সব অশান্তির জ্বালা দূর হয়ে গেল। মনে শান্তি আর সান্ত্বনা পেলাম। আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে জীবনযাত্রা শুরু করলাম।

তিন দিন তিন রাত ঘরে বসে কাটাবার পর আবার আমার বাড়ীর সীমানা ছেড়ে একটু একটু করে বাইরে বেরোতে শুরু করলাম। খাদ্যের টান আছে। তার উপর দুধ দোয়ানো হয়নি এ কদিন।

সাহস করে একদিন সেইখানে আবার গেলাম। সমুদ্রের কূলে সেই বালিয়াড়ির ছাপগুলো দেখলাম। আমার পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। দেখলাম ছাপগুলো আরো বড় মাপের।

দীর্ঘ পনের বছরের মধ্যে কোন মানুষ এ দ্বীপে দেখিনি। কিন্তু পায়ের ছাপ কাদের তা বুঝতে পারলাম না কিছুতেই। এ ছাপ যদি নরখাদকের পায়ের না হয় তাহলে হয়ত সভ্য জগতের মানুষের হবে। হয়ত সমুদ্রের কবলে পড়ে কূলে জাহাজ ভিড়িয়ে এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সভ্য জগতের মানুষ হলেও আমাকে দেখে তাদের শত্রু ভাবতে পারে। আমার এই সব সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারে। সেখানেও আমার ভয়। আছে বিপদের সম্ভাবনা।

আমি তাই ভাবলাম আমার আস্তানার চারদিকে যে দেওয়াল আছে পাশে পাশে গাছ বসালে তাতে আড়াল হয়ে যাবে আস্তানাটা। বাইরে থেকে কেউ এটা দেখতে পাবে না।

এই ভেবে দেওয়ালের চারদিকে গাছ বসালাম। বছর দুয়েকের মধ্যে বড় হয়ে উঠল সেই সব গাছ। আমার আস্তানার মধ্যেই ছাগলের পাল থাকার জন্য একটা খোঁয়াড় করেছি।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়ে হঠাৎ সমুদ্রের দিকে তাকাতেই একটা নৌকো দেখতে পেলাম। কিন্তু কাছে দূরবীণ না থাকায় ভাল করে দেখতে পেলাম না। জাহাজ থেকে নিয়ে আসা দুটো দূরবীণ ছিল আমার কাছে।

যাই হোক, কাছে একটা ছোট পাহাড় ছিল। তার মাথার উপর আবার লক্ষ্য করলাম। দেখলাম অনেক দূরে দুটো নৌকো মনে হলো, তাতে জংলী নরখাদক রয়েছে। সঙ্গে কিছু বন্দী। এই দ্বীপে হয়ত বন্দীদের ধরে এনে তাদের হত্যা করে তাদের মাংস খায়।

পাহাড় থেকে কূলের দিকে কিছুটা এগোতেই এক জায়গায় দেখলাম এক গাদা মাথার খুলি আর কাটা হাত পা আর ধড়ের কঙ্কাল। মানুষের মাংস আগুনে ঝলসে খেয়ে কঙ্কালগুলো ফেলে রেখে গেছে নরখাদকেরা। আবার দারুণ ভয়ে শিউরে উঠল আমার সারা শরীর। এই নরখাদক কারা, কোথা থেকে এসেছিল তা নিয়ে আবার অনেক জল্পনা কল্পনা শুরু হলো আমার মনে।

যাই হোক, অদৃশ্য মানুষদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য আমি আমার

আস্তানার কাছের পাহাড়ের উপর উঠে দূরবীণ দিয়ে দূরে লক্ষ্য করি রোজ একবার করে। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম আবার যখনি দেখতে পাব নৌকো করে নরখাদকের দল বন্দীদের খাবার জন্য দ্বীপে এসে আগুন জ্বালবে তখনি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব তাদের উপর। আমার সঙ্গে থাকবে টোটা। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করে ওদের যতগুলোকে পারব ঘায়েল করব।

কোনখানে লুকিয়ে থাকব তাও ঠিক করে ফেললাম। পাহাড়ের ঢালে মস্তবড় একটা গাছের কোটরে বসে থেকে লক্ষ্য করব ওদের গতিবিধি। তারপর সুযোগ বুঝে নরখাদকদের যতদূর সম্ভব নিহত ও আহত করে বন্দীদের উদ্ধার করব। সেই বন্দীদের পরে দলে টেনে তাদের দ্বারা অনেক উপকার পাব। ওরা সমুদ্রের গতিপ্রকৃতি সব বোঝে। তাদের দ্বারা হয়ত ভবিষ্যতে এই দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যাবার একটা পথ খুঁজে পাব।

এইভাবে রণকৌশল সব ঠিক করে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগালাম। পাছে দূর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পাওয়া যায় এজন্য আগুন জ্বালাই না বাইরে। দরকার হলে গুহার ভিতরে জ্বালাই। এইরকম আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কেটে গেল পুরো একটি বছর।

একদিন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য কাঠ কাটতে গেছি পাহাড়সংলগ্ন বনে। হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে দেখতে পেলাম একটা গুহা। ভাবলাম ভালই হলো, এই গুহার ভিতরে আগুন জ্বালালে বাইরে কেউ ধোঁয়া বা আগুন দেখতে পাবে না।

ভিতরে ঢুকে দেখলাম গুহার মুখটা সাত ফুট উঁচু এবং দুটো মানুষ ঢোকার মত চওড়া। তবে ভিতরটা বেশী লম্বা নয়। ভিতরে অন্ধকার জমে থাকায় দেখা যাচ্ছিল না।

ছাগলের চর্বি দিয়ে একরকম মোমবাতি তৈরি করতাম। এইরকম বাতি জ্বেলে জ্বেলে একদিন সেই নতুন আবিষ্কার করা গুহাটার মধ্যে ঢুকলাম। দেখলাম গুহাটা বেশ বড় এবং ভিতরে অনেক পাথর রয়েছে। সোনা না হীরে তা জানি না। বাতির আলোর ছটা পড়ায় জ্বলজ্বল করছিল পাথরগুলো।

তখন ডিসেম্বর মাস। দ্বীপে আমার তেইশ বছর পূর্ণ হয়েছে। তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে সূর্যের দক্ষিণায়ন। মাঠে এখন ফসল কাটার কাজ। রোজ সকালে উঠে মাঠে কাজ করতে যেতে হয় আমাকে।

একদিন ভোরে উঠে মাঠে গেছি ফসল কাটতে। হঠাৎ দূরে তাকাতেই দেখলাম সমুদ্রের কূলের কাছে একজায়গায় আগুন জ্বলছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলি

উঠছে। দূরবীণ কাছেই ছিল। দেখলাম নরখাদক, একেবারে বর্বর। কিন্তু এদিকটায় ওরা আসে না। যেখানে ওরা এখন রয়েছে সেখানটা আমার আস্তানা থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূর। তবু ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। ঘুরতে ঘুরতে যদি ওরা চলে আসে এদিকে, যদি দেখতে পেয়ে যায় আমার আস্তানা তাহলে আমার বন্দীত্ব এবং মৃত্যু অনিবার্য।

আত্মরক্ষার জন্য তাই আমি আমার ঘরে চলে গেলাম মই দিয়ে উঠে। বন্দুক তিনটে ও পিস্তল দুটো নামিয়ে হাতের কাছে রাখলাম। তরোয়ালটাও হাতের কাছে রাখলাম।

কেউ এল না দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে সটান শুয়ে পড়ে দূরবীণ নিয়ে দেখলাম মোট নজন উলঙ্গদেহ নরখাদক আগুনের চারপাশে বসে শিকারের মাংস কাটাকুটি করছে। দুটো ডিঙ্গি জল থেকে ডাঙ্গায় তুলেছে। তখন জোয়ার চলছিল। ভাঁটা পড়লে ফিরে যাবে।

মাংস খেয়ে আগুনটা ঘিরে উন্মত্ত হয়ে নাচতে লাগল নরখাদকের দল। তারপর ভাঁটা পড়লে ডিঙ্গিগুলো জলে নামিয়ে দাঁড় বেয়ে চলে গেল আমার দৃষ্টির সীমানার বাইরে।

মনে ভয় হলেও সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠলাম আমি। আবার যখন ওরা আসবে কোন বন্দী এনে খাবার জন্য তখন আমি ওদের পুরো দলটাকে মারব গুলি করে। ওদের দেখতে পেয়ে অনেকখানি ভয় আমার কেটে গেছে।

তখন মে মাস। সকালে ঝড়বৃষ্টির জন্য আবহাওয়াটা বড় খারাপ ছিল। ক্রমে দিন গিয়ে সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠল। আমি ঘরের ভিতর বসে বাইবেল পড়ছিলাম। হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম আমি। এই সময় দ্বীপে কারা এল? বন্দুক যখন আছে নিশ্চয় কোন সভ্য জাতের লোক।

আমি ভাবলাম হয়ত কোন জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে বন্দুক থেকে গুলি করে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে। আমি তখন আমার অস্তিত্বটাকে জানাবার জন্য আগুন জ্বালালাম পাহাড়ের উপর।

এর পর আরো একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ ভেসে এল। সারারাত্রি আমি সেইখানেই জেগে কাটালাম। সকাল হলেই দূরবীণ দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সেই আধ ডুবো পাহাড়টার ধারে আধভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে একটা জাহাজ। কি ব্যাপার আমি তা বুঝতে পারলাম না কিছুই। কূলের উপর কোন আগুন দেখতে পেলাম না।

জাহাজডুবি বিপন্ন মানুষদের যদি কোন কাজে লাগতে পারি, এই ভেবে আমি ডুবো পাহাড়টার দিকে এগিয়ে গেলাম। কূলের কাছে গিয়ে দেখি একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকটির বয়স কম। পরনে জামা আর পায়জামা। হয়ত নাবিক হবে। কোন দেশের লোক বুঝতে পারলাম না। নিগ্রো নয়। হয়ত আর কেউ বাঁচেনি।

জাহাজটার প্রকৃত অবস্থা কি তা দেখার জন্য আমি আমার আস্তানায় গিয়ে আমার খাল থেকে ডোঙ্গাটা নিয়ে ডুবো পাহাড়ের কাছে চলে গেলাম জলপথে। সঙ্গে নিলাম কিছু রুটি, এক কলসী খাবার জল, এক বোতল মদ আর কিছু কিসমিস। কিন্তু তখন জোয়ার চলছিল বলে জাহাজের কাছে দারুণ স্রোত থাকায় আমার ডোঙ্গা এগোতে পারল না। আমি ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে স্রোতের বেগ কম থাকায় আমি আবার ডোঙ্গা নিয়ে চলে গেলাম জাহাজটার কাছে। দেখলাম ধাক্কা খেয়ে পাহাড়ের একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে জাহাজটা। মাস্তুল নেই, হাল ভাঙ্গা পাটাতন একেবারে জলমগ্ন।

মানুষের গন্ধ পেয়ে একটা কুকুর জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ল জলে আমার কাছে। আমি তাকে আমার নৌকায় তুলে কিছু রুটি জল দিলাম। তা খেয়ে প্রাণ ফিরে পেল মৃতপ্রায় দেহে।

আবার আমি জাহাজে ফিরে গেলাম। উপরে উঠে দেখলাম একটা মানুষও নেই। জাহাজের রান্নাঘরের সামনে দুটো মানুষের মৃতদেহ। ফুলে উঠেছে তাদের দুজনের মৃতদেহ। হাতে দড়িবাঁধা ছিল। নাবিকদের জিনিসপত্র ভর্তি কয়েকটা বাক্স পেঁটরা ছিল। আর একটা পেটিতে ছিল অনেক মদের বোতল। আমি মদের বোতলের পেটিটা আর দুটো হালকা বাক্স নিয়ে ডোঙ্গাতে এনে তুললাম। কটা বন্দুক আর কিছু শুকনো বারুদও পেলাম সেই ভাঙ্গা জাহাজটার মধ্যে।

এই সব নিয়ে কুকুরটাকে সঙ্গে করে ডোঙ্গায় করে আমার আস্তানার কাছে ফিরে এলাম। কিন্তু সে রাতে আমি আমার ঘরে গেলাম না। ডোঙ্গাতেই শুয়ে রইলাম। ভাবলাম পরদিন সকালে আমার নতুন গুহার ভিতরে এই মালগুলো রাখব।

বাক্সগুলো খুলে দেখলাম নাবিকদের কিছু পোশাক আছে। তবে একটা পাওয়া গেল এগারশো টাকার নোট, দুটা সোনার গিনি আর কিছু সোনার পাত। সব মিলিয়ে এক পাউণ্ডের মত ওজন হবে।

এইভাবে আরো দুটি বছর কেটে গেল।

তখন মার্চ মাস। আমি ঠিক করে ফেললাম এর পর কোন নরখাদকের দল বন্দী নিয়ে এই দ্বীপে উঠলেই আমি তাদের হত্যা করে বন্দীদের উদ্ধার করব। বন্দীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কতকগুলো হিংস্র মানুষকে হত্যা করলে আমার কোন পাপ হবে না তাতে বরং সেটা হবে পুণ্যের কাজ।

হিসেব করে দেখলাম দ্বীপে আসার চব্বিশ বছর পূর্ণ হলো আমার।

সেদিন ভোরবেলায় উঠে রোজকার মত কূলের দিকে তাকাতেই দেখলাম একসঙ্গে পাঁচটা নৌকা কূলের কাছে এসে ভিড়েছে। তাতে আছে অনেকগুলো মানুষ। লোকগুলো কূলে উঠেই আমার চোখের আড়ালে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসল। আর কিছু দেখতে পেলাম না।

তখন আমি পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে দূরবীন নিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখলাম মোট তিরিশ জন লোক আগুন জ্বেলে তার চার পাশে গোল হয়ে বসেছে। মাংস কাটছে। তারপর তাদের রান্না দেখতে পেলাম। দেখি হঠাৎ তারা নাচতে শুরু করে দিয়েছে উদ্দামভাবে।

এর পর দেখি নৌকা থেকে দুজন বন্দীকে নামাচ্ছে তারা। দুজনের এক জনের মাথায় একটা মুগুর দিয়ে মারতেই লোকটি পড়ে গেল। তখন তাকে ধরে তুলে নিয়ে গেল আগুনের কাছে।

অপর বন্দীটি তখন চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। দেখলাম সে ছুটে আসছে আমার আস্তানার দিকে। তাকে ধরার জন্য নরখাদকদের মধ্যে তিন জন তার পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

আমি ভাবলাম এই আমার সুযোগ আমি বন্দুক নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম। আমার আস্তানার কাছে আমার ডোঙ্গা থাকার জন্য যে নালাটা কেটে ছিলাম বন্দী লোকটা সেই নালাটা সাঁতরে পার হয়ে এদিকে চলে এল। আর অনুসরণকারী তিন জনের মধ্যে একজন ফিরে গেল নালার ওপার থেকে। বাকি দুজন ঝাঁপ দিল জলে।

আমি তখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে হাতের ইশারা করে বন্দীকে ডাকলাম আমার কাছে। সে ইতস্তত করছিল। অনুসরণকারীদের একজন ডাঙ্গায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম তার বুক লক্ষ্য করে। লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে গেল। অন্য অনুসরণকারীটা আমাকে লক্ষ্য করে তার ধনুকে তীর যোজনা করতে যেতেই আমি ছুটে তার কাছে গিয়ে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারলাম তার মাথায়। সে পড়ে গেল। তার তীর ধনুকটা ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে।

'এবার বন্দীকে ডাকতেই সে ছুটে এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল।

আমি ইশারায় বললাম, ভয়ের কোন কারণ নেই।

তবু সে আমার একটা পা তার মাথায় চাপিয়ে দিল। এর মানে সে আমাকে ওদের প্রথামত প্রভু হিসাবে মেনে নিল আর আমার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল। আমি তখন আমার কোমর থেকে তলোয়ারটা খুলে তার হাতে দিয়ে ইশারা করে বললাম, যে অনুসরণকারীটা বেঁচে আছে এখনো তাকে নিজের হাতে খতম করো।

সে তখন তলোয়ারটা দিয়ে এক কোপে তার গলাটা কেটে ফেলল। তার শক্তি দেখে আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। শত্রুর গলা কেটে তলোয়ারটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর রক্ত মুছে আমার আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। সে তখন খুব খুশি। হাসি ফুটে উঠল তার সারা মুখে।

বন্দীটিও বন্দুকের ব্যবহার জীবনে প্রথম দেখে দারুণ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, আমার নির্দেশে সে মৃতদেহটাকে মাটি খুঁড়ে একটা গর্ত করে পুঁতে দিল। তারপর এক মৃতের তীর ধনুকটা নিয়ে আমার সঙ্গে আসতে লাগল।

মই দিয়ে উঠে তাকে আস্তানার ভিতর নিয়ে গেলাম। তারপর তাকে রুটি দুধ খেতে দিলাম। গোগ্রাসে খেল সে। কারণ খিদে পেয়েছিল। তারপর খড়ের উপর কম্বল বিছিয়ে দিলাম। সে তাতে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম বন্দী লোকটির বয়স বেশী নয়, পঁচিশ কি ছাব্বিশ। লম্বা সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। গায়ের রং নিগ্রোদের মত কালো নয়। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ যাকে বলে। মাথায় লম্বা চুল। গোল মুখ। ঝকঝকে দাঁত। চোখে মুখে একটা আদিম সরলতার ভাব। তবে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হলো।

পরদিন সকালে উঠে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে আমার একটা পা তার মাথায় একবার তুলে নিল সে। সে ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাকে একটা প্যান্ট দিলাম পরতে। তাকে কিছু কিছু আমার ভাষা শেখাতে লাগলাম। তাকে আমি শুক্রবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি বলে তার নাম দিলাম ফ্রাইডে। তাকে কথাটা বুঝিয়ে দিতে সেও খুশি হলো।

একটু বেলা হওয়ার পর ফ্রাইডেকেবন্দুক ছোঁড়া শিখিয়ে তার হাতে একটা

বন্দুক আর তলোয়ারটা দিয়ে তাকে সঙ্গে করে সমুদ্র কূলের দিকে এগিয়ে চললাম। আমার মনে একটা ভয় ছিল। ভাবছিলাম ওরা হয়ত অনুসরণকারী সেই লোকটার মুখ থেকে সব কিছু শুনে আমার আস্তানা আক্রমণ করতে আসছে দল বেঁধে।

রাতের মধ্যে বা পরদিন সকালেও না আসায় ওরা চলে গেছে কি না তা দেখতে গেলাম। ফ্রাইডেরাও নরখাদক। গতকাল তার নিজের হাতে পুঁতে দেওয়া দুটো মৃতদেহের মাংস সে খেতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি সেটা খারাপ এই কথাটা হাবেভাবে বুঝিয়ে দেওয়ায় সে আর তা খেতে চায়নি।

কূলে গিয়ে দেখলাম গতকালকার সেই নরখাদকের দল আর নেই। মনে হয় গুলির শব্দ শুনে সব পালিয়েছে। ফ্রাইডে বলল, ওরা মোট চারজন বন্দী এনেছিল। তার মধ্যে তিনজনকে মেরেছে। সে-ই একমাত্র পালিয়ে বেঁচেছে। আমি দেখলাম সত্যি সত্যিই সেই গাছের তলায় তিনটে কাটা মুণ্ড আর ছ'টা কাটা হাত পড়ে রয়েছে।

আমি তখন ফ্রাইডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা তোদের ধরে মারতে গিয়েছিল কেন ?

ফ্রাইডে বলল, ক্ষমতার লড়াই চলছিল তাদের রাজ্যে। ওদের রাজাকে হারিয়ে আর একজন রাজা হতে চায়। সে লড়াইয়ে ওদের রাজা হেরে যায়। ফ্রাইডেরা ছিল রাজার পক্ষে। তাই তাদের বন্দী করে ধরে আনে এখানে। লড়াইয়ে পরাজিত শত্রুদের মাংস খায় ওরা। তা ছাড়া নরমাংস খায় না।

সেই গাছতলায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো এক জায়গায় জড়ো করে আগুনে পুড়িয়ে দিল ফ্রাইডে। সেই পোড়া মাংস খাবার লোভ হচ্ছিল তার। কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলাম তাকে সে যেন আর কখনো নরমাংস খাবার লোভ না করে তাহলে আমি ভীষণ রেগে যাব। রাগের মাথায় মারতেও পারি।

তখন সে আমার পা ছুঁয়ে শপথ করল। সে কখনো এ লোভ আর করবে না।

মানুষের মাংসের পরিবর্তে অন্য মাংস খাওয়াতেও সমান তৃপ্তি পাওয়া যায় এটা বোঝালাম ফ্রাইডেকে।

বাসায় ফেরার সময় পথে বন্দুক দিয়ে গুলি করে একটা ছাগল মারলাম। বন্দুকের ক্রিয়াটা খুব কাছে থেকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। তাকে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়ে দিলাম আমি হাত ধরে। শেখাতে গিয়ে একটা বনমোরগ মারলাম।

ছাগল আর বনমোরগ বয়ে নিয়ে এল ফ্রাইডে। বাসায় এসে মাংসের ঝোল রান্না করে খেতে দিলাম তাকে। সে জীবনে কখনো নুন খায়নি। প্রচুর মাংস খেল সে। নুন খাওয়ায় অভ্যস্ত হতে সময় লেগেছিল তার।

পরদিন মাংস রান্না না করে আগুনে ঝলসে খেলাম। ফ্রাইডে আমাকে যা করতে দেখে তাই শিখে নেয়। সে খুব চালাক। যব পেষাই, রুটি তৈরি করা, ছাগলের দুধ দোয়ানো, চাষের কাজ একে একে সব শিখে নিল সে।

রোজ একটু কথাবার্তা ভালভাবে বলার জন্য ভাষা শেখাতে লাগলাম। দীর্ঘকাল একা একা থাকার পর ফ্রাইডেকে কাছে পেয়ে খুব ভাল লাগছিল আমার।

একদিন আমি ফ্রাইডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর আগে তোরা এ দ্বীপে এসেছিলি ?

সে বলল, হ্যাঁ একদিন তাদের এক বিরাট দল তেইশ জন বন্দী নিয়ে এখানে এসে তাদের মেরে মাংস খায়। সে এক বিরাট ভোজ।

আমি বললাম, তোদের দেশ কতদূরে ? কিভাবে আসিস ? তোদের পানসি ডুবে যায় না ?

ফ্রাইডে বলল, ওদের দেশ বেশী দূরে নয়। ভোরে রওনা হয়ে সন্ধ্যের সময় ফিরে যায়। ওদের পানসি ডোবে না। সমুদ্রের স্রোত কখন কম থাকে, হাওয়া কখন অনুকূল থাকে তা তারা জানে।

বুঝলাম, ওরা ক্যারিবীয় সম্প্রদায়ের লোক। ম্যাপ খুলে দেখলাম ওদের দেশটা আমেরিকা ছাড়িয়ে ওরুনুকো নদীর ধারে। আর আমি এতদিন যে দ্বীপে বাস করছি সেটা হলো ত্রিনিদাদ দ্বীপপুঞ্জের একটা অংশ।

ফ্রাইডে আরও বলল, ওদের অঞ্চলের কাছাকাছি একটা জায়গায় সাদা চামড়ার একদল মানুষ থাকে। তারা স্পেনদেশীয়। বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। মাঝে মাঝে যখন তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে তখন ওরা নির্মমভাবে হত্যার তাণ্ডব চালায়।

আমি বললাম, সেই শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলোর সঙ্গে কিভাবে দেখা করা যায় বলত ?

সে বলল, তাহলে দুটো নৌকোর সমান একটা বজরা বা জাহাজ চাই ; তবেই তাদের দেখা পাওয়া যাবে।

একদিন বিশ্বসৃষ্টি ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা তুলতে ফ্রাইডে বলল বেনামুকিই সব কিছু সৃষ্টি করেছে। বেনামুকিই তাদের ভগবান। মানুষ মৃত্যুর পর

বেনামুকির কাছে চলে যায় সবাই। বেনামুকির খুব ক্ষিদে। তাই মৃত্যুর পর সব মানুষকে গ্রাস করে। বেনামুকিই এই পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র, মানুষ সব কিছুর মালিক। তারই আদেশে সব কিছু চলে। বেনামুকি থাকে আকাশে।

আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল ফ্রাইডে।

আমি তখন যীশুর গল্প শোনালাম তাকে। বললাম স্বয়ং ভগবান যীশুকে পাঠিয়েছিলেন এই পৃথিবীতে।

ফ্রাইডে বলল, তাদের মধ্যে যারা বুড়ো এবং ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক তাদের উকাকী বলে। তারা পাহাড়ের উপরে গিয়ে বেনামুকির সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু তাদের বয়স কম বলে এখন তারা কথা বলতে পারবে না বেনামুকির সঙ্গে। উকাকীরা বেনামুকির সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে আমাদের দেশের লোকদের যা যা করতে বলে তারা তাই করে।

বুঝলাম, ধর্মের নামে উকাকী নামে চতুর লোকগুলো সরল প্রকৃতির অসভ্য মানুষগুলোকে ঠকায়। সভ্য জগতেও লোক ঠকাবার অনেক ছল চাতুরী ও কলাকৌশলের অভাব নেই।

এর পর আমি এই দ্বীপে কতদিন আগে কিভাবে এলাম তা সব খুলে বললাম ফ্রাইডেকে। খৃষ্টধর্ম ও ইউরোপ মহাদেশ সম্বন্ধেও অনেক কথা বললাম। এইভাবে দুটি একেবারে ভিন্ন জাতীয় মানুষ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম পরস্পরের।

আমাদের যে নৌকোটা স্রোতে ভেসে এখানকার কূলে এসে লাগে সেটা নিয়ে গিয়ে দেখালাম ফ্রাইডেকে। নৌকোটার আধখানা তখনো পোঁতা ছিল বালিতে।

নৌকোটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার পর ফ্রাইডে বলল বছর চারেক আগে এইরকম নৌকোয় করে সতের জন শ্বেতাঙ্গ জাহাজডুবি হয়ে তাদের রাজ্যে এসে ওঠে।

আমি বললাম, তোরা তাদের বধ করে খাসনি ?

ও বলল, আমরা সাদা চামড়ার মানুষ খাই না। তারা আমাদের দেশেই বাস করছে। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া বিবাদ হয় না।

এবার আমি ফ্রাইডেকে আমার ডোঙ্গাটা দেখিয়ে বললাম, এতে চেপে আমরা দুজনে তোদের দেশে যেতে পারব ?

সে বলল, না। বড় ছোট।

আমি তখন বললাম, আমরা দুজনে মিলে তাহলে একটা নৌকো বানাই। তারপর তুই আগে তাতে চেপে তোর দেশ থেকে ঘুরে আয়। আমি এখানেই থাকব।

একথা শুনে খুব দুঃখিত হলো। তার মুখ ভার হয়ে উঠল।

আমি বললাম, কি হলো রে তোর ?

সে বলল, তুমি কেন আমাকে একথা বললে ? তুমি না গেলে আমি যাব না। তুমি আমাকে মোটেই ভালবাস না।

আমি বললাম, আমি তোদের দেশে কি করব ?

সে বলল, তুমি আমাদের সব শেখাবে। ভগবান, মানুষের মাংস না খাওয়া, যত সব ভাল ভাল জিনিস।

আমি বললাম, কিন্তু আমি গেলে তোর দেশের লোকেরা যদি বন্দী করে ? যদি আমাকে খেয়ে ফেলে ?

তোমাকে বন্দী করবে কেন ? তোমার সঙ্গে কি যুদ্ধ হয়েছে ? কেউ কিছু করবে না। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। আমি কখনো যাব না।

এই বলে কাঁদতে লাগল সে।

আমি বুঝলাম, আমি তার মনে কষ্ট দিয়েছি। সে সত্যি আমাকে ভালবাসে। বুঝলাম তার একান্ত বিশ্বাস, তার একান্ত অভিলাষ, আমি তাদের দেশের উন্নতি করব, আমি অনেক ভাল জিনিস শেখাব। তাই ও আমাকে ওদের দেশে নিয়ে যেতে চায়।

আমার কিন্তু তাদের দেশে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হলো তাদের দেশে যে সতের জন শ্বেতাঙ্গ আছে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। হয়ত তাদের মাধ্যমে আমার একটা উপায় হয়ে যেতে পারে।

আমি তাই বললাম, ঠিক আছে, আমিও তোর সঙ্গে যাব। তার জন্য দুজনে মিলে একটা বড় নৌকো বানাব। তাতে চেপে আমরা দুজনেই যেতে পারব।

ফ্রাইডেই দেখে শুনে একটা সারবান গাছ বাছাই করল। তারপর সেই গাছ কেটে কাঠ চেরাই করে নৌকো বানানোর কাজে লেগে গেল। দেখলাম সে এ কাজে বেশ পাকা। হাতুড়ি, বাটালি কুড়ুল সব তাকে দিয়ে শিখিয়ে দিলাম কিভাবে কি করতে হবে। সে সব শিখে নিল। আমিও কাজে হাত লাগালাম।

অবশেষে একটা বড় নৌকো তৈরি হয়ে গেল। সেটাকে খালের জলে নামিয়ে দিলাম। ফ্রাইডে খুব ভাল দাঁড় বাইতে পারে। দাঁড় বেয়ে সে সমুদ্রের অনেকখানি ঘুরে এল। তার দাঁড় বাওয়ার ভঙ্গি বড় স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল। নৌকোতে মাস্তুল আর পাল খাটিয়ে দিলাম। ফ্রাইডে খুব খুশি হলো।

নৌকোটা বানাতে পুরো ছ'মাস সময় লাগল আমাদের। সবশেষে একটা কম্পাস লাগিয়ে দিলাম। কম্পাস কিভাবে দেখতে হয় তাও শিখিয়ে দিলাম। আমার কাছে ফ্রাইডে আসার পর দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। অর্থাৎ আমি এ দ্বীপে এসেছি মোট সাতাশ বছর।

বর্ষাকাল এসে গেল। ছ'মাস বর্ষা থাকবে। এই ছ'মাস ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। সুতরাং এই ছমাস অপেক্ষা করতে হবে। নৌকোটা রাখলাম বাড়ির কাছের সেই খালটায়। কিন্তু যাতে নৌকোটা ভেসে না যায় তার জন্য দুজনে মিলে একটা খাড়ি কেটে একদিকে বাঁধ দিয়ে রেখে দিলাম নৌকোটাকে।

নভেম্বর এসে গেল। বৃষ্টি বাদল সব শেষ হয়ে গেল। আকাশ বেশ পরিষ্কার। পরিষ্কার আবহাওয়া। অবশেষে আমাদের যাওয়ার সব ঠিক করে ফেললাম। একে একে খাবার, পানীয় জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী যোগাড় করে নৌকোয় তুলতে লাগলাম।

আমরা সপ্তায় একদিন করে কাছিমের মাংস খেতাম। একদিন সকালে আমি তাই ফ্রাইডেকে কাছিম আনতে পাঠিয়েছিলাম। আমি জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম। হঠাৎ ফ্রাইডে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে ডাকতে লাগল দারুণ ব্যস্তভাবে, মালিক, মালিক, সর্বনাশ হয়েছে।

আমি আস্তানার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বললাম, কি হয়েছে রে?

ফ্রাইডে হাত বাড়িয়ে সমুদ্রকূলের দিকে দেখিয়ে বলল, একটা দুটো নয় ছ'টা। কূলে এসে ভিড়ছে। অনেকগুলো লোক।

আমি দেখলাম দারুণ ভয় পেয়ে গেছে ফ্রাইডে। আমি তাকে বললাম, ভয় করিস না। আমরা দুজনে লড়াই করব। তোর হাতে বন্দুক দেব। ওরা যেই হোক, আমরা দুজনে গুলি করব। ওদের সব ঘায়েল করব দেখবি।

ফ্রাইডে ভাবল, হয়ত ওদের দেশের শত্রুরা দল বেঁধে তাকে ধরতে এসেছে। সে পালিয়ে এসেছে এটা তারা জানতে পেরেছে।

তার ভয় কাটাবার জন্য এক বোতল মদ দিলাম। সেটা খেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল সে।

এর পর আমি দূরবীন নিয়ে আস্তানার কাছের পাহাড়ের উপরে উঠলাম। দেখলাম এবার ওরা অনেকটা এগিয়ে এসে নৌকো ভিড়িয়েছে। আমার কাটা খালটার ওপারে যে ঘন বন আছে তার ওদিকের কূলে। দূরবীন দিয়ে দেখলাম ওরা সংখ্যায় আছে মোট একুশ জন। সঙ্গে তিনজন বন্দী।

এবার আমি সংকল্প করে ফেললাম মনে মনে, আমার এত কাছে আমি মানুষ খুন করতে দেব না। আমি বন্দীদের জীবন রক্ষা করব। বারবার এই অমানুষিক নরহত্যা আমি সহ্য করব না কিছুতেই।

আমি ফ্রাইডেকে বললাম, চল, আজ ওদের শিক্ষা দেব। এই খুন বন্ধ করতেই হবে।

ফ্রাইডের হাতে দিলাম তিনটে বন্দুক আর একটা পিস্তল আর আমিও তাই নিলাম। একটা ঝোলাতে সীসে, বারুদ, গুলি ভরে ফ্রাইডের কাঁধে ঝুলিয়ে দিলাম।

আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম পা টিপে টিপে। ফ্রাইডেকে বলে দিলাম সে যেন আমার নির্দেশ মেনে চলে। আমি না বললে যেন গুলি না চালায়। বন্দীদের ছিনিয়ে আনতে গেলে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবেই। ওদের হাতে হয়ত তীর ধনুক আছে।

আমার নির্দেশে ফ্রাইডে একটা গাছে উঠে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করল। তারপর নেমে এসে বলল, আগুনের চারপাশে বসে মাংস খাচ্ছে ওরা। ওরা ওদের দেশেরই লোক, তিনজন বন্দীর মধ্যে একজনকে ইতিমধ্যেই হত্যা করেছে। বন্দীদের একজন সাদা চামড়ার মানুষ।

আমি তখন লাফ দিয়ে গাছে উঠে দেখলাম সত্যিই তাই। একজন শ্বেতাঙ্গ বন্দীর হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে একধারে। আর একজন উলঙ্গ বন্দীকে উপুড় করে শুইয়ে রেখেছে নৌকোর খোলে। ওরা তখনো মাংস খাচ্ছে। ওদের কাছ থেকে আমরা ছিলাম মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। ওদের কাছে একটা ঝোপ ছিল।

আমরা গুড়ি মেরে সেই ঝোপের এদিকে আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। দেখলাম একজন লোক শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের দিকে এগিয়ে গেল। আমি ফ্রাইডেকে বললাম, আমি যা করব তুইও তাই করবি। আমি বন্দুক হাতে নিয়ে ওদের লক্ষ্য করলাম।

আমরা দুজনেই গুলি করলাম একসঙ্গে। বন্দীকে যারা ধরতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে দুজন পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। তিনজন জখম হলো। বাকি লোকগুলো চিৎকার করতে করতে নৌকোর দিকে পালাতে লাগল।

আমি ফ্রাইডেকে বললাম, আবার গুলি চালাও। ফ্রাইডের গুলিতে যারা পালিয়ে যাচ্ছিল তাদের অনেকে আহত হলো। আমরা তখন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমি শ্বেতাঙ্গ বন্দীর হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে হাত ধরে তুললাম। ভয়ে শুয়ে পড়েছিল মাটিতে। তাকে একবোতল মদ আর একটা রুটি দিলাম। সে তা খেয়ে শরীরে বল পেল। আমি তখন তার হাতে একটা পিস্তল আর একটা তরোয়াল দিলাম। সে বলল তার বাড়ি স্পেন। অস্ত্র পেয়ে সে তার চিরশত্রুদের আক্রমণ করল। আমি আর গুলি ছুঁড়লাম না। আমাদের দুজনের হাতে দুটো বন্দুক ছিল। বাকি চারটে বন্দুক ছিল। বাকি চারটে বন্দুক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেগুলো আনিয়ে গুলি ভরে রাখলাম।

এদিকে মুক্ত হয়ে সেই শ্বেতাঙ্গ বন্দী পিস্তল আর তলোয়ার দিয়ে লড়াই করতে লাগল তার শত্রুদের সঙ্গে। ফ্রাইডেও আর বন্দুকের গুলি খরচ না করে একটা কুড়ুল নিয়ে লড়াই করতে লাগল।

শেষে দেখা গেল মোট একুশ জন লোকের মধ্যে সতের জন নিহত হলো। মাত্র চারজন গিয়ে নৌকোয় উঠল। কিন্তু খুনের যেন নেশা চেপেছে ফ্রাইডের মনে। সে আবার গুলি করল। নৌকো থেকে তিনজন পড়ে গেল জলে। মাত্র একজন নৌকো নিয়ে পালিয়ে গেল। ফ্রাইডে আমাদের নৌকো নিয়ে তাড়া করতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি নিষেধ করলাম। শত্রুর শেষ রাখবে না সে। কারণ লোকটা পালিয়ে গিয়ে দেশ থেকে আবার দলবল নিয়ে আসতে পারে।

এরপর ওদের নৌকোয় উঠে দেখি যে একজন বন্দী বাঁধা অবস্থায় শুয়ে ছিল তার উপর ঝুঁকে কাঁদছে ফ্রাইডে। পরে জানলাম ঐ বন্দীই হচ্ছে ফ্রাইডের বাবা। পিতাপুত্রের এক অপ্রত্যাশিত মিলন ঘটল এই ভাবে। ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এইভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে ওদের।

ফ্রাইডের বাবাকে রুটি আর জল খেতে দিয়ে সুস্থ করে তুললাম।

ফ্রাইডের বাবা বলল, ফ্রাইডেকে যারা মারতে এসেছিল এ দ্বীপে তারা দেশে গিয়ে বলেছে বজ্রাঘাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা বন্দুকের গুলিকে বজ্রাঘাত বলে।

স্পেনীয় শ্বেতাঙ্গের মুখ থেকে শুনলাম, তারা জাহাজে করে লা প্লাটা থেকে যাচ্ছিল হাভানার পথে। পথে ঝড়ের কবলে পড়ে। সবাই উদ্ধার পায়নি। মাত্র সতের জন নৌকোয় করে হাভানা দ্বীপে গিয়ে ওঠে। সেই দ্বীপের বর্বর অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল তারা। জাহাজে ছিল চামড়া আর রূপোর পসরা। কথা ছিল জাহাজের পণ্য সব বিক্রি করে অন্য পণ্য নিয়ে আসবে। পথে জাহাজডুবি হয়ে এই দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়।

ফ্রাইডের বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিল গাছের ছায়ায়। বৃদ্ধ লোক। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অনেকখানি। ফ্রাইডে তার বাবাকে কাঁধে করে তুলে আমার আস্তানার কাছে নিয়ে এল। মই দিয়ে উঠতে পারবে না বলে বাইরে তাঁবু খাটিয়ে দেওয়া হলো তার থাকার জন্য।

একদিন শ্বেতাঙ্গ স্পেনীয় আমাকে বলল, আমি আর ফ্রাইডের বাবা দেশে ফিরে যাই। সেই সতের জন স্পেনীয়কে সব কথা বুঝিয়ে বলি। তারা যদি আপনার নির্দেশ মেনে চলতে রাজী হয় তাহলে তাদের এখানে নিয়ে আসব। তারা বড় দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে আছে। খাওয়া পরার কোন সংস্থান নেই। সবই বর্বর আদিবাসীদের দয়ার উপর। অত্যাচার করে না ঠিক, কিন্তু করতেই বা কতক্ষণ।

আমিও ঠিক করলাম তারা দুজনে যাবে। তবে তারা এলে প্রচুর খাদ্য দরকার। তাই বর্ষাকাল আসতে বেশী করে চাষের কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বীজের অভাব নেই। তাই ওদের চাষের কাজ সব বুঝিয়ে দিলাম। চারজনে মিলে চাষের কাজ করতে লাগলাম। প্রচুর যব আর ধানের বীজ ছড়িয়ে দিলাম।

সেবার ফসলও হলো প্রচুর। ফসল পাকলে সবাই মিলে কাটতে ও ঝাড়াই পেষাই করতে শুরু করে দিলাম। অনেকগুলো ঝুড়ি বুনলাম।

এবার ওদের দেশে যাবার অনুমতি দিলাম। কাগজ কলম যোগাড় করে বললাম লিখিত প্রতিশ্রুতি আনবে।

মনে মনে ভাবলাম, স্পেনীয়রা সাধারণতঃ বিশ্বাসঘাতকতায় অদ্বিতীয়। ওরা ইংরেজদের দেখতে পারে না।

আমার পানসিটায় করে ওরা রওনা হলো। সঙ্গে খাবার ও ওদের দুজনের হাতে দুটো বন্দুক ও গুলি দিলাম। তবে বলে দিলাম প্রয়োজন না হলে যেন তা ব্যবহার না করে।

এদিকে চাষের কাজ শেষ হলে ফসল পাকার আগে যে সময় পেয়েছিলাম

তাতে আমরা চারজনে আবার একটা বড় আকারের বজরা তৈরি করেছিলাম। যদি একসঙ্গে সবাই মিলে রওনা তে হয় তার জন্য একটা বড় বজরার দরকার।

ওরা চলে যাবার আটদিন পর একদিন ভোরে আমি যখন গুহার বিছানায় শুয়েছিলাম তখন হঠাৎ ফ্রাইডে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলল, মালিক, মালিক, ওরা এসে গেছে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি ওরা কি করে ফিরে আসবে তা বুঝতে পারলাম না।

খালি চোখে কূলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কূল থেকে মাইলখানেক দূরে একটা নৌকো কূলের দিকে এগিয়ে আসছে। সেটা জাহাজের নৌকো বলে মনে হলো। তাতে অনেক যাত্রী ছিল।

দূরবীন নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে দেখলাম দূরে একটা জাহাজ রয়েছে। জাহাজটা আমাদের দেশের বলে মনে হলো। নৌকোর যাত্রীরাও সব ইংরেজ। ফ্রাইডের বাবা ও সেই স্পেনীয় কেউ নেই।

মনে মুক্তির আশা জাগায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও হতে লাগল। ওরা ত দস্যুও হতে পারে। আমাদের এই আস্তানাটা দেখতে পেয়ে আমদের মেরে অথবা বন্দী করে সব লুটপাট করে নেবে। ওরা সভ্য জগৎ থেকে এসেছে অস্ত্র আছে ওদের কাছে। ওদের ঠেকাতে পারব না।

আমার নালা দিয়ে না ঢুকে কূলের কাছে নৌকা রেখে ওরা কূলে নামল। দেখলাম ওরা সংখ্যায় মোট এগার জন। সবাই ইংরেজ নয়, কিছু ওলন্দাজ। ওলন্দাজ তিনজন ছাড়া বাকি সকলের হাতে অস্ত্র অর্থাৎ বন্দুক ছিল।

পরে বুঝলাম যে তিনজনের হাতে বন্দুক ছিল না তারা বন্দী। নৌকা থেকে তাদের জোর করে নামাল ওরা।

ফ্রাইডে বলল, ইংরেজরা কি মানুষ খায়?

আমি বললাম, না ওরা বন্দীদের হত্যা করার জন্য এসেছে এখানে। আমরা ভাবলাম ওরা হয়ত বন্দীদের মারবে বা এই দ্বীপে তাদের নির্বাসনে রেখে সমুদ্রে জোয়ার এলে চলে যাবে। নাবিকদের দুজন নৌকায় উঠে শুয়ে রইল। বাকিরা বন্দীদের ঘিরে বসে রইল কূলের উপর।

আমি বুঝলাম দ্বীপ ছেড়ে জাহাজে ফিরে যেতে জোয়ারের দরকার। তার মানে দশ ঘণ্টার আগে নয়। ফ্রাইডেকে বললাম সন্ধ্যার আগে আমরা কিছু করব না। তারপর যা হয় একটা করব।

তবে বন্দী তিনজনকে উদ্ধার করার এক দৃঢ় সংকল্প খাড়া করলাম মনে মনে। খাওয়া দাওয়া না করে সারাদিন আমরা পাহাড়ের উপর থেকে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

দুপুর হতে নৌকো থেকে দুজন নাবিক নেমে কূলে এসে উঠল। গাছের ছায়ায় আটজন শুয়ে পড়ল। বাকী তিনজন একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়ল। ওদের পাশে আছে ঘন জঙ্গল আর ঝোপঝাড়।

ফ্রাইডেকে নিয়ে আমি সন্তর্পণে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ভাবলাম, উপস্থিত আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা কিছু শুনব।

গিয়ে দেখলাম বন্দী তিনজন ছাড়া নাবিকরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে।

পা টিপে টিপে যতদূর সম্ভব বন্দীদের কাছে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বললাম আমি আপনাদের বন্ধু, ভয় নেই। আপনারা কে? আমার উপর নির্ভর করতে পারেন।

বন্দীদের একজন বলল, আপনি কি দেবদূত?

বললাম, না আমি মানুষ। কেন আপনারা এসেছেন?

আমরা বন্দী। বিপদগ্রস্ত। আমাদের ওরা মারবে।

আমি তখন একটু করে নিজেকে প্রকাশ করতে লাগলাম ওদের সামনে। ছাগলের চামড়ায় তৈরি পোশাক দেখে ওরা ঘাবড়ে গিয়েছিল।

আমি বললাম, আমি একজন ইংরেজ। আপনাদের সাহায্য করতে এসেছি। আমাদের কাছে বন্দুক আছে।

বন্দীদের আর একজন তখন বলল, আমি ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন। ওরা নাবিক; বিদ্রোহ করেছে। বাকি দুজন বন্দীর মধ্যে একজন আমার সহকারী আর একজন যাত্রী। আমাদের তিনজনকে ওরা প্রথমে খুন করতে গিয়েছিল। পরে ঠিক করল আমাদের এই দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে যাবে। তাই এখানে এনেছে। তারা বিদ্রোহের প্রতিবাদ করেছিল বলেই ওদের বন্দী করেছে।

আমি বললাম, ওদের কটা বন্দুক আছে?

ক্যাপ্টেন বলল, দুটো, আর আছে তলোয়ার।

ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আমরা পিছিয়ে বনের গভীরে চলে এলাম। ক্যাপ্টেন বলল, এখন ওরা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিকালে আমাদের ছেড়ে রেখে চলে যাবে।

আমি বললাম, এখন আমরা ওদের হত্যা করতে পারি অথবা বন্দী করতে পারি।

ক্যাপ্টেন বলল, ওদের মধ্যে তুজন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তাদের শায়েস্তা করতে পারলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আমি বললাম, আমি তুটো শর্তে আপনাদের জীবন রক্ষা করতে পারি। একটা শর্ত হলো এই যে, এই দ্বীপে আপনারা যতদিন থাকবেন ততদিন আমার নির্দেশ মেনে চলবেন। আমি আপনাদের হাতে অস্ত্র তুলে না দিলে ব্যবহার করতে পারবেন না। আমার দ্বিতীয় শর্ত হলো, যদি আপনাদের জাহাজ উদ্ধার করতে পারি তাহলে সেই জাহাজে করে আমাদের ইংলণ্ডে নিয়ে যাবেন এবং তার জন্য কোন ভাড়া দাবি করতে পারবেন না।

ওরা আমার সব শর্ত মেনে নিতে রাজী হলো।

এর পর আমি ওদের তিনজনের হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে বললাম, চল এবার আমরা পাঁচজনে গিয়ে গুলি করব। তাতে যদি তু একজন মরে ত মরবে। আমরা অবশ্য ওদের না মেরে বন্দী করতে চাই।

ক্যাপ্টেনও দেখলাম শুধু তুষ্ট প্রকৃতির তুজন লোক ছাড়া আর কারো ক্ষতি করতে চায় না।

ক্যাপ্টেন তার সহকারী আর তাদের সেই সঙ্গী যাত্রী তিনজনে মিলে প্রথমে এগিয়ে গেল। হাতে তালি দিয়ে ঘুমন্ত নাবিকদের জাগাবার চেষ্টা করল। নাবিকদের একজন প্রথমে উঠেই চিৎকার করে বাকিদের ডাকতে লাগল। ক্যাপ্টেন তখন গুলি করে তাকে হত্যা করল। তখন আর একজন উঠে ডাকাডাকি করতেই ক্যাপ্টেন তার মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে জোর মারল।

তখন আমি ও ফ্রাইডে এগিয়ে গেলাম বন্দুক উঁচিয়ে। বাকি বিদ্রোহী নাবিকরা জেগে উঠে আর লড়াই না করে আমাদের পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। আটজন বিদ্রোহী নাবিকের মধ্যে ছজন মারা গেছে, তুজন বেঁচে রইল। তুজনই আত্মসমর্পণ করল আমাদের কাছে।

আত্মসমর্পণ করলেও আমরা তাদের সবাইকে বেঁধে গুহাতে নিয়ে গিয়ে রেখে দিলাম বন্দী করে।

ক্যাপ্টেন বলল, ছজন বন্দীর মধ্যে তিনজন ভাল আর তিন জন বদমাস। তাদের মুখ দেখেও আস্ত শয়তান বলে মনে হচ্ছিল। একটা তুর্বিনীত হিংসাত্মক ভাব ছিল তাদের মুখে।

আমার আস্তানা ও বিষয়-সম্পত্তি সব ক্যাপ্টেন ও তার সাথীদের দেখালাম। এর পর ভাবতে লাগলাম জাহাজে আরো যে সব বিদ্রোহ নাবিক

আছে তাদের কথা। ক্যাপ্টেন বলল, জাহাজে এখনো ছাব্বিশ জন বিদ্রোহী নাবিক আছে। তারা আটজনকে পাঠিয়েছিল বন্দীদের নির্বাসন দেবার জন্য। ওদের হাতে আছে অস্ত্র। ওদের সঙ্গীরা ফিরে না গেলে ওরা নিশ্চয় দল বেঁধে অস্ত্র নিয়ে দ্বীপে এসে খোঁজাখুঁজি করবে। তাহলে আমাদের সঙ্গে লড়াই বাধবে অবশ্যই। কিন্তু আমরা সংখ্যায় অনেক কম। পেরে উঠব না তাদের সঙ্গে।

আমরা প্রথমতঃ নাবিকদের নৌকোয় গিয়ে জিনিসগুলো সব নামিয়ে আনলাম। এই জিনিসগুলো ছিল কটা বন্দুক, কয়েক বোতল ব্র্যাণ্ডি কিছু বিস্কুট আর বারুদের একটা প্যাকেট। জিনিসগুলো সব নামিয়ে নিয়ে নৌকোটাকে ফুটো করে দিলাম। জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকরা এখানে এসে এই নৌকোটা থেকে কোন সাহায্য পাবে না।

নৌকোটা ফুটো করে আমরা ফিরে আসার জন্য কূলে উঠতেই জাহাজ থেকে আসা একটা গুলির শব্দ পেলাম। বুঝলাম জাহাজের নাবিকরা দ্বীপে আসা নাবিকদের ফিরে যাওয়ার সঙ্কেত জানাচ্ছে।

এর পর দেখলাম জাহাজ থেকে একটা নৌকো নামানো হলো। দশজন নাবিক তাতে উঠল। ওরা এবার এই দ্বীপের পথেই রওনা হলো।

আমরা তখন তাড়াতাড়ি আস্তানায় ফিরে এসে বন্দীদের সবাইকে আনুগত্যের শপথ করিয়ে নিয়ে তাদের বাঁধন খুলে দিলাম। তারা আমাদের সব নির্দেশ মেনে চলবে। আমাদের কথামত সব কাজ করবে এইভাবে শপথ করল ঈশ্বরের নামে।

এদিকে জাহাজের সেই বিদ্রোহী নাবিকরা কূলে এসে নেমে আগেকার নাবিকদের সেই নৌকোটার কাছে গেল। দেখল সেটা ফুটো। এর পর তারা ডাঙ্গার উপর উঠে তাদের হারানো মনিবের উদ্দেশ্যে জোর চীৎকার করে ডাক দিল। বন্দুক থেকে ফাঁকা আওয়াজ করল।

কিন্তু কোন সাড়া পেল না কোনদিক থেকে। তখন ওরা তিনজনকে ওদের নৌকোয় রেখে সাতজন দ্বীপের চারদিকে খোঁজ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

আমরা তখন কি করব তা ভেবে পেলাম না। আমরা যদি ডাঙ্গার সাতজন নাবিককে হত্যা করি তাহলে নৌকোর নাবিকরা জাহাজে গিয়ে সে খবর জানালে ওরা জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের উদ্ধারের কোন আশা থাকবে না। জাহাজটা দেখার পর থেকে আমার মনে কেবল

আশা হচ্ছিল কোন রকমে বিদ্রোহী নাবিকদের কবল থেকে জাহাজটাকে উদ্ধার করতে পারলে ঐ জাহাজে করে আমরা দেশে ফিরতে পারি।

আমরা লক্ষ্য করলাম, সাতজন যে পাহাড়টায় উঠল তার এদিকে আমার আস্তানা। তিনজন নৌকোটা নোঙর করে অপেক্ষা করতে লাগল। পাহাড়টায় উঠে সেই সাতজন নাবিক তাদের হারানো সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকতে লাগল।

ক্যাপ্টেন বলল, ওরা হয়ত হারানো সঙ্গীদের জন্য সঙ্কেতসূচক গুলি করবে। ওরা গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ওদের উপর অর্থাৎ নতুন করে গুলি ভরার আগেই।

আমরা তখন কি করব কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এমন সময় একটা ফন্দী এঁটে ফ্রাইডেকে ও ক্যাপ্টেনের সহকারীকে আমার কাটা খালটার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বললাম এখান থেকে লুকিয়ে এমন ভাবে হাঁক দিবি যাতে করে ওরা ভাবতে পারে ওদের হারানো সঙ্গীরাই ওদের ডাকছে, কিন্তু দেখা দিবি না।

তখন সেই ডাক লক্ষ্য করে ওরা এগোলে তোরা পিছিয়ে যাবি অথবা আড়ালে লুকিয়ে পড়বি। ওরা যেন কোনমতে দেখতে না পায় তোদের।

এদিকে ডাক শুনে নৌকোর তিনজন নাবিক নৌকোটা খালের মধ্যে ঢুকিয়ে আমাদের এদিকে এসে পড়ল। নৌকো থেকে একজন ডাঙ্গায় নামতেই ক্যাপ্টেন ও তার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। বন্দুকের বাঁট দিয়ে তার মাথায় মারতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বাকি ছজনের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ক্যাপ্টেন বলল, নেমে আয় না হলে গুলি করে মারব।

বাকি ছজন তখন নৌকো থেকে নেমে এসে ক্যাপ্টেনের পায়ে ধরল।

এরপর সেই সাতজনের দলটা ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যে হতেই জঙ্গলের মধ্যে আমাদের কাছে এসে পড়ল। তাদের সবচেয়ে শয়তান লোকটাকে চিনতে পেরে ক্যাপ্টেন তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। তাতে সেই শয়তানটা মারা গেল এবং আর একজন জখম হলো।

আমরা তখন সবাই সদলবলে ক্যাপ্টেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

রবিনসন নামে আমাদের দলের একজন নাবিক বিদ্রোহী নাবিকদের নাম ধরে ডেকে ডেকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। বলল, যদি বাঁচতে চাও ত অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করো। আমাদের ক্যাপ্টেনও আছে এ দলে। তোমাদের একজন পাণ্ডা মারা গেছে আর একজন জখম হয়েছে।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে তখন। বিদ্রোহী নাবিকরা ভয় পেয়ে গিয়ে

একে একে আত্মসমর্পণ করল আমাদের কাছে। সবাই এলে ক্যাপ্টেন বলল, মালিককে তোমাদের প্রাণরক্ষার কথা বলব। আগে অস্ত্র ফেলে দিয়ে হিংসা ভাব ত্যাগ করো।

আপাতত বিদ্রোহী নাবিকদের হাত বেঁধে বন্দী করে রাখা হলো। বন্দীরা একবাক্যে প্রার্থনা জানাল, তারা দেশে ফিরে যেতে চায় না। কারণ দেশে ফিরে গেলে তাদের বিচার হবে। তাদের ফঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।

পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন আমার কথামত বন্দী নাবিকদের কাছে গিয়ে বলল, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে জাহাজে গিয়ে বাকি নাবিকদের বুঝিয়ে যদি আমাদের দলে আনতে পার তাহলে দেশে গিয়ে তোমাদের কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না অথবা এখানেও নির্যাতনে থাকতে হবে না।

ওরা সবাই আনন্দে রাজী হয়ে গেল। বন্দীরা সবাই আমাদের অনুগত হয়ে গেলে আমি তাদের মুক্তি দিলাম।

আমি আর ফ্রাইডে আস্তানায় রয়ে গেলাম। বারোজনের এক দলকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে জাহাজে পাঠিয়ে দিলাম।

জাহাজে তখন বিদ্রোহী ষোল জন নাবিক ঘুমোচ্ছিল। তাদের প্রধান পাণ্ডাকে জাগিয়ে তার সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। নাবিকটা চোখ মুছে একটা লাফ দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে যেতে একটা গুলি তার মাথাটাকে বিদ্ধ করে। বাকি নাবিকরা ক্যাপ্টেন ও তার দলবল দেখেই আত্মসমর্পণ করে। জাহাজ দখল হয়ে গেল অনায়াসে। তখন জাহাজের তোপঘরে গিয়ে সাতবার কামান দেগে আমাকে জাহাজ দখলের কথাটা জানিয়ে দিল ক্যাপ্টেন। আমি এইরকম নির্দেশ দিয়েছিলাম।

বাইরের গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ভোরে। উঠে দেখি জাহাজ দখল করার পর আমাকে খবর দিতে এসেছে ক্যাপ্টেন। জাহাজটা কূলের কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে নৌকোয় করে খাল দিয়ে আমার আস্তানায় এসে উঠেছে।

এসেই ক্যাপ্টেন এক পেটি খাবার উপহার দিল। তার ভিতরে কত রান্নামাংস, বিস্কুট, পাঁউরুটি, চিনি ও কত রকমের সব খাবার। এক বোতল ব্রাণ্ডি আমাকে তখনি ছিপি খুলে খেতে দিল ক্যাপ্টেন।

আমাদের তখন ক্যাপ্টেন বলল, আপনার জন্যই আজ জাহাজ উদ্ধার করতে পারলাম। বলুন এবার কি করতে হবে। আপনি যা বলবেন তাই হবে।

অবশেষে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বসে আমি ঠিক করলাম, আমরা শুধু সবচেয়ে বদমাস দুজন নাবিককে এখানে নির্বাসনে রেখে বাকি সবাইকে নিয়ে জাহাজে করে রওনা হব ইংলণ্ডের পথে।

দীর্ঘ আঠাশ বছর এই নির্জন কারাবাস ও নির্বাসনের পর আজ এত দিনে মুক্তি পেতে চলেছি আমি। আসন্ন মুক্তির আনন্দে মাতাল হয়ে উঠেছে আমার দেহের সমস্ত রক্ত।

রাত্রিতে এক বড় করে নৈশভোজের ব্যবস্থা করলাম। বাকি বন্দীদের মুক্তি দিলাম। যারা থেকে যাবে তাদের সব কিছু ঘুরে দেখিয়ে দিলাম।

অবশেষে প্রত্যাবর্তনের পালা। ১৬৮৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। হিসেব করে দেখলাম আমি দ্বীপে ছিলাম মোট আঠাশ বছর দুমাস উনিশ দিন।

আমাদের প্রত্যাবর্তন যাত্রা নির্বিঘ্নেই শেষ হলো। ইংলণ্ডে পৌঁছলাম ১৬৮৭ সালের ১১ই জুন। সোজা পথে না এসে ঘুরপথে গিয়েছি বলেই এত দেরি হলো। মোট পঁয়ত্রিশ বছর আমি দেশছাড়া।

প্রথমেই আমি দেখা করলাম সেই পুরনো সদাগর ক্যাপ্টেনের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে যাঁর কাছে আমি আমার টাকা জমা রেখেছিলাম। তিনি মাঝখানে আবার বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীও মারা গেছেন। বড় কষ্টে দিন কাটছিল তাঁর। তিনি বললেন, আমার টাকা ফেরৎ দেবার সামর্থ্য নেই তাঁর।

আমি বললাম, আপনি কিছু ভাববেন না তার জন্য, তা দিতে হবে না।

এই বলে আমি তাঁকে বেশ কিছু টাকা দিলাম। এরপর ইয়র্কশায়ারে গিয়ে দেখি আমাদের বাড়িঘরের কোন চিহ্ন নেই। বাবা মা দুজনেই অনেক আগে গত হয়েছেন। আমি বাড়ি থেকে পালাবার পর আমার দুই বোনের জন্ম হয়। তারা কেউ আমাকে দেখেনি। তাদেরও বিয়ে হয়ে গেছে।

বোনেদের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হতে পারলাম না। তারা আমায় ভাই বলে কাছে টেনে নিতে পারল না। কেমন যেন একটা ব্যবধান রয়ে গেল আমাদের মাঝখানে।

তাই কিছু কথাবার্তা বলে বিদায় নিলাম তাদের কাছ থেকে। তবে তাদের ঠিকানা দুটো জেনে রাখলাম। ফ্রাইডে আমার কাছে কাছেই রইল। আমি ইংলণ্ডে আগেকার ক্যাপ্টেনের বিধবা স্ত্রীর বাড়িতে দিনকতক রইলাম।

ইংলণ্ডে থাকাকালে একদিন আমাদের এবারকার জাহাজের ক্যাপ্টেন একদল বণিককে সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে এল। জাহাজে এই সব বণিকের অনেক পণ্যদ্রব্য ছিল। আমারই চেষ্টায় জাহাজ উদ্ধার হয়েছে বলে বণিকরা কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে আমার প্রতি। আমাকে খাতির করে তারা দুশো পাউণ্ডের নোট দিল।

আমি ঠিক করলাম ইংলণ্ডে আর বেশী দিন থাকব না। যাব লিসবন হয়ে ব্রাজিল। আমার নিজে হাতে গড়া সেখানকার ক্ষেত খামারের অবস্থা কি তা একবার দেখব।

ব্রাজিলে পৌঁছতে পরের বছর এপ্রিল হয়ে গেল। খবর নিয়ে জানলাম যে ক্যাপ্টেনের উপর আমি আমার বিষয়সম্পত্তির ভার দিয়ে গিয়েছিলাম তিনি এখনো জীবিত আছেন। তবে অনেক বয়স হয়েছে।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, আমি চলে যাবার পর তিনি ব্যবসায় একজন অংশীদার গ্রহণ করেন। আমার অংশ দেখাশোনার ভার তাঁরই হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি যোগাযোগ করলেই আমার অংশের জমা টাকা সব পেয়ে যাব। আমি দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট থাকায় আমার অংশের সব বিষয়সম্পত্তি সরকারের ট্রাস্টী বা অছির হাতে চলে গিয়েছে। সেখানে গিয়ে আমার পরিচয়ের প্রমাণ দিলেই আমার অংশের টাকা পেয়ে যাব।

ক্যাপ্টেন বিদায় নেবার সময় আমার হাতে একশো ষাটটি মোহর তুলে দিলেন। বললেন, এটা আমি বহু কষ্টে জমিয়ে রেখেছি। এটা তোমার প্রাপ্য।

আমি তাঁর কষ্ট এবং সততা দেখে সব মোহর ফিরিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি নিলেন না। অগত্যা আমি একশোটি মোহর নিয়ে ষাটটি মোহর জোর করে দিলাম।

এরপর সেই অংশীদার আর ব্রাজিলের রাজদরবারে চিঠি লিখে যোগাযোগ করলাম আমি। অংশীদার চিঠি দিয়ে জানালেন আমার নামে এতদিনে মোট সঞ্চয় হয়েছে ৩২৪১ মোহর। আমি ফিরে না এলে এই টাকার এক অংশ যেত রাজকোষে আর এক অংশ যেত গীর্জায় গরীব দুঃখীদের সেবার জন্য।

আমি আমার নামে সঞ্চিত সব টাকা তুলে নিয়ে একশো মোহর সেই ক্যাপ্টেনকে দিলাম। তাঁকে জানিয়ে দিলাম আমি দলিলে লিখে দিয়েছি

আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন আমার বাৎসরিক আয় থেকে একশো মোহর করে আপনাকে দেওয়া হবে। আপনার মৃত্যুর পর আপনার ছেলেকে দেওয়া হবে পঞ্চাশ মোহর করে। এরপর ইংলণ্ডের সেই বিধবা ভদ্রমহিলাকেও বেশ কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলাম লণ্ডনগামী এক জাহাজ মারফৎ। শেষে লণ্ডনে আমার যে দুবোন আছে তাদের দিলাম একশো পাউণ্ড করে।

এর পর আমি লিসবন হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে গেলাম আবার। সমুদ্রপথে না গিয়ে হাঁটাপথে কয়েক মাস পর গিয়ে পৌছলাম লণ্ডনে। ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হলাম।

কিন্তু ব্রাজিলের সম্পত্তি আর রাখতে চাইলাম না আমি। সম্পত্তির ঝামেলা আমার ভাল লাগে না। আমি অংশীদারকে চিঠি দিলাম সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেবার জন্য।

আটমাস পর হুণ্ডী করে টাকা পাঠাল অংশীদার। সব জমা রাখলাম সেই বিধবা বৃদ্ধার কাছে। তিনি আমাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন।

লণ্ডনে আমার এক ভাইপোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। একটা জমি কিনে তার একটা অংশ দিলাম তাকে। আর এক ভাইপোকে জাহাজের কাজ শেখাবার পরে সে ক্যাপ্টেন হয়ে ওঠে।

লণ্ডনে বেশ কয়েকবছর সুখে কেটে গেল আমার। ইতিমধ্যে বিয়ে করে সংসারী হয়েছি। আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ আমার স্ত্রী মারা যাওয়ায় মন আমার খারাপ হয়ে হয়ে ওঠে। আবার আমি বেরিয়ে পড়লাম।

১৬৯৪ সালে আবার আমি চলে গেলাম আমার সেই দ্বীপে। তখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি। গিয়ে দেখলাম বেশ জাঁকিয়ে বসেছে সেই স্পেনীয় নাবিকের দল যাদের আমি আনতে পাঠিয়েছিলাম ফ্রাইডের বাবাকে। ক্ষেত খামার প্রচুর বাড়িয়েছে। সোনার ফসল ফলে এখন এ দ্বীপে। এখানকার জমি খুব উর্বর।

এর মধ্যে এক বর্বর ক্যারিবীয়দের দল এদের আক্রমণ করে। তারা হেরে গিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের থেকে ষোলজনকে বন্দী করে আনে। তাদের মধ্যে পাঁচজন স্ত্রীলোক ছিল। সেই সব মেয়েদের থেকে অনেক ছেলে-মেয়ে হয়েছে।

এই গোটা দ্বীপটার আমি অধিকারী। আমি দলিল করে বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু সম্পত্তি বিলি বণ্টন করে দিলাম।

ফেরার পথে আমি ব্রাজিলে গিয়ে একটা জাহাজ কিনে সাতটি মেয়ে, অনেক লোক, কিছু গবাদি পশু পাঠিয়ে দিলাম আমার দ্বীপে। আমি চাই সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক আমার দ্বীপ, আমার নিজস্ব সাম্রাজ্য।



টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী

টোয়েণ্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী

জুল ভার্ণ

১

১৮৬৬ সালের ১০শে জুলাই 'গভর্নর হিগিনসন' জাহাজটি যখন অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে ছিল তখন জাহাজ থেকে হঠাৎ দেখা যায় অতিকায় লম্বাটে ধরনের একটা বস্তু ভাসছে। ক্যাপ্টেন বেকার প্রথমে ভাবলেন হয়ত বা একটা ডুবো পাহাড়। নতুন একটা ডুবো পাহাড় আবিষ্কার করে ফেলেছেন ভেবে কাঁটা কম্পাস দিয়ে মানচিত্রে অবস্থান নির্ণয় করতে লাগলেন তিনি।

এমন সময় দেখা গেল সেই ডুবো পাহাড় থেকে দেড়শো ফুট উঁচু দুটো জলস্তম্ভ উঠল প্রচণ্ড বেগে। তার সঙ্গে আবার ধোঁয়ার মত গরম বাষ্প উঠছে।

তখন অনেকে ভাবল হয়ত বা একটা তিমিমাছ। কিন্তু বস্তুটা শুধু তিমিমাছের থেকে বড় নয়, তার গতিবেগও অনেক বেশী ক্ষিপ্র। তাছাড়া তিমিমাছ বা তিমিঙ্গিল থেকে কখনো বাষ্পময় জলস্তম্ভ ওঠে না। মোটের উপর ব্যাপারটা যে রহস্যময় তাতে কোন সন্দেহ নেই। হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন বেকার।

এর আগেও ইউরোপ ও আমেরিকার নাবিকরা এই ধরনের রহস্যময় ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। সবাই দেখে অদ্ভুত অতিকায় একটা জলজন্তু মাঝে মাঝে এইভাবে জলের উপর উঠে পড়ে ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

তিনদিন পর ২৩শে জুলাই 'কলম্বাস' জাহাজ এই অদ্ভুত জন্তুটা দেখল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। আবার সবাই ভাবল ভাসমান একটা ডুবোপাহাড়, অথচ তার গতিবেগ অবিশ্বাস্য।

এর পনেরো দিন পর আতলান্তিক মহাসাগরের বুকে ফরাসী জাহাজ 'হেলভেতিয়া' আর ব্রিটিশ জাহাজ 'শ্যামন' এই অতিকায় সিন্ধুদানবটার মুখোমুখি হলো। জাহাজ দুটির ক্যাপ্টেন ও নাবিকরা তার মাপ নিয়ে দেখল তার আকার তিনশো ফুট। কিন্তু কোন তিমিমাছ যত বড়ই হোক তার আকার কখনো ষাট ফুটের বেশী হয় না।

খবরটা চারদিক ছড়িয়ে পড়তে এক বিরাট সাড়া পড়ে গেল ইউরোপ আমেরিকার নৌজগতে। খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো এই অবিশ্বাস্য ঘটনার আশ্চর্যজনক বিবরণ।

অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে 'স্কটিয়া' নামে একটি জাহাজ এই সিন্ধুদানবের কবলে পড়ল ১৮৬৭ সালের ২:শে এপ্রিল।

আতলান্তিক মহাসাগরে কেপ-ক্লিয়ার থেকে প্রায় তিনশো মাইল দূরে 'স্কটিয়া' যখন অবাধে ছুটে চলেছিল তখন কিসের সঙ্গে হঠাৎ তার খুব আস্তে ধাক্কা লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ছ ফুট চওড়া একটা ফুটো হয়ে যায় জাহাজটার তলায়। জল ঢুকতে শুরু করে জাহাজের মধ্যে। কোন রকমে মেরামতের জন্য জাহাজটাকে নিয়ে যাওয়া হয় লিভারপুল বন্দরে। ড্রাই ড্রেকে জাহাজটাকে পরীক্ষা করে দেখা যায় জাহাজের পুরু লোহার পাতে প্রায় ছ ফুট চওড়া তেকোণা একটা ফুটো। কে যেন ধারাল তুরপুন চালিয়ে ফুটো করে দিয়েছে জাহাজটাকে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো। আবার খবরের কাগজে এই রহস্যের কথা ছাপা হতে লাগল। কেউ কেউ বলল, ওটা মোটেই কোন ডুবো পাহাড় বা ভাসমান গিরিশৃঙ্গ নয়। আসলে ওটা ভূতে পাওয়া একটা মস্ত তিমি। আর তা যদি না হয় তাহলে কোন শক্তিশালী ডুবো জাহাজ। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বিনা কারণে কেন এই ডুবো জাহাজ বানাতে যাবে কোন দেশের সরকার? এখন ত কোন প্রয়োজন নেই।

তখন ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের খবর সরকারের কাছে দেওয়া হলো। কিন্তু সব দেশই ভাবল এ ধরনের ডুবো জাহাজ বানানো ত দূরের কথা, তার খবরই তারা জানে না।

ফলে আবার শুরু হলো যতসব আজগুবি জল্পনা-কল্পনা। ভয় পেয়ে গেল সব জাহাজের নাবিকরা। তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন ভাবতে লাগল কে কখন যে সেই সিন্ধুদানবের ভয়ঙ্কর কবলে পড়বে তার ঠিক নেই।

২

এখানে ওখানে মহাসমুদ্রের বুকে যখন একের পর এক এইসব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে চলেছিল আমি তখন প্যারী মিউজিয়ামে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করতাম। সেই সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ নিয়ে গবেষণা করতাম আমি। থাকতাম প্যারিস শহরে।

একবার কিছু বিরল উদ্ভিদ আর প্রাণী সংগ্রহের জন্য ফরাসী দেশ থেকে আমাকে যেতে হয়েছিল নেব্রাস্কায়। কাজ সেরে সেখান থেকে ফরাসী দেশে

ফেরার পথে নিউইয়র্কে নেমে সংগ্রহ করা জিনিসগুলোর তালিকা তৈরি করছিলাম আমি। এমন সময় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা সেই সিন্ধুদানবটা সম্বন্ধে জনরবটা কানে এল আমার।

সমুদ্রে দেখা সেই অদ্ভুত বস্তুটা কোন জলজন্তু কিনা সে বিষয়ে আমার মতামত চাওয়া হলো, কারণ আমি প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং গবেষক। ৩০শে এপ্রিল 'নিউ হেরাল্ড' কাগজে এ বিষয়ে আমার একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার এই প্রবন্ধের মূল কথা ছিল অগাধ সমুদ্রের তলায় এমন অনেক জীবজন্তু আছে যাদের কথা আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি। আমি লিখেছিলাম, ডুবো জাহাজের কথা যদি সব দেশের সরকার অস্বীকার করে তাহলে সেই আশ্চর্য বস্তুটা এক অতিকায় নারহোয়ান অর্থাৎ খড়্গের মত দাঁতওয়ালা বিশালকায় এক সামুদ্রিক ড্রাগন যা সাধারণতঃ মেরুবলয়ের হিমজলের মধ্যে বাস করে গোপনে। তবে নারহোয়ান ষাট ফুটের থেকে বেশী লম্বা হয় না। অথচ এই নারহোয়ানটি নাকি তিনশো ফুট লম্বা। অবশ্য এমন হতে পারে যে আদিম যুগের কোন একটি অতিকায় নারহোয়ান কালের কবলে পড়ে অবলুপ্ত না হয়ে কোনরকমে বেঁচে আছে।

সেই খুনে বস্তুটাকে নারহোয়ান বা সী ইউনিকর্ণ বলে আমার মনে করার পিছনে একটা কারণ ছিল। কারণ 'স্কটিয়া' জাহাজের পুরু লোহার চাদরে যে ধরনের ফুটো হয়েছিল তা একমাত্র নারহোয়ান ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারা হতে পারে না। কারণ একমাত্র নারহোয়ানদেরই মাথায় থাকে ইস্পাতের মত কঠিন এক খড়্গ।

যাই হোক, আমার এই প্রবন্ধটা ভাবিয়ে তুলল অনেককে। এদিকে আরও জাহাজ ডুবির খবর আসতে লাগল। আবার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল নাবিকরা।

অবশেষে ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে ঘায়েল করার জন্য এক অভিযানের ব্যবস্থা করল মার্কিন নৌবহর। ঠিক হলো 'আব্রাহাম লিঙ্কন' নামে একটা যুদ্ধ জাহাজ পাঠাবে যা সেই জন্তুটার একেবারে মুখোমুখি হয়ে লড়াই করবে। এই জাহাজটি পরিচালনার ভার নিয়েছেন ক্যাপ্টেন ক্যারাগুতে। ক্যাপ্টেন ক্যারাগুতে যেমন অভিজ্ঞ তেমনি বুদ্ধিমান। এ দুটোই বিশেষভাবে সাহায্য করবে এবিষয়ে।

ব্রুকলিন বন্দর থেকে 'আব্রাহাম লিঙ্কন' ছেড়ে যাওয়ার মাত্র তিন ঘণ্টা আগে হঠাৎ একটা চিঠি এসে পড়ে আমার হাতে। চিঠিটা পাঠিয়েছে মার্কিন

নৌবহর। তাতে লেখা ছিল, আপনি অনুগ্রহ করে 'আব্রাহাম লিঙ্কনের' সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাতে অনুগৃহীত ও আনন্দিত হবে। আপনার জন্য একটি কেবিন রেখে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন।

চিঠিটার তলায় সই করেছেন মার্কিন নৌবহরের সম্পাদক জে. বি. হরমন।

এই ধরনের এক সামুদ্রিক অভিযানের কোন সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আমি কোনদিন। চাঁদে পাড়ি দেবার মতই এ কাজটা অসম্ভব ছিল আমার কাছে।

চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিশ্বস্ত পরিচালক কোনসাইনকে ডাকলাম, কোনসাইন ছিল জাতিতে ওলন্দাজ। যেমন সাহসী তেমনি অনুগত। আমার সব অভিযানেই সঙ্গী হত সে। কখনো কোন প্রশ্ন না তুলে নীরবে সব কাজ আমার কথামত ঠিকভাবে করে চলত।

আমি তাকে যখন বললাম এখনি আমাদের এক সিন্ধুদানবের বিরুদ্ধে অভিযানে বার হতে হবে তখন সে তা শুনে কিছুমাত্র আশ্চর্য হলো না। সে তাড়াতাড়ি আমাদের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিল।

আমরা একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিউ ইয়র্কের জাহাজঘাটে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি 'আব্রাহাম লিঙ্কন' জাহাজটি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তার হুটো চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বার হচ্ছে।

মালপত্র তুলে দিয়ে জাহাজে উঠে বসলাম। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করার পর কোনসাইনকে নিয়ে আমার জন্য নির্দিষ্ট কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম।

জাহাজ ছাড়ল বেলা তিনটের সময়। হাজার হাজার নরনারী রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানাল আমাদের। এক বড় কামান দেগে তোপধ্বনিও করা হলো বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য।

রাত আটটার সময় ফায়ার আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে আতলান্তিক মহাসাগরের কালো জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল জাহাজটা। তিমি শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম ছিল আমাদের জাহাজে। হাতে ছোঁড়া হারপুন ছাড়া ছিল হারপুন বন্দুক। আর ছিল হারপুন ছোঁড়ার জন্য নেডল্যাণ্ড নামে এক সাহসী লোক। তার চেহারাটা যেমন ছিল অসুরের মত বলিষ্ঠ, তেমনি দৃষ্টিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ।

জাহাজে উঠে ক্যাপ্টেন ক্যারাগুতে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রথমে সেই

খুনে জানোয়ারটাকে দেখতে পাবে তাকে দু হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। ফলে সকলেই দিনরাত সজাগ হয়ে থাকত। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত সমুদ্রের জলরাশির দিকে।

কিন্তু কোথাও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না সেই অতিকায় সিন্ধুদানবের। কিছুটা হতাশ হয়ে উঠলাম আমরা। ক্রমে কেপ হর্ণ পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়ল আমাদের জাহাজটা।

তবে কি সব জনরব মিথ্যা? অলীক কল্পনা? কিন্তু 'স্কটিয়া' জাহাজের তলায় সেই বড় ফুটোটা ত আর মিথ্যা নয়।

এইভাবে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল।

৩

দু হাজার ডলার পুরস্কারের প্রতি কোনসাইনের কিছুটা লোভ থাকলেও পুরস্কারের প্রতি আমার কোন আগ্রহই ছিল না। তবু নেহাৎ কৌতূহলের বশেই ডেকের উপর আর সকলের মত দাঁড়িয়ে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। কারণ আমি নিজের চোখে দেখতে চাইছিলাম সেই সিন্ধুদানবটাকে। দেখতে চেয়েছিলাম সেটা অধুনালুপ্ত কোন নারহোয়ান অথবা সুদূর পৌরাণিক যুগের কোন সিন্ধুড্রাগন কিনা!

সাতাশে জুলাই বিষুবরেখা ছাড়িয়ে জাপানের দিকে এগিয়ে চললাম আমরা। বহুকথিত সিন্ধুদানবের দেখা না পেয়ে ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়ল নাবিকরা। অলীক এক বস্তুর পিছনে বৃথা না ছুটে বাড়ি ফিরতে চাইল তারা। অবশেষে তাদের চাপে ঘোষণা করলেন ক্যাপ্টেন ক্যারাগুতে, তিন দিনের মধ্যে সেই সিন্ধুদানবের দেখা না পেলে নিউইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন 'আব্রাহাম লিঙ্কন'কে নিয়ে।

তিন দিনের মধ্যে দুদিন কেটে গেল। সিন্ধুদানবটাকে প্রলুব্ধ করার জন্য বড় বড় মাংসের টুকরো ফেলা হতে লাগল জলের মধ্যে। হাঙরগুলো মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল। কিন্তু সেই সিন্ধুদানবের কোন চিহ্ন নেই।

আর মাত্র একটা দিন বাকি। ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা বাজল। আমরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি ডেকের উপর।

কোনসাইন ত স্পষ্ট বলল, সব বাজে কথা। এ ধরনের কোন সিন্ধুদানব ছিল না কখনো।

আমি বললাম, দেশে ফিরে গিয়ে আমরা ত তাহলে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠব লোকের কাছে।

সহসা এক সময় নেডল্যাণ্ডের প্রবল চিৎকারে চমকে উঠলাম আমরা। নেড প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠল, আমরা যাকে খুঁজে চলেছি সে রয়েছে ওখানে।

নেডের চিৎকার শুনে জাহাজের সকলে ছুটে গেল তার দিকে। দেখা গেল আমাদের জাহাজ থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে জলের উপর রহস্যময় সিন্ধুদানবটা ভেসে রয়েছে আর তার পিঠ থেকে আলো ঠিকরে বার হচ্ছে।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশমত আমাদের জাহাজটা অর্ধ বৃত্তাকারে পথ থেকে ঘুরে সরে যেতে লাগল সিন্ধুদানবটার কাছ থেকে। তবু দেখা গেল দানবটা আমাদের জাহাজের দিকে বেগে ধাবিত হয়ে আসছে।

একবার হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে জাহাজটার চারপাশে ঘুরে আবার ছুটে আসতে লাগল প্রচণ্ড বেগে।

আমাদের নাবিকরা তখন ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু জ্বলন্ত সেই বিভীষিকাময় দানবটা আমাদের জাহাজের একেবারে সামনে এসেই আলো নিবিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার তাকে দেখা গেল জাহাজের অন্য এক ধারে।

আমাদের জাহাজটা তখন সব আলো নিবিয়ে দিয়ে দানবটার সঙ্গে আপাততঃ যুদ্ধ না করে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল।

আমি ক্যাপ্টেনকে পালাবার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, আজ রাতের অন্ধকারে ঐ অদ্ভুত জানোয়ারটার সঙ্গে লড়াই না করে কাল দিনের বেলায় ওর শক্তি পরীক্ষা করব।

সে রাতে উত্তাজনা ও আতঙ্কে সারারাতের মধ্যে ঘুম হলো না কারো। রুদ্ধশ্বাসে সেই রহস্যময় সিন্ধুদানবটার গতিবিধি লক্ষ্য করছে সকলে।

মাঝরাতে আলো নিবিয়ে অন্ধকারে কোথায় ডুবে গেল দানবটা। শেষ রাতের দিকে সেই দানবটার পিঠে আবার আলো দেখা গেল।

পরদিন সকাল হতেই আক্রমণ শুরু করল নেডল্যাণ্ড। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে হারপুন বাগিয়ে ধরে এঞ্জিন চালিয়ে দিল।

তখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে। লাল হয়ে সূর্য উঠেছে পূর্ব দিগন্তে। দেখা গেল মাইল দুই দূরে তিমিমাছের মত দেখতে বিশালকায় একটা কালো শরীর ভেসে আছে জলের উপর। পিঠে আর কোন আলো নেই। তিমিমাছের মত স্তম্ভের আকারে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু জল ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে এবার আমাদের জাহাজটা যতই ছুটে যেতে লাগল তার দিকে ততই সে দূরে সরে যেতে লাগল। খুব জোর এঞ্জিন চালিয়ে ও জাহাজের গতিবেগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েও ধরা গেল না জন্তুদানবটাকে।

ক্যাপ্টেন তখন কামান দাগার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দানবটার মসৃণ কালো গাটায় লেগে পিছলে গেল কামানের গোলাটা।

এরপর সারাদিন ধরে মরীচিকার পিছনে ধাবমান মরুপথিকের মত সেই সিন্ধুদানবটার পিছনে ছুটে চলল আমাদের জাহাজটা। দেখতে দেখতে দিন কেটে গিয়ে রাত এল।

রাত এগারটার সময় প্রায় তিন মাইল দূরে আবার জ্বলে উঠল সেই চোখ ধাঁধানো আলো। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই।

ক্যাপ্টেন ক্যারাগুতে ভাবলেন, দানবটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই তিনি এঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দে জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে চলার হুকুম দিলেন কালো দানবটার দিকে।

সেই কালো দানব আর আমাদের জাহাজটার ব্যবধান যখন মাত্র বিশ ফুটে এসে দাঁড়াল তখন নেডল্যাণ্ড হারপুন ছুঁড়ল দানবটাকে লক্ষ্য করে। তার গায়ে ঠক করে একটা শব্দ হতেই নিবে গেল পিঠের উপর জ্বলতে থাকা আলোটা।

সহসা প্রচণ্ডবেগে দুটি জলের ধারা এসে জাহাজের উপর এমনভাবে পড়ল যে মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। মাস্তুলটা ভেঙ্গে পড়ল। দড়িগুলো ছিঁড়ে গেল। নাবিকরা এ ওর গায়ে পড়ে গেল।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে রেলিং থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম আমি সমুদ্রের জলে। মনে হলো জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু সাঁতার জানতাম বলে ভেসে উঠতে পারলাম জলের উপর। আমি দেখলাম আমাদের 'আব্রাহাম লিঙ্কন' জাহাজটা পূব দিক ধরে ছুটে চলেছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। কিন্তু জাহাজের কেউ আমার ডাক শুনতে পেল না।

ভিজে ভারী পোশাক নিয়ে ঠিকমত হাত পা ছুঁড়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে পারছিলাম না। ভয়ানক ক্লান্তিবোধ করতে লাগল। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমি প্রায় তলিয়ে যাচ্ছি। কয়েক ঢোক লোনা জলও খেয়ে ফেললাম।

এমন সময় কোথা থেকে কে একজন এসে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল আমার জামার কলারটা।

মুখ ঘুরিয়ে দেখি আমার অনুগত ভৃত্য কোনসাইন। আমার তখন কোন কথা বলার শক্তি ছিল না। তবু আমি দারুণ বিস্ময়ের ঘোরে বললাম 'কোনসাইন তুমি!' এই কথাদুটি অতি কষ্টে না বলে পারলাম না।

কোনসাইন বলল, আমাকে জলে পড়ে যেতে দেখেই সে ঝাঁপ দেয় এবং আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে সাঁতার কেটে।

আমি তখন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের জাহাজ 'আব্রাহাম লিঙ্কন' চলে গেল আমাদের ফেলে রেখে?

কোনসাইন বলল, কোন উপায় ছিল না মঁসিয়ে। জন্তুদানবটার ভয়ঙ্কর কামড়ে জাহাজের চাকা আর হাল খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। এখন জলের উপর নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় অকূলে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার।

আমি তখন কাতর কণ্ঠে বলে উঠলাম, তাহলে এখন আমাদের উপায় কি হবে?

কোনসাইন এবার নীরবে একটা ছুরি বার করে আমার পোশাকটা কেটে মুক্ত করে দিল আমাকে। নিজেকেও মুক্ত করল সে এইভাবে। তারপর আমরা দুজনে পালা করে সাঁতার কাটতে লাগলাম। একজন সাঁতার কেটে অন্যজনের ভাসমান দেহটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল।

এভাবে বেশীক্ষণ কেউ সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে লড়াই করতে করতে সাঁতার কেটে যেতে পারে না। ক্রমে আমাদের অঙ্গ অবশ হয়ে আসতে লাগল। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল।

এমন সময় লোহার মত কঠিন একটা জিনিসের সঙ্গে আমাদের ধাক্কা লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলিষ্ঠ হাতে আমাকে জলেরউপর তুলে নিল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। তারপর কি হলো আমার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম দুটি উদ্বিগ্ন মানুষ আমার উপর ঝুঁকে আছে। তারা হলো নেডল্যাণ্ড আর কোনসাইন।

আমি নেডল্যাণ্ডকে দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠে বললাম, নেডল্যাণ্ড তুমি!

নেডল্যাণ্ড বলল, হ্যাঁ প্রফেসর আরোনা, আমি। পুরস্কারের টাকাটার মায়া ছাড়তে না পেরে দানবটার পিঠের উপর চেপে বসেছি। এখন বুঝতে পারছি কেন আমার হারপুন ঠক করে লেগে ঠিকরে পড়েছিল। কোন হারপুন কি ইস্পাতের বর্ম ভেদ করতে পারে?

তার মানে ?

তার মানে আপনি যার উপর বসে আছেন সেটা ধাতুতে গড়া একটা খোল। যার পিছনে আমরা সব ছেড়ে ছুটে চলেছিলাম সেটা তিমি নয়, অথবা কোন সিন্ধুদানবও নয়। আসলে সেটা একটা—

ডুবোজাহাজ।

কথাটা আমি যুগিয়ে দিলাম।

হ্যাঁ ঠিক তাই।

তখন পূব দিকে সূর্য উঠছিল। দেখলাম আগুনের একটা গোল চাকার মত লাল সূর্য ধীরে ধীরে উঠে আসছে জলের ভিতর থেকে।

এমন সময় আমরা যার উপর বসেছিলাম সেই ডুবো জাহাজটা ডুবতে শুরু করল। আমরা ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম। নেডল্যাণ্ড চিৎকার করতে লাগল। তখন হঠাৎ সেই ডুবোজাহাজের ঢাকনাটা খুলে একজন বেরিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলল। তারপর সে ভিতরে ঢুকে যেতেই কয়েকজন বেরিয়ে এসে আমাদের টেনে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল।

৪

পায়ের তলায় একটা সিঁড়ি অনুভব করে টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছনে ঘরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাথার উপর একা বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠল ফানুশের লণ্ঠনের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একদিকে নীরেট ও মসৃণ দেওয়ালের মধ্যে একটা জায়গা দরজার মত খুলে গেল। সেই দরজা দিয়ে দুজন লোক ঘরে ঢুকল।

তাদের মধ্যে একজনের চেহারা দেখে বেশ বোঝা গেল সে-ই নেতা। তার শান্ত চোখ মুখের মধ্যে এক অটল ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা ও এক দুর্জয় সাহসের ছাপ ফুটে উঠেছিল। তবু দীর্ঘদেহী এই মানুষটিকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। আমাদের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাদের মর্মভেদ করে কি যেন দেখতে চাইছিলেন।

প্রথমে আমি ফরাসী ভাষায় আমাদের দুঃখের কাহিনী বললাম সেই মানুষটির কাছে। তিনি বেশ কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠলেও কোন কথা

বললেন না। তখন আমার অনুরোধে নেড ইংরিজি ভাষায় ও পরে কোন-সাইন আলেমান ভাষায় সেই একই কাহিনী শোনাল।

এবারেও তিনি কথা না বলায় আমি লাতিন ভাষায় কিছু বললাম। কিন্তু তিনি তখন দুর্বোধ্য কি একটা কথা বলে সেই পথেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

নেডল্যাণ্ড অধৈর্য হয়ে বলল, কোন অসভ্য বর্বর লোকের পাল্লায় পড়লাম যে সভ্য জগতের কোন ভাষাই বোঝে না।

নেডের কথা শেষ হতে না হতেই সিন্ধুভোঁদড়ের লোমের টুপি মাথায় অচেনা কাপড়ের পোশাক আর সীলমাছের জুতো পরে ঘরে ঢুকল একটি লোক। তারপর আমাদের সামনে সেই ধরনের পোশাক রেখে চলে গেল।

আমরা আমাদের পোশাক ছেড়ে সেই পোশাক পরে নিলাম।

এর পর একজন চিনেমাটি আর রূপোর থালায় আমাদের জন্য খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। খাবারের মধ্যে ছিল শুধু অচেনা মাছ। রান্নাটা ভাল লাগল আমার। রুটি আর মদ না থাকায় নেড বিরক্ত হলো। খাবার জলটাও বেশ পরিষ্কার।

খাওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা তিনজনেই।

আমার ঘুম ভাঙলে দেখলাম নেড ও কোনসাইন তখনো ঘুমুচ্ছে। ঘরের ভিতরটায় কোন জানালা ছিল না। গুমোট মত, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ এক ঝলক তাজা সমুদ্র বাতাস এসে ঘরের ভিতরকার গুমোট ভাবটা কাটিয়ে দিল।

ঘুম থেকে উঠে খিদের জ্বালায় ছটফট করতে লাগল নেড। ঘরময় ছুটে বেরিয়ে দরজায় লাথি মারতে লাগল। এই সময় একজন লোক ঘরে ঢুকতেই তাকে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসল।

আমি আর কোনসাইন দুজনে মিলে কোনরকমে টেনে তুলতে লাগলাম তাকে।

এমন সময় পিছন থেকে কে পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় বলে উঠল, শান্ত হও ল্যাণ্ড। প্রফেসার দয়া করে আমার কয়েকটা কথা শুনবেন কি?

দেখলাম যিনি কথা বললেন তিনি ডুবোজাহাজের নেতা। নেড লাফিয়ে উঠে পড়ল।

সেই নেতা টেবিলের গা ঘেঁষে বুকের উপর হাতদুটো আড়াআড়িভাবে রেখে ফরাসী ভাষায় বলতে লাগলেন, আমি ফরাসী, ইংরিজি, আলেমান ও

লাতিন ভাষা জানি। কিন্তু তখন আপনাদের সামনে কোন কথা বলিনি, কারণ তখন আমি বুঝতে পারছিলাম না আপনারা সত্যি বলছেন কি না। পরে যখন দেখলাম আপনাদের তিনজনের কথাই এক তখনি বুঝলাম আপনাদের কাহিনী মনগড়া বা বানানো নয়, সত্যি। বর্তমানে আমি পৃথিবীর অধিবাসী নই। আপনাদের জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জলের তলায় বাস করছি আমি। তবু আপনারা এসেছেন আমাকে বিরক্ত করতে।

আমরা বললাম, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করে আসিনি এখানে।

কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করেই 'আব্রাহাম লিঙ্কন' জাহাজে সাত সমুদ্রে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। আমার জাহাজ লক্ষ্য করে হারপুন ছুঁড়েছেন, কামানের গোলা ছুঁড়েছেন। ইচ্ছা করেই এসব কাজ করেছেন আপনারা। যাক, এবিষয়ে আর বাদ প্রতিবাদ করতে চাই না আমি। এখন আপনারা যুদ্ধবন্দী। শুধু দয়া করে আপনাদের অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে না দিয়ে উদ্ধার করেছি সলিলসমাধি থেকে।

আমি বললাম, সভ্য জগতের মানুষরা বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করে। না করাটা বর্বরোচিত কাজ।

বিরক্ত হয়ে নেতা বললেন, প্রফেসার, আপনারা যাকে সভ্য বলেন আমি তা নই। আপনাদের সভ্য জগতের ক্রিয়াকলাপ সব দেখেছি। সব দেখে-শুনেই আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না তার সঙ্গে। আমি সভ্য জগতের কোন নিয়ম কানুন মানি না। সভ্য জগতের কথা আর আমার সামনে বলবেন না।

এর পর তিনি বললেন, আমি আপনাদের আমার জাহাজে রাখতে পারি কয়েকটি শর্তে। মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটবে যা আপনাদের দেখতে দেওয়া হবে না এবং তখন এই ঘরে বন্দী করে রেখে দেওয়া হবে আপনাদের। আর জীবনে কোন সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারবেন না।

আমরা কি তাহলে সারাজীবন বন্দী হয়েই থাকব?

বন্দী থাকলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমার মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবেন। তবে আমি আপনাদের আর কোনদিন পৃথিবীতে ফিরে যেতে দেব না। কারণ আপনারা আমার গোপন আস্তানার কথা জেনে ফেলেছেন।

আমি বললাম, আপনার শর্ত মেনে না নিলে মৃত্যু বরণ করে নিতে হবে তাহলে আমাদের ?

হ্যাঁ তাই। তবে শুনুন মঁসিয়ে আরোনা, আপনার অন্ততঃ ও প্রস্তাব মেনে না নেওয়া বা আপত্তি করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ সমুদ্রের রহস্য সম্বন্ধে যে সব কথা আপনি লিখেছেন তা অসম্পূর্ণ। কারণ আপনি চোখে না দেখে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে এসব কথা লিখেছেন। কিন্তু আমার এই জাহাজে থাকলে সমুদ্রগর্ভের অজানা জগৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন আপনি। এজন্য আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমাকে।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণার কথা উল্লেখ করতে আমার মনটা দুর্বল হয়ে গেল। আমার স্বাধীনতার কথা ভুলে গেলাম। আমি বললাম, আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব আমি ?

তিনি বললেন, ক্যাপ্টেন নেমো।

তারপর নেড আর কোনসাইনের দিকে ফিরে বললেন, এখানে আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে। এই পরিচারকটি আপনাদের দেখাশোনা করবে। আর মঁসিয়ে আরোনা, আসুন আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

লম্বা করিডর পার হয়ে আমাকে নিয়ে প্রথমে খাবার ঘরে গেলেন। মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো টেবিলগুলো দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। জলের তলায় এ যেন এক আশ্চর্য জগৎ।

টেবিলের উপর যে সব খাবার সাজানো ছিল তা সবই আমার অচেনা।

আমার মুখের ভাব দেখে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, বেশীর ভাগ খাবারই আপনার অচেনা। যা কিছু খাবার দেখছেন সবই সমুদ্রের তলায় হয়। পৃথিবীতে আপনারা যে সব খাদ্য গ্রহণ করেন তা আমি ত্যাগ করেছি। কিন্তু এই সব খেয়েই সুস্থ ও শক্ত আছি আমি।

আমি বললাম, এ সবই সমুদ্রের অবদান ?

হ্যাঁ প্রফেসর। মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে জলের তলায় শিকারে বেরোই আমি। আপনার এই সব খাবারের মধ্যে আছে কচ্ছপের মাংস ভাজা, শুশুকের যকৃৎ—খেতে শুয়োরের মাংসের মত। আর এটা হলো তিমিমাছের দুধ থেকে তৈরি পনির। চিনি তৈরি করেছি উত্তর সাগরের শ্যাওলা থেকে।

ক্যাপ্টেন নেমো আরও বললেন, সমুদ্র শুধু আহারই যোগায় না। বসন-ভূষণও দেয়। ঝিনুক, শামুক, গুগলি প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে এক

ধরনের আঁশ আছে যাকে বলে বাইমাস। আপনাকে যে পোশাক দেওয়া হয়েছে তা সেই বাইমাস থেকে তৈরি। ভূমধ্য সাগরের কতকগুলি কঠিন চর্ম প্রাণীর দেহের রঙে রং করা হয়েছে। আপনার শয্যায় পাতা আছে সমুদ্রের নরম ঘাস। লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় তিমিমাছের হাড় থেকে তৈরি কলম, আর কালামারির দেহ থেকে নিঙ্ড়ানো কালো রঙের এক তরল পদার্থ থেকে তৈরি কালি।

আমি বললাম, সমুদ্রকে আপনি ভালবাসেন ?

হ্যাঁ, সমুদ্রই আমার সব, আমার যথাসর্বস্ব। তার হাওয়া বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর। সমুদ্রে কেউ কখনো একা বোধ করে না। চারপাশে সব সময় প্রাণের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের তলায় কোন স্বৈরাচার, সংগ্রাম বা হানাহানি নেই। প্রাণীরা হানাহানি করে পৃথিবীর মাটিতে। এই সমুদ্রের তলাতেই আমি আমার স্বাধীনতা ঠিকভাবে বজায় রেখে চলতে পারি।

ঘরের মধ্যে অশান্তভাবে পায়চারি করতে করতে নেমো বলছিলেন কথাগুলো। শেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন মঁসিয়ে আরোনা, আমার 'নটিলাস' জাহাজটা ঘুরিয়ে দেখাই।

৫

ক্যাপ্টেন নেমোর নটিলাস জাহাজে যা যা দেখেছিলাম সত্যিই তা আশ্চর্যজনক। দেখেছিলাম মস্তবড় এক গ্রন্থাগার। যেখানে বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন রুচির বই থরে থরে সাজানো আছে। তাতে দর্শন, পুরাণ, কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাসের বই থাকলেও সংখ্যায় বিজ্ঞানের বই-ই বেশী। এমন এক বিচিত্রভবন ও সংগ্রহশালা দেখছিলাম সারা ইউরোপে যার তুলনা নেই। তাছাড়াও যে সব দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু দেখেছিলাম তার সন্ধান পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানীই পায়নি। আর দেখছিলাম রত্নশালা। সেখানে ছিল নানা আকারের ও নানা রঙের অসংখ্য মূল্যবান মুক্তো। যা জমিয়ে রাখা হয়েছে।

অথচ এই সব কিছুর মালিক যিনি তার শয়নকক্ষটি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম আমি। ঠিক যেন কোন সন্ন্যাসীর ঘর। একটা লোহার খাট, একটা ছোট টেবিল, আর হাত ধোয়ার বেসিন—এ ছাড়া কিছুই নেই।

এরপর তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন নটিলাস-এর যন্ত্রপাতি। দেখলাম নটিলাসের যে দানবিক শক্তি সাত সমুদ্রকে কাঁপিয়ে তুলেছে তার মূলে আছে বিদ্যুৎ। সমুদ্রজল থেকে সোডিয়াম বার করে নিয়ে অতি অনায়াসে ও সস্তায়

বিদ্যুৎশক্তি বানিয়ে নেয় নটিলাস। এই অফুরন্ত বিদ্যুৎশক্তির জন্যই তার এত গতিবেগ আর আলো। শক্তিশালী পাম্প দিয়ে একটা ঘরে ঘন বাতাস জমিয়ে রাখা হয়। তার ফলে জলের তলায় একটানা অনেকদিন থাকতে হলে কোন অসুবিধা হয় না।

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে একে একে বিদ্যুৎচালিত ঘড়ি, জাহাজের গতি মাপার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, জলস্তরের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র, বহু অতিরিক্ত গীয়ার ইত্যাদি সব যন্ত্র দেখালেন।

নটিলাস জাহাজের মাঝখানে কূয়োর মত খাড়া সুড়ঙ্গ দেখতে পেলাম। কূয়োর উপরে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে। এটা কি বা এর কাজ কি তা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেমোর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, এর উপরে আমার নেকো আছে।

আমি বললাম, কিন্তু নৌকোয় চড়তে হলে নটিলাসকে ত জলের উপরে উঠতে হয়।

না, তা হয় না। নেকোর উপর নিচে দুটো ঢাকনি আছে। নিচের ঢাকনিটা বন্ধ করে বাঁধন খুলে দিলেই ছিপির মত জলের উপর ভেসে ওঠে নৌকো। তখন পাটাতনের উপরকার ঢাকনি খুলে মাস্তুল লাগিয়ে পাল তুলে দাঁড় টানলেই হলো।

কিন্তু ফিরে আসেন কি করে জাহাজে ?

আমি আসি না, বরং নটিলাসই আমার কাছে যায় দরকার হলে। বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে খবর পাঠাই আমি।

জাহাজের মধ্যেই একদিকে কিভাবে সমুদ্রের নোনাজল পরিস্রুত হয়ে পানীয় জলে পরিণত হয় তার ব্যবস্থাও দেখলাম। এঞ্জিন ঘরটা ছিল জাহাজের পিছন দিকে। এখান থেকে প্রপেলার ঘুরিয়ে জাহাজের গতিবেগ বাড়ানো হয়।

ঘুরে ঘুরে দেখার পর আবার আমরা গ্যালারি ঘরে ফিরে এলাম।

আমাকে একটা চুরুট বাড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এখানে আপনারা চুরুটও খান নাকি ? তাহলে হাভানার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা বজায় আছে এখনো ?

না, রাখিনি। চুরুটটা হাভানার নয়। তবে ভাল।

সোনালি রঙের চুরুটটা ধরিয়ে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দেখলাম। খুব ভাল লাগল। বললাম, চমৎকার ! কিন্তু ভিতরে তামাক আছে বলে ত মনে হয় না।

না, এ তামাক পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে আমদানি করা নয়, এ তামাক সমুদ্রেরই এমন এক রকমের শ্যাওলা থেকে তৈরি যার মধ্যে আছে প্রচুর নিকোটিন। এ সিগারেট প্রচুর খেতে পারেন আপনি ভাল লাগলে।

চুরুট খেতে খেতে আমি বললাম, কিন্তু নটিলাসের আসল রহস্য এখনো গোপন রয়ে গেল আমার কাছে।

ক্যাপ্টেন নেমো আমার দিকে তীক্ষ্ণগভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তার কোন রহস্যই গোপন থাকবে না মঁসিয়ে আরোনা। সবই বলা হবে একে একে। কারণ এইসব গোপন তথ্য নিয়ে আপনি বাইরের জগতে আর ফিরে যেতে পারবেন না কোনদিন।

ক্যাপ্টেন নেমো আবার বলতে শুরু করলেন, 'নটিলাস'-এর দৈর্ঘ্য পঁচাত্তর গজ। দুটো বড় ইস্পাতের খোলে মোড়া আছে জাহাজটা। একটা পুরু ইস্পাতের পাতের উপর আর একটা ইস্পাত বসানো আছে বলে তার গা-টা এত শক্তিশালী। এইজন্যই যে কোন আঘাত অনায়াসে প্রতিহত করতে পারে নটিলাস। জাহাজের ভিতর কতকগুলো বড় বড় ট্যাঙ্ক আছে। পাম্প দিয়ে মাঝে মাঝে সেগুলো ভরে নেওয়া হয়। কখনো খুব গভীরে নামতে হলে হাইড্রোপ্লেনের সাহায্যে কোণাকুণিভাবে জল কেটে নামতে পারে নটিলাস।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু জাহাজচালক জলের তলায় পথ দেখবে কেমন করে?

একটা বড় ঘুলঘুলি বসানো স্তম্ভের মধ্যে চালক আর হুইল থাকে। দেওয়ালের গায়ে দূরবীন বসানো আছে। দুপাশ থেকে তীব্র বিদ্যুতের আলোয় সমুদ্রের জল দিনের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, এই আলোকেই আমরা সিন্ধুদানবের গা থেকে বিচ্ছুরিত ফসফরাসের আলো বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু 'স্কটিয়া' জাহাজটাকে সহসা বিকল করে দিলেন কি কারণে?

ইচ্ছে করে বিকল করিনি। সেদিন আমার নটিলাস মাত্র এক বাঁও তলা দিয়ে যাচ্ছিল। এজন্যই স্কটিয়ার খোলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায় তার।

কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন?

এটা ভুলে যাবেন না যে আব্রাহাম লিঙ্কন আমায় আক্রমণ করেছিল। সুতরাং আত্মরক্ষার খাতিরেই ডুবিয়ে না দিয়ে বিকল করে দিই জাহাজটাকে।

আমি তখন বললাম, কিন্তু এত বড় ডুবোজাহাজটা কোথায় কি করে গোপনে তৈরি করলেন যার কথা কেউ জানল না ?

একটা নির্জন দ্বীপে। এর বিভিন্ন অংশগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে আনি যাতে কারও মনে কোন সন্দেহ না হয়। ফ্রান্স থেকে এনেছি খোল, লণ্ডন থেকে চাকার রড, লিভারপুল থেকে ইস্পাতের বর্ম, গ্লাসগো থেকে চাকা। প্যারীতে ট্যাঙ্কগুলো তৈরি করেছিলাম, জার্মানীতে এঞ্জিন, সুইডেনে সামনের অংশটা আর নিউইয়র্কে বানিয়েছিলাম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলো। প্রত্যেকটা কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন নামে নক্সা আর খসড়া পাঠিয়েছিলাম। অবশেষে ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলো জুড়ে দিলাম এক নির্জন দ্বীপে। এইভাবে গড়ে ওঠে 'নটিলাস'। তারপর তাকে নিয়ে ভেসে পড়ি অকূল সমুদ্রে।

আমি বললাম, আপনার ঐশ্বর্য এমনই বিপুল যে তার কোন সীমা নেই।

কথাটা সত্যি। আমি অনায়াসে ফ্রান্সের সব জাতীয় ঋণ শোধ করে দিতে পারি।

এরপর একসময় ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, এখন আমরা প্যারীর মধ্য-রেখার ৩৭°১৫´ দ্রাঘিমা আর ৩০°৭´ অক্ষরেখায় আছি। অর্থাৎ জাপানের উপকূল থেকে তিনশো মাইল দূরে। এখান থেকে আজ নভেম্বরের আট তারিখে দুপুরবেলায় শুরু হবে আমাদের সমুদ্রতলে অভিযান। আবার একবার গোটা পৃথিবীটা জলের তলা দিয়ে ঘুরে আসবে নটিলাস।

এই কথা বলেই একবার এঞ্জিনঘরে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন নেমো।

আমি তখন একা বসে বসে ভাবতে লাগলাম রহস্যময় মানুষ ক্যাপ্টেন নেমোর কথা। মানুষটি বুদ্ধিমান, সাহসী এবং স্বাধীনচেতা। কিন্তু মুখে বিষাদ জমে আছে কেন ? তবে কি অতীতে এমন একটা আঘাত পান যার বেদনাময় স্মৃতির কথা ভুলতে পারছেন না আজও ? কিন্তু তিনি পৃথিবী আর মানবজাতিকে এত ঘৃণা করেন কেন ? তিনি কি কোন পরাধীন দেশের মানুষ ? এই সব নানা প্রশ্ন ভিড় করে আসতে লাগল আমার মনে। সব মিলিয়ে লোকটিকে ঘিরে একটা রহস্য ঘন হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশঃ।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ টেবিলের উপর তাকাতেই মস্ত বড় গ্লোব বা ভূগোলকটার উপর একবার তাকালাম। বুঝলাম এখন আমরা যাচ্ছি গাল্‌ফ স্ট্রীম ধরে। এই গাল্‌ফ স্ট্রীম সমুদ্রের তলায় যেন একটা নদী। তার জলের রং হচ্ছে গাঢ় নীল। জলের রং দেখেই এক একটি নদীর স্রোত বোঝা যায়। এই গালফ স্ট্রীম বঙ্গোপসাগর থেকে বেরিয়ে মানাক্কা প্রণালী পার হয়ে

এশিয়ার উপকূল ধরে এগিয়ে অবশেষে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়ে। এর স্রোত শুধু কালো নয় বেশ গরমও বটে।

এমন সময় ঘরে ঢুকল নেড আর কোনসাইন।

সংগ্রহশালাটি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল তারা দুজনেই। কিন্তু নেডের তখন একমাত্র চিন্তা কি করে এই ডুবোজাহাজ থেকে পালানো যায়। এই বন্দীশালা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এই কথাই সে বারবার বলছিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

এমন সময় হঠাৎ ঘরে আলোটা নিভে যেতে সব অন্ধকার হয়ে গেল। এঞ্জিনের ঘর্ঘর শব্দ শুনে মনে হলে হয়ত যাত্রা শুরু করল নটিলাস। ঘরখানা অন্ধকার থাকলেও দুপাশে দুটো আয়তকার পুরু কাচের মধ্য উজ্জ্বল আলোর ছটা আসতে লাগল। ওই কাচের ওপারেই সীমাহীন সমুদ্রের অতল জলরাশি।

কাচের মধ্য দিয়ে দেখলাম তীব্র আলোর ছটায় স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে জলরাশি। দেখলাম সবুজ শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন আকারের অসংখ্য মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। আলোর ছটায় আকৃষ্ট হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছিল মাছগুলো।

ম্যাকারেল, স্যালামাণ্ডার, সারমুলেট প্রভৃতি কত সব নাম মাছগুলোর। মাছের সঙ্গে সঙ্গে ছিল কত সামুদ্রিক সাপ।

এর পর হঠাৎ এক সময় সেই কাচের জানালা বন্ধ হয়ে গেল আর ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল। সমুদ্রের আর কোন কিছু দেখতে পেলাম না আমি। তবু সেদিন সেই দুটি কাচের জানালা সমুদ্রের অতলান্তিক গভীরে যে এক অচেনা অজানা রহস্যময় জগৎ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল আমার সামনে তা আমি ভুলতে পারব না কোনদিন।

৬

গাঢ়নীল চঞ্চল স্রোতের মধ্য দিয়ে নটিলাস অবিরাম ছুটে চলতে লাগল সমান গতিতে। কিন্তু পর পর সাতদিন ক্যাপ্টেন নেমোর দেখা পেলাম না আমরা। আমি একা একা গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

আমার মনে হলো নিজেকে বেশী প্রকাশ করতে চান না বলেই আর পাঁচজনের থেকে একটু দূরে দূরে থাকতে চান ক্যাপ্টেন নেমো। এক রহস্যময় ব্যবধানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া করতে চান নিজের চারদিকে।

১৬ই নভেম্বর আমার ঘরের টেবিলের উপর একটা কাগজ পেলাম। তাতে আলেমান ভাষায় আমাকে সম্বোধন করে, লেখা ছিল, ক্রেসপো আইল্যাণ্ডের জঙ্গলে কাল সকালে শিকারে যাবেন বলে স্থির করেছেন ক্যাপ্টেন নেমো। এই শিকার অভিযানে তিনি অধ্যাপক আরোনা ও তাঁর সঙ্গীদের সাহচর্য পেলে আনন্দিত হবেন।

নেড আর কোনসাইন কথাটা শুনে খুশি হলো। দ্বীপের মাটিতে নামতে পাবে অনেক দিন পর। কিন্তু পরদিন খাবার সময় নেমোর মুখ থেকেই জানা গেল আমরা ক্রেসপো আইল্যাণ্ডে উঠব। সে দ্বীপের কাছাকাছি জলের তলাতেই আমরা শিকারে বার হব।

কিন্তু জলের তলায় পায়ে হেটে বন্দুক নিয়ে কিভাবে শিকার করা সম্ভব হবে তা ভেবে পেলাম না আমি। প্রথম কথা জলের তলায় মানুষ নিঃশ্বাস নেবে কি করে? দেখতেই বা পাবে কিকরে আর বন্দুকই বা কি করে কাজ করবে জলের তলায়?

আমার সব প্রশ্নের উত্তরে ক্যাপ্টেন নেমো একে একে বলতে লাগলেন, সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রচুর বাতাস থাকবে আমাদের সঙ্গে। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন কষ্ট হবে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক ধরনের ঝাঁকুনি দিয়ে এই ঘন বাতাসকে হালকা করে পৌছে দেওয়া হবে আপনার নাকে। ডুবুরিদের মত এক পিতলের গোলাকার শিরস্ত্রাণে মাথাটা ঢাকা থাকবে। আপনার কোমরবন্ধে যে বৈদ্যুতিক টর্চ বাঁধা থাকবে তারই আলোয় সব দেখতে পাবেন আপনি। এবার থাকে শুধু বন্দুকের কথা। আমাদের সঙ্গে যে বন্দুক থাকবে তা সাধারণ বন্দুক নয়। এ বন্দুকের গুলিগুলো বৈদ্যুতিক। সংরক্ষিত বাতাসের চাপে ছুটে চলে। শিকারের গায়ে লাগলেই ফেটে পড়ে। এ রকম দশটা করে গুলি থাকে এক একটা বন্দুকে।

প্রথমে ডুবুরি পোশাকের ঘরে গিয়ে পোশাক পরলাম। পুরো রবার দিয়ে ঢাকা পোশাকগুলোর কোথাও সেলাই নেই। পোশাকের শিরস্ত্রাণ আঁটলাম মাথায়। শিরস্ত্রাণের মধ্যে ছিল তিনটি পুরু কাঁচের জানালা যাতে দেখতে কোন কষ্ট না হয়। শিরস্ত্রাণ পরে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল না আমাদের। তারপর বিশেষ ধরনের বন্দুক কাছে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলাম।

ক্যাপ্টেন নেমোও ডুবুরির পোশাকপরা এক অনুচর নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। আমরা প্রথমে একটা ঘরে এলাম। ঘরটা অন্ধকার হয়ে যেতেই ঠাণ্ডা

জলের স্রোত ঢুকতে লাগল ঘরে। তারপর ঘরখানা জলে একেবারে ভরে গেলে বড় ঢাকনার মত একটা দরজা খুলে গেল। উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল দরজার ওপারে।

এবার ডুবোজাহাজের ভিতর থেকে সেই খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে সমুদ্রের তলায় এসে নামলাম।

আমাদের পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে লাগলেন ক্যাপ্টেন নেমো। সাবধানে রইলাম আমি আর আমার অনুচর কোনসাইন। আমাদের পিছনে ছিল নেমোর অনুচর সেই সবুজ আলোয়আমাদের সামনে একশো ফুট জায়গা দেখা যাচ্ছিল। হাঁটতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না, বরং হালকা লাগছিল।

তখন বেলা দশটা বাজে। সূর্যের আলো জলের মধ্য দিয়ে তির্যকভাবে প্রবেশ করছিল তলায়। আলোর ছটাটা সাতটা রঙে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। সাত রঙের এই কম্পমান চঞ্চলতা মায়াময় করে তুলেছিল সমুদ্রতলের সেই আশ্চর্য জগৎকে। কত জলজ গাছপালা, ঘাস, শক্ত আঁশেঢাকা কত প্রাণী দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা নটিলাসকে দূরে ফেলে রেখে।

অবশেষে যখন আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল ক্রেসপো আইল্যাণ্ডের অরণ্যে প্রবেশ করলাম তখন বেলা প্রায় একটা। সে অরণ্যে দেখলাম বিরাট বড় বড় গাছগুলো ডালপালা সমেত সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে। গাছের ডালে ডালে পাখির বদলে নানা রঙের মাছেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে এক জায়গায় বসে পড়লাম আমরা বিশ্রাম নেবার জন্য। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি এক গজ উচু একটা মাকড়শা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্যাপ্টেন নেমোর অনুচর সেটাকে মেরে ফেলল বন্দুকের বাঁট দিয়ে।

এরপর আবার এগোতে লাগলাম। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্র-তলের জমি। গাঢ় নীল কুয়াশাটাও আগের থেকে অনেক বেশী ঘন হয়ে নেমে এসেছে এখানে। তাই বৈদ্যুতিক উনুন জ্বালিয়ে দিলেন নেমো এখানে।

সেই আলোয় দেখতে পেলাম আমাদের সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানাইট পাথরের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। বুঝলাম ওখান থেকেই শুরু হবে ক্রেসপো আইল্যাণ্ড। এটাই হলো ক্যাপ্টেন নেমোর রাজ্যের শেষ সীমানা। এখান থেকে ফিরতে শুরু করলাম আমরা। ফেরার সময় অন্য পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন নেমো।

ফেরার পথে এক জায়গায় একটা হাঙরের সামনে পড়লাম আমরা।

প্রথমটায় আমি দেখতে পাইনি। সহসা আমাকে ও কোনসাইনকে জোর করে এক সময় শুইয়ে দেওয়া হয় পথের উপর। পরে দেখি বিরাটকায় দুটি হাঙর হাঁ করে আমাদের মাথার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তারা আমাদের দেখতে পায়নি আমরা সবাই শুয়ে পড়েছিলাম বলে।

আধঘণ্টা পরে নটিলাসে পৌঁছলাম। বাইরে ঢাকনাটা খোলা ছিল। আমরা ভিতরে ঢোকার পর ঢাকনাটা বন্ধ করে একটা বোতাম টিপলেন নেমো। সঙ্গে সঙ্গে সব জল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

৭

পরের দিন সকাল হতেই দেখলাম নটিলাস চলছে সমুদ্রের উপর দিয়ে। প্লাটফর্মের উপর গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কোন জাহাজ নেই। নীল জলের উপর সোনার মত সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

ডেকের চারদিকে জাল পেতে রাখা হয়েছিল। তাতে দেখলাম অনেক মাছ ধরা পড়েছে। নাবিকরা এসে সেই সব মাছ নিয়ে গেল।

নটিলাস তখন ছুটে চলেছে দক্ষিণ পূর্ব দিক দিয়ে। বিষুবরেখা পার হয়ে গেলাম ১লা ডিসেম্বর। মাঝে মাঝে প্রশান্তমহাসাগরের অরণ্যময় দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল এক একটা। এ ছাড়া আর কোনদিকে কোন ভূখণ্ড দেখা যাচ্ছিল না।

এ জায়গায় অনেক চোরা পাহাড় থাকায় জলের তলা দিয়ে যাচ্ছিল নটিলাস। জলের তলায় কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম আমরা।

প্রবালসমুদ্র পার হবার পর ক্যাপ্টেন নেমো আমায় বললেন, অস্ট্রেলিয়া নিউগিনির মধ্যবর্তী টোরেজ প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়ব আবার আমরা। এ অঞ্চলে চোরাপাহাড়ের সংখ্যা খুব বেশী বলে নিজে জাহাজ চালাতে লাগলেন ক্যাপ্টেন নেমো।

এবার জলের উপর ভেসে উঠল নটিলাস। নিপুণ হাতে চোরাপাহাড় কাটিয়ে জাহাজটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন নেমো।

হঠাৎ এক সময় একটা দ্বীপের কাছে একটা ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নটিলাস। অবশ্য কোন ক্ষতি হয়নি তার, শুধু পাহাড়ের খাঁজে আটকে গেছে। জোয়ারের জল ছাড়া আর বার হতে পারবে না। পাঁচদিন পর পূর্ণিমার দিন জোয়ার আসবে। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে

নটিলাসকে। জোয়ারের জল এলেই আবার ভেসে উঠবে সে। ফিরে পাবে তার চলার শক্তি।

ক্যাপ্টেন নেমোকে আমি বললাম, নেড আর কোনসাইনের ইচ্ছা এই ক'টা দিন জাহাজে না থেকে সামনের দ্বীপটায় ঘুরে বেড়াবে। অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

কোন আপত্তি না করে তিনি আমাকেও বেড়াতে যাবার অনুমতি দিলেন।

আমরা সবাই খুশি হলাম। পরের দিন নটিলাস থেকে নৌকো নামানো হলো। বেলা আটটার সময় বন্দুক আর কুড়ুল নিয়ে রওনা হলাম আমরা নৌকোয় করে। নেড হাল ধরে বসল। প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগলাম আমি আর কোনসাইন।

আমরা যে দ্বীপটা দেখেছিলাম তার নাম জিনগেয়া। জিনগেয়া দ্বীপের মাটিতে আমাদের নৌকো যখন ঠেকল তখন সাড়ে আটটা বাজে।

একটানা জলের তলায় দিনের পর দিন থাকার পর দ্বীপের মাটিতে পা দিয়ে মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম আমরা। ক্রমাগত মাছ খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে নেডের। সে তাই পশুপাখির মাংস খেতে চায়।

তাই দ্বীপে উঠেই বনে জঙ্গলে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম আমরা সকলে। সন্ধ্যের দিকে শিকার করা কিছু মাংস পুড়িয়ে আর বনের মিষ্টি ফল খেয়ে নৈশভোজ সারলাম। আমাদের নৌকোটা বাঁধা রইল কাছে। কিছু দূরে সমুদ্রের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নটিলাস।

পরের দিনও আমরা সেই দ্বীপেই কাটালাম। সেদিন সন্ধ্যার সময় আমরা নৈশভোজ সারলাম। কিন্তু আমাদের খাওয়া শেষ হতে না হতেই আমাদের পায়ের কাছে একটা মস্ত পাথর এসে পড়ল। চমকে উঠলাম আমরা।

এরপর আবার একটা পাথর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ফেলে লাফ দিয়ে উঠে বন্দুক তুলে ধরলাম।

কোনসাইন বলল, নিশ্চয় দ্বীপে জঙ্গলীরা শাসন করে।

আমরা বললাম, তাড়াতাড়ি নৌকোয় চল।

আমরা সকলেই ছুটতে লাগলাম নৌকোর দিকে। এদিকে প্রায় বিশজন আদিবাসী জঙ্গলী তীরধনুক হাতে বেরিয়ে এল। আমরা তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে নৌকোতে উঠলাম। নৌকো তীরবেগে চালিয়ে নটিলাসে গিয়ে উঠলাম।

ভিতরে গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন নেমো তাঁর কেবিনে বসে অর্গান বাজাচ্ছেন।

নির্বিকারভাবে। আমি জঙ্গলীদের ভয়ে উত্তেজিতভাবে সব কথা বললাম নেমোকে। কিন্তু তিনি নির্বিকারভাবে অর্গান বাজিয়ে যেতে লাগলেন।

আমার ডাকাডাকিতে একসময় শান্তভাবে শুধু বললেন, মনে রাখবেন পাপুয়া দ্বীপের সব জঙ্গলীরা এলেও আমার নটিলাসের গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারবে না। পৃথিবীতে বর্বর কোথায় নেই? আপনি যাদের বর্বর জঙ্গলী বলছেন তারা অন্যান্য মানুষদের থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট?

আমি বললাম, কিন্তু ওরা দল বেঁধে তীরধনুক নিয়ে ছুটে আসছে। ওরা সংখ্যায় অগণ্য।

কথাটা শুনেও তিনি অর্গানের উপর আবার ঝুঁকে পড়লেন।

পরদিন পাপুয়ার অধিবাসীরা চারপাশ থেকে নটিলাসকে ঘিরে ধরল। কিন্তু তাদের কেউ জাহাজের খুব কাছে আসতে বা তার উপর উঠতে সাহস পেল না। সারাদিন তারা ভিড় করে রইল তীরে। রাত্রিবেলায় তীরে অনেক আগুন জ্বালল।

পরদিন দেখা গেল বেশ কিছু পাপুয়ার যোদ্ধা তীরধনুক হাতে একটা ডিঙ্গিতে করে নটিলাসের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমাকে ও কোনসাইনকে দেখে তারা চেঁচামিচি শুরু করে দিল। তারপরেই আমাদের আশেপাশে একঝাঁক তীর এসে পড়ল।

এবার তাহলে তারা আক্রমণ করবে আমাদের। অথচ জোয়ার না এলে নটিলাস চলতে পারবে না।

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমি ক্যাপ্টেন নেমোকে খবর দিলাম। কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না তিনি। তিনি বললেন, আপনাদের কামানের গোলাই যখন কিছু করতে পারেনি তখন সামান্য তীরধনুক তার কি ক্ষতি করবে বলুন?

আমি বললাম, কিন্তু বাতাস নেবার জন্য জাহাজের ঢাকনা বা বহির্দ্বার খুলতেই হবে তখন ওরা ঢুকে পড়বে।

নটিলাসের মধ্যে ঢোকা অত সহজ নয়। কাল দুটো চল্লিশের সময় জোয়ার আসবে। তখন নটিলাস আবার চলতে শুরু করবে। সুতরাং আর কোন কথা নয়।

কিন্তু সে রাতে জঙ্গলীদের দাপাদাপিতে আমার ভাল ঘুম হলো না। পরদিন বেলা বাড়ার পর ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে নটিলাসের বহির্দ্বারের কাছে নিয়ে গেলেন। যেখানে নেড আর কোনসাইনও ছিল।

ক্যাপ্টেন নেমো ঢাকনাটা খুলে দিতে বললেন। ঢাকনাটা খুলতেই

একজন জঙ্গলী ঢাকনা খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে রেলিংএর উপর হাত রাখতেই সে একটা আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল এবং ওদিকে ছিটকে পড়ে গেল। এরপর আর একজন তাই করতে তারও সেই দশা হলো।

পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। রেলিংএর সঙ্গে বিদ্যুৎ চার্জ করে রেখেছেন নেমো যার ফলে বাইরে থেকে কারো জোর করে ঢোকা সম্ভব নয় নটিলাসের মধ্যে।

এদিকে ব্যাপারটা ভৌতিক ভেবে পাপুয়ার লোকেরা ভয়ে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল।

এর মধ্যে জোয়ার আসতেই আবার ভেসে উঠল নটিলাস। আবার যাত্রা শুরু হলো তার। ভয়াবহ টোরেজ প্রণালী পার হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

৮

পরের দিন সকালবেলায় প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখলাম কয়েকদিন আটকে থাকার পর তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে নটিলাস। আমি প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াবার পরেই দেখলাম দূরবীণ নিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন ক্যাপ্টেন নেমো।

কি দেখতে পেয়ে তিনি ফার্স্ট অফিসারকে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বললেন। তখন জাহাজের গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলাম না। আমার সেলুনে গিয়ে দূরবীণ নিয়ে চোখে দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকালাম। কিন্তু কিছু দেখার আগেই পিছন থেকে কে টান দিয়ে দূরবীণটা ফেলে দিল আমার হাত থেকে।

মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম ক্যাপ্টেন নেমো। কিন্তু যেন অন্য মানুষ। চোখে আগুন। মুখে এক কঠিন ভাব। ভ্রূ দুটো কোঁচকানো।

আমি কি এমন অপরাধ করেছি তা বুঝতে পারলাম না। ক্যাপ্টেন নেমো ফার্স্ট অফিসারকে কি বলার পর আমাকে বললেন, মঁসিয়ে আরোনা, আপনাদের তিন জনকে সাময়িকভাবে একটি ঘরে বন্দী করে রাখা হবে। পরে অবশ্য আবার এমনি করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবেন। প্রথম দিন আমি আপনাকে আমার এই শর্তের কথা বলে দিয়েছিলাম।

আমি বললাম, আপনি যখন নটিলাসের সর্বময় কর্তা তখন যা বলছেন তাই হবে।

চারজন নাবিক এসে একটি ঘরে নিয়ে গেল আমাদের। এই ঘরেই প্রথমে বন্দী করে রাখা হয়েছিল আমাদের।

আমাদের সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল। আমরা তা খেয়ে নিলাম। কিন্তু দেখলাম খাওয়া হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নেড আর কোনসাইনও ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমারও চোখ দুটো ভারী হয়ে উঠল ঘুমে। পরে বুঝলাম, আমাদের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন নেমো। ঘুমিয়ে পড়ার ফলে বুঝতে পারেনি জলের তলায় ডুব দিয়েছে নটিলাস।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। বুঝলাম আর কোন বিধিনিষেধ নেই আমাদের উপর।

আমি প্ল্যাটফর্মে যাবার জন্য এগোতেই একজন ভৃত্য এসে আমাকে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন নেমোর কাছে।

আমি যেতে নেমো বললেন, আপনি ডাক্তারি জানেন ?

আমি বললাম, আমি ত আগে ডাক্তারই ছিলাম।

তাহলে এই লোকটিকে একটু পরীক্ষা করে দেখুন।

দেখলাম একটি নাবিকের মাথায় রক্তাক্ত একটি পট্টি বাঁধা রয়েছে। সে মৃতপ্রায়। ভয়ঙ্কর একটা আঘাতে মাথার খুলিটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

নেমো বললেন, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লেগে এঞ্জিনের একটা কীলক ভেঙ্গে যায়। তখন এই নাবিকটি অন্য একজনকে লাফ দিয়ে বাঁচাতে গেলে চোটটা ওর মাথাতেই লাগে।

আমি তার ব্যাণ্ডেজ খুলে মাথাটা পরীক্ষা করে বললাম, আর কোন উপায় নেই। মারা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

পরদিন সমুদ্রের তলায় প্রবালস্তূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হলো লোকটির। ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, সত্যি হাঙরের খপ্পর থেকে অনেক দূরে আমাদের এই কবরখানা।

পরের দিন ভোরবেলায় একজন ভৃত্য এসে খবর দিল, ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে ডাকছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সমুদ্রের নিচে মুক্তোর ক্ষেত দেখতে আমার ইচ্ছা আছে কিনা।

নেড আর কোনসাইন কথা শুনে আনন্দে নাচতে লাগল। ডুবুরির পোশাক পরে ছুরি নিয়ে তৈরি হয়ে উঠল।

ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত জীব দেখলাম

সত্যিই সে এক রোমাঞ্চকর জায়গা। অসংখ্য জীবের মধ্যে বিরাটাকার এক কাঁকড়াকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি।

অনেকক্ষণ পর অবশেষে মুক্তোর ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। অসংখ্য ঝিনুক পড়ে আছে। এইসব ঝিনুকের মধ্যে বাদামী তন্তুর বাঁধনে বন্দী হয়ে আছে মুক্তো। কোন এক অদ্ভুত রোগে যখন তাদের দেহ থেকে একরকম রস ক্ষরণ হতে থাকে সেই রসই শুক্তির মধ্যে জমে উঠে ঝকঝকে মুক্তোতে পরিণত হয়।

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে গুহার মত একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কি দেখালেন। দেখলাম একটা খালের মধ্যে এক বিরাট ঝিনুক দুটি বড় বড় ডানা বন্ধ করে পড়ে আছে। এতবড় ঝিনুক আমি এর আগে কখনো দেখিনি। নেমোর সংগ্রহ শালাতেও দেখিনি।

ক্যাপ্টেন নেমো একবার তাঁর ছোরাটা ঝিনুকটার ডানাতে ঠেকাতেই তা খুলে গেল আর তখন দেখলাম নারকেলের মত একটা বড় মুক্তো রয়েছে তার মধ্যে। আমি হাত বাড়িয়ে সেটা তুলতে যেতেই নেমো আমাকে বাধা দিলেন। তিনি ছোরাটা তুলে নিতেই তার ডানা দুটো বন্ধ হয়ে গেল। নেমো চান এইভাবে বছরের পর বছর ধরে মুক্তোটা গোপনে বড় হয়ে উঠুক। তারপর একদিন সেটাকে তাঁর সংগ্রহ শালায় সাজিয়ে রাখবেন তিনি।

এর কিছুক্ষণ পরেই এক সিংহলী ডুবুরির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের। তার ডিঙ্গি নৌকো ভাসছিল জলের উপরে। হঠাৎ একটা মস্ত বড় হাঙর দাঁত বার করে তেড়ে এল তাকে। প্রথম আক্রমণটা সে কৌশলে কাটিয়ে উঠলেও পরের বারে হাঙরটা তার লেজের ঝাপটায় ফেলে দিল তাকে। তারপর তাকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত হলো।

এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো ছুটে গিয়ে তাঁর ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিলেন হাঙরটার পেটে। কিন্তু হাঙরের লেজের ঝাপটায় নেমোকেও পড়ে যেতে হলো। পরক্ষণেই হাঙরটা হাঁ করে তাঁকেও গ্রাস করতে এল।

ঠিক এই সময় নেডল্যাণ্ডের ছোঁড়া একটা হারপুন এসে বিদ্ধ করল হাঙরের হৃৎপিণ্ডটাকে। ক্যাপ্টেন একপাশে সরে গেলেন। নেডল্যাণ্ডের হারপুনই বাঁচিয়ে দিল নেমোকে।

ক্যাপ্টেন নেমো এবার সিংহলী ডুবুরিকে নিয়ে জলের উপরে তার নৌকোতে নিয়ে গেলেন। অল্প চেষ্টাতেই তার জ্ঞান ফিরে এল। নেমো তাকে একটি মুক্তো উপহার দিলেন। তারপর আমাদের সঙ্গে নটিলাসে ফিরে এলেন।

আমি বুঝতে পারলাম না, যে মানবজাতিকে ঘৃণা করেন ক্যাপ্টেন নেমো সেই মানবজাতিরই একজনকে বাঁচাতে গেলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে ?

আমার মনের কথা হয়ত বুঝতে পেরে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, এই ভারতীয়টি এক শোষিত ও পরাধীন দেশের অধিবাসী আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমিও হয়ত তাই থাকব।

আমার মনে তখন একটা প্রশ্নই বারবার উঠতে লাগল, তবে কি নেমো কোন পরাধীন দেশের অধিবাসী ?

৯

সেদিন ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ন' তারিখ। জাহাজের প্ল্যাটফরমে গিয়ে দেখলাম লোহিত সাগরের উপর দিয়ে নটিলাস এগিয়ে চলেছে ভূমধ্যসাগরের দিকে।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো এসে বললেন, আমরা আগামী পরশু ভূমধ্যসাগরে পৌঁছব।

আমি বললাম, তাহলে আফ্রিকার পাশ দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসা সম্ভব হবে কি করে ?

কিন্তু উত্তমাশা ঘুরতে হবে কেন ?

তবে কোনদিকে যাবেন ?

তখন সবেমাত্র সুয়েজ খাল কাটা হচ্ছিল। তাই উত্তমাশা অন্তরীপ ঘোরা ছাড়া ভূমধ্যসাগরে যাবার অন্য কোন পথ ছিল না।

নেমো বললেন, এখন সুয়েজ খাল কাটা হচ্ছে বটে তবে প্রকৃতি অনেক আগে থেকেই সুয়েজের তলা দিয়ে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত এক সুড়ঙ্গপথ তৈরি করে রেখেছে। আমি ও পথের নাম দিয়েছি আব্রাহাম সুড়ঙ্গ।

সুড়ঙ্গটা কি করে আবিষ্কার করেন আপনি ?

সুড়ঙ্গটার খোঁজ পেয়েছিলাম মাছ থেকে। লক্ষ্য করেছিলাম একই জাতের কতকগুলো মাছ ভূমধ্যসাগরে আর লোহিত সাগরে পাওয়া যায়। অথচ আমরা জানতাম এই দুই সমুদ্রের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। এই দুই সমুদ্রের মধ্যে কোন সুড়ঙ্গ থাকলে লোহিত সাগর থেকেই তা উত্তরমুখে যাবে, কারণ লোহিত সাগরের উচ্চতাই বেশী। আমার অনুমান ঠিক কিনা তা দেখার জন্য লোহিতসাগরে কতকগুলো মাছ ধরে তাদের লেজে পিতলের আংটি বেঁধে সেগুলোকে আবার ছেড়ে দিলাম। কয়েকমাস পরে লিবিয়ার

কাছে এই আংটিসহ মাছগুলোকে খুঁজে পেলাম। আর কোন সন্দেহ রইল না। তখন নটিলাস নিয়ে সুড়ঙ্গের খোঁজে বার হলাম। সে সুড়ঙ্গের খোঁজও পেয়ে গেলাম। আমি ছাড়া তার সন্ধান আর কেউ জানে না।

পরের দিন সন্ধ্যের সময় সুয়েজের কাছে জলের তলায় ডুব দিল নটিলাস।

এ বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখে ক্যাপ্টেন নেমো জাহাজচালকের কেবিনে আমাকে নিয়ে গেলেন। ছফুট লম্বা ঘরখানার মাঝখানে চাকা ছিল। চার-দিকের দেওয়ালে ছিল চারটে কাচের জানালা যাতে চালকের পক্ষে চারদিক দেখা সম্ভব হয়।

কামরার পিছনে যে লণ্ঠন ছিল তার আলো এসে পড়েছে জলে। তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমুদ্রের তলদেশ।

সুড়ঙ্গটা যাতে দেখতে পাওয়া যায় তার জন্য বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে এঞ্জিন ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন ক্যাপ্টেন নেমো। একই সঙ্গে জাহাজের বেগ আর দিক নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন তিনি। চাকার হাতলে চাপ দিয়ে জাহাজের বেগটা কমিয়ে ফেললেন তিনি।

দুপাশে সুয়েজের পাথরে দেওয়াল দেখতে পেলাম। রাত সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ দেওয়ালের পরিবর্তে একটা বিরাট গহ্বর দেখতে পেলাম। নটিলাস তার মধ্যে ঢুকে পড়ল নির্ভয়ে। উঁচু ঢাল বেয়ে লোহিত সাগরের জলরাশি বেগে ভূমধ্যসাগরে ঢুকছিল। জলোচ্ছ্বাসের জোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে চালকের আসন থেকে চাকা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নেমো। আমাকে বললেন, ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছি আমরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূমধ্যসাগরে এসে পড়ল নটিলাস। সুয়েজ যোজক কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারল না তার পথে।

নটিলাস তখন গ্রীসের সমুদ্রে ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ পাশের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি একজন ডুবুরি সাঁতার কাটছে আর মাঝে মাঝে জলের উপর ভেসে উঠছে নিঃশ্বাস নেবার জন্য। তারপর আবার নেমে আসছিল জানলার কাছে।

ক্যাপ্টেন নেমো সেই ঘরেই ছিলেন। ডুবুরিটি জানলার কাছে আসতেই নেমো হাত দিয়ে কি ইঙ্গিত করলেন। উত্তরে লোকটি হাত নেড়ে উপরে উঠে গেল আর ফিরে এল না।

ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, ভয় পাবেন না। লোকটি হলো ঘাটাপান অন্তরীপের নিকোলাস। আশেপাশের সব দ্বীপই ওর চেনা। ওর মত সাহসী ডুবুরি আর নেই বললেই চলে।

এই বলে ঘরের একদিকে গিয়ে মস্ত বড় লোহার সিন্দুকের তালা খুললেন ক্যাপ্টেন নেমো। দেখলাম, সিন্দুকের ভিতরে রাশি রাশি সোনার ডেলা সাজানো রয়েছে। ভেবে পেলাম না এত সোনা কোথা থেকে পেলেন এবং তা দিয়ে কীই বা করবেন তিনি।

কোন কথা না বলে নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। সোনার ডেলাগুলো একটা একটা করে একটা বাক্সে বোঝাই করে রাখলেন। বাক্সটা ভরে গেলে উপরে গ্রীক হরফে কার ঠিকানা লিখলেন। তারপর হাতল ঘুরিয়ে ঘন্টার আওয়াজ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারজন অনুচর এসে বাক্সটা বার করে নিয়ে গেল ঘর থেকে। এর পর কপিকল দিয়ে বাক্সটাকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে তোলার শব্দ শুনতে পেলাম।

কাজ সেরে আমাকে রাত্রির মত বিদায় জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন নেমো।

আমিও আমার ঘরে ফিরে এলাম। সব ব্যাপারটা রহস্যময় ঠেকল আমার কাছে। আমি আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম।

একসময় বুঝলাম নটিলাস জলের উপর ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফরমে অনেক লোকজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

প্রায় দুঘণ্টা পরে প্ল্যাটফরমে নৌকো টেনে তোলার শব্দ হলো। বুঝলাম সোনার বাক্সটা ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে গেছে। বুঝতে পারলাম না এত সোনা কোথায় কোন ঠিকানায় পাঠালেন নেমো।

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি গ্রীসের উপকূল পিছনে ফেলে চলে এসেছে আমাদের জাহাজ।

ভূমধ্যসাগরটা যেভাবে দ্রুতগতিতে পেরিয়ে এসেছে 'নটিলাস' তাতে বুঝলাম এ অঞ্চলটা পছন্দ করেন না নেমো কোন কারণে। শুধু সিসিলির কাছে ডুবোপাহাড়ের ভয়ে জাহাজের গতিবেগটা কিছু কম করা হয়েছিল। তারপর জিব্রাল্টার প্রণালীতে পড়লে আবার বাড়িয়ে দেওয়া হয় গতিবেগ। পথে একবার চকিতে হারকিউলিসের মন্দিরটা দেখতে পেলাম। তারপরই আমরা আতলান্তিক মহাসাগরে পৌঁছলাম।

১০

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টায় ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আতলান্তিক মহাসাগরে পড়ে 'নটিলাস'। পরে সে চলতে থাকে ইস্পাহানের উপকূল ধরে জলের তলা দিয়ে।

এমন সময় পালাবার এক পরিকল্পনা করল নেডল্যাণ্ড। 'নটিলাসে' থাকতে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাবই ছিল না। তবু বন্দীদশায় বেশী দিন ভাল লাগে না। তাই নেডের কথায় রাজী না হয়ে পারিনি।

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হয়নি ক'দিন। নেড ঠিক বলেছে আজই রাত ন'টার সময় নটিলাসের এক নৌকো নিয়ে তাতে করে পালাব।

ভাবলাম যাবার আগে শেষবারের মত একবার দেখা করে যাওয়া উচিত রহস্যময় মানুষ ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে। তাই রাত প্রায় আটটার সময় নেমোর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভিতর থেকে কোন শব্দ পেলাম না। সাহস করে বাইরে থেকে একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। দেখলাম চারদিকের দেওয়ালে নানা দেশের সেই সব নেতাদের ছবি টাঙ্গানো রয়েছে যাঁরা স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। পোল্যাণ্ডের বীর নেতা কোসকিউস্কু, আয়ারল্যাণ্ডের ড্যানিয়েল ও কর্নেল, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন্ আর জন ব্রাউন।

তবে কি ক্যাপ্টেন নেমো কোন নির্যাতিত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা বিপ্লবের নেতা ?

এই কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম আমি। হঠাৎ ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজতে মনে পড়ল এ ঘরে আসলে এসেছি আমি দিক-নির্ণয়ের যন্ত্র দেখে আমাদের গতিপথ ঠিক করে নিতে।

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এসে নাবিকের পোশাকে সজ্জিত করে নিলাম নিজেকে। নটিলাসের এঞ্জিনের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দ ছিল না। পাছে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই এই ভয়ে বুকের ভিতরটা কাঁপছিল আমার।

ন'টার কিছু আগে একটা ছোট ধাক্কা খেয়ে বুঝলাম নটিলাস সমুদ্রের গভীরে নেমে যাচ্ছে। তাহলে কি আমাদের পালানো হবে না ? জাহাজ জলের উপরে না থাকলে ত আমাদের পালানো সম্ভব নয়।

এমন সময় ঘরের দরজা খুলে হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নেমো। বললেন, এই যে প্রফেসর, আপনাকেই খুঁজছিলাম। ইস্পাহানের ইতিহাস আপনি জানেন ?

আমি বললাম, যৎসামান্য।

এর পর ডিভানের উপর হেলান দিয়ে বসে ইস্পাহানের জাতীয় সংগ্রামের কাহিনী বলতে শুরু করলেন তিনি। বললেন 'ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দশ লুই-এর আদেশে তেইশটা ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ কতকগুলো ইস্পাহানি জাহাজ সোনারূপোয় ভর্তি করে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল কাডিজের দিকে। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার সামর্থ্য না থাকায় সন্ধি করতে বাধ্য হয় তারা। এদিকে খবর পেয়ে ইংরেজ নৌবাহিনী কাডিজ অবরোধ করে বসল। পথ না পেয়ে ফরাসী সেনাধ্যক্ষ আর ইস্পাহানি অধিনায়ক সোনাভর্তি জাহাজগুলো নিয়ে চললেন ভিগো উপসাগরে। কিন্তু উপকূলে মাল খালাস করতে দেরি হয়ে যাওয়ায় ইংরেজ বাহিনী সেখানে গিয়ে আক্রমণ করল তাদের। ঘোর যুদ্ধ বাধল দুপক্ষে। সমুদ্রের নীল জল লাল হয়ে গেল। ফরাসী সেনাধ্যক্ষ যখন দেখলেন জয়ের কোন আশা নেই তখন কামান দেগে সোনাভরা ইস্পাহানি জাহাজগুলো জলে ডুবিয়ে দিলেন তিনি। শত্রুর হাতে তুলে না দিয়ে সব সম্পদ জলে ডুবিয়ে দেওয়া ভাল।

আমি বুঝতে পারলাম না, নেমো এ সময় আমাকে এ কাহিনী শোনালেন কেন।

কাহিনী শেষ করে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, মঁসিয়ে আরোনা, নটিলাস এখন সেই ভিগো উপসাগরে নেমে পড়েছে।

এই বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে একটা জানলার পাশে আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন ডুবুরির পোশাকপরা নটিলাসের নাবিকরা সমুদ্রের তলায় বালি খুঁড়ে অজস্র জাহাজের ধ্বংসাবশেষের মাঝে ভাঙ্গাচোরা অনেক বাক্স উদ্ধার করছে। সেই বাক্সগুলো রাশি রাশি সোনার ডেলায় ভরা ছিল। সেই সব সোনাগুলো বড় বড় সিন্দুকে বোঝাই করছিল নাবিকরা। ইস্পাহানি মোহর আর কত সব মূল্যবান পাথরের উজ্জ্বল ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে।

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে একসময় বললেন, এবার বুঝলেন ত কিভাবে আমি এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছি।

আমি বললাম, কিন্তু এত ঐশ্বর্য ত কোন কাজে লাগছে না। নষ্ট হচ্ছে শুধু শুধু।

তিনি বললেন, আপনি কি মনে করেন আমি এই সব সম্পদ উদ্ধার করছি নিজের ভোগের জন্য? এই সব সম্পদের সদ্ব্যবহার করছি না কে বলল আপনাকে? আমি কি খবর রাখি না পৃথিবীর কোন দেশের মানুষ লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হচ্ছে?

এই বলে থেমে গেলেন তিনি।

বুঝলাম মানবজাতির দুঃখে প্রাণ কাঁদে ক্যাপ্টেন নেমোর। নিপীড়িত নির্যাতিত দীন দরিদ্র মানবজাতির জন্য তাঁর এই সব সম্পদ ব্যয় হয়। বুঝতে পারলাম ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় কাদের উদ্দেশ্যে সোনা-ভরা সিন্দুক পাঠিয়ে দেন তিনি।

পরের দিন ছিল উনিশে ফেব্রুয়ারি। সকালবেলায় একসময় ব্যস্ত হয়ে আমার ঘরে ঢুকল নেডল্যাণ্ড। তার চোখেমুখে ছিল হতাশার ছবি।

নেড এসেই বলল, ঠিক ওই সময়টাতেই নটিলাস জলের তলায় নামল। আমাদের পালানো হলো না।

যাবার আগে নেড বলে গেল, ঠিক আছে, পরের বারে ঠিক পালাব। সুযোগ বুঝলে আজ রাতেই পালাব।

নেড বলল, নটিলাস এখন কোন দিকে যাচ্ছে জান?

আমি বললাম, না, দুপুরে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে জেনে নেব।

নেড এবার কেনসাইনের খোঁজে চলে গেল।

কিন্তু সেদিন আর পালাবার কথা ভাবতে পারল না নেড। আশপাশে কোথাও ডাঙ্গা দেখতে পাওয়া গেল না। তার উপর আকাশে মেঘের আনা-গোনা শুরু হয়ে গেল।

রাত্রি এগারোটার সময় হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। আমাকে দেখেই বললেন, মঁসিয়ে আরোনা, রাত্রিবেলায় আপনি ত কখনো সমুদ্রের নিচে নামেননি। চলুন না একটু ঘুরে আসা যাক। তবে আগেই বলে রাখছি অনেকটা পথ হাঁটতে হবে এবং একটা পাহাড়ের চূড়োয় উঠতে হবে।

নেমোর কথায় আমার আগ্রহ আর কৌতূহল দ্বিগুণ বেড়ে উঠল। ডুবুরির পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলাম। দেখলাম নেমো লোহার আংটা লাগানো লাঠি নিলেন সঙ্গে। কোন বৈদ্যুতিক লাঠি নিলেন না সঙ্গে। কোন অনুচরও সঙ্গে নিলেন না।

আমরা যখন সমুদ্রের তলায় নেমে পড়লাম তখন রাত বারোটা বাজে।

দূরে একটা লাল আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলতে লাগলাম আমরা। শ্যাওলায় পা পিছলে যাচ্ছিল, তাই লাঠিতে ভর দিয়ে সামলে নিচ্ছিলাম।

বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম যে লাল আলোটা লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম আমরা সেই আলোটা ছিল একটা পাহাড়ের চূড়োয়।

অনেকক্ষণ যাবার পর পাহাড়টার পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। সেখানে নানা রকমের গাছপালার ঘন অরণ্য। পাইনগাছের জঙ্গল চলে গেছে সারবদ্ধভাবে। কিন্তু কোন গাছে কোন সবুজ পাতা নেই। পাতাগুলো সব পচে গেছে। কালো কঙ্কালসার গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মত।

এখানকার উঁচুনিচু পার্বত্যময় পথ সব চেনা ক্যাপ্টেন নেমোর। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখলাম সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাসাদ আর মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। বুঝতে পারলাম এসব কোন যুগের কোন দেশের মানুষের কীর্তি। সভ্যতাগর্বী এই সব বিশাল প্রাসাদ আর উন্নত জনপদ কতকাল আগে কিভাবে বিলীন হয়ে যায় সমুদ্রগর্ভে তার কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি।

এবার আমি দেখতে পেলাম সেই লাল আলোর উৎসটা। দেখলাম একটা পাহাড়ের মুখ থেকে আগুন বার হচ্ছে। আসলে ওটা আগ্নেয়গিরি। তার মুখ দিয়ে গলন্ত লাভার লাল স্রোত বেরিয়ে আসছে। অক্সিজেন না থাকায় আগুনে কোন শিখা নেই। সহসা একসময় একটা খড়িমাটি দিয়ে পাথরের উপর নেমে লিখলেন 'আটলান্টিস'।

মুহূর্তে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। বুঝলাম এ হলো প্লেতোর সেই আটলান্টিস নগরী যার অধিবাসীরা ছিল শৌর্যে বীর্যে উন্নত, যারা একদিন প্রাচীন গ্রীকদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এক ঘোর যুদ্ধে। কোন এক রাতে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মহাপ্রলয়ে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেল সব কীর্তি।

প্রায় পাঁচঘণ্টা সেখানে থাকার পর ক্লান্ত দেহে যখন নটিলাসে ফিরে এলাম তখন আলো ফুটে উঠেছে পূর্বদিকে।

১১

সারাগোসা সাগর পার হয়ে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে তুহিনমেরুর দিকে ছুটে যেতে লাগল নটিলাস। ষাট অক্ষরেখার কাছে এসে দেখি চারদিকে শুধু বরফের প্রাচীর। জলের উপর বরফের বড় বড় চাঙ্গড় ভেসে বেড়াচ্ছে।

অন্য কেউ হলে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ফেরার পথ ধরত। কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমো দমবার বা কোন অবস্থাতেই হার মানার পাত্র নন। খুঁজে খুঁজে একটা সরু পথ বার করে তারই মধ্য দিয়ে কৌশলে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। বৈদ্যুতিক চুল্লী জ্বালিয়ে জাহাজের ভিতরটাকে গরম রাখার ব্যবস্থা হলো।

১৬ই মার্চ তারিখে আমরা তুষার প্রাচীরের মধ্য দিয়ে অনেক পথ পার হয়ে কুমেরু বলয় অতিক্রম করলাম। কিন্তু ১৮ই মার্চ এগোবার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল একেবারে।

কিন্তু তাতে কোনরকম বিচলিত না হয়ে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, বরফের বাধা কোন বাধাই নয়। আমরা যাব বরফের তলা দিয়ে। আমাদের জলের তলায় নামতে হবে নশো ফুট। কিন্তু জলের তলায় কতদিন থাকতে হবে জানি না। সেখানে ওঠার পথ যদি না পাই তাহলে শ্বাসরোধ হয়ে মরতে হবে।

নাবিকরা কুড়ুল দিয়ে বরফ কেটে কেটে একটু একটু করে নিচে নামাতে লাগাল জাহাজটাকে।

ধীরে ধীরে নশো ফুট নয়, প্রায় আড়াই হাজার ফুট নিচে নেমে গেল নটিলাস। অবশ্য নশো ফুট নিচেই জল পাওয়া গিয়েছিল।

উনিশে মার্চ অর্থাৎ পরের দিন জাহাজ একবার উপরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। কোথায় যে খোলা সমুদ্রে ভাসতে পারবে তার খোঁজ করতে লাগল। পরদিন সকালেই ক্যাপ্টেন নেমো খবর দিলেন, খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছি আমরা।

প্ল্যাটফরমে উঠে দেখলাম সত্যিই খোলা সমুদ্র। তবে বরফের চাঙড় ছড়িয়ে আছে চারপাশে। মেরু প্রদেশের শান্ত নীল জলের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে নটিলাস। আকাশে পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। জলে খেলা করে বেড়াচ্ছিল অসংখ্য মাছের ঝাঁক।

মাইল দশ দূরে ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম আমরা। সেই দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। কিন্তু ঘন কুয়াশা থাকায় পরদিন দুপুর বারোটার সময় সেই দ্বীপে গিয়ে উঠলাম আমরা।

আমি ক্যাপ্টেন নেমোকে প্রথমে নামতে বললাম। বললাম, এ দ্বীপে প্রথম পা দেবার গৌরব আপনার।

ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, এটা দক্ষিণ মেরু।

তাঁর দূরবীনটা নিয়ে দিগন্তে তাকিয়ে দেখলাম, সূর্যকে আধখানা ফালির মত দেখাচ্ছে।

২২শে মার্চ শুরু হলো আমাদের ফেরার পালা। জলাধারগুলো সব জলে ভর্তি করে জলের তলায় আবার ডুব দিল নটিলাস। একবার একটা হিমশৈল উল্টে যাবার সময় নটিলাসকে চাপা দেয়। কাৎ হয়ে বরফের উপর পড়ে যায় নটিলাস। হিমশৈলটা ধীরে ধীরে উঠতে থাকে আর সেই সঙ্গে নটিলাসও উঠতে থাকে।

সেই বরফের পাহাড়টা থেকে নটিলাস মুক্ত হলেও সামনে পিছনে সব পথ বন্ধ হয়ে গেল তার বরফের প্রাচীরে। এমনকি ক্যাপ্টেন নেমোও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মুক্ত হতে না পারলে সব সঞ্চিত বাতাস ফুরিয়ে যাবে। শ্বাসকষ্টে মরতে হবে। ।

তখন সবাই কুড়ুল নিয়ে বরফ সরাতে লাগল। মোট সাত হাজার ঘন গজ বরফ সরাতে হবে। কিন্তু তার জন্য পাঁচ দিন সময় লাগবে। কিন্তু দুদিনের বেশি থাকতে পারব না আমরা বাতাসের অভাবে।

ক্যাপ্টেন নেমো তখন জাহাজের বড় বড় চুল্লীতে প্রচুর জল গরম করে সেই জল চারদিকের বরফের প্রাচীরগুলোতে ছড়িয়ে দিতে বললেন। বরফ গলতে লাগল। তবে শ্বাসকষ্ট হতে লাগল আমাদের।

ছয়দিন পর বরফের স্তর কাটিয়ে বেগে নিচে ডুব দিয়ে উত্তর দিকে ছুটে যেতে লাগল নটিলাস। বরফের বিশ ফুট নিচ দিয়ে যাচ্ছিল। শ্বাসকষ্টে মূর্ছিত হয়ে পড়লাম আমি। নেড আর কোনসাইন অক্সিজেনের টিউবের শেষ বাতাসটুকু ধরেছিল আমার নাকের কাছে।

হঠাৎ একসময় পিছন দিকটা হেলিয়ে মাথাটা উপর দিক করে প্রচণ্ড বেগে বরফের ছাদে ধাক্কা খায় নটিলাস। তারপর একটু নিচে নেমে আবার একবার জোর ধাক্কা মারল নটিলাস। সঙ্গে সঙ্গে বরফের ছাদ ভেদ করে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল নটিলাস আর সঙ্গে সঙ্গে হু হু বেগে চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল মুক্ত হাওয়া।

উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে আমাজান পর্যন্ত ছুটে এসেছে নটিলাস। কিন্তু আমেরিকার উপকূলভাগটাকে ইচ্ছা করে এড়িয়ে গেছে সে।

২০শে এপ্রিল বাহামার কাছ দিয়ে সাতশো ফাদম জলের তলা দিয়ে যাচ্ছিল নটিলাস। তার বৈদ্যুতিক আলোর ছটায় স্বচ্ছ ও আলোময় হয়ে উঠেছিল সমুদ্রের কালো জল।

একসময় নেডল্যাণ্ড আমাকে ডেকে নিয়ে গেল একটা জানালার ধারে। বলল, দেখুন কী ভীষণ জানোয়ার।

দেখলাম সে জানোয়ার সত্যিই বড় ভীষণ। রূপকথার সেই ড্রাগন যার আকারটা বত্রিশ ফুট লম্বা আর যার মাথা থেকে আটটা সাপের মত হাত বেরিয়েছে। সবুজ চোখ দুটো জ্বলছিল আগুনের মত। তার মুখটা খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল। তার ধারাল দাঁতগুলোর মাঝে জিভটা লকলক করছিল।

তীব্র বেগে ছুটে এসে তার আটটা হাত দিয়ে নটিলাসের পুরু কাচের জানালার ওধারে থেমে পড়ল। হাতগুলো বাড়িয়ে বাড়িয়ে ধরতে চাইল নটিলাসের বাস্তব কঠিন দেহটাকে।

ক্রমে এই ধরনের আরো কতকগুলো অক্টোপাশ এসে জড়ো হলো। তারা শুঁড়ের মত সেই নরম হাতগুলো দিয়ে জাহাজের চাকাগুলোকে পেঁচিয়ে ধরে বন্ধ করে দিল।

থর থর করে একবার কেঁপে উঠে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নটিলাস।

ক্যাপ্টেন নেমো বললেন এখন ওদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে হবে আমাদের।

আমি ভয়ে ও বিস্ময়ে বললাম, সেকি হাতাহাতি ?

নেমো বললেন, হ্যাঁ হাতাহাতি। ওদের শুঁড়ে চাকা বন্ধ হয়ে গেছে। ওদের গা খুব গরম বলে গুলিতে কোন কাজ হবে না। কারণ আমার গুলি শক্ত জিনিসে ধাক্কা না খেলে ফাটবে না।

নেডল্যাণ্ড হারপুন নিয়ে তৈরী হলো।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে একজন নাবিক নটিলাসের বাইরের দরজাটা খুলে দিল। নটিলাস তখন জলের উপর ভেসে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অক্টোপাশ তার একটা শুঁড় ঢুকিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন নেমো কুড়ুলের এক ঘায়ে দুখণ্ড করে দিলেন শুঁড়টাকে। কিন্তু আর একটা শুঁড় দিয়ে অক্টোপাশটা একজন নাবিককে সাতপাকে জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে নিল।

আমরা সবাই মিলে তখল কুড়ুল চালিয়ে অক্টেপাপটার সাতটা শুঁড় কেটে দিলাম। তবু সে একটা শুঁড় দিয়েই নাবিকটাকে জড়িয়ে ধরে রইল। ক্যাপ্টেন নেমো তখন তার দিকে কুড়ুল নিয়ে ছুটে যেতে তার মুখ থেকে ঘন কালো রঙের এক তরল পদার্থ উগরে দিল। আর তার ফলে আমাদের চোখগুলো অন্ধ হয়ে আসতে লাগল ।

কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি ফিরে পেয়ে দেখলাম অক্টোপাশটা জলের তলায় পালিয়ে গেছে আর নাবিকটিরও চিহ্ন নেই।

এরপর আমরা দারুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুড়ুল দিয়ে অক্টোপাশগুলোর শুঁড় কাটতে লাগলাম। তাদের রক্ত আর উগরানো কালির স্রোত বয়ে যেতে লাগল জাহাজের প্ল্যাটফরমটায়।

একবার একটা অক্টোপাশের একটা শুঁড় নেডল্যাণ্ডকে জড়িয়ে ধরলে সে শুঁড়টাকে সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলেন নেমো। নেড তখন তার হারবুন বসিয়ে দেয় অক্টোপাশটার বুকে।

অবশেষে আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে সমুদ্রের গভীরে ঢুকে পড়ল অক্টোপাশগুলো। পনের মিনিট ধরে সেই সব অক্টোপাশগুলোর সঙ্গে যে যুদ্ধ আমাদের হয়েছিল সে যুদ্ধের কথা আমি ভুলব না কখনো।

এরই মধ্যে আমেরিকার সীমানা ছাড়িয়ে এসে ইউরোপের উপকূল ধরে যেতে শুরু করেছে নটিলাস। নটিলাস কখনো জলের উপর দিয়ে যায়। আবার কখনো বা ডুব দিয়ে জলের তলা দিয়ে যায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

১লা জুন তারিখে নটিলাস যখন জলের উপর দিয়ে ভেসে চলছিল তখন হঠাৎ মেঘের গর্জনের মত এক শব্দ শুনে চমকে উঠি আমরা। মেঘের মত গর্জন। অথচ আকাশে মেঘ নেই।

নেডল্যাণ্ড বলল, কামানের গর্জন।

দূরে একটা জাহাজ দেখা গেল। যুদ্ধজাহাজ বলেই মনে হলো। কিন্তু কোন দেশের জাহাজ তা বোঝা গেল না।

কিন্তু জাহাজটা ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগল কামান দাগতে দাগতে। বুঝলাম নটিলাসই ওদের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু আব্রাহাম লিঙ্কনের ক্যাপ্টেন ক্যারাগুতে নন, আজ প্রায় পৃথিবীর সব যুদ্ধজাহাজই বুঝি বা অদ্ভুত ডুবোজাহাজ নটিলাসের অস্তিত্বের কথা জেনে গেছে। তাকে হয়ত তারা সবাই খুঁজছে।

কিন্তু কামানের গোলাগুলোর একটাও এখনো নটিলাসের গায়ে লাগেনি। লাগলেও কোন ফল হল হত না তাতে।

নেড চিৎকার করে আমাকে বলল, আসুন। এই সুযোগে আমাদের পালাতেই হবে।

এই বলে সে রুমাল বার করে সেই যুদ্ধজাহাজটাকে সংকেত জানাবার

উপক্রম করতেই এক ধাক্কায় তাকে প্ল্যাফরমের উপর ফেলে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো।

নেডের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করে বলে উঠলেন, তুমি কি চাও নটিলাসের খড়্গা নিয়ে ঐ জাহাজটাকে গেঁথে ফেলার আগে তোমাকেও তাই করি ?

এই বলে নেডকে ছেড়ে দিয়ে নটিলাসের উপর একটি কালো পতাকা উড়িয়ে দিলেন। তারপর, আমাদের বললেন, আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে যান।

আমি যাবার আগে বললাম, আপনি কি জাহাজটাকে আক্রমণ করবেন ?

আক্রমণ নয়। ওকে ডুবিয়ে দেব।

না না তা করবেন না।

হ্যাঁ তা করবই। আপনার কোন মতামত চাই না এ বিষয়ে।

আমি আমার ঘরে চলে এলাম। যুদ্ধজাহাজ তখন সামনে গোলাবর্ষণ করে চলেছে। নেমো গর্জন করে বলছেন, যতই কামান দাগো নটিলাসের খড়্গা তুমি এড়াতে পারবে না।

প্রথমে নটিলাস তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে সরে গেল যুদ্ধজাহাজটার দিকে। তারপর ডুব দিল জলের ভিতরে। বুঝলাম রাতের অন্ধকারে জলের তলা থেকে জাহাজটাকে তার খড়্গা দিয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেবে নটিলাস।

এতদিন নেডের কথায় তেমন আমল দিইনি। কিন্তু আজ মনে হলো, আর থাকব না এখানে। এই উন্মাদ জাহাজটা থেকে পালাতেই হবে।

সহসা প্রচণ্ড হয়ে উঠল নটিলাসের গতিবেগ। একটা জোর ধাক্কা খেল কিসে। কেঁপে উঠল গোটা জাহাজটা।

নেমোর ঘরের পাশে ছুটে গেলাম। দেখলাম জানালার ধারে একা একা গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে নেমো। দেখছেন কিভাবে অতবড় যুদ্ধজাহাজটা ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে।

প্রথমে জল ঢুকতে লাগল জাহাজের পাটাতন। তারপর একটা প্রবল বিস্ফোরণে গোটা পাটাতনটা ফেটে চৌচির হয়ে উড়ে গেল। এক নিমেষে অতল জলে তলিয়ে গেল বিধ্বস্ত জাহাজটা।

সব কিছু লক্ষ্য করার পর নিজের ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো এক বীরপুরুষের ছবির নিচে দু বাহু প্রসারিত করে নতজানু হয়েবসে পড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো।

১২

এর পর কুড়ি দিন ধরে শুধু পাগলের মত ছুটে চলল নটিলাস। প্রচণ্ড বেগে কোথায় যেন পালাচ্ছে সে। কখনো জলের উপর দিয়ে কখনো ডুবে ডুবে জলের তলায় দিয়ে ছুটে চলেছে সে। মুহূর্তের জন্যও হ্রাস হয় না এই গতিবেগের।

এই কুড়ি দিনের মধ্যে একটি রাতের জন্যও দেখা পাইনি ক্যাপ্টেন নেমোর। শুধু রাত্রিবেলায় তাঁর ঘরে অর্গান বাজানোর শব্দ শুনতে পাওয়া যেত।

তাঁর অর্গানের সেই বাজনা শুনে আমার মনে হলো যুদ্ধজাহাজটা ডোবানোর পর থেকে যেন বিবেকের দংশন অনুভব করছেন ক্যাপ্টেন নেমো। আপাতনিষ্ঠুর এই মানুষটার কোন গোপন অন্তরালে লুকিয়ে আছে যেন একটা চাপা বেদনা আর সেই বেদনাই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে রোজ রাতে অর্গানের সুরের প্রতিটি সঞ্চরণ মূর্ছনায়।

সেই রাতেই নেড আমাদের পালাবার ব্যবস্থা করল। বলল, আজ চাঁদ উঠবে সাড়ে দশটার সময়। তার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে পালাতে হবে।

তখন নটিলাস যাচ্ছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উপকূল ধরে। সারাদিন আমি নটিলাসের গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় ঘুরে বেড়ালাম শেষবারের মত। নেমোর জন্য সত্যিই অন্তরে একটা ব্যথা অনুভব করছিলাম আমি: তাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। তবু যেতেই হবে। এভাবে জীবনকে ক্ষয় করে কোন লাভ নেই।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে নেমোর ঘরের পাশ দিয়ে লাইব্রেরি ঘরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফরমে উঠে পড়লাম। পাশেই নৌকোতে আগে হতে বসে ছিল নেড আর কোনসাইন।

নেড হাল ধরল আর কোনসাইন নৌকোর বাঁধন খুলে দিল।

হঠাৎ জাহাজের ভিতর থেকে 'মেলস্ট্রম মেলস্ট্রম' বলে চিৎকার করে উঠল কারা। ভয়ে কেঁপে উঠল আমার বুকটা। তবে কি নরওয়ের সেই ভীষণ ঘূর্ণিপাকে এসে পড়লাম যাতে একবার পড়লে বড় বড় জাহাজ বাঁচতে পারে না।

কিন্তু আর কিছু ভাবার আগেই একটা ঘুরপাক খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল

আমাদের নৌকোটা। সেই সময় একটা লোহার ফ্রেমে জোরে আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম আমি।

জ্ঞান ফিরে এলে চোখ খুলে দেখলাম নরওয়ের উপকূলে এক জেলের ঘরে শুয়ে আছি। নেড আর কোনসাইন আমার উপর ঝুঁকে বসে আছে।

লোফোডেন দ্বীপের এই জেলের বাড়িতে ফরাসীগামী কোন এক জাহাজের জন্য ছ মাস কাটাতে হয় আমাদের। এখানে বসেই দশমাস ধরে লাভ করা আমার সব অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেলি আমি। নটিলাসের কথা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না আমি।

নটিলাসের কথা বারবার মনে পড়ে আমার। আর তা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে অনেকগুলো। নটিলাস কি সেদিন ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে? এখনো কি বেঁচে আছেন ক্যাপ্টেন নেমো? এক মিথ্যে ঘৃণা আর প্রতিহিংসাকে কি আজও তিনি পুষে রেখে দিয়েছেন তাঁর অন্তরে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর আমি কোনদিনই পাব না। এর উত্তর কেউ দিতে পারবে না আমায়।

আমি শুধু বাইরে ভীষণ ও অন্তরে শুদ্ধ সুন্দর সেই মানুষটির জন্য প্রার্থনা করে যেতে পারি। তাঁর জন্য আর কিছুই করতে পারি না আমি।


ট্রেজার
আইল্যাণ্ড

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

১

সেদিনকার ঘটনাটা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। সব কিছু চোখের সামনে ভাসছে। সেই বুড়ো লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের সরাই-খানার সামনে এসে থামল। তার পিছনে ছিল ঠেলায় চাপানো একটা জাহাজী সিন্দুক। বুড়ো হলেও লোকটা যেমন বলিষ্ঠ ঠিক তেমনি তেজী। তার এলোমেলো চুলগুলো কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে ময়লা নীল কোটটার উপর। হাতদুটো খসখসে। তার গালে ছিল একটা বড় কাটা দাগ। এক নজরেই চোখে পড়ে। হয়ত কোন লড়াইয়ে তলোয়ারের আঘাতে কেটে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে তার গোটা চেহারা ও বেশভূষায় ছিল একটা নোংরা ভাব।

বেশ মনে আছে আমার, লোকটা শিষ দিতে দিতে সরাইখানায় ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে সেই পুরনো গানটা গাইতে লাগল। এ গানটা সে পরে প্রায়ই গাইত।

মরা মানুষের সিন্দুক ; পনেরটা মানুষ দেখ
তার মধ্যে হো হো হো এক বোতল রাম।

তার গলাটা কাঁপা কাঁপা আর বেশ জোরাল।

বুড়োটার হাতে ছিল একটা লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে সে দরজায় ঠক ঠক শব্দ করল। সরাইখানার মালিক আমার বাবা আসতেই চড়া গলায় হুকুম করল, এক গেলাস রাম।

'এক গেলাস রাম এনে দিলে চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে মদটুকু পান করতে লাগল।

তারপর সে এক সময় চোখ তুলে সরাইখানার সাইনবোর্ডটা দেখে নিয়ে বাবাকে বলল, তোমার সরাইখানাটায় বসে বসে মদ খাবারও ব্যবস্থা আছে। তা বন্ধু, লোক টোক আসে ত ?

বাবা বললেন, খুব কমই আসে।

তা শুনে বুড়োটা বলল, থাক, তাহলে আমি ঠিক জায়গাতেই এসেছি।

এই বলে সে ঠেলাওয়ালাকে জিনিষপত্র তুলে নিয়ে আসতে বলল। বলল, এখানে দিনকতক আমি থাকব। আমাকে তোমরা ক্যাপ্টেন বলে ভাবতে পার।

এর পর সে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা ঘরের দরজার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মেজাজের

সঙ্গে বলল, এই নাও। ফুরিয়ে গেলে আমায় বলবে। একটু রাম, বেকন আর কয়েকটা ডিম—আর কোন ঝামেলা নেই আমার।

লোকটার নোংরা জামাকাপড় দেখে আমার ত মনে হলো না ও কখনো ক্যাপ্টেন ছিল। হয়ত বা সারেঙ্‌ বা মেট ছিল।

ঠেলাওয়ালার কাছ থেকে শুনলাম, গতকাল সকালের ডাকগাড়িতে এসে রয়েল জর্জ সরাইখানায় উঠেছিল প্রথমে। পরে আমাদের সরাইখানা এ্যাডমিরাল বেনবোর নাম শোনে। আমাদের সরাইখানাটা সমুদ্রের ধারে নির্জন জায়গায় বলে সে চলে আসে এখানে। এ ছাড়া সেদিন তার সম্বন্ধে আর কোন কথা জানতে পারিনি আমরা।

লোকটা সব সময় একা একা থাকতে ভালবাসত। সারাদিন সে একা ঘুরে বেড়াত আমাদের সরাইখানার চারপাশে। মাঝে মাঝে একটা দূরবীন হাতে নিয়ে ছোট ছোট পাহাড়গুলোর মাথায় উঠত। আর সন্ধ্যে হলেই বসার ঘরে আগুনের পারে একটা চেয়ারে বসে এক চুমুক এক চুমুক করে রাম বা খুব কড়া মদ খেত অল্প কিছু জল মিশিয়ে। ও কথা খুব কম বলত। ওর সঙ্গে কেউ কথা বললেও ও কথা বলত না, শুধু নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করত।

দিনকতকের মধ্যে লোকটার প্রকৃতি সব জেনে ফেললাম। আমাদের সরাইখানায় যারা নিয়মিত আসত তারা তাকে চিনে ফেলল।

রোজ বাইরে থেকে ঘুরে এসেই জিজ্ঞাসা করত কোন জাহাজী মানুষ এসেছিল কি না। প্রথম প্রথম আমরা ভাবতাম আলাপ করা বা কথা বলার জন্য হয়ত জাহাজী মানুষের খোঁজ করছে। কিন্তু পরে বুঝলাম আসলে ও জাহাজী মানুষদের এড়াতে চায়। ব্রিস্টল যাওয়ার পথে কোন নাবিক বা জাহাজী মানুষ আমাদের সরাইখানায় এসে উঠলে তার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখত। সে যতক্ষণ থাকত একটা কথাও বলত না।

একদিন ও আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, এই শোন, একটা পাওয়ালা কোন জাহাজী নাবিককে ক্রাচে ভর দিয়ে খট খট করে আসতে দেখলেই ছুটে এসে আমাকে খবর দিবি। ঠিকমত নজর রাখবি। তাহলে প্রতি মাসের প্রথম দিন তোকে একটা করে রূপোর চার পেনি দেব।

পয়সার লোভে আমি ঠিকই নজর রাখতাম। কিন্তু লোকটাকে দেখতে পেতাম না। কিন্তু একপাওয়ালা সেই লোকটাকে চোখে দেখতে না পেলেও প্রায়ই তার একটা কল্পিত রূপ ভেসে উঠত আমার মনের সামনে। বিশেষ করে

ঝড়ের রাতে যখন সোঁ সোঁ করে বাতাস বইত, আমাদের সরাইখানার দরজা জানালাগুলো কাঁপত, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউগুলো যখন আছাড় খেয়ে পড়ত আমাদের সরাইখানার দরজার কাছে, লোকটার অদ্ভুত চেহারাটা আমার কল্পনায় ফুটে উঠত। কোন কোন রাতে তাকে নিয়ে কত দুঃস্বপ্ন দেখতাম।

সেই বুড়ো ক্যাপ্টেনকে সব লোকই ভয় করে চলত। একমাত্র আমিই কোন ভয় করতাম না। এক একদিন রাতে খুব বেশী মদ খেলে সে যত সব ভয়ঙ্কর গল্প শোনাত। মাঝে মাঝে সেই গানটা গাইত। ঘরে যারা উপস্থিত থাকত তাদের সবাইকে তার গল্প শুনতে হত। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানও গাইতে হত। তা না হলে নেশার ঘোরে ছোরা বার করে মারতে যেত। তার গল্প বলার সময় কেউ কোন কথা বললে টেবিল চাপড়ে চুপ করতে বলত। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কেউ কোন প্রশ্ন করলে সে রেগে যেত, আবার কেউ কোন প্রশ্ন না করলেও রেগে যেত, কারণ ভাবত কেউ শুনছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গল্প বলা শেষ হত এবং সে বিছানায় শুয়ে না পড়ত ততক্ষণ কেউ উঠতে বা বেরোতে পারত না ঘর থেকে।

তার গল্পগুলো ছিল যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়ঙ্কর। শুনে ভয়ে হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠত। আসলে ওরা ছিল জলদস্যু। জলদস্যু থাকাকালে কিভাবে বন্দীদের ফাঁসি দিত, অথবা জাহাজের ধারে সরু পাতলা পাটাতনের উপর তাদের হাঁটাত এবং পা ফসকে তারা পড়ে গেলেই সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো হাঙরগুলো তাদের দেহগুলোকে ছিঁড়ে খেত সেই সব গল্প বলত সে।

তার গল্প বলার ভাষাও ছিল কুৎসিত আর নোংরা।

বাবা প্রায়ই বলতেন, লোকটা আমার সর্বনাশ করবে। ও থাকলে আর কেউ আসবে না আমার সরাইখানায়। কারণ ওর ভয়ঙ্কর সব গল্প শুনে ওরা ভয় পায়, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে।

কিন্তু আমি লক্ষ্য করতাম ভয় পেলেও অনেকেই ভালবাসত সেই সব গল্প শুনতে। অনেকেই আসত তা শুনতে। ঘর ভরে যেত রোজ সন্ধ্যায়।

বাবা তাই এক এক সময় লোকটার তারিফ করে বলতেন, তোমাদের মত সাহসী জাঁদরেল নাবিকদের জন্যই ইংরেজদের জাহাজের কাছে কেউ আসতে সাহস পায় না।

তবে লোকটা আমাদের ক্ষতিও করছিল। তার টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেলেও সে মাসের পর মাস থেকে যাচ্ছিল আমাদের সরাইখানায়। যাবার নাম করত না। বাবা তাকে টাকা চাইতে সাহস পেতেন না। কখনো টাকা

চাইলে সে সজোরে নাক ঝেড়ে একটা শব্দ করে এমন করে বাবার দিকে তাকাত যে বাবা আর কোন কথা বলতেন না। তার প্রতি বাবার এই চাপা ভয়ই অকালমৃত্যু ডেকে আনে বাবার।

বুড়ো ক্যাপ্টেনটা যতদিন আমাদের সরাইখানায় ছিল ততদিন সে একবারও পোশাক বদলায় নি। একবার শুধু একটা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একজোড়া মোজা কিনেছিল। তার মাথার টুপির একটা দিক ছিঁড়ে ঝুলে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে তার কোটটায় তালি দিত। তালিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল তার কোটটা। প্রতিবেশী ছাড়া আর কারো সঙ্গে কখনো কোন কথা বলত না। তার সঙ্গে যে জাহাজী সিন্দুকটা ছিল সেটাকে কেউ কখনো খুলতে দেখেনি তাকে।

একদিন একটা ব্যাপারে দারুণ ক্ষেপে যায় ক্যাপ্টেন। ঘটনাটা ঘটে ডাক্তার লিভজিকে নিয়ে। গাঁয়ে রোগী দেখার জন্য বেরিয়ে আমাদের সরাইখানায় বেড়াতে এসেছিলেন ডাক্তার লিভজি। আমাদের আস্তাবল না থাকায় তাঁর ঘোড়াটা গাঁয়ের একটা লোকের কাছে রেখে এসেছিলেন। মার কাছে কিছু ডিনার খেয়ে বসার ঘরে পাইপ খেতে খেতে তাঁর ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এমন সময় মদের নেশায় চড়া গলায় বোম্বেটেদের মত গান ধরল ক্যাপ্টেন। সেই মড়া মানুষের সিন্দুকের গান যার মধ্যে আছে পনেরটা লোক।

ডাক্তার তার সেই গানের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মালী টেলরকে বাতের একটা ওষুধের কথা বোঝাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেন চাইত না তার গান গাওয়ার সময় কেউ কথা বলুক। তাই সে রেগে গিয়ে টেবিল চাপড়াল। কিন্তু ডাক্তার তাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে কথা বলে যেতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন তখন ধমক দিয়ে বলল, এই চুপ, আর কথা নয়।

ডাক্তার বললেন, তুমি যদি আমাকে একথা বল তাহলে বলব এইভাবে তুমি রাম খেয়ে গেলে খুব শিগগির তোমার মত একটা ইতর লোকের হাত থেকে মুক্ত হবে পৃথিবী।

একথা শুনে দারুণ রেগে গিয়ে ছোরা বার করে সেটা দোলাতে দোলাতে বলল, এখনি তোমাকে শেষ করে দেব।

ডাক্তার তাতে কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে এমন কি তার কথা গ্রাহ্য না করে জোর গলায় সবাইকে শুনিয়ে বলল, তুমি যদি এখনি ছোরাটা পকেটে না না ঢোকাও তাহলে ফাঁসি কাঠে ঝোলাব তোমাকে।

শেষে চোখ নামিয়ে নিল ক্যাপ্টেন। ছোরাটা পকেটে ভরে চেয়ারে বসে পড়ল সে।

ডাক্তার তখনো বলে যেতে লাগলেন, তোমার মত বদ লোকের কথা যখন জানতে পারলাম তখন এবার হতে সব সময় নজর রাখব তোমার উপর। মনে রেখো আমি শুধু ডাক্তার নই, ম্যাজিষ্ট্রেটও বটে। যদি কোন-দিন তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনি তাহলে তোমাকে মজা দেখিয়ে দেব। তাহলে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে তোমায়।

ডাক্তারবাবুর ঘোড়া চলে এলে তিনি উঠে পড়লেন। সেদিন আর কোন গোলমাল করেনি ক্যাপ্টেন। এর পর সন্ধ্যাবেলায় চুপচাপ থাকত সে।

২

সেদিন ছিল দারুণ শীত। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়ায় হিম হয়ে জমে যাচ্ছিল গায়ের রক্ত। তুষারপাতও হচ্ছিল। বাবার খুব অসুখ। তাঁর অবস্থাটা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তাই সরাইখানার সব দায়িত্ব আমারই উপর।

সেদিনকার মত হিমেল সকালেও ভোরে উঠে যথারীতি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছে ক্যাপ্টেন। তার কোটের নিচে ছিল ছোরা আর হাতে দূরবীন।

মা তখন ছিলেন বাবার কাছে। তাই আমি ক্যাপ্টেনের জন্য প্রাতরাশের টেবিল সাজাচ্ছিলাম। এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলে একটা লোক ঢুকল ঘরের মধ্যে। লোকটার দেহটা রোগা রোগা। বাঁ হাতে দুটো আঙুল নেই। ক্যাপ্টেনের মত একটা ছোরা ঝুলছিল কোমরে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না ও কিকরে ছোরাটা চালায়।

লোকটাকে আমি বললাম, কি চাই?

সে বলল, একপাত্র রাম পান করতে চাই।

আমি রাম আনার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে লোকটা আমাকে ডেকে বলল, এই টেবিল কি আমার বন্ধু বিলের জন্য সাজাচ্ছ?

আমি বললাম, তোমার বন্ধু বিলকে জানি না, এ টেবিল সাজাচ্ছি এমন একজনের জন্য যিনি এখানে থাকেন এবং যাকে আমরা ক্যাপ্টেন বলে ডাকি।

লোকটা বলল, তার গালের ডানদিকে কি একটা কাটা দাগ আছে? তা আমার বন্ধুটি গেল কোথায়?

সে বেড়াতে গেছে।

কোন দিকে গেছে ?

আমি পাহাড়টা দেখিয়ে বললাম, ঐ দিকে। তার আসার সময় হয়ে গেছে।

লোকটা ঘরের এককোণে লুকিয়ে রইল যাতে ঘরে ঢুকেই কেউ তাকে একনজরে দেখতে না পায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে প্রাতরাশের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

এমন সময় আগন্তুক লোকটি ডাকল, বিল ! বিল তোমার পুরনো বন্ধুকে চিনতে পারছ না ?

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের মুখের বাদামী রংটা উবে গেল। তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল। নাকটা নীল হয়ে উঠল। পরে বলল, কালো কুকুর !

আবার কে ? কত কষ্ট করে বেনবো সরাইখানা খুঁজে বার করে পুরনো বন্ধু বিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কত দিন কেটে গেল। কত কি ঘটল। এই দেখ, আমার হাতের দুটো আঙ্গুল কেটে গেছে।

ক্যাপ্টেন বলল, আমার তো অনেক সর্বনাশ করেছ। এখন কি চাই তা বল।

সেই লোকটি বলল, আগে একপাত্র রাম খাব। তারপর দুজনে বসে হিসাবনিকাশ করব। আগের মত গল্প করব।

আমি একপাত্র রাম এনে টেবিলে রেখে দেখলাম ক্যাপ্টেন আর লোকটা টেবিলের দুদিকে বসে আছে। লোকটা আমাকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে যেতে বলল।

আমি ওদের ছেড়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলাম। ওরা নিচু গলায় কথা বলছিল। ক্রমে শুনলাম ওদের ঘর থেকে চেঁচামেচি হচ্ছে। ক্যাপ্টেন বলল, এই হলো আমার শেষ কথা। আর কোন দরকষাকষি নয়।

এরপর টেবিল চেয়ার ওল্টানোর শব্দ পেলাম। একজন আর্তনাদ করে উঠল। পরে দেখলাম আগন্তুক লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। তার ঘাড় থেকে রক্ত ঝরছে।

ক্যাপ্টেন ছোরা হাতে তাকে তাড়া করছে। সে শেষবারের মত একবার ছোরা চালাল। কিন্তু ছোরাটা আমাদের সরাইখানার সাইনবোর্ডে লেগে যাওয়ায় লোকটা বেঁচে গেল।

লোকটা রাস্তায় নেমে জোরে ছুটতে লাগল। তারপর দূরে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে ক্যাপ্টেন বসার ঘরে ফিরে এসেই আমাকে রাম আনতে বলল।

তার পা টলছিল। সে বসে পড়ল। আপন মনে বলতে লাগল, এখানে আমার আর থাকা চলবে না।

হঠাৎ বসার ঘরে একটা কিছু পড়ে যাওয়ার জোর শব্দ শুনতে পেলাম। ছুটে গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। ক্যাপ্টেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, কিন্তু তার চোখ বন্ধ।

চেঁচামেচি শুনে মা ছুটে এল। ক্যাপ্টেনের অবস্থা দেখে মা খুব ঘাবড়ে গেল। ভাবলাম ক্যাপ্টেন ঠিক মরে যাবে।

কি করব কিছু ভেবে না পেয়ে একটু রাম ঢেলে দিলাম ক্যাপ্টেনের মুখে। কিন্তু তা গেল না ওর মুখে। চোয়ালদুটো লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে।

আমরা যখন হতবুদ্ধি হয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিলাম তখন হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার লিভজি।

ডাক্তার দেখে আমরা প্রাণ ফিরে পেলাম। মা সব কথা ডাক্তারকে বললে ডাক্তার ক্যাপ্টেনের দেহটাকে পরীক্ষা করে বললেন, মরেনি। ওর স্ট্রোক হয়েছে। মিসেস হকিন্স, আপনি উপরে আপনার স্বামীর কাছে যান। আমি দেখছি কি করতে পারি।

ডাক্তারবাবুর আদেশে একটা গামলা এনে কাছে রাখলে তিনি ক্যাপ্টেনের একটা হাতের শিরা কেটে খানিকটা রক্ত বার করে দিলেন। কিছুটা সুস্থ হলো ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঠার চেষ্টা করে বলল, কালো কুকুরটা কোথায়?

ডাক্তার বললেন, এখানে কালো কুকুর নেই। তুমি আছ। আর মদ খেও না। বেশী মদ খেলে এইভাবে মরবে তুমি।

ডাক্তারবাবু ও আমি দুজনে ক্যাপ্টেনকে ধরে বিছানায় তুলে শুইয়ে দিলাম।

ডাক্তারবাবু এবার আমাকে সঙ্গে করে উপরে বাবাকে দেখতে গেলেন।

দুপুরবেলায় ক্যাপ্টেনের জন্য সরবত আর ওষুধ নিয়ে যেতেই ক্যাপ্টেন আমার হাতে একটা গিনি গুঁজে দিয়ে বলল, জিম, আমার জন্য একপাত্র রাম নিয়ে এস। তা না হলে আমি মরে যাব।

আমি বললাম, আমাকে গিনি ঘুষ দিতে হবে না। ডাক্তার মদ দিতে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু মদ না খেয়ে ছাড়বে না সে। কথা কাটাকাটি ও গোলমালের শব্দ বাবার কানে যেতে তাঁর ক্ষতি হবে ভেবে মদ এনে দিয়ে বললাম, মাত্র একপাত্র, আর না।

মদ খেয়ে ক্যাপ্টেন বলল, এবার বলত জিম, ডাক্তার এভাবে আর কতদিন রাখবে আমায় ?

আমি বললাম, এক সপ্তাহ।

ক্যাপ্টেন তখন হতাশ হয়ে বলতে লাগল, ডাক্তার আমার কি সর্বনাশ করল ? এক সপ্তাহ ! সব ফাঁস হয়ে গেছে। ওরা আমায় কালো ছাপ দিয়ে যাবে। পাজী নাবিকগুলো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। অনেক কষ্টে জমানো টাকা আমি হারাতে চাই না। আমার সিন্দুকটার উপর ওদের যত লোভ। আমি একবার উঠতে পারলে আমি ওদের দেখে নেব।

কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল ক্যাপ্টেন। কিন্তু হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ওর পা টলছিল। আমি শুইয়ে দেবার আগেই ও বিছানার উপর পড়ে গেল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল। কথা বলতে পারছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, জিম, তুমি সেই জাহাজী লোকটাকে দেখেছিলে ?

সেই কালো কুকুরটা ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কালো কুকুরটা। ও একটা আস্ত শয়তান। ওকে যারা পাঠিয়েছিল তারা আরো বেশী শয়তান। কোনরকমে আমি যদি কেটে পড়তে না পারি এখান থেকে তাহলে ওরা আমাকে কালো ছাপ দেবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কালো ছাপটা কি ?

ওটা একটা সমন, মৃত্যুর পরোয়ানা। যদি ওরা তা পাঠায় তাহলে সব বলব। কিন্তু সব সময় নজর রাখবে। সেই একপেয়ে মানুষটাকে দেখতে পাও কিনা চেষ্টা করবে। সে-ই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

এর পর আমি তাকে ওষুধ দিলাম আর সে তা খেয়ে নিল। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়তে আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমার বাবা মারা গেলেন। বাবার সৎকার ও সরাইখানা চালু রাখতে আমাকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হত। ক্যাপ্টেনের কথা আর ভাববার সময় পাইনি। বাবার মৃত্যুতে সংসারের সব দায়দায়িত্ব আমার ঘাড়ের উপর চাপল।

যেদিন রাতে বাবার মৃত্যু হয় সেরাতে ইচ্ছামত মদ খেয়ে আবার মাতাল হয়ে ওঠে ক্যাপ্টেন। সেই পুরনো গানটা গাইতে থাকে।

পরদিন সকালে সে নিচে নেমে এসে খায়। তারপর খুব বেশী পরিমাণে

কড়া মদ খায় বলে সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। সিঁড়ি ধরে ধরে ওঠানামা করত। যখনই সে মাতাল হয়ে পড়ত তখনি সে তার ছোরাটা সামনের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখত।

সেদিন বেলা তিনটের সময় আমি সরাইখানার বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। সেদিন দুপুরেও কুয়াশা কাটেনি আর ছিল দারুণ শীত। হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন অন্ধ লোক আমাদের সরাইখানার দিকে লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চিনে এগিয়ে আসছে।

কিছুটা দূরে থেমে সে সামনের অদৃশ্য কাউকে সম্বোধন করে চিৎকার করে বলতে লাগল। সে তার দেশ ইংলণ্ডের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে এমন একজন হতভাগ্য অন্ধকে কোন সহৃদয় ব্যক্তি কি বলে দেবে এটা কোন্ জায়গা ?

আমি বললাম, ব্ল্যাকহিল রোডের এ্যাডমিরাল বেনবোর সামনে দাঁড়িয়ে আছ।

সে বলল, ঠিক আছে, তুমি আমাকে সরাইখানার ভিতরে হাত ধরে নিয়ে যাবে ? শুনতে পাচ্ছি কোন ছেলে কথা বলছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরতেই সে আমার হাতটা সাঁড়াশির মত টিপে ধরল। বলল, আমাকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চল।

আমি বললাম, সে সাহস আমার নেই। সে টেবিলে ছোরা রেখে বসে থাকে সর্বদা।

আমার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটা বলল, যা বলছি করো তা না হলে তোমার ঘাড় মটকে দেব।

অন্ধ লোকটা এমন নিষ্ঠুর হবে তা ভাবতেই পারিনি। বাধ্য হয়ে আমি তাকে বসার ঘরে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে গেলাম। বোম্বেটে ক্যাপ্টেন তখন রাম পান করে নেশার ঘোরে ঝিমোচ্ছিল। অন্ধ লোকটা এমনভাবে আমাকে সামনে রেখে নিজে পিছনে রইল যাতে ক্যাপ্টেন ছুরি চালালে আমার গায়ে লাগে।

অন্ধ লোকটা যা শিখিয়ে দিয়েছিল সেইমত আমি ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে বললাম, বিল, তোমার এক বন্ধু এসেছে।

ক্যাপ্টেন ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু ওঠার শক্তি তার ছিল না। অন্ধ লোকটা বলল, বিল, একেবারে নড়বে না। আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে আসিনি ! তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও।

এই বলে ক্যাপ্টেনের হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে চলে গেল।

ভয়ে সাদা হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের মুখটা। সে হাতের মুঠো খুলে কাগজটা দেখেই চমকে উঠল। বলল, রাত্রি দশটা, এখনো ছ'ঘণ্টা সময় আছে।

এই বলে উঠে দাঁড়াতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন। তার মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ।

৩

ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিলাম। চরম বিপদে পড়ে গেলাম আমরা। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, ক্যাপ্টেনের কাছে যদি সত্যিই কিছু টাকা থাকে তাহলে সেটা আমাদেরই প্রাপ্য, কারণ সরাইখানায় থাকা খাওয়া বাবদ অনেক টাকা পাওনা আছে তার কাছে।

ওদিকে আবার সেই কালো কুকুরটা আর অন্ধ শয়তানটা আবার ফিরে এসে ক্যাপ্টেনের সিন্দুক নিয়ে ঝামেলা করতে পারে। ডাক্তার লিভজিকে খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু মাকে একা রেখে যেতে সাহস পেলাম না আমি। ক্যাপ্টেনের লাসটা পড়ে রইল বসার ঘরে।

তখন কোন উপায় না দেখে মাকে নিয়ে সাহায্যের জন্য পাশের গ্রামে চলে গেলাম। সরাইখানার উল্টোদিকে পাহাড়টার ওধারেই ছিল গ্রামটা। কিন্তু আমাদের সব কথা শুনে কেউ আসতে রাজী হলো না আমাদের সঙ্গে। রাতে বেনবো'কে কেউ পাহারা দিতেও চাইল না। তবে ডাক্তার লিভজিকে খবর দেওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে দিল। গ্রামের লোকেরা ভয়ে ভয়ে বলাবলি করতে লাগল, ঐসব ভিনদেশী নাবিকরা সব চোরাকারবারী, বড় ভয়ঙ্কর লোক, হয়ত ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের দলের লোক।

মা তখন বলল, আমি আবার যাব আমার সরাইখানায়। ক্যাপ্টেনের সিন্দুক খুলে আমার প্রাপ্য টাকা গুণে নেবই। তারপর সরাইখানা ছেড়ে এখানে চলে আসব।

মা আর আমি একটা থলে নিয়ে আবার ভয়ে ভয়ে ফিরে এলাম সরাইখানায়। ক্যাপ্টেনের মৃতদেহটা সেইখানে পড়েছিল বসার ঘরে। ঘড়িতে ছটা বাজল।

মা আমাকে ক্যাপ্টেনের পকেট থেকে সিন্দুকের চাবিটা বার করতে বলল। কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা ছিল ক্যাপ্টেনের গলায় একটা কারের সঙ্গে বাঁধা।

সিন্দুক খুলতেই তার মধ্যে পাওয়া গেল ভাল কাপড়ের একটা স্যুট, তামাক, খাপে ভরা দুটো পিস্তল, একটা রূপোর বাট, একটা পুরনো স্প্যানিশ ঘড়ি, কিছু বিদেশী গয়না, অয়েলক্লথে মোড়া একটা বাণ্ডিল যার মধ্যে ছিল একটা কাগজ আর একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা।

কিন্তু বেশীর ভাগ মুদ্রা স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের। মা ঠিকমত হিসাব করতে পারছিল না। গুনতে দেরি হচ্ছিল। তার মধ্যে গিনি কম ছিল এবং মা গিনির হিসাবই জানত। তার উপর ক্যাপ্টেনের থাকা খাওয়ার হিসাব দেখে টাকা গুনতে দেরি হচ্ছিল।

দেরি হয়ে যাওয়ায় আমার ভয় হতে লাগল। সহসা একবার লাঠির ঠক ঠক আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি। আমার মনে হলো অন্ধ লোকটা আবার আসছে। মনে হলো বন্ধ দরজাটা কে ঠেলছে। তারপর সব চুপচাপ। মনে হলো দরজা বন্ধ দেখে অন্ধটা তার লোকদের ডাকতে গেছে।

আমি ব্যস্তভাবে মাকে বললাম, গোনাগুনি ও হিসাব নিকাশ বন্ধ রেখে চল ব্যাগসুদ্ধ সব টাকা নিয়ে চলে যাই। কানা লোকটা এখনি দলবল নিয়ে এসে পড়বে।

কিন্তু মা আমার হিসাবের বাইরে একটা পয়সা বেশী নেবে না। মা বলল, এখন সাতটা বাজেনি, এখনো সময় আছে।

এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম একটা পাহাড়ের মাথা থেকে কে শিষ দিয়ে ওদের ডাকছে। এবার মাও ভয় পেয়ে গেল। বলল, চল, যা পেয়েছি সব নিয়ে চলে যাই।

অয়েলক্লথে মোড়া বাণ্ডিলটা নিয়ে আমি মার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম। মোমবাতির আলোটা খালি থামটার পাশে জ্বলতে লাগল।

তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে। তবে কুয়াশা থাকার জন্য আমাদের দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল না। কিছুদূর গিয়েই আমরা দেখতে পেলাম দূর থেকে বাতি হাতে কারা আমাদের দিকেই আসছে। তাদের পায়ের শব্দ কানে আসছিল।

মা খুব সাহসী হলেও তখন ভয় পেয়ে গেল। বলল, তুই এই টাকার থলেটা নিয়ে গ্রামে পালিয়ে যা। আমি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাব।

মাকে নিয়ে কোনরকমে এগোতে লাগলাম। শীতে ও ভয়ে মা সত্যিই কাঁপছিল। পথে একটা সাঁকো পেয়ে তার তলায় ঢুকতে গেলাম লুকিয়ে থাকার জন্য। কিন্তু সাঁকোটা খুব ঝুলে থাকায় ঢুকতে পারলাম না, শুধু কিছুটা আড়াল হলো।

কিন্তু ওরা আমাদের সরাইখানায় ঢুকে কি করে না করে তা দেখার একটা প্রবল কৌতূহল হলো আমার। এখান থেকে সরাইখানার পথটা চাঁদের আলোয় বেশ দেখা যাচ্ছিল। আমি তাই মাকে সাঁকোর তলায় রেখে উপরে উঠে এসে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। কারণ সেখান থেকে সরাইখানার সব শব্দ শুনতে পাব।

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম লণ্ঠনের আলো হাতে তিনজন লোক আমাদের সরাইখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে লাঠি হাতে সেই অন্ধ লোকটাও ছিল।

দরজা খোলা ছিল বলে তা আর ভাঙ্গতে হলো না। ওরা সংখ্যায় ছিল সাতজন। পাঁচজন ভিতরে ঢুকল আর দুজন অন্ধ লোকটার সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধ লোকটাই ছিল দলের নেতা।

ভিতরে গিয়ে ভিতর থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, বিলত আগেই শেষ হয়ে গেছে।

অন্ধ লোকটা তখন তাদের গালাগালি করতে করতে বলল, দুজন মড়াটাকে খুঁজে দেখ আর বাকি সবাই গিয়ে সিন্ধুকটা নামিয়ে আন।

সারা বাড়িটা তখন ওদের দাপাদাপিতে কাঁপতে লাগল। উপরে গিয়ে সিন্দুকটা খোলা দেখে একজন চিৎকার করে বলল, শেষ পিউ, সিন্দুক খোলা। কেউ আগেই মালকড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে। আজেবাজে জিনিসগুলো রেখে গেছে।

অন্ধ লোকটার নাম ছিল পিউ। পিউ অধৈর্য হয়ে বলল, ফ্লিন্টের বাণ্ডিলটা আছে কিনা দেখ।

সে বাণ্ডিল কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

অন্ধ পিউ এবার চিৎকার করে উঠল, তাহলে সরাইখানার লোকগুলো সেটা নিয়ে পালিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও আমি দেখে গেছি ওরা দরজা বন্ধ করে ভিতরেই ছিল। চার দিকে খুঁজে দেখ। আগে বাড়িটা ভাল করে খুঁজে দেখে তারপর চারদিকে বেরিয়ে পড়। ওদের খুঁজে বার করতেই হবে।

আমাদের খোঁজার জন্য চারদিকে হৈচৈ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল লোকগুলো।

এমন সময় রাত্রির নিস্তব্ধতার বুক চিরে আবার সেই শিষটা পাহাড়ের দিক থেকে বেজে উঠল। পরপর দুবার সেই শব্দটা শোনা গেল। পিউর

দলের একজন বলল, ঐ শোন, ডার্ক বাঁশি বাজাচ্ছে। আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছে, সামনে বিপদ। সুতরাং কেটে পড়।

ভয় পেয়ে তারা সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। তাতে পিউ ভীষণ রেগে গেল। ডার্কটা ভীতু তোদের মত। তোরা বুঝতে পারছিস না কত টাকা তোদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

এই বলে তাদের গালাগালি করতে করতে হাতের লাঠিটা ঘোরাতে লাগল। কেউ কেউ ওর হাতের লাঠিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তখন তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে তারা পালিয়ে গেল জাহাজ ঘাটের দিকে। ওরা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়েছিল।

শব্দটা আমিও পেয়েছিলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম গ্রামের দিকে যে পাহাড় আছে তার ওপার থেকে চার পাঁচজন অশ্বারোহী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেশ জোরে ছুটে আসছে।

তার সঙ্গীরা তাকে ফেলে যাওয়ায় কাতর কণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল পিউ। তোরা তোদের বন্ধু পিউকে ছেড়ে চলে গেলি।

পথ ভুল করে, এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল পিউ। একবার একটা খানায় পড়ে গেল। উঠে আবার ছোটাছুটি করতে লাগল এলোমেলো-ভাবে। এমন সময় একটা বড় ঘোড়া সামনে ছুটে আসতে আসতে চার পা দিয়ে পিউকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। আরোহী চেষ্টা করেও থামাতে পারল না ঘোড়াটাকে। একবার নড়ে উঠেই নিথর নিস্তব্ধ হয়ে উঠল পিউর দেহটা।

আমি অশ্বারোহী দলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। প্রথমে আমি ওদের দলের একজনকে চিনতে পারলাম। যে ছিল গ্রামের সেই যুবকটি যে ঘোড়ায় চড়ে আমাদের জন্য খবর দিতে গিয়েছিল ডাক্তার লিভজিকে। তারপর দেখলাম সুপারভাইজার ভান্সও রয়েছেন দলে।

ভান্স খবর পেয়ে কিটস হোল-এ চোরাকারবারীদের জাহাজে তদন্ত করতে যাচ্ছিলেন। পথে সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁর দলের লোকদের নিয়ে বেনবো সরাইখানার দিকে ছুটে আসেন।

প্রথমে আমি তাঁদের সাহায্যে মাকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কিছুটা ঠাণ্ডা নুনজল খাইয়ে সুস্থ করে তুললাম।

তারপর ভান্স কিটস হোলে চোরাকারবারীদের ধরতে গেলেন। কিন্তু ওরা তখন জাহাজে উঠে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। জাহাজে উঠে ওরা গুলি করল। একটা বুলেট ভান্সের হাতের পাশ দিয়ে চলে গেল।

মিস্টার ভান্সের সঙ্গে এবার আমি আমাদের সরাইখানায় ফিরে এলাম। দেখলাম সব আসবাবপত্র তছনছ ও ভাঙচুর করে দিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। দেওয়াল ঘড়িটা পর্যন্ত ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।

এরপর ভান্স আমাকে ডাক্তার লিভজির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার তখন বাড়িতে ছিলেন না। তিনি ছিলেন জমিদার বাড়িতে। যাবার আগে গ্রামে গিয়ে মাকে কথাটা জানিয়ে এলাম। আমি একটি ঘোড়ায় একজনের পিছনে চাপলাম।

৪

ডাক্তার লিভজির বাড়ি থেকে জমিদার বাড়ি বেশী দূরে নয়। তাই আমি আর ঘোড়ায় উঠলাম না। আমরা গেটের সামনে গিয়ে পরিচয় দিতে পরিচারক আমাদের লাইব্রেরি ঘরে জমিদার বাবুর কাছে নিয়ে গেল।

চারদিকে বুককেস। বুককেসের মাথায় পণ্ডিতদের আবক্ষ মূর্তি ছিল। ফায়ার প্লেসের দুদিকে ডাক্তার লিভজি ও জমিদারবাবু ট্রেলনি বসে ছিলেন। তাঁদের দুজনেরই মুখে ছিল পাইপ। জমিদার ট্রেলনি ভান্সকে এবং ডাক্তার লিভজি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ভান্স দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা বললেন। ভান্সের সব কথা শুনে ডাক্তার লিভজি ও জমিদার দুজনেই খুশি হলেন।

ডাক্তার লিভজি আমাকে বললেন, ভান্সের সব কথা ভেবে বুঝলাম দুর্বৃত্তগুলো শুধু টাকার জন্য আসেনি, এসেছিল একটা কাগজের বাণ্ডিলের জন্য। সেটা তোমার কাছে আছে?

অয়েলক্লথে মোড়া কাগজের বাণ্ডিলটা তাঁর হাতে দিলাম।

সেটা ভাল করে দেখে ডাক্তারবাবু জমিদারকে বললেন, ভান্স কিছু মদ খেয়ে ওর দরকারী কাজে ফিরে যাক। কিন্তু জিম হকিন্স আজ রাতে এখানেই খেয়ে আমাদের কাছে থেকে যাক।

জমিদার তাতে আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে আমার খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমার খাওয়া হয়ে গেলে ডাক্তার জমিদারকে বললেন, তুমি ফ্লিন্টের নাম শুনেছ?

ফ্লিন্টের নাম ইংলণ্ডের কে না জানে?

ডাক্তার বললেন, আমার মনে হয় ফ্লিন্ট তার ধনভাণ্ডার কোথায় লুকিয়ে

রেখেছে তার একটা হদিশ এই বাণ্ডিলের কাগজগুলোতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে ভাণ্ডারে যা ধনরত্ন আছে তাতে মজুরী পোষাবে ত ?

জমিদার বললেন, পোষাবে মানে ? আমি ত ভাবছি ব্রিস্টলে গিয়ে একটা জাহাজের ব্যবস্থা করে ডকে অপেক্ষা করব। তুমি আর জিম গেলে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে জায়গাটার খোঁজ করে বার করব।

ডাক্তার লিভজি এবার অনুমতি নিয়ে বাণ্ডিলটা খুললেন। সেটা সেলাই করা ছিল। সেলাই কেটে বাণ্ডিল খুলে একটা খাতা আর সীলকরা একটা খাম পাওয়া গেল। খাতাটা হিসাবের খাতা।

লিভজি বললেন, আমি ত এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

জমিদার বললেন, এটা হলো শয়তানদের হিসাবের খাতা। এই কাটা দাগগুলো হলো জাহাজ আর শহর যেগুলো ওরা ডুবিয়েছে বা লুট করেছে। সংখ্যাগুলো হলো শয়তানটার অংশ।

ডাক্তার বললেন, ঠিক বলেছ।

জমিদার বললেন, এবার খাতাখানা দেখা যাক।

ডাক্তারবাবু খুব সাবধানে খামের সীলগুলো খুললেন। সীলগুলো খোলার সঙ্গে সঙ্গে খামের ভিতর একটা দ্বীপের ম্যাপ বেরিয়ে এল। তাতে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, সমুদ্রের খাড়ি, পাহাড়ের নাম, উপসাগর এবং দ্বীপের তীরে কোথায় নিরাপদে জাহাজ ভেড়ানো যাবে প্রভৃতি চিহ্নিত করা আছে। দ্বীপটা লম্বায় প্রায় ন মাইল, চওড়ায় পাঁচ মাইল। দ্বীপের মাঝখানে একটা পাহাড় আছে। নাম স্পাইগ্লাস। লাল কালিতে তিনটে ক্রসচিহ্ন ছিল। দুটো চিহ্ন দ্বীপের উত্তর দিকে আর একটা দক্ষিণ-পশ্চিমে। এক জায়গায় লাল কালিতে স্পষ্ট করে লেখা ছিল, বেশীর ভাগ গুপ্তধন এখানে আছে।

ম্যাপখানা আমার কাছে খুবই সংক্ষিপ্ত বলে মনে হলো। আমি সবকিছু ঠিক বুঝতে না পারলেও ডাক্তার ও জমিদারবাবু খুব আনন্দিত হলেন ম্যাপটা পেয়ে।

জমিদার ট্রেলনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আমি কালই ব্রিস্টল যাব। তিন সপ্তাহ···বা দশদিনের মধ্যেই আমি জাহাজ যোগাড় করব। বাছাবাছা নাবিক থাকবে সে জাহাজে। হকিন্স হবে কেবিনবয়। আর লিভজি, তুমি হবে জাহাজের ডাক্তার। আর আমি হব জাহাজের এ্যাডমিরাল। রেডরুথ, জয়েস আর হান্টারকেও আমরা সঙ্গে নেব। দ্বীপটা তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করব। তারপর টাকা আর টাকা।

সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাব ট্রেলনি। জিমও যাবে। তবে তোমাকে নিয়েই ভয়। তোমার জিবে কোন আঁট নেই। কোন কথা গোপন থাকে না। আজ যারা সরাইখানা আক্রমণ করতে এসেছিল তারা ও আরো অনেকেরই লোভ আছে ওই গুপ্ত ধনের উপর। জাহাজে ওঠার আগে একা আমরা কোথাও যাব না। ব্রিস্টলে তুমি জয়েস আর হাণ্টারকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

ট্রেলনি বললেন হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এবার আমি একটা কথাও বলব না।

৫

তাঁর জায়গায় একজন ডাক্তারের খোঁজে লণ্ডন যেতে হলো ডাক্তার লিভজিকে।

জমিদার ট্রেলনিও ব্রিস্টলে চলে গেলেন জাহাজের খোঁজে। আমি রয়ে গেলাম জমিদারের বাড়িতে শিকারের কাজকর্ম তদারক করতে।

এইভাবে কিছুদিন কাটল। সমুদ্রযাত্রার জন্য মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম আমি। এমন সময় একদিন জমিদারবাবুর একখানা চিঠি এল। চিঠিখানা ডাক্তার লিভজিকে লেখা। তবে ডাক্তার না থাকলে টম রেডরুথ অথবা জিম হকিন্স খুলবে একথা লেখা ছিল খামের উপর। ডাক্তার তখন লণ্ডনে।

রেডরুথ পড়তে পারে না বলে আমিই পড়লাম। জমিদার চিঠিতে লিখেছেন, দুশো টনের একটা জাহাজ কেনা হয়ে গেছে। জাহাজটা এখন নোঙর ফেলে বসেই আছে। নাম হিসপ্যানিওলা।

জাহাজ যোগাড়ের পর উপযুক্ত নাবিক নিয়োগের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ একদিন লং জন সিলভার নামে এক পুরনো নাবিককে পেয়ে গেলাম। সে আমাদের জাহাজে রাঁধুনির কাজ করবে। তার একটা পা নেই। ব্রিস্টলে ওর একটা মদের দোকান আছে। মাঝিমাল্লাদের ও চেনে। ওরই চেষ্টায় প্রায় উনিশ জন লোক নিযুক্ত করলাম আমি।

এরপর উনি ডাক্তারকে অবিলম্বে ব্রিস্টলে যেতে লিখেছেন। আর লিখেছেন জিম তার মার সঙ্গে দেখা করে সোজা এখানে রেডরুথকে নিয়ে চলে আসে।

চিঠিখানা পড়ে আনন্দের এক উত্তেজনায় সমস্ত অন্তর লাফাতে লাগল

আমার। পরদিন সকালেই রেড়রুথকে নিয়ে আমি আমাদের সরাইখানায় বেনবোতে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম, আমাদের সরাইখানাটা জমিদারবাবু ভালভাবে মেরামত করিয়ে দিয়েছেন। সাইনবোর্ডটা নতুন করে লিখিয়ে দিয়েছেন। ভাঙ্গা আসবাবপত্রগুলোও সব মেরামত করিয়ে দিয়েছেন। আমি না থাকলে মার যাতে কোন কষ্ট না হয় তার জন্য নতুন একজন শিক্ষানবিশী ছোকরা নিযুক্ত করে দিয়েছেন জমিদারবাবু।

মাকে সব কথা বুঝিয়ে বললাম। রাত্রিটা কাটিয়ে পরদিন খাওয়ার পর রেডরুথকে সঙ্গে নিয়ে মার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বিকালের ডাকগাড়িটতে চেপে বসলাম আমরা। গাড়িতে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

পরদিন সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখি ব্রিস্টলে এসে গেছি। ডক থেকে কিছু দূরে একটা সরাইখানায় বাসা নিয়েছিলেন লিখে-ছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে সরাইখানা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম আমরা। চমৎকার সাজানো শহর। সমুদ্রের ধার দিয়ে পথ চলছে। খুব ভাল লাগছিল আমার।

সরাইখানায় গিয়ে মিস্টার ট্রেলনির খোঁজ করতেই উনি জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘোর নীল পোশাক পরে এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামানে। মনে হলো তিনি যেন এখনি সমুদ্রে যাবেন। রত্নদ্বীপের সন্ধানে আমি সমুদ্র-যাত্রা করব একথা ভাবতে আনন্দের এক উচ্ছ্বাস অনুভব করছিলাম আমি।

আমি সেই উত্তেজনার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, জমিদারবাবু জহাজ কখন ছাড়বে ?

তিনি উত্তর দিলেন, জাহাজ ছাড়বে কাল।

জমিদারবাবু জন সিলভারের নামে একটা চিঠি নিয়ে আমাকে স্পাইগ্লাস সরাইখানায় পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁর নির্দেশমত ডকের ধার বরাবর হেঁটে যেতে লাগলাম। সরাইখানার সামনে পিতলের দূরবীন আঁকা একটা সাইনবোর্ড ঝোলানো আছে।

সরাইখানায় গিয়ে দেখলাম বেশীর ভাগ খরিদ্দারই নাবিক এবং মাঝি-মাল্লা। ভিতরে ঢুকতে ভয় করছিল আমার। এমন সময় জাহাজের ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই আমার মনে হলো এই লোকটাই জন সিলভার। তার কোমর থেকে একটা পা ছিল না। ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছিল সে। চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ। মাথাটা বেশ বড়। তার খ থেকে সে

সাধু না শয়তান তা বোঝা যাচ্ছিল না। তবে সে যে বেশ বুদ্ধিমান এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল।

আমার হঠাৎ ক্যাপ্টেন বিলের কথাটা মনে পড়ে গেল। মনে হলো এই একপেয়ে মানুষটার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতাম অ্যাডমিরাল বেনবোতে। আমি কালো কুকুর কানা পিউকে দেখেছি। তাদের দেখেই জলদস্যু বলে মনে হত। কিন্তু জন সিলভারকে তা মনে হলো না।

আমি জমিদারবাবুর দেওয়া চিঠিটা জন সিলভারের হাতে দিয়ে দিলাম। চিঠি দেখে সে বলল, তুমিই তাহলে আমাদের জাহাজের কেবিন বয়। তা বেশ বেশ। তোমাকে দেখে আনন্দ পেলাম।

ঠিক এই সময় একটা লোক আমকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি বেশ চিনতে পারলাম সেই লোকটার একটা হাতে দুটো আঙুল ছিল না। বুঝলাম এই লোকটা একদিন আমাদের সরাইখানার ক্যাপ্টেন বিলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এবং তাকে ক্যাপ্টেন কালো কুকুর বলছিল। ক্যাপ্টেন বিলের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে ঘাড়ে ছোরার আঘাত নিয়ে।

আমি চিৎকার করে জন সিলভারকে বললাম, ধর, ও কালো কুকুর।

জন সিলভার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি নামে তার একজন চাকরকে বলল, লোকটাকে আমি চিনি না। ওকে ধরে আন।

তারপর টম মর্গান নামে একটা চাকরকে বলল, এই টম তুই ত লোকটাকে মদ দিচ্ছিলি। তোকে কি কথা বলছিল?

টম ভয়ে ভয়ে বলল, আমরা জাহাজে কয়লা বোঝাইএর দর নিয়ে কথা বলছিলাম।

সিলভার তাকে গালাগালি করতে লাগল। বলল, কালো কুকুর কিনা ওর নাম টাম জানি না। তবে মনে হচ্ছে লোকটাকে আগে দেখেছি। ও এখানে একটা কানা লোককে নিয়ে আসত। কানাটা যেন আস্ত একটা হাঙর।

আমি বললাম, ঠিক বলেছে সেই কানা লোকটার নাম পিউ।

সিলভার বলল, ঠিক বলেছ, পিউ। লোকটাকে ধরতে পারলে অনেক খবর জানা যাবে।

এমন সময় হ্যারি ফিরে এসে জানাল লোকটাকে পাওয়া গেল না।

এর পর মাথায় টুপি পরে জন সিলভার আমার সঙ্গে জমিদার ট্রেলনির সঙ্গে দেখা করতে চলল। ওর সম্বন্ধে আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে

উঠলেও আমি সেটাকে আমল দিলাম না। ডকের ধার দিয়ে যেতে যেতে সিলভার বলল, তোমার সঙ্গে আমার ভাল মিলবে। আমরা দুজনে বেশ কাজ চালিয়ে নেব।

ডকের ধার দিয়ে যাবার সময় সিলভার আমাকে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজগুলোর নাম এবং কোনটা কোন দেশের তার পরিচয় দিতে লাগল। তা শুনতে আমার খুব ভাল লাগছিল।

সরাইখানায় পৌঁছে দেখলাম জমিদার ট্রেলনি আর ডাক্তার লিভজি দুজনে যেন আমাদের অপেক্ষায় বসেছিলেন।

তাঁদের দুজনকে মিনভার তাঁদের কিছুক্ষণ আগে স্পাইগ্লাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাটার কথা সব বলল। শুনে তাঁরা দুজনেই বললেন, লোকটা যখন পালিয়ে গেল তখন কি আর করা যাবে।

এর পর জমিদারবাবু সিলভারকে বলল, আজ বিকাল চারটের সময় যেন সকলে জাহাজে উপস্থিত থাকে।

রাঁধুনি জন সিলভার বলল, ঠিক আছে স্যার।

এই বলে সে ক্রাচে ভর দিয়ে খট খট করে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার লিভজি আবার ট্রেলনিকে বললেন, লোকটা সত্যিই কাজের লোক। তুমি ঠিকই বাছাই করেছ।

মিঃ ট্রেলনি খুশি হয়ে বললেন, আমি লোক চিনি।

ডাক্তার লিভজি বললেন, জিমও আমাদের সঙ্গে জাহাজ দেখতে যাবে।

৬

বিকাল চারটের সময় আমরা নৌকায় করে ডক থেকে একটু দূরে নোঙর করে থাকা আমাদের হিসপ্যানিওলা জাহাজটাকে দেখতে গেলাম। জাহাজের মেট মিঃ এ্যারো আমাদের অভিবাদন জানাল।

দেখলাম এ্যারোর বেশ বয়স হয়েছে। পায়ের রং তামাটে। কানে দুল। চোখ একটু ট্যারা।

আমরা জাহাজে পা দিতেই একজন নাবিক মিঃ ট্রেলনিকে বললেন, ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান।

ক্যাপ্টেন স্মলেটের চেহারাটা বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কিন্তু তাঁকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল কোন কারণে মনে মনে তিনি ক্ষুব্ধ। তিনি অবশ্য তাঁর ক্ষোভের কারণ পরে বুঝিয়ে বললেন।

ক্যাপ্টেন জমিদারবাবুকে বললেন, কিছু মনে করবেন না স্যার, এই সমুদ্রযাত্রা আমার মোটেই পছন্দ নয়। নাবিকগুলোকে আমার ভাল মনে হচ্ছে না। অবশ্য জাহাজটা আমি চালিয়ে না দেখলেও ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

ডাক্তার লিভজি বললেন, ঠিক আছে, এই সমুদ্রযাত্রায় কেন আপনার সাহস হচ্ছে না তার কারণ বলুন।

ক্যাপ্টেন বলতে লাগলেন, আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন। কোথায় কোন পথে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেটা আমার কাজ। কিন্তু জাহাজের প্রত্যেকটি লোক দেখছি আমার থেকে বেশী জানে সব ব্যাপারে। আমি আমাদের নাবিকদের কাছে থেকে শুনেছি আমরা যাচ্ছি গুপ্তধনের সন্ধানে। ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? গুপ্তধনের খোঁজে সমুদ্রযাত্রা আমি পছন্দ করি না। বিশেষ করে সেই গোপন ব্যাপারটা যখন ফাঁস হয়ে যায় সকলের কাছে। আমার বিশ্বাস আপনারা জানেন না কোন অশুভ ঘটনার সম্মুখীন হতে চলেছেন।

ডাক্তার লিভজি বললেন, আপনি হয়ত সব ঠিক বলছেন। কিন্তু আমাদের ঝুঁকি নিতেই হবে। নাবিকদের আপনার পছন্দ হচ্ছে না কেন? তারা কি অভিজ্ঞ নয়?

এদের মোটেই আমি পছন্দ করতে পারছিনা স্যার। নাবিকদের আমার নিজের বেছে নেওয়াই উচিত ছিল।

ডাক্তার লিভজি বললেন, আমার বন্ধুর হয়ত আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল নাবিক নিযুক্ত করার সময়। যাই হোক ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু জাহাজের মেট এ্যারোকে আপনার পছন্দ হয় ত?

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, মোটেই না। লোকটা অভিজ্ঞ বটে, কিন্তু নাবিকদের সঙ্গে বড় বেশী মেলামেশা করে। খোলখুলিভাবে কথা বলে। নাবিকদের সঙ্গে এভাবে মেশা ও মদ্যপান করা জাহাজের অফিসারের পক্ষে মোটেই উচিত নয়।

ডাক্তার লিভজি এবার বললেন, এখন আপনি কি চান তা স্পষ্ট করে বলুন।

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, আপনারা কি একান্তই এই সমুদ্রযাত্রা করতে চান?

হ্যাঁ আমরা দৃঢ়সংকল্প এ বিষয়ে।

ভাল কথা। তবে আমার আরও কয়েকটা কথা ধৈর্য ধরে শুনুন। কেবিনের নিচে একটা ভাল জায়গা থাকতে ওরা খোলের সামনে অস্ত্র ও বারুদগুলো তুলছে কেন? তাছাড়া আপনাদের যে চারজন লোক সঙ্গে যাচ্ছে তাদের কেবিনের পাশের বার্থগুলোকে না রেখে সামনের দিকের বার্থে রাখা হবে কেন?

ট্রেলনি বললেন, আর কিছু বলার আছে?

আর মাত্র একটা কথা। আপনাদের কাছে একটা দ্বীপের মানচিত্র আছে। তাতে এই দ্বীপের অবস্থান এবং তার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার উল্লেখ আছে। সেই দ্বীপের কোথায় গুপ্তধন আছে তা মানচিত্রের উপর কাটা দাগ দিয়ে দেখানো আছে। এই জাহাজে এমন এক লোক আছে যে এই সব কথাগুলি বলে বেড়িয়েছে।

মিঃ ট্রেলনি বললেন, আমি একথা বলিনি।

যেই বলুক যা হবার হয়ে গেছে! এখন শুধু কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে বলব আপনাদের। না হলে আমাকে পদত্যাগ করতে হবে বাধ্য হয়ে। আর মানচিত্রের কথাটা বা দ্বীপের কথাটা কাউকে বলবেন না। এমন কি আমাকেও না।

ক্যাপ্টেনের সব কথা ধৈর্য ধরে শুনে তাকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিলেন ডাক্তার লিভজি। ঠিক হলো ক্যাপ্টেন তার মনের মত করে জাহাজটাকে গুছিয়ে নেবে।

ক্যাপ্টেনের ব্যবস্থাটা আমার ভালই লাগল।

নাবিকরা যখন ক্যাপ্টেনের কথায় অস্ত্রশস্ত্র তুলছিল জাহাজের উপর তখন জন সিলভার এসে নাবিকদের বলল, এ কি করছ?

নাবিকদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। আমরা বললাম, অস্ত্র ও বারুদ রাখার জায়গা বদলাচ্ছি।

লং জন সিলভার চিৎকার করে উঠল, তাহলে যে সকালের জোয়ার শেষ হয়ে যাবে।

ক্যাপ্টেন স্মলেট তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলেন, আমার হুকুম। তুমি নিচের রান্নাঘরে যাও। খাবারের ব্যবস্থা করগে।

এর পর আমাকেও রাঁধুনির কাছে যেতে বললেন ক্যাপ্টেন।

লং জন সিলভার সঙ্গে সঙ্গে নিচে চলে গেল। আমিও চলে গেলাম। ক্যাপ্টেনের উপর এবার আমিও বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

৭

প্রায় সারারাত ধরে মাল বোঝাই ও মালপত্র গুছিয়ে রাখার পর দারুণ ক্লান্ত হয়ে শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ভোরে জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল। এই সময়টা আমার খুব ভাল লাগছিল।

হঠাৎ নাবিকরা গান গাইতে শুরু করল। দেখলাম গানটা আমার চেনা। ক্যাপ্টেন বিল মদ খেয়ে নেশার ঘোরে গাইত।

মরা মানুষের সিন্দুকে পনেরটা লোক
হো হো হো রামের বোতল।

এই কোরাস গানের মধ্যে আমি ক্যাপ্টেন বিলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মুহূর্তে আমার মনটা চলে গেল আমাদের সরাইখানা এ্যাডমিরাল বেনবোতে।

যাই হোক, আমাদের হিসপ্যানিওলা জাহাজটা এগিয়ে যেতে লাগল বদ্বীপের সন্ধানে।

দিনকতকের মধ্যেই দেখা গেল ক্যাপ্টেন স্মলেটের কথাই ঠিক। জাহাজের মেট এ্যারো লোকটা সত্যিই খারাপ। প্রায়ই মদ খায়। মুখ চোখ ফোলা ফোলা থাকে। ক্যাপ্টেন তাকে অপমান করলেও তার চৈতন্য হত না। এক একবার সারাটা দিন শুয়েই কাটিয়ে দিত।

অথচ কোথা থেকে এত মদ পেত কেউ জানত না। একদিন এ্যারোকে জাহাজের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কেউ আশ্চর্যও হলো না। কারণ সবাই ধরে নিল নেশার ঘোরে হয়ত রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জলে পড়ে গেছে।

একজন মেট ছাড়া জাহাজ চলতে পারে না। এ্যারোর অবর্তমানে নাবিকদের ফোরম্যান জর্জ এ্যাণ্ডারসন মেটের কাজ করতে লাগল। জমিদার ট্রেলনির সমুদ্রযাত্রায় প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকায় তিনিও মাঝে মাঝে দূরবীণ হাতে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করতেন। এ ছাড়া কক্সায়েন ইজরেল হ্যাণ্ডস্‌ও অভিজ্ঞ নাবিক ছিল। সিলভারের সঙ্গে হ্যাণ্ডস্‌-এর খুব ভাব ছিল।

রাঁধুনি হিসাবে সত্যিই দক্ষ ছিল সিলভার। জাহাজের সবাই তাকে 'বারবিকিউ' বলে ডাকত। কথাটার মানে হলো ঝলসানো রোস্ট। ক্রাচটাকে জাহাজের কোন একটা পার্টিশানে ঠেসিয়ে রেখে দুটো হাত খালি রেখে দিত। চওড়া ফাঁকা জায়গাগুলোতে সে মাথার উপর কতকগুলো দড়ির ফাঁস ঝুলিয়ে রাখত। সেইগুলো হাত দিয়ে ধরে ধরে ডেকের একধার থেকে অন্য ধারে অনায়াসে যাতায়াত করত। এমন কি জাহাজটা যখন ঝড়ের সময় খুব

দুলত তখনও এইভাবে যাওয়া আসা করত সহজে যাতে তার একটা পা নেই বলে বোঝাই যেত না।

হ্যাণ্ডস আমাকে বলত, সিলভার মোটেই সাধারণ লোক নয়। ছোটবেলায় সে স্কুলে ভালভাবে পড়াশুনো করেছে। ইচ্ছা করলে সে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলতে পারে। তাছাড়া সে খুব সাহসী। একবার ও চারটে লোকের সঙ্গে মারামারি করে সবাইকে হারিয়ে দেয়। তাদের সবাইকে ও মারে, কিন্তু ওর গায়ে কেউ আঁচড় দিতে পারেনি।

সকলের সঙ্গে কথা বলার একটা বিশেষ ধরন ছিল তার। মাঝিমাল্লা ও নাবিকরা তাকে সম্মান করত। অনেকের সে উপকার করত। আমার সঙ্গে সে সব সময় ভাল ব্যবহার করত এবং আমাকে দেখে সে খুশি হত। তার একটা টিয়াপাখি ছিল। পাখিটাকে সে এককোণে একটা খাঁচায় রাখত। এক এক সময় পাখিটা তার ঘাড়ের উপর বসে থাকত। টিয়াপাখিটাকে সে ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট বলে ডাকত।

পাখিটা প্রায়ই 'আটমোহর' 'আটমোহর' করে চেঁচাত। আমি কথাটার মানে বুঝতে পারতাম না। সিলভার একদিন আমায় কথাটা ভেঙ্গে বুঝিয়ে দেয়।

সিলভার একদিন আমায় বলল, এই পাখিটার বয়স দুশো বছর। ও জীবনে কত দেশ যে সমুদ্রপথে গেছে, কত জাহাজডুবী দেখেছে, কত পাপকাজ আর শয়তানির সাক্ষী হয়েছে তার শেষ নেই। যে সব আমেরিকান জাহাজগুলো স্পেনে রূপোর মুদ্রা নিয়ে যেত তার কয়েকটা যখন ডুবে যায় তখন ও সেখানে ছিল। সেইখানেই ও আটমোহর কথাটা শেখে। তার মানে সাড়ে তিনলাখ আটমোহর ওর চোখের সামনে ডুবে যায়। তাই আটমোহর কথাটা ভুলতে পারেনি। যখন গোয়া থেকে ভারতের বড়লাট সমুদ্রযাত্রা করেন ও তখন সে জাহাজেই ছিল। অথচ দেখলে মনে হবে ও কিছুই জানে না—একেবারে বোকা।

সিলভার পকেট থেকে একটু চিনি বার করে পাখিটাকে খাওয়ালেই ও খাঁচার শিকে ঠোক্কর মারতে মারতে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করত। সিলভার তখন পাখিটার কপালের উপর ঝুলে থাকা চুলের গুচ্ছটাকে ছুঁয়ে আদর করে বলত, এই সব গালাগালির ও কি আর মানে জানে?

এদিকে জমিদারের উপর থেকে ক্যাপ্টেন স্মলেটের রাগটা তখনো যায় নি। তিনি প্রয়োজনের বেশী একটা কথাও বলতেন না জমিদারের সঙ্গে।

এক এক সময় তিনি বলতেন, নাবিকদের ব্যাপারে হয়ত তিনি ভুল বুঝেছিলেন, কারণ বেশীর ভাগই দক্ষ এবং ভাল। জাহাজটাও ভাল। তবু তিনি বলতেন, এই সমুদ্রযাত্রাটা তাঁর ভাল লাগছে না। জমিদারবাবুও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কোন কথা বলতেন না

কয়েকবার আমরা ঝড়ের মুখে পড়লাম। কিন্তু আমাদের জাহাজের কোন ক্ষতি হলো না। বরং জাহাজটা কত ভাল তাই প্রমাণিত হলো। জাহাজের নাবিকগুলোও বেশ সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করে যেত। তাদের ব্যবহার ভালই ছিল। যে কোন অজুহাত দেখিয়ে অবাধে মদ্যপান করতে পেত তারা। তাদের কারো জন্মদিনের কথা শুনলে কেকের ব্যবস্থা করতেন জমিদারবাবু। এ ছাড়া সব সময় একটা পিপেতে আপেল ভরা থাকত। ইচ্ছামত যে কেউ আপেল নিয়ে খেতে পারত।

ক্যাপ্টেন ডাক্তার লিভজিকে প্রায়ই বলতেন. নাবিকদের এত আস্কারা দেওয়া ভাল নয়। এতে তাদের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু আপেলের পিপে থেকে আমাদের একটা উপকার হয়েছিল। পিপেটা না থাকলে যথাসময়ে সতর্ক হতে পারতাম না আমরা। বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী নাবিকদের হাতে মরতে হত আমাদের।

অনুকূল হাওয়া পেয়ে জাহাজটা দ্রুত এগিয়ে চলেছিল দ্বীপের দিকে। হিসাব মত দিনটা ছিল আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন। সেদিন অথবা বড় জোর পরদিন আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার কথা।

সেদিন সূর্য অস্ত যাবার কিছু পরে আমি আমার সব কাজ শেষ করে বার্থে যাবার সময় একটা আপেল খাবার ইচ্ছা হতে আমি ডেকে চলে গেলাম। ওয়াচের প্রহরীরা তখন জাহাজের সামনের দিকে দ্বীপ দেখতে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিল। হালে বসা নাবিকটি পালের দিকে তাকিয়ে শিষ দিচ্ছিল।

পিপেটার মধ্যে নেমে পড়ে দেখলাম, মাত্র কয়েকটা আপেল রয়েছে। পিপের মধ্যে ঢুকে গরমে একটা আপেল খাওয়ার পর জাহাজের দুলুনিতে, কিছুটা আরাম আবার কিছুটা ক্লান্তিতে ঘুম নেমে এল আমার চোখে।

হঠাৎ ভারী চেহারার একটা লোক পিপের বাইরে তার গা ঘেষে বসতেই তার ধাক্কায় আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। আমি লাফিয়ে উঠতে যাব এমন সময় লোকটার কথা শুনে বুঝলাম লং জন সিলভার। তার দুচারটে কথা শুনেই বুঝতে পারলাম সে একটা গোপন বিষয় আলোচনা করছে তার সঙ্গীদের সঙ্গে। এখন আমার বেরোন মোটেই উচিত হবে না

সিলভার বলল, আমি না, তখন ফ্লিন্ট ছিল ক্যাপ্টেন। তখন আমি ছিলাম কোয়ার্টার মাষ্টার এবং আমার তখন পা ছিল। সেইবারেই আমার পাটাকে বাদ দিতে হয় আর পিউ তার চোখ হারায়। আমি প্রথম সমুদ্রযাত্রায় গিয়েছিলাম ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং তারপর যাই ফ্লিন্টের সঙ্গে। এবার এসেছি নিজের স্বার্থে। আমি ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে পেয়েছিলাম নশো আর ফ্লিন্ট ঘরে যাবার পর পেয়েছিলাম দু হাজার পাউণ্ড। সব নিরাপদে ব্যাঙ্কে জমা আছে। একজন সাধারণ মাল্লা আর কি করতে পারে? শুধু রোজগার করলেই হয় না, টাকা বাঁচাতে জানা চাই। ফ্লিন্টের লোকদের বেশীর ভাগ এই জাহাজেই আছে। কিন্তু কাজ না পেলে রুটির জন্য ভিক্ষে করে বেড়াতে হত। বেঁচে গেছে কাজ পেয়ে। একমাত্র বুড়ো কানা পিউ বছরে বারোশো পাউণ্ড খরচ করে লর্ডদের মত থাকত। এখন অবশ্য বেঁচে নেই। তবে শেষ দুবছর ওর দারুণ কষ্টে কেটেছে। প্রায় উপোস করে থাকতে হত। লোকের গলা কাটত, চুরি করত, ভিক্ষে করত।

একটা অল্পবয়সী নাবিক বলল, এ সব টাকা থাকে না।

কেন থাকবে না? যারা বোকা তাদেরই থাকবে না। তোর এখন বয়স কম। আমার কথা শুনে চলবি। সমুদ্রযাত্রার এই সব লোকদের পকেটে শত শত পাউণ্ড আসে। কিন্তু তারপর রাম খেয়ে ফুর্তি করে সব খরচ করে ফেলে অল্প দিনের মধ্যে। আমার বয়স এখন পঞ্চাশ। এবার আমি সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে ভদ্রলোকের মত জীবন কাটাব। অবশ্য এতদিন আমি আরামেই ছিলাম। অথচ অতীতে একদিন জীবন শুরু করেছিলাম মাস্তুলের নিচে একজন সাধারণ মাল্লা হিসাবে।

শিষ দিয়ে আর একজন এসে সিলভারকে বলল, দিক, ঠিক আছে।

হ্যাণ্ডস বলল, একটা জিনিস আমি জানতে চাই, এভাবে আর কদিন চলবে? এই ক্যাপ্টেন স্মলেট লোকটাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি কেবিনে থাকতে চাই।

সিলভার বিজ্ঞের মত বলল, তোর মাথায় বুদ্ধি নেই, কিন্তু দুটো কান আছে। আমার কথা শুনবি। জাহাজের সামনের দিকে যেখানে থাকতে বলবে সেখানেই থাকবি। চড়া গলায় কথা বলবি না। মদ খাবি না।

কিন্তু আমি বলছি আর ক'দিন। কবে হবে আসল কাজটা?

তা যদি বলিস ত আমি বলব শেষ মুহূর্তে। যখন সময় থাকবে না। ক্যাপ্টেন স্মলেট খুব বুদ্ধিমান লোক। জমিদার আর ডাক্তারের কাছে আছে

ম্যাপ। তা কোথায় আমরা কেউ জানি না। আমি বলি কি ওরা ধনরত্ন খুঁজে বার করে জাহাজে এনে তুলুক। তারপর জাহাজ ছেড়ে দিক। অর্ধেক পথ ফিরিয়ে নিয়ে গেলে শেষে আঘাত হানব। কিন্তু তোদের আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। তোরা মানুষের কাছ থেকে কাজ গুছিয়ে নিতে পারিস না। মনে রাখিস আমরা জাহাজ চালাতে পারি, কিন্তু চার্ট ম্যাপ দেখে পথ নির্দেশ করতে পারি না। তোরা ত কিছু শিখবি না। শুধু মদ খাবি আর ফাঁসিকাঠে ঝুলবি। যাই হোক, ঠিক করেছি ধনরত্ন নিয়ে দ্বীপ থেকে জাহাজে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপেই ওদের খতম করে দেব।

ডিক বলল, আমরা যখন ওদের বন্দী করব তখন ওদের কি করব ?

এই ত হলো কাজের কথা। ক্যাপ্টেন ইংলণ্ড বন্দীদের কোথাও নামিয়ে দিত। কিন্তু ফ্লিন্ট ও ক্যাপ্টেন বিলি বোনস কেটে টুকরো টুকরো করত বন্দী-দের। আমি সোজা মানুষ। আমি চাই ওদের মৃত্যু। তাই বলছি অপেক্ষা কর। সময় এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব।

হ্যাণ্ডস বলল. আমি শুধু একটা লোককে চাই। সে হলো ট্রেলনি। ওর মাথাটাকে আমি দুহাতে করে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাই।

এমন সময় সিলভার ডিককে বলল, একটা আপেল এনে দে ত। অনেক-ক্ষণ কথা বলে গলাটা শুকিয়ে গেছে।

কথাটা শুনে ভয়ে চমকে উঠলাম আমি। আমি এবার তাহলে ধরা পড়ে যাব। কিন্তু ডিক আপেল আনার জন্য উঠতেই হ্যাণ্ডস সিলভারকে বলল. আপেল আনতে হবে না। মদ আনাও দেখি।

সিলভার বলল, ঠিক আছে, একমাত্রা করে আনবি। মদের পিপের গায়ে মাপ লেখা আছে আমার।

ডিক ফিরে এলে ওরা মদ খেতে লাগল। তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদের আলো এসে পড়ছিল পিপের মধ্যে। হঠাৎ কারা চিৎকার করে উঠল, সামনে ডাঙ্গা।

৮

ডেকের উপর যখন সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল ব্যস্ত হয়ে আমি তখন চকিতে লাফ দিয়ে পিপের বাইরে চলে এলাম খোলা ডেকে। সবাই ছুটছে জাহাজের সামনের দিকে।

চাঁদ উঠতে কুয়াশা সরে গেছে। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখলাম

দুটো পাহাড় পরস্পরের কাছ থেকে মাইলখানেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পিছনে আর একটা উঁচু পাহাড়। তিনটে পাহাড়ই ছিল পিরামিডের মত তিনকোনা খাড়া।

আমি তখন কিছুই দেখছিলাম না সেই ভয়ের ঘোরে। কতক্ষণে কথাটা জানাতে পারব জমিদার আর ডাক্তারকে সেই কথাই ভাবছিলাম।

ক্যাপ্টেন এবার সব নাবিকদের ডেকে বললেন, তোমাদের কেউ এর আগে সামনের দ্বীপটা দেখেছ ?

জন সিলভার বলল, আমি দেখেছি স্যার। আমি একবার একটা জাহাজে রাঁধুনি ছিলাম। সেই জাহাজটা জল নিতে নেমেছিল ঐ দ্বীপে। নাবিকরা ওটাকে বলত কঙ্কাল দ্বীপ।

ক্যাপ্টেন একটা চার্ট বার করে বললেন, দেখ ত এটা সেই জায়গা কিনা। আমার মনে হয় জাহাজ নোঙর করার জায়গা মিলবে দক্ষিণে।

সিলভার ভেবেছিল ঐটাই আসল ম্যাপ। কিন্তু দেখল ওটা নকল, একেবারে নতুন কাগজে আঁকা। তাই সে হতাশ হলো।

কিন্তু সে হতাশাকে চেপে রেখে সিলভার বলল, হ্যাঁ স্যার, এটাই সেই জায়গা। চার্টটা খুব সুন্দর করে আঁকা। একটা শক্তিশালী জলস্রোত দক্ষিণ উপকূল ঘেঁষে গিয়ে উত্তর পশ্চিম উপকূলের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। আপনি ঠিক বলেছেন স্যার, এই স্রোতের ভিতরে ঢুকে জাহাজটাকে আড়াআড়িভাবে রাখতে হবে।

ক্যাপ্টেন এবার সিলভারকে বিদায় দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ। তোমাকে পরে দরকার হতে পারে।

সিলভার যখন ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ফিরে আসছিল তখন তার সঙ্গে দেখা হতেই আমার পিঠ চাপড়ে বলল, বড় সুন্দর জায়গা এই দ্বীপটা। তুমি সেখানে আশ মিটিয়ে স্নান করতে পারবে, গাছে চড়তে পারবে, বুনো ছাগল শিকার করতে পারবে, পাহাড়ে চড়তে পারবে। তোমাদের মত কমবয়সী ছেলেদের কাছে খুব ভাল লাগবে জায়গাটা।

এই বলে পিঠ চাপড়ে চলে গেল সিলভার। তার নিষ্ঠুরতা ও ভণ্ডামির জন্য তার প্রতি একই সঙ্গে ভয় আর ঘৃণা জাগল আমার মনে।

এরপর আমি ডাক্তারবাবুর খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম কোয়ার্টার ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন স্মলেট, ডাক্তারবাবু আর জমিদারবাবু কথা

বলছেন। আমি কাছে যেতে ডাক্তারবাবু নিচে থেকে তাঁর ফেলে আসা পাইপটা আনতে বললেন।

আমি পাইপটা এনে ডাক্তার লিভজিকে পাশে ডেকে বললাম, একটা সাংঘাতিক খবর দেবার আছে। আপনি জমিদারবাবু আর ক্যাপ্টেনকে নিয়ে কেবিনে গিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হলো ডাক্তার আমার কথাটা ক্যাপ্টেন ও জমিদারকে শুনিয়ে দিয়েছেন। ক্যাপ্টেন ডেকের উপর সব নাবিক ও মাঝিমাল্লাদের ডেকে তাদের বললেন, এই যে দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে তারই উদ্দেশ্যে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। তোমরা সকলেই ভালভাবে কাজ করেছ! তবে যে ভদ্রলোকের জন্য আমাদের এই যাত্রা সম্ভব ও সফল হলো তার উদ্দেশ্যে তোমরা একটা নাবিক সুলভ হর্ষধ্বনি দেবে।

সকলেই মিঃ ট্রেলনির নামে হর্ষধ্বনি করল। সিলভারের আদেশে তারা ক্যাপ্টেন স্মলেটের নামেও আবার হর্ষধ্বনি করল।

এরপর কেবিনে গিয়ে ডাক্তার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি পিপের ভিতরে থেকে যা যা শুনেছিলাম সব বললাম। আমার মত তাঁরাও এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে যারা একটু আগে তাঁদের নামে হর্ষধ্বনি দিল তারাই তাঁদের গলা কাটার জন্য ঘোর ষড়যন্ত্র করছে তলায় তলায়।

ডাক্তার আমাকে তাঁর পাশে একটা চেয়ারে বসিয়ে কিসমিস আর কিছু মদ দিলেন। আমার সাহস ও বিশ্বস্ততার জন্য তাঁরা আমাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আবার মদ্যপান করলেন।

জমিদার ট্রেলনি বললেন, ক্যাপ্টেন আপনি ঠিক বলেছিলেন, আমিই ভুল করেছি। আমার বোকামি স্বীকার করছি। এবার কি করতে হবে বলুন।

ক্যাপ্টেন বললেন, আমিও কম বোকা নই। ওরা সত্যিই আমায় বোকা বানিয়েছে। সাধারণতঃ যে সব নাবিকরা বিদ্রোহ করে তারা আচার আচরণের মধ্য দিয়ে তাদের বিদ্রোহের একটা আভাস দেয় আগে থেকে। ফলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার সময় পাওয়া যায়। কিন্তু ওদের অভিসন্ধির কথা মোটেই বুঝতে দেয়নি আমাদের।

একটু থেমে ক্যাপ্টেন আবার বললেন, যাই হোক, এখন কাজের কথায় আসা হোক। আমার প্রথম কথা হচ্ছে সব কিছু সত্ত্বেও আমাদের এখন এগিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন ফেরার আদেশ দিলেই ওরা এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর। দ্বিতীয় কথা

হলো, আমাদের হাতে কিছুটা সময় দরকার অন্ততঃ যতদিন গুপ্তধন পাওয়া না যায়। তৃতীয় কথা হলো, কিছু লোক আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত আছে। এখন আমাদের সাবধানে এগোতে হবে যাতে আমরাই আক্রমণ করতে পারি প্রথমে। মিঃ ট্রেলনি, আপনার বাড়ির দুজন ভৃত্যের উপর নির্ভর করতে পারা যাবে ত ?

মিঃ ট্রেনলি বললেন, আমার উপর যতখানি নির্ভর করতে পারেন ততখানিই পারেন।

ক্যাপ্টেন বললেন, হকিন্সকে ধরে আমরা মোট সাতজন। দুর্বৃত্তরা মোট উনিশ জন।

ডাক্তার বললেন, ট্রেলনি নিজে যাদের বাছাই করে নিযুক্ত করে তারাও সিলভারের খপ্পরে পড়ে গেছে।

মিঃ ট্রেলনি বললেন, যেমন হ্যাণ্ডসকে আমি বেছে নিয়েছিলাম।

ক্যাপ্টেন বললেন, আমিও ভেবেছিলাম ও বিশ্বাসী। কিন্তু এখন দেখছি তার উল্টো। যাই হোক, এখন আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করে যেতে হবে।

ডাক্তার বললেন, হকিন্স আমাদের অনেকটা সাহায্য করতে পারে। ওর দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ এবং নাবিকদের সঙ্গে প্রাণখোলাভাবে মেশে।

জমিদার বললেন, হকিন্স, তোমার উপর আমার গভীর বিশ্বাস।

আমার কিন্তু তখন সত্যিই ভয় করছিল।

৯

পরদিন সকাল হতেই দেখলাম দ্বীপের কাছে অনেকটা এগিয়ে গেছে আমাদের জাহাজটা। দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রায় আধমাইল দূরে শান্ত জলের উপর থেমে রয়েছে।

দেখলাম গোটা দ্বীপ ধূসর রঙের বনে ঢাকা। মাঝে মাঝে এক একটা পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে তিনটে পাহাড়ের আকৃতি বড় অদ্ভুত। তার মধ্যে আবার স্পাইগ্লাসটা সব থেকে উঁচু। প্রায় তিন চারশো ফুট।

তখন জোয়ারের ঢেউয়ে আমাদের জাহাজ হিসপ্যানিওলা দুলছিল। জাহাজটার সর্বাঙ্গ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে মোচড় দিয়ে উঠছিল।

আমার মনটা তখন সত্যিই ভেঙ্গে পড়েছে একেবারে। তখন রত্নদ্বীপের কথাটা ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছিল মনে।

এরপর জাহাজটাকে খাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। সারেঙের পাশে দাঁড়িয়ে জন সিলভার জাহাজ পরিচালনা করতে লাগল, কারণ এখানকার পথ সে চেনে। জায়গাটা তিন দিকে ডাঙ্গা দিয়ে ঘেরা। বনটা নেমে এসেছে জলের কাছ পর্যন্ত। প্রায় আধ মাইল দূরে বেলাভূমি। এর পর নৌকো নামিয়ে যেতে হবে সেখানে।

পোতাশ্রয়ের উপর ভিজে পাতা, পচা পাতা ও পচা গাছের গুঁড়ির একটা বিশ্রী গন্ধ আসছিল। ডাক্তারবাবু নাক তুলে বাতাস শুঁকে বললেন, এ দ্বীপে গুপ্তধন আছে কিনা জানি না, তবে এখানকার বাতাসে জ্বরের জীবাণু আছে।

নৌকোর কাজ শেষ করে নাবিকরা নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল। ডেকের এখানে ওখানে জটলা করতে লাগল। বিদ্রোহের কালো মেঘ ক্রমশ ঘনিয়ে আসতে দেখে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

আমরা কেবিনে বৈঠকে বসলাম। ক্যাপ্টেন বললেন, স্যার, নাবিকরা আমার সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করছে ঠিক, কিন্তু এখন যদি আমি কড়া কথা বলি, বা কড়া আদেশ দিই, তাহলে ওরা উত্তেজনায় ফেটে পড়বে। তাহলে সিলভার বুঝতে পারবে এর মধ্যে রহস্য আছে এবং তার ফন্দী আমরা জেনে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। এখন সিলভারের উপর কিছুটা নির্ভর করতে হবে। সেও আমাদের মত উত্তেজনাটাকে জাগিয়ে রাখতে উৎসুক। আমি বলি সে সুযোগ ওকে দেওয়া হোক। বিকালে সবাইকে তীরে নামার অনুমতি দেওয়া হোক। যদি ওরা সকলেই যায় তাহলে জাহাজের দখল নিয়ে আমরা লড়াই করব। যদি কেউ না যায়, তাহলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে কেবিন রক্ষা করার চেষ্টা করব। আর যদি কয়েকজন মাত্র যায় সিলভার প্রত্যেককে বুঝিয়ে আবার জাহাজে ফিরিয়ে আনবে।

ক্যাপ্টেনের কথামত আমাদের পক্ষের মাঝি মাল্লাদের প্রত্যেককে গুলিভরা পিস্তল দেওয়া হলো। হান্টার, জয়েস ও রেডরুথকে সব কিছু খুলে বলা হলো।

এরপর ক্যাপ্টেন সবাইকে ডেকে বললেন, আজ সারাদিন গরমে দারুণ খাটুনি গেছে। নৌকোগুলো জলেই আছে। তোমরা যতজন খুশি তীরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করতে পার। সূর্য অস্ত যাবার আধঘণ্টা আগে আমি একটা গুলি ছুঁড়ব। আওয়াজ শুনলেই ফিরে আসবে।

ঘোষণাটা শুনেই সকলে খুশি হয়ে ক্যাপ্টেনের জয়ধ্বনি করল।

কথাগুলো বলেই ক্যাপ্টেন সরে গেলেন সেখান থেকে। নাবিকদের বোঝাবার সুযোগ দেওয়া হলো সিলভারকে।

যাই হোক, অবশেষে তীরে যাওয়ার জন্য একটা দল প্রস্তুত হলো। ওরা ঠিক করল ওদের দলের ছজন জাহাজে থাকবে এবং বাকি তের জন সিলভারের সঙ্গে দ্বীপে যাবে। আমাদের দলের সকলেই জাহাজে রয়ে গেল।

এই সময় আমার মাথায় একটা পাগলামি জাগল। আমি ঠিক করলাম আমিও ওদের সঙ্গে তীরে যাব। আমি ভাবলাম ছটা লোক জাহাজে থাকলে জাহাজ দখল করা যাবে না। আমি থেকেও কিছু করতে পারব না।

সিলভার ও তার দলের লোকেরা দুটো নৌকোয় করে রওনা হলো। আমি বিদ্যুৎ বেগে জাহাজ থেকে নেমে একটা নৌকোয় চেপে বসলাম। নৌকো তীরবেগে এগিয়ে চলল কূলের দিকে।

আমাদের নৌকোটা আগে তীরে গিয়ে পৌঁছল। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা নুয়ে পড়া গাছের ডাল ধরে ঝুলে দোল খেয়ে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে গিয়ে পড়লাম। তখন সিলভার ও সঙ্গীদের নৌকোটা আমাদের একশো গজ পিছনে পড়ে ছিল।

সিলভার আমার নাম ধরে বারকতক ডাকল। কিন্তু আমি সাড়া না দিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে ছুটে দূরে চলে গেলাম।

উইলো, বাবলা আর অদ্ভুত ধরনের কত গাছ আর পাহাড়। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কত রকমের সাপ। র‍্যাটলস্নেক নামে একটা ভয়ঙ্কর সাপ আমাকে একসময় তেড়ে এল পাথরের ফাঁক থেকে বেরিয়ে। চিরহরিৎ লম্বা ওকগাছ-গুলোর জঙ্গলটা একটা উঁচু জমি থেকে ক্রমশঃ নেমে এসেছে জঙ্গলটা। যেখানে শেষ হয়েছে তার পাশ দিয়ে একটা নদী এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে একটা পোতাশ্রয়ের দিকে।

হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে দুটো মানুষের কণ্ঠস্বর এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। পরে বুঝতে পারলাম একটা কণ্ঠস্বর সিলভারের।

আমি তখন ভাবতাম দুঃসাহসে ভর করে আমার কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে যখন দ্বীপে এসে পড়েছি, যখন এতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি তখন ওদের গোপন কথাবার্তা লুকিয়ে শোনা উচিত যতদূর সম্ভব।

তাই আমি অতি সন্তর্পণে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা জলার ধারে ঘাসে ঢাকা একফালি জমির উপর লং জন সিলভার আর একজন নাবিক দাঁড়িয়ে রাগের সঙ্গে কথা বলছে।

সিলভার তার মাথা থেকে টুপিটা ঘাসের উপর ফেলে দিয়ে তার পাশের নাবিকটাকে বলল, শোন টম, তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। তোমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যই আমি এত কথা বলছি।

কিন্তু টম সিলভারের কথা শুনতে রাজী হলো না। উল্টে তার প্রতিবাদ করল।

এমন সময় কিছু দূরে আরও দুজনের ক্রুদ্ধ চাৎকার শোনা গেল। তারপর একজন ভীষণ জোরে আর্তনাদ করে উঠল।

টম সিলভারকে জিজ্ঞাসা করল, ও কার আর্তনাদ ?

সিলভার বলল, আনানের।

টম চিৎকার করে বলল, আনান ! ঈশ্বর তার মত সৎ নাবিকের আত্মার শান্তি দিন। তোমরা আনানকে খুন করেছ। যদি পারো, আমাকেও খুন করো। কিন্তু তোমার কোন কথা শুনতে রাজী নই।

এই কথা বলে টম সোজা হাঁটতে লাগল। সিলভার রাগে গর্জন করতে করতে একটা গাছের ডাল ধরে ফেলল। পরমুহূর্তেই সে তার ক্রাচটাকে টেনে বর্শার মত করে টমের দিকে ছুঁড়ে মারল। ক্রাচের ডগাটা টমের দুটো কাঁধের মাঝখানে শিরদাঁড়ার উপর সজোরে লাগতেই জোর আঘাত পেয়ে পড়ে গেল টম। মনে হলো তার শিরদাঁড়াটা ভেঙ্গে গেছে।

সামলে ওঠার সময় পেল না টম। সিলভার এক পা নিয়ে অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল টমের উপর। তার ছোরাটা বার করে পর পর আমূল বসিয়ে দিল টমের বুকে।

আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল। সব কিছু ওলট পালট হয়ে যেতে লাগল।

সিলভার নির্বিকারভাবে তার রক্তমাখা ছোরাটা ঘাসের উপর ঘষে নিয়ে পকেটে ভরে নিল। তারপর ক্রাচটা তুলে বগলে নিয়ে ঠিক হয়ে পকেট থেকে বাঁশি বার করে বাজিয়ে তার সঙ্গীদের কি সঙ্কেত করল কে জানে।

আমি সাবধানে ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে লাগলাম। ওরা দুজন সৎ নাবিককে খুন করেছে। আমাকে দেখতে পেলেও তারা খুন করতে আসবে। আমি ভাবলাম আমি এ দ্বীপে এসে ভুল করেছি। আমি ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেললাম। আমি বুঝলাম আমার মৃত্যু নিশ্চিত। দুর্বৃত্তদের হাতে না মরলেও এই জনমানবশূন্য দ্বীপে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

১০

আমি ছুটতে ছুটতে একটা ছোট পাহাড়ের ধারে এসে পড়লাম। হঠাৎ পাহাড়ের গা থেকে একরাশ নুড়ি গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। সেদিকে চোখ ফিরিয়ে আমি তাকিয়ে দেখলাম একটা মানুষের মত মূর্তি উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে পাইন গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সেই লোমশ মূর্তিটা কোন মানুষ না পশুর তা বুঝতে পারলাম না।

এরপর আমি ভাল করে দেখলাম জন্তু নয় মানুষই বটে। তবে রুক্ষ চুল দাড়িওয়ালা মানুষটা বন্য আদিবাসী।

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো আমার কাছে একটা পিস্তল আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত ভয় চলে গেল। আমি এবার নির্ভয়ে দ্বীপের বন্য মানুষটার দিকে এগিয়ে চললাম। মানুষটাও আমায় এতক্ষণ গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিল।

আমি তার কাছে গেলে সে বেরিয়ে এসে আমার সামনে নতজানু হলো প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

আমি বললাম, তুমি কে ?

সে বলল, আমি হতভাগ্য বেলগান। আমি তিন বছর এই দ্বীপে একা আছি। কোন সভ্য মানুষের দেখা পাইনি।

দেখলাম লোকটা সরল প্রকৃতির। তার মুখখানা কালো আর গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। তার পরনে ছিল জাহাজের ত্রিপল আর পালের কাপড়।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি জাহাজডুবি হয়েছিল ?

না, আমাকে ছেড়ে রেখে যাওয়া হয়েছিল। আমাকে একটুখানি পানীয় খাওয়াতে পার ? কতদিন খাইনি।

যদি আমি জাহাজে উঠতে পারি তাহলে বাটি ভর্তি পানীয় খাওয়াব।

কিন্তু তোমাকে আটকাচ্ছে কে ?

এরপর আমার নাম জিজ্ঞাসা করল বেলগান।

বেলগান এবার বলতে লাগল তার অতীত জীবনের কথা। আমার মা খুব ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন। ছোটবেলায় আমিও খুব ভদ্র ও ধার্মিক ছিলাম। বাইবেল মুখস্থ বলতে পারতাম। কিন্তু তার ফল এই নির্বাসন। কিন্তু তুমি দেখে নিও জিম, আমি আবার খুব ভাল হয়ে উঠব।

সে হঠাৎ একসময় আমার মুখের কাছে তার মুখটা এনে ফিস ফিস করে

বলল, আমি এখন ধনী লোক। আমি তোমাকেও ধনী করে দিতে পারি। তোমার ভাগ্য ভাল যে আমার সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হলো।

তার কথা শুনে আমার মনে হলো লোকটা এই মারা দ্বীপে একা দীর্ঘদিন থেকে থেকে পাগল হয়ে গেছে।

এবার বেলগান বলল, আচ্ছা বল ত জিম, জাহাজটা ফ্লিন্টের নয় ত ?

আমি বললাম, না, ফ্লিন্টের জাহাজ নয়। সে মরে গেছে। তবে তার কিছু লোক আছে আমাদের জাহাজে। তাই আমাদের এই দুরবস্থা।

বেলগান বলল, একপেয়ে সেই লোকটা নেই ত ?

আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তার নাম সিলভার ত ?

হ্যাঁ তাই বটে।

সে জাহাজের রাঁধুনি, আবার তার দলের নেতা।

সে বলল, লং জন তোমায় পাঠায়নি ত ? তাহলে আমার সব শেষ। এখন থাকবে কোথায় তুমি ?

আমি তখন আমাদের সমুদ্রযাত্রার কারণ থেকে শুরু করে সব বিবরণ দান করলাম।

কিন্তু মন দিয়ে শুনে বেলগান বলল, একমাত্র বেলগানই তোমাদের বাঁচাতে পারে। তোমরা তাহলে সত্যিই খুব বেকায়দায় পড়েছে। আচ্ছা তোমাদের জমিদারবাবু ত বেশ ভাল লোক। তিনি অন্তত আমাকে হাজার পাউণ্ড ছেড়ে দেবেন ত ? তাহলেই আমার চলে যাবে। সব ধনই এখন আমার।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই তোমাকে তা দেবেন। আগে থেকেই কথা ছিল মাঝি মল্লারাও সব সমান ভাগ পাবে। তাছাড়া দুর্বৃত্তদের জাহাজ থেকে তাড়াতে পারলে জাহাজ চালিয়ে দেশে ফেরার জন্যও ত তোমার দরকার হবে।

কথাটা শুনে আশ্বস্ত হলো বেলগান।

বেলগান এবার বলতে লাগল, ফ্লিন্ট যেবার এই দ্বীপে এসে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখে সেবার আমি ছিলাম তার জাহাজে। জাহাজটার নাম ছিল সিন্ধুঘোটক বা সমুদ্রের ঘোড়া। ফ্লিন্টের সঙ্গে ছিল ছজন শক্ত সমর্থ নাবিক। তারা সাতজনে এক সপ্তা এই দ্বীপে ছিল। কিন্তু সাতদিন পর সে নৌকো নিয় একা ফিরে যায় জাহাজে। বাকি ছজনকে সে এই দ্বীপে খুন করে কবর দিয়ে যায়। তার মাথায় সেদিন জড়ানো ছিল এক নীল স্কার্ফ। ওরকম শক্তিশালী

দুজন লোককে সে একা কি করে খুন করল তা ভেবে পেলাম না আমরা কিছুতেই।

ফ্লিন্টের সেই জাহাজের মেট ছিল তখন বিলি বোনস। লং জন সিলভার ছিল কোয়ার্টার মাস্টার।

ওরা দুজন ফ্লিন্টকে জিজ্ঞাসা করল, গুপ্তধন কোথায়?

ফ্লিন্ট বলল, তোমরা চাও ত দ্বীপে নেমে গিয়ে থাকতে পার। এই জাহাজে আমি এখন আরো আরও ধনরত্ন বোঝাই করব।

এরপর আজ থেকে বছর তিনেক আগে অন্য জাহাজে করে একবার এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তখন নাবিকদের একজোট করে বললাম, এই দ্বীপে ফ্লিন্টের গুপ্তধন আছে। চল আমরা সেখান থেকে সে ধন খুঁজে বার করি।

ক্যাপ্টেনের কথা অমান্য করে জোর করে জাহাজ থামিয়ে সব নাবিকরা মিলে নেমে পড়লাম এই দ্বীপে। বারো দিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও সে গুপ্তধন পেলাম মা। তখন তের দিনের দিন অন্য সব নাবিকরা আমাকে একটা বন্দুক একটা কোদাল আর একটা শাবল দিয়ে এই দ্বীপে একা ফেলে রেখে চলে গেল। সেই থেকে আমি এখানেই পড়ে আছি।

আমি বললাম, তা ত সব বুঝলাম। এখন প্রথম কথা হলো, আমি জাহাজে উঠব কি করে?

বেলগান বলল, আমার একটা নৌকো আছে। আমি নিজের হাতে সে নৌকো তৈরি করেছি। ওই পাথরের নিচে লুকিয়ে রেখেছি সেটাকে।

ঠিক সেই সময় কামানের গোলা দাগার এক প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, মনে হয় ওরা লড়াই শুরু করে দিয়েছে।

আমি তখন সব ভয় ভুলে পোতাশ্রয়ের দিকে ছুটতে লাগলাম। সেই অদ্ভুত পোশাক পরে আমার পিছু পিছু বেলগানও ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে কত কথা বলতে লাগল সে। সে একবার বলল, ঐ যে কবরের মত ঢিবিগুলো দেখতে পাচ্ছ কোন কোন দিনকে রবিবার ভেবে আমি ঐখানে এসে বসে বসে প্রার্থনা করি। অথচ আমার একটা বাইবেল পর্যন্ত নেই।

কামান দাগার অনেক পরে এক ঝাঁক গুলির শব্দ হলো। তারপর সব চুপ হয়ে গেল। হঠাৎ দেখলাম একটা ছোট জঙ্গলের মাথায় আমাদের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে।

১১

সিলভার যখন তুটো নৌকোয় করে তেরজন নাবিককে নিয়ে দ্বীপে যায় তখন ডাক্তার লিভজি, জমিদার ট্রেলনি ও ক্যাপ্টেন কেবিনের মধ্যে বসে ছিলেন। তাঁরা তখন ভাবছিলেন হাওয়া অনুকূল থাকলে তাঁরা তখনি তুজন বিদ্রোহী নাবিককে ঘায়েল করে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবেন।

কিন্তু তখন মোটেই হাওয়া অনুকূল ছিল না। তারপর একজনের কাছ থেকে খবর পান হকিন্স নৌকোয় করে বিদ্রোহী নাবিকদের সঙ্গে দ্বীপে চলে গেছে। আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে ভয় পেয়ে যান তাঁরা। আমাকে আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে একথা ভাবতেই পারেননি তাঁরা।

সিলভার তার দলবল নিয়ে কখন কি করে তার জন্য অনির্দিষ্ট কাল ধরে অপেক্ষা করাটা তখন যন্ত্রনাদায়ক হয়ে উঠল তাঁদের কাছে।

তখন তাঁরা ঠিক করলেন ডাক্তার লিভজি আর হাণ্টার একটা নৌকোয় করে দ্বীপে গিয়ে দেখে আসবেন ব্যাপারটা।

হাণ্টারকে নিয়ে একটা নৌকোয় গিয়ে উঠে দ্বীপের দিকে রওনা হলেন লিভজি। তীরে নেমে ম্যাপে দেখানো খুঁটির বেড়া দেওয়া একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন ডাক্তার। তীরে ওঠার সময় তাঁরা দেখলেন সিলভারেরা যে তুটো নৌকো এনেছিল তাতে তুজন নাবিককে পাহারাদার রেখে গেছে।

ডাক্তার একবার ভাবলেন ওরা যদি সিলভারকে খবরটা দেয় তাহলে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠবে। কিন্তু ওরা গেল না। ওরা জাহাজের দিকে তাকিয়ে আগের মত গান গাইতে লাগল।

তীরের কাছে একটা বাঁক ছিল। হাণ্টার নৌকো চালিয়ে আড়ালে চলে গেল। তীরে উঠে তাঁরা দেখলেন দারুণ গরম। গরম হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটা করে সিল্কের রুমাল লাগিয়ে নিলেন টুপির নিচে। তাঁদের তুজনের হাতেই ছিল একটা করে গুলিভরা পিস্তল।

কিছু দূর যেতেই একটা টিবি দেখতে পেলেন ডাক্তার লিভজি। টিবির মাথা থেকে নেমে এসেছে পরিষ্কার জলের একটা ঝর্ণা। ঝর্ণাটার পাশে চারদিকে শক্ত মজবুত কাঠের বেড়া দেওয়া কাঠের বাড়িটা মস্ত বড়; তাতে চল্লিশ জন লোক ভালভাবে থাকতে পারে। বাড়িটার চারদিকেই আছে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। তারপর বেড়া। বাড়ির চারদিকের দেওয়ালে

অনেক ফুটো আছে যাতে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে গুলি করা যায়। বেড়াটা ছফুট উঁচু। বাড়ির ভিতরে খাবার আর অস্ত্রশস্ত্র থাকলে বাড়িটা দুর্ভেদ্য দুর্গের মত কাজ করবে। তাছাড়া আছে ভাল পানীয় জলের প্রাচুর্য। আমাদের জাহাজের কেবিনে যথেষ্ট খাবার ও অস্ত্রশস্ত্র থাকলেও তাতে জলের ব্যবস্থা নেই।

ডাক্তার যখন এই সব কথা ভাবছিলেন তখন হঠাৎ এক ভয়াবহ আর্তনাদ শুনতে পেলেন তিনি। ডাক্তার নিজে একদিন যুদ্ধ করেছেন। তবু এই আর্তনাদ শুনে তাঁর হৃৎস্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম হলো। জিম হকিন্সের জন্য চিন্তা হলো তাঁর মনে।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ছুটে বেলাভূমিতে গিয়ে নৌকোয় চড়ে বসলেন। হাণ্টার খুব ভাল দাঁড় বাইতে পারত। জলি বোট তীর বেগে হিসপ্যানিওলায় ফিরে গেল।

তীর থেকে আসা আর্তনাদের শব্দ পেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন জমিদার ট্রেলনি। দু'জন নাবিকের মধ্যে একজন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে বললেন ডাক্তার। তারপর দুজনে আলোচনা করে তিন চারটে গুলিভরা বন্দুক দিয়ে রেডরুথকে কেবিন ও ফোকসলের মাঝখানের গ্যালারীতে বসিয়ে দিলেন। হাণ্টার নৌকোটাকে জাহাজের কাছে সরিয়ে আনলে তাতে বারুদের টিন, বিস্কুটের থলি, মাংসের পাত্র, এক পিপো কনিয়াক মদ ও ওষুধের বাক্স বোঝাই করা হলো।

ক্যাপ্টেন ও জমিদার ডেকের উপর ছিলেন। ক্যাপ্টেন এবার হ্যাণ্ডসকে বললেন, আমাদের হাতে গুলিভরা পিস্তল। তোমাদের একজন যদি তীরের দিকে তাকিয়ে কাউকে ডাক বা ইশারা করো তাহলে মরবে সঙ্গে সঙ্গে।

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে ওরা চমকে উঠল। নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা করে ছুটে নেমে গ্যালারীর দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখল গ্যালারী আটকে রেডরুথ বসে আছে বন্দুক হাতে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে নোকোতে লাফিয়ে চেপে বসল সকলে, সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছেড়ে দিল। এবার তীরের কাছে নামার সময় জাহাজের ডেক থেকে কামান দাগছিল বিদ্রোহী নাবিকরা। তীরের স্রোত বেশী থাকায় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমাদের নৌকোটা উল্টে গেল। আমাদের অনেক জিনিসপত্র জলে পড়ে গেল। কয়েকটা বন্দুক ও বারুদ জলে ভিজে গেল। নৌকোতে ছিলেন ডাক্তার, ক্যাপ্টেন, জমিদার, জয়েস, রেডরুথ আর গ্রে।

তীরে নেমেই কাঠের বাড়িটার দিকে হাঁটতে লাগল সকলে। বাড়িটা পাহারা দেবার জন্য আগেই লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কাঠের বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই, কয়েক জনের জুতো পরা পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন ডাক্তার।

ডাক্তার দেখলেন, এখন দুবৃত্তদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। তাই তিনি ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, আমাদের মধ্যে ট্রেলনি সবচেয়ে ভাল বন্দুক ছুঁড়তে পারেন। তাই আপনার বন্দুকটা ওঁকে দিন।

এই বলে গ্রেকে তাঁর নিজের তলোয়ারটা দিলেন। গ্রে সেটা ঘোরাতে লাগল।

বেড়ার দক্ষিণ দিকে গিয়ে তাঁরা দাঁড়াতেই দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে সাতজন বিদ্রোহী নাবিক চিৎকার করতে করতে তাঁদের দিকে ছুটে এল। তাদের সবার আগে ছিল জন এ্যাণ্ডারসন।

তাদের লক্ষ্য করে ডাক্তার, জমিদার ট্রেলনি গুলি চালালেন। বাড়ির ভিতর থেকে প্রহরারত জয়েস আর হান্টারও গুলি চালাল। বিদ্রোহীদের একজন গুলি লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। তার বুক ফুঁড়ে একটা গুলি চলে গেছে। এই দেখে বাকি নাবিকরা ছুটে পালিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ক্যাপ্টেনরা যখন নিজেদের সাফল্যে নানাভাবে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন তখন হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে একটা পিস্তলের গুলির আওয়াজ হলো। পরক্ষণেই টম রেডরুথ আচমকা আছড়ে পড়ল মাটিতে। তখন ডাক্তার ও জমিদার দুজনেই ঝোপটা লক্ষ্য করে বন্দুক থেকে গুলি চালালেন। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না।

বিদ্রোহীরা তখন সবাই পালিয়েছিল। বৃদ্ধ রেডরুথকে কাঁধে করে বেড়ার ওপরে কাঠের বাড়ির সীমানার ভিতর ফাঁকা উঠোনটার নিয়ে যাওয়া হলো। সে তখনো বেঁচে ছিল। তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। সে যন্ত্রনায় আর্তনাদ করছিল। পরীক্ষা করে ডাক্তার দেখলেন তার জীবনের আর কোন আশা নেই।

জমিদার ট্রেলনির অনুগত ভৃত্য ছিল টম রেডরুথ। জমিদার ট্রেলনি তার হাত দুটো ধরেই বললেন, টম, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

টম বলল, আমেন।

আর কোন কথা বলতে পারল না টম রেডরুথ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মারা গেল সে।

এই সময় ডাক্তার তাঁর জামার মধ্য থেকে বার করলেন দুটো ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা, একটা বাইবেল এক গোছা মোটা দড়ি, কলম, কালি, জাহাজের নোটবুক, খানিকটা তামাক। হান্টারের সাহায্যে বাড়ির ছাদে উঠে একটা জাতীয় পতাকা ছাদের উপর উড়িয়ে দিলেন। তারপর আর একটা জাতীয় পতাকা রেডরুথের মৃতদেহের উপর বিছিয়ে দিলেন সম্ভ্রমের সঙ্গে। ইউনিয়ন জ্যাক উড়তে লাগল।

ক্যাপ্টেন জমিদারকে জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের সঙ্গীরা ইংলণ্ড থেকে কত দিনের মধ্যে এসে পৌঁছবে বলে মনে করেন ?
জমিদার বললেন, আগস্ট মাসের মধ্যে আমরা ফিরে না গেলে আমার বন্ধু ব্ল্যাণ্ডলি আমাদের খুঁজতে জাহাজ পাঠাবে।

ক্যাপ্টেন বললেন, আমাদের কিছু জিনিসপত্র সেদিন জলে পড়ে গেছে বলে আমাদের খাবারে কম পড়ে যাবে। গুলি বারুদ অবশ্য প্রচুর আছে।

এমন সময় একটা কামানের গোলা এসে ছাদের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পাশের বনটাতে গিয়ে পড়ল। এর পর আর একটা গোলা বাড়ির সামনে এসে পড়ল। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু কোন ক্ষতি হলো না।

জমিদারকে একবার ক্যাপ্টেন বললেন, আমার মনে হচ্ছে জাহাজ থেকে ওরা আমাদের বাড়িটা দেখতে না পেয়ে ছাদের উপর টাঙ্গানো জাতীয় পতাকা লক্ষ্য করে কামান দাগছে।

ক্যাপ্টেন কিন্তু জাতীয় পতাকা নামাতে রাজী হলেন না। তাছাড়া তিনি ভাবলেন পতাকা উড়িয়ে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ শত্রুরা তাহলে ভাববে তাদের কামান দাগাতে মোটেই ভয় পাচ্ছি না।

রেডরুথকে উঠোনের একধারে কবর দেওয়া ঠিক হলো। তারপর ক্যাপ্টেন তাঁর নোটবুকে লিখতে লাগলেন, আলেকজাণ্ডার স্মলেট ক্যাপ্টেন ; ডেভিড লিভজি জাহাজের ডাক্তার ; জন ট্রেলনি জাহাজের মালিক ; আব্রাহাম গ্রে-ছুতোরের সহকারী ; জন হান্টার ও রিচার্ড জয়েস মালিকের ভৃত্য। জাহাজের লোকজনের মধ্যে এরাই এখনো বিশ্বস্ত আছে। দশ দিনের মত খাবার নিয়ে আজ তীরে এসে উঠেছি। রত্নদ্বীপের অন্তর্গত কাঠের বাড়িতে আমাদের জাতীয় পতাকা উড়িয়েছি। মালিকের ভৃত্য টমাস রেডরুথ বিদ্রোহী নাবিকদের গুলিতে নিহত। জেমস হকিন্স কেবিন বয়—

হঠাৎ দ্বীপের ডাঙ্গার দিক থেকে 'ডাক্তারবাবু, জমিদারবাবু, ক্যাপ্টেন' বলে কে ডাকতে লাগল।

হাণ্টার তখন পাহারায় ছিল। সে বলল, আমাদের নাম ধরে কে ডাকছে। ডাক্তার লিভজি বেরিয়ে এসে দেখলেন জিম হকিন্স তখন অক্ষত দেহে বেড়া টপকে ভিতরে ঢুকছে।

১২

মাঝখানে দিনকতকের জন্য জিম হকিন্স ছিল না। এবার থেকে সে-ই শুরু করবে কাহিনীর বর্ণনা।

এই কাঠের বাড়ির ছাদে ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেলগান বলে ওঠে, এইখানেই তোমার বন্ধুরা আছে।

কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওখানে বিদ্রোহীরাই আছে। বেলগান বলল, তাহলে ওরা জলদস্যুদের পতাকা 'জলি রজার' ওড়াত। বাড়িটা ফ্লিণ্ট বানিয়েছিল একদিন। ফ্লিণ্ট একমাত্র ভদ্রবেশী শয়তান সিলভার ছাড়া আর কাউকে ভয় পেত না।

তারপর আমি বেলগানকে আমার সঙ্গে যেতে বললে সে গেল না। সে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদের জমিদার সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে দেখছি বা তাঁর কাছ থেকে কথা পাচ্ছি ততক্ষণ আমি রামের লোভ দেখালেও যাব না।

কথা বলতে বলতে প্রায়ই আমাকে একটা চিমটি কাটত বেলগান। এটা তার স্বভাব।

অবশেষে আমি বললাম, বুঝেছি তুমি ডাক্তার কিম্বা জমিদার কাে সঙ্গে কথা বলতে চাও এবং তোমার সঙ্গে দেখা করতে হলে আমাদের যেখানে প্রথম দেখা হয় সেইখানে যেতে হবে।

বেলগান বলল, সময়টাও বলে দিও। দুপুর থেকে ছটার মধ্যে। আর সিলভারের সঙ্গে তোমার যদি দেখা হয় তাহলে আমার সঙ্গে যেন বিশ্বাসঘাতকতা করো না। ভয় দেখালেও পেট থেকে কথা বের করবে না।

বেলগানের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পূব দিকে কিছুটা ঘুরে সমুদ্রের দিকে চলে গেলাম। তখন প্রায়ই কামানের এক একটা গোলা এসে সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছিল। সমুদ্রের বাতাসে গাছের মর্মরধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠছিল। তখন জল দূরে সরে গেছে বেলাভূমি থেকে। দেখলাম হিসপ্যানিওলা যেখানে ছিল সেখানেই নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাস্তুলে উড়ছে জলদস্যুদের কালো পতাকা 'জলি রজার'।

বেলাভূমি থেকে দূরে নদীর মোহনার কাছে গাছের ফাঁক দিয়ে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড দেখা যাচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর আমি খুঁটির বেড়া দেওয়া কাঠের বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম। বাড়ির বাইরে আমার লোকদের ডেকে বেড়া টপকে ভিতরে ঢুকলাম। তারপর আমার অভিজ্ঞতার কথা সব খুলে বললাম।

বাড়ির ভিতর ও চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম আমি। পতাকা ঢাকা দেওয়া রেডরুথের মৃতদেহটা তখনো পড়ে ছিল। গ্রে নামে এক নাবিক বিদ্রোহীদের কাছে আসার সময় গালে ছোরার আঘাত পায়। তার মুখে তখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল।

ক্যাপ্টেন স্মলেট আমাদের পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। একটা দলে রইলাম আমি, গ্রে আর ডাক্তার। আর একটা দলে রইলেন, জমিদার ট্রেলনি, জয়েস ও হাণ্টার। আমরা সবাই ক্লান্ত ছিলাম। তবু দুজনকে জ্বালানি কাঠ আনতে পাঠানো হলো। আর দুজন মৃতের জন্য কবর খুঁড়তে লাগল।

রাতে খাওয়ার আগেই বুড়ো টমাস রেডরুথকে কবর দিলাম আমরা। খাওয়ার পর ব্রাণ্ডি খেতে খেতে আমাদের তিন প্রধান আমাদের অভিযানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

আমাদের খাবারের পরিমাণ কমে আসছে ক্রমশঃ। সাহায্য আসতে অনেক দেরী এখনো। অবশ্য বিদ্রোহীদের সংখ্যা উনিশ থেকে পনেরোতে কমে এসেছে। তাও দুজন আহত।

ডাক্তার বললেন, ওরা যে জলাভূমির ধারে তাঁবু খাটিয়েছে সেখানকার হাওয়া এত খারাপ যে সপ্তাহখানেকের মধ্যে ওদের শয্যাশায়ী হতে হবে। সঙ্গে ওষুধও নেই।

ক্লান্তির চাপে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম গভীরভাবে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার পরেই বাইরে কয়েকজন লোকের শব্দ শুনতে পেলাম। কে বলল শান্তির পতাকা হাতে সিলভার আসছে।

তাকিয়ে দেখলাম খুঁটির বেড়ার ওপারে একজন লোককে সঙ্গে করে একটা পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে সিলভার।

ক্যাপ্টেন তাদের লক্ষ্য করে বললেন, কে যায়? দাঁড়াও। তা না হলে গুলি করব।

সিলভার বলল, শান্তির পতাকা।

ক্যাপ্টেন বলল, ডাক্তার লিভজি, আপনি উত্তর দিকটায় থাকুন, জিম

পূবে যাও। গ্রে পশ্চিমে। নিচে যারা পাহারায় আছ সবাই বন্দুকে গুলি ভরে তৈরি থাক।

এর পর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিদ্রোহীদের বললেন, কি চাও তোমরা?

সিলভার বলল, ক্যাপ্টেন সিলভার আপনাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চায়।

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, আমি তাকে চিনি না।

সিলভার বলল, আপনারা জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে আসার পর এরা আমায় ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করেছে।

স্মলেট বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না। তোমার দরকার হলে ভিতরে আসতে পার। আমাদের তরফ থেকে কোন বিশ্বাসঘাতকতা হবে না।

সিলভার বাড়ির ভিতর এলে ক্যাপ্টেনের পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে আমি দেখলাম ঝকঝকে পিতলের বোতাম লাগানো হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা নীল কোট পরে এসেছে সিলভার, মাথায় লেসবসানো দামী টুপি।

ক্যাপ্টেনের সামনে এসেই একটা স্যালুট দিল সিলভার। তারপর বলল, আমরা গুপ্তধন চাই—এই আমাদের শেষ কথা। আপনারা যদি শুধু প্রাণে বাঁচতে চান তো তা আপনাদের দেওয়া হবে। তবে আপনাদের যে একটা চার্ট বা ম্যাপ আছে তা আমাদের দিতে হবে।

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, তোমাদের চার্ট দেওয়ার পরিবর্তে তোমাদের সুদ্ধ গোটা দ্বীপটাকে উড়িয়ে দেব।

সিলভার ঠাণ্ডা মাথায় বলল, চার্টটা আমাদের দিন যাতে গুপ্তধনটা পাই। গরীব নাবিকদের উপর গুলি চালানো বন্ধ করুন। গুপ্তধন জাহাজে তোলা হয়ে গেলে আপনারা জাহাজে গিয়ে উঠতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের কোন নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দেব। আর যদি তা না চান তাহলে এখানেই থাকতে পারেন। আমরা যে জাহাজ দেখতে পাব তাকে আপনাদের উদ্ধারের জন্য পাঠিয়ে দেব।

ক্যাপ্টেন স্মলেট অধৈর্য হয়ে বললেন, তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে। আপনি আমার প্রস্তাব না মানলে আমাকে আবার দেখতে পাবেন। পাবেন বন্দুকের গুলি।

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, তোমরা গুপ্তধন পাবে না। জাহাজ চালাতেও পারবে না। তোমাদের মধ্যে একজনও নেই যে চার্ট দেখে জাহাজ চালাতে

পারে। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা। এবার তোমার দেখা পেলে তোমার পিঠ বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব আমি।

একজনের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল সিলভার। তারপর বলল, এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের এই কাঠের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেব।

এই বলে শান্তির পতাকা হাতে চলে গেল সিলভার। তার সঙ্গী অতি-কষ্টে তাকে বেড়ার ওপারে নিয়ে গেল।

সিলভার চলে গেলে ক্যাপ্টেনের আদেশে আবার আমরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, সিলভার যা বলে গেল তাতে ও ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে আক্রমণ করবে। আমরা লড়াই করব আড়াল থেকে।

আমরা সংখ্যায় ছিলাম মোট সাত জন। আমাদের বন্দুক ছিল মোট কুড়িটা। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দুটো করে চারটে ফোকর আর উত্তর দিকের দেওয়ালে ছিল পাঁচটা ফোকর। টেবিলের উপর চারটে করে গুলিভরা বন্দুক সাজিয়ে রাখা হলো।

মিঃ ট্রেলনি ভাল বন্দুক চালাতে পারেন বলে তাঁকে রাখা হলো উত্তর দিকে। সেখানে পাঁচটা ফোকর আছে বলে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। হাণ্টার পূব দিকে আর জয়েস পশ্চিম দিকে রইল। ডাক্তার রইলেন দরজায় নজর রাখার জন্য। আমি ও ক্যাপ্টেন দুজনে বন্দুকে গুলি ভরব।

গাছপালার মাথার উপরে সূর্য উঠতেই রোদ এসে পড়ল ফাঁকা জায়গাটায়। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বড় একঘেঁয়ে লাগছিল।

এই সময় হঠাৎ আক্রমণের শব্দ পেয়ে জয়েস প্রথমে গুলি চালাল। তখন বেড়ার চারপাশে থেকে কয়েকটা গুলি এসে দেওয়ালে লাগল। তার-পরই সব চুপ হয়ে গেল।

ওদের গুলি ছোঁড়ার ভাব দেখে আমরা বুঝতে পারলাম আসলে ওরা আক্রমণ করবে উত্তর দিক থেকে। অন্য দিকে গুলি করে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চায় শুধু।

এমন সময় হঠাৎ উত্তর দিকের জঙ্গল থেকে একজন বিদ্রোহী নাবিক বেড়ার দিকে ছুটে আসতে লাগল। বনের দিক থেকে গুলি আসতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে। একটা রাইফেলের গুলি এসে ডাক্তারের বন্দুকে লাগায় সেটা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল।

ওরা যখন বেড়ায় উঠছিল তখন জমিদার ও গ্রের বন্দুকের গুলিতে ওদের

তিন জন পড়ে গেল। একজন বেড়ার ভেতরে ও অন্য দুজনে বেড়ার বাইরে পড়ল। তাদের অন্য একজন বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

এ ছাড়া চারজন আমাদের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে। সাত আটজন বাইরে বন থেকে গুলি ছুঁড়ে চলেছিল। যে চারজন বাড়ির ভিতর ঢুকে ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে ছুটে আসছিল তাদের লক্ষ্য করে আমরা গুলি ছুঁড়লেও তাদের কারো গায়ে লাগল না। তারা সোজা ছুটে এল।

তাদের একজন হাণ্টারের বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে তার মাথায় এমনভাবে মারল যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। একজন তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাক্তারের উপর।

ক্যাপ্টেন ফাঁকা জায়গায় লড়াই করতে বললেন। ঘরের ভিতরটা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। ডাক্তার তলোয়ার নিয়ে তাঁর আক্রমণকারীকে তাড়া করছিলেন। একজনের তলোয়ারের আঘাতে হাতের একটা জায়গায় একটু-খানি কেটে গেল। আমি ছুটে ফাঁকায় চলে গেলাম।

এরপর অবস্থা আবার উল্টে গেল। বিদ্রোহীদের পাঁচজন খতম হলো। আমাদের জয় হলো বটে কিন্তু সে জয়ের জন্য মূল্য দিতে হলো আমাদের অনেক। হাণ্টারের তখনো জ্ঞান ফেরেনি। গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে জয়েসের মাথা। ক্যাপ্টেন আহত। তাঁকে জমিদার ধরে আছেন।

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, ওরা পালিয়েছে?

ওরা পালিয়েছে আর ওদের পাঁচজন মারা গেছে।

ক্যাপ্টেন বললেন, তাহলে আমাদের অবস্থা ত আগের থেকে এখন ভাল। ওদের নজন আর আমাদের চারজন।

পরে ওদের আহত একজন মারা যাওয়ায় ওদের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট আটজন।

১৩

ক্যাপ্টেনের আঘাতটা গুরুতর হলেও মারাত্মক নয়। কাঁধের হাড় ভেদ করে গুলিটা বিদ্ধ হয়েছিল বুকের কাছে। গুলিটা বার করে ডাক্তার বললেন সপ্তাহ তিনেক বিশ্রাম করতে হবে। তবে হাণ্টারের জ্ঞান আর ফিরল না। মাঝরাতে মারা গেল। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমি ও জমিদারবাবু বাইরেই রান্না করলাম।

খাওয়ার পর ডাক্তার ও জমিদার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ পরামর্শ

করলেন। গ্রে ও আমি বাইরে বসে রইলাম। তারপর ডাক্তার কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে কোমরে তলোয়ার বেঁধে ও হাতে পিস্তল নিয়ে তুপুরের দিকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সঙ্গে চার্টটাও নিলেন।

গ্রে বলল, ডাক্তারের কি মাথা খারাপ হলো নাকি?

আমি বললাম, ওঁর মাথা ঠিকই আছে। উনি বোধ হয় বেলগানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

খাওয়ার পর আমি যখন বাসনপত্র ধুচ্ছিলাম তখন বাড়িতে গরমে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ডাক্তারকে তখন পাখিডাকা পাইনগাছের জঙ্গলের ঠাণ্ডা ছায়ায় হাঁটতে দেখে হিংসা হচ্ছিল আমার।

আমার মাথায় একটা তুর্বুদ্ধি জাগল। আমি একটা পরিকল্পনা খাড়া করে নিলাম মনে মনে। কিন্তু আমার সে পরিকল্পনার কথা কেউ শুনবে না। তাই ঠিক করলাম কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে যাব বাড়ি থেকে। আমি ঠিক করলাম বেলগানের লুকোনো নৌকোটা বার করে তাতে করে আমাদের জাহাজটার অবস্থা দেখতে যাব।

এর পর আমি সঙ্গে একজোড়া পিস্তল, কিছু বারুদ, বুলেট আর কিছু বিস্কুট নিলাম।

জমিদার ও গ্রে তুজনে মিলে যখন ক্যাপ্টেনের ব্যাণ্ডেজ বদলাতে ব্যস্ত ছিলেন তখন আমি গোপনে সরে পড়লাম বাড়ি থেকে।

তখন বিকেল হয়ে গেছে। জঙ্গল পার হয়ে আমি দ্বীপের পূর্ব উপকূল দিয়ে এগোতে লাগলাম। ভাবলাম সমুদ্রের ধার দিয়ে চলে যাব যাতে পোতাশ্রয় থেকে আমাকে কেউ দেখতে না পায়।

সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগলাম বেলাভূমি ধরে। কঙ্কাল দ্বীপের পাশে স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিল পোতাশ্রয়টা। দেখলাম স্বচ্ছ জলে হিসপ্যানিওয়ালার ছায়া পড়েছে। তার মাস্তুলে উড়ছে 'জলি রজার' পতাকা।

জাহাজের পাশে একটা ছোট নৌকোয় বসেছিল সিলভার। তার কাছে কাজ করছিল তুজন লোক। তাদের মধ্যে একজন আমাদের কাঠের বাড়ির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল।

হঠাৎ সিলভারের ডান হাতের কব্জির উপর বসে থাকা তার টিয়াপাখি 'ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট বলে জোরে চিৎকার করে উঠতেই সেই নৌকোটা তীরের দিকে

জোরে চালিয়ে দিল সিলভার। তার কাছে যে দুজন লোক ছিল তারা জাহাজে উঠে গেল।

তখন স্পাইগ্লাস পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। কুয়াশা ঘন হয়ে উঠছিল চারদিকে। আমি ঠিক করলাম আলো থাকতে থাকতে বেলগানের নৌকোটা খুঁজে বার করতে হবে।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার দুতিনশো গজ দূরে ছিল সেই সাদা পাথরটা যার আড়ালে লুকোন ছিল বেলগানের নৌকোটা।

নৌকোটা বার করে দেখলাম ছাগলের চামড়া দিয়ে মোড়া ও অসম্ভব রকমের ছোট। এমনকি একজনের পক্ষেও যথেষ্ট না।

নৌকোটা পেয়ে যাওয়ার পর আর দেরি না করে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু আমার মাথায় একটা নতুন মতলব এল। আমি ঠিক করলাম রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হিসপ্যানিওলার নোঙরের দড়ি কেটে দেব। জাহাজটা তাহলে ভাসতে ভাসতে দূরে নাগালের বাইরে কোথাও চলে যাবে। তাহলে বিদ্রোহী নাবিকরা আর সেটাতে চড়ে পালাতে পারবে না।

আমি আগেই দেখে নিয়েছি জাহাজের পাশে পাহারা দেবার জন্য কোন নৌকো নেই এখন। কোন পাহারাদার নেই বাইরে।

আমি বিস্কুট খেতে খেতে অন্ধকার নামার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। জোয়ার ঘুরে যাওয়ায় জাহাজের সামনের দিকটা আবার নিচে সরে এল। জোয়ারের জল সরে যাওয়ায় রাতের অন্ধকারে নৌকোটা কাঁধে করে বেশ খানিকটা জল ভেঙ্গে এগোতে হলো আমাকে।

নৌকোটা এত হালকা যে জলে নামিয়ে দিতেই খুব ভালভাবে ভাসছিল। হাওয়ার স্রোত অনুযায়ী এমন ঘুরে যাচ্ছিল যে সেটা চালানো খুব শক্ত। বেলগান ঠিকই বলেছিল যে তার স্বভাব না জানলে সেটা চালানো খুবই কষ্টকর।

আমি তার স্বভাব জানতাম না বলে সেটাকে যেদিকে চালাতে চাইলাম সেদিকে না গিয়ে অন্য দিকে ঘুরে যেতে লাগল। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল যে সেই সময় জোয়ার এসেছিল। জোয়ারের স্রোত আমাকে সোজা ভাসিয়ে নিয়ে চলল হিসপ্যানিওলার দিকে। স্রোতে আমাকে মুহূর্তের মধ্যে জাহাজের কাছে নিয়ে গেল। দেখলাম জোয়ারের টান এত প্রবল যে কাছি বাঁধা নোঙরে দারুণ টান পড়েছে। এ অবস্থায় কাছিটাকে কাটলে কাছি ছিটকে

এসে আমাকে ঘা মেরে আমাকে ও আমার নৌকোটাকে উল্টে ফেলে দেবে, আর জাহাজটাও ভেসে বেরিয়ে যাবে।

এই সময় হঠাৎ দমকা বাতাসে জাহাজটা ঘুরে স্রোতের সোজাসুজি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাছিটা আলগা হয়ে গেল। আমি তখন আমার ছুরিটা বার করে কাছিটার গোছাগুলো একে একে কাটতে লাগলাম। এবার জাহাজের কেবিনে কারা কথা বলছিল কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম।

কেবিনে কথা বলছিল সহকারী প্রধান মাল্লা হ্যাণ্ডস আর একজন লাল টুপিপরা নাবিক। বুঝলাম তারা দুজনেই মাতাল এবং দুজনে ঝগড়া করছে। মাঝে মাঝে দারুণ চেঁচামেচি করছে আর ঝগড়া করছে।

কাছিটা একেবারে কেটে দিতে জাহাজটা ঘুরে গেল। আর একটু হলে আমার নৌকোটা জাহাজের তলায় চলে যেত। শেষে অতিকষ্টে জাহাজের হাত থেকে রেহাই পেলাম। জাহাজের মাঝখান দিয়ে জলের উপর নেমে আসা একটা দড়িতে হাত ঠেকতে আমি সেটা ধরে ফেললাম।

আমি তখন কৌতূহলবশতঃ দড়িটাকে টেনে কেবিনের কাছে নিয়ে গিয়ে কেবিনের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। জাহাজ আর আমার নৌকোটা তীরের দিকে ভেসে চলতে লাগল।

কেবিনের জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম হ্যাণ্ডস ও তার সঙ্গী দুজনে দুজনের গলা টিপে প্রাণপণ লড়াই করছে। আমি ভয় পেয়ে নৌকোতে নেমে গেলাম। হঠাৎ আমার নৌকোটা ঘুরে তীব্রগতিতে ছুটে চলল অন্য দিকে। চোখ মেলে দেখলাম আমার চারদিকে উত্তাল ঢেউ উঠছে নামছে আর তাদের মাথায় মিট মিট করে জ্বলছে ফসফরাসের আলো। এবার হিসপ্যানিওলা ঘুরে দক্ষিণমুখো হয়ে গেল।

এবার শুনতে পেলাম হ্যাণ্ডসরা লড়াই থামিয়ে চিৎকার আর ছোটাছুটি করছে। এবার তারা জাহাজ সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠেছে। নৌকোটা যতবার ঢেউএর মাথা থেকে নামছিল ততবারই আমার মনে হচ্ছিল এই বুঝি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করছে। ঢেউএর ঝাপটায় আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।

এই দারুণ দুশ্চিন্তা আর মৃত্যুভয়ের মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি চারদিকে দিনের আলো ফুটে উঠেছে। দেখলাম দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ঢেউএর মাথায় দোল খাচ্ছে আমার

নৌকোটা। স্পাইগ্লাস পাহাড়ের জলের ধার ঘেঁষে খাড়া হয়ে উঠে সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে। আমি তখন ডাঙ্গা থেকে মাত্র সিকিমাইল দূরে।

আমি দেখলাম সেখানে নৌকো ভেড়ানো সম্ভব নয়। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে। পাথরের উপর আছাড় খেলে আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাব। আরো দেখলাম শামুকের মত বড় আকারের একরকম অসংখ্য প্রাণী পাথর থেকে লাফিয়ে পড়ছে জলের উপর।

এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল সিলভার আমাকে একবার বলেছিল এই স্থানের পুরো পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে একটা জলস্রোত উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। আমি সেই স্রোতের আওতায় এসে পড়লাম। দক্ষিণ দিকে বাতাস বইছিল। ভাবলাম বনঘেরা অন্তরীপটায় উঠব আমি। কিন্তু নৌকোটাকে আমি কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিলাম না।

নৌকোর উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আমি দেখছিলাম এক একটা বিশাল ঢেউ আমার মাথার উপর উঁচু হয়ে উঠতেই নৌকোটাও তার মাথার উপর উঠে আবার অন্য দিক দিয়ে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। এইভাবে নৌকোটা এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নৌকোটাকে ঘুরিয়ে ডাঙ্গার দিকে নিয়ে যেতে পারছিলাম না কিছুতেই।

ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমি শুয়ে শুয়েই বৈঠাটাকে নামিয়ে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম নৌকোকে। এইভাবে একশো গজ সরে গেলাম তীরের কাছে। কিন্তু অবশ্য অন্তরীপে নৌকো ভেড়ানো সম্ভব নয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জলস্রোতের টান অন্তরীপ পার করে আরো এগিয়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল আমার থেকে আধ মাইলেরও কম দূরে হিসপ্যানিওলা পাল তুলে ভেসে চলেছে। আমার ভয় হলো দেখতে পেলে হ্যাণ্ডসরা হয়ত আমায় ধরবে।

কিন্তু তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। মনে হলো কোনরকমে যেতে পারলে হয়ত একটু জল পাব। প্রথমে মনে হলো হ্যাণ্ডসরা হয়ত জাহাজটাকে চালিয়ে দ্বীপটাকে ঘুরে আবার পোতাশ্রয়ে ফিরে যাবে।

কিন্তু পরে দেখলাম জাহাজটা এমনভাবে যেদিকে সেদিকে যখন তখন ঘুরছে যাতে মনে হচ্ছে কোন চালক নেই তার মধ্যে। ওটা নিজেই ভেসে চলেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে। তাই মনে হলো আমি জাহাজটাতে

একবার উঠতে পারলে আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে ফিরে যেতে পারব। জাহাজে আমাদের দেশে ফেরার একটা ব্যবস্থা হবে।

আমি ঢেউএর ফাঁক দিয়ে নৌকোটাকে জাহাজের দিকেই চালিয়ে নিয়ে গেলাম। জাহাজের খুব কাছে চলে এলেও ডেকের উপর কেউ বেরিয়ে এল না। তাহলে কি সবাই পালিয়ে গেছে জাহাজ ছেড়ে?

জাহাজটা আবার সামনে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে পড়ল স্রোতের আঘাতে আর সেই সঙ্গে একটা বিরাট ঢেউএর মাথায় উঠে পড়ল আমার নৌকোটা। জাহাজের আগের দিকটা এগিয়ে এল আমার কাছে। আমি তখন একটা লাফ দিয়ে জাহাজে উঠে তিনকোণা পালের কাঠের দাঁড়টা আঁকড়ে ধরলাম জোরে। এমন সময় আমার নৌকোটা জাহাজের তলায় গিয়ে তলিয়ে গেল অতল জলের মধ্যে। জাহাজ থেকে ফিরে যাওয়ার আর কোন উপায় রইল না।

১৪

আর একটু হলে ছিটকে পড়ে যেতাম সমুদ্রে। তাই আর দেরী না করে দাঁড়টা ধরে সেটা বেয়ে ডেকের উপর আছড়ে পড়লাম।

জাহাজে উঠে এদিক ওদিক খোঁজ করে দেখলাম হ্যাণ্ডস একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। হাত দুটো টান টান হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে ডেকের উপর। থুঁতনিটা ঝুলে পড়েছে বুকের উপর। আর তার লালটুপিওয়ালা সঙ্গীটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে হাত পা ছড়িয়ে। ডেকের তক্তায় তাদের রক্ত লেগে ছিল। বুঝলাম মাতাল অবস্থায় পরস্পরকে খুন করেছে তারা।

এমন সময় হ্যাণ্ডস একটা কাতর আর্তনাদ করে ভাল করে উঠে বসল। তখন বুঝলাম সে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু মরেনি। তার দাঁতগুলো সব ভেঙ্গে যাওয়ায় চোয়ালদুটো শিথিল হয়ে পড়েছে।

হ্যাণ্ডসের জ্ঞান ফিরে এলে আমাকে দেখেই বলে উঠল, একটু ব্রাণ্ডি।

আমি তাড়াতাড়ি কেবিনে গিয়ে দেখি চার্টের খোঁজে সমস্ত কেবিন লণ্ড-ভণ্ড করেছে, সব কিছু ওলোটপালোট করেছে ওরা। দেখলাম বেশ কয়েক ডজন মদের বোতল রয়েছে। আশা মিটিয়ে জল খেয়ে একটা মদের বোতল নিয়ে গিয়ে হ্যাণ্ডসকে দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে বোতলটা তুলে সব মদ খেয়ে নিল।

এবার একটু সুস্থ হয়ে হ্যাণ্ডস বলল, ও বেটা ত মরে কাঠ হয়ে গেছে। এখন তুমি এলে কোথা থেকে?

আমি বললাম, আমি জাহাজের দখল নিতে এসেছি হ্যাণ্ডস। আমাকে ক্যাপ্টেন বলে মানবে।

তার মুখের ভাব দেখে বুঝলাম মনে তার বিষ আছে।

এরপর আমি ছুটে গিয়ে জলদস্যুদের পতাকা 'জলি রজার' নামিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে। বললাম, জাহাজে কোন পতাকা থাকবে না সে ভাল তবু ও পতাকা আমি উড়তে দেব না।

হ্যাণ্ডস বলল, শোন হকিন্স, আমার সাহায্য ছাড়া তুমি জাহাজ চালিয়ে তীরে নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি বরং আমাকে কিছু খাবার আর একটা রুমাল দাও। মুখটা বেঁধে নিই। তাহলে আমি তোমাকে বলে দেব কি করে জাহাজ চালাবে।

আমি বললাম, আমি কিন্তু ডিকের পোতাশ্রয়ে ফিরব না। আমি উত্তরের খাঁড়িতে ঢুকে তীরে নিয়ে যাব জাহাজটাকে।

একটা বাক্স থেকে রুমাল এনে ওর মুখটা বেঁধে দিলাম। হ্যাণ্ডস বলল, এখন লাগাম তোমার হাতে। যেখানেই জাহাজ নিয়ে যাও আমাকে সাহায্য করতেই হবে।

এরপর কিছু খাবার ও ব্রাণ্ডি খেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল হ্যাণ্ডস। তার সাহায্যে অনুকূল বাতাসে জাহাজটাকে দ্বীপের পাশ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দ্বীপের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পাহাড়টার কোল ঘুরে খাঁড়ির দিকে এগোতে লাগলাম।

সঙ্গীদের ছেড়ে আসার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত বিবেকের যে দংশন অনুভব করছিলাম, জাহাজটাকে দখল করার আনন্দে সে দংশনজ্বালা মুহূর্তে উবে গেল। এ জাহাজে এখনো প্রচুর খাবার ও পানীয় জল আছে।

এই সময় হ্যাণ্ডসএর চোখ মুখ আর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে আমার সন্দেহ হতে লাগল। গোপন বিশ্বাসঘাতকতার এক কুটিল ছায়া দেখতে পেলাম তার চোখে মুখে।

বাতাসটা হঠাৎ পশ্চিম দিকে ঘুরতেই আমাদের সুবিধা হলো। উত্তরের খাঁড়ির মুখে সহজেই পেঁছে গেলাম আমরা। তবে জোয়ারের জল না বাড়া পর্যন্ত তীরে জাহাজ ভেড়াবার কোন উপায় ছিল না। কিভাবে জাহাজটাকে থামাতে হয় তা আমাকে শিখিয়ে দিল হ্যাণ্ডস। আমিও তা শিখে নিলাম।

ও ব্রায়েসের মৃতদেহটাকে রেলিংএর উপর দিয়ে জলে ফেলে দিতে বলল। কিন্তু আমি বললাম, আমি তা পারব না। ওখানেই ওটা পড়ে থাক।

এরপর হ্যাণ্ডস আমাকে কিছু মদ এনে দিতে বলল। আমি নিচের ডেকে মদ আনতে গিয়ে লুকিয়ে মুখ বার করে একসময় দেখলাম হ্যাণ্ডস্ হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা দড়ির গাদা থেকে একটা রক্তমাখা ছোরা বার করে রক্তটা মুছে তার ধার পরীক্ষা করে নিয়ে জামার ভিতর লুকিয়ে রাখল।

আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তাই হলো। কিন্তু আমাকে মেরে হ্যাণ্ডস কি ফিরে যেতে পারবে তার বন্ধুদের কাছে ?

সে ঢক ঢক করে অনেকটা মদ খাবার পর আমাকে তামাক দিতে বলল। আমি বললাম, তুমি যে পাপ করেছ একটা লোককে খুন করে তার জন্য প্রার্থনা করা উচিত ঈশ্বরের কাছে।

হ্যাণ্ডস্ গম্ভীরভাবে বলল, তিরিশ বছর ধরে এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাল মন্দ অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু ভাল লোকের জীবনে ভাল হয়েছে, সৎ লোক লাভবান হয়েছে এমন ব্যাপার আমি একটিও দেখিনি। যে আগে মারতে পারে সেই জয়ী হয়। মরা লোক কামড়ায় না।—আমেন।

অন্তরীপ পার হতেই দুদিকের ডাঙ্গা কাছে এসে পড়ল। উত্তরের এই খাড়ির দুপাশেও গম্ভীর জঙ্গল। এই খাড়িটা অনেক বেশী লম্বা ও সংকীর্ণ। হ্যাণ্ডস্ বলল, সামনের ঐ জায়গাতে জাহাজ ভেড়াতে হবে।

হ্যাণ্ডসএর নির্দেশমত নিপুণভাবে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ হ্যাণ্ডস চিৎকার করে উঠল, থামো থামো।

শেষের দিকে জাহাজ চালানোর আনন্দে হ্যাণ্ডস-এর উপর নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। কিসের একটা শব্দে চমকে উঠে চোখ ফেরাতেই দেখি, উদ্যত ছুরি হাতে আমার দিকে ছুটে আসছে হ্যাণ্ডস !

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই আমি সরে গিয়ে আমার পিস্তল থেকে গুলি করলাম তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু বুঝতে পারলাম জলে ভিজে বারুদ নষ্ট হয়ে গেছে বলে গুলি হলো না। অন্য পিস্তলটা নেবার সময় ছিল না। অবসর সময়ে পিস্তলে গুলি ভরে না রেখে ভুল করেছি। এখন আর কোন উপায় নেই।

আমি আর ছুটে না বেড়িয়ে মাস্তুলটার উপর দুহাতের তালু রেখে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে তখন ছোরাটা আমার সামনে ঘোরাতে লাগল আর আমি একে বেঁকে পাশ কাটিয়ে তার 'আঘাত এড়িয়ে চলতে লাগলাম।

এমন সময় জাহাজটা একটা জোর ধাক্কা খেয়ে বেলাভূমিতে আটকে গেল বাঁদিকে হেলে। আমরা দুজনেই তখন পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে নর্দমার ধারে চলে এলাম।

হ্যাণ্ডস্ আমার পাশে পড়ে আমাকে ছোঁবার চেষ্টা করতেই আমি লাফ দিয়ে উঠে মাস্তুল বেয়ে পর্যবেক্ষণের মাঁচায় গিয়ে বসে পড়লাম।

নিচের থেকে ছোরাটা ছুঁড়ে দিল হ্যাণ্ডস্। অল্প কিছুর জন্য বেঁচে গেলাম আমি। ছোরাটা বিঁধে রইল মাস্তুলের গায়ে। এবার আমি সুযোগ পেয়ে দুটো পিস্তলেই বারুদ ভরে নিলাম।

হ্যাণ্ডাস এবার মাস্তুল থেকে ছোরাটা তুলে দাঁতে চেপে ধরে উঠে আসতে লাগল আমার কাছে। আমি তখন পিস্তল উঁচিয়ে বললাম আর এক পা এগোলে গুলি করে তোমার মাথা উড়িয়ে দেব।

তবু সে একসময় নিঃশব্দে ডান হাতটা বাড়িয়ে ছোরা দিয়ে আমার কাঁধের বদলে জামার কলারটাকে মাস্তুলের সঙ্গে গেঁথে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে এক সাথে আমার দুটো পিস্তল গর্জে উঠল। নিচের দিকে মুখ করে সোজা জলে পড়ে গেল হ্যাণ্ডস।

ছোরাটা আমার কোট আর শার্টের সঙ্গে কাঁধের কিছুটা চামড়াকেও গেঁথে রেখেছিল। ছোরাটাকে তুলে ফেলতেই রক্ত পড়তে লাগল। আমি মুক্ত হয়ে ওব্রায়েনের মৃতদেহটাকে জাহাজ থেকে জলে ফেলে দিলাম। হ্যাণ্ডসের মৃত দেহটা যেখানে ভাসছিল তার পাশেই ফেলে দিলাম লাশটাকে।

এবার আমি নোঙরের কাছিটা দুহাতে শক্ত করে ধরে নিচে কোমরভর জলে লাফিয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে পাইনগাছের ছায়ার মধ্য দিয়ে জল ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলাম কূলের দিকে। তখন সূর্য ডুবছিল।

জাহাজ দখল করতে পারার আনন্দে বুকটা ফুলে ছিল আমার। আমি তীরে উঠে কাঠের বাড়িটার দিকে এগোতে লাগলাম।

জঙ্গলটা এখানে ঘন নয় বলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাহাড়টার কোল ঘেঁষে নদীটার সামনে এসে পড়লাম। এরপর হাঁটুভোর জল ভেঙ্গে পেরিয়ে গেলাম নদীটা। এইখানেই বেলগানের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল আমার। সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদ উঠল আকাশে, এবার চাঁদের আলোয় স্বচ্ছন্দে পথ হাঁটতে লাগলাম আমি।

অবশেষে সেই খুঁটির বেড়ার কাছে এসে পড়লাম। বেড়া ডিঙ্গিয়ে ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছলাম আমি। একদিকে একটা বিরাট

অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুনের আভা আসছিল। কিছুটা জায়গায় চাঁদের আলো ছিল আর বাকি অংশ কালো ছায়ায় ঢাকা। এরকম অগ্নিকুণ্ড ত আমরা কখনো জ্বালাইনি। কেউ কোথাও নেই। মনে সন্দেহ এবং ভয় হলো। আমার এই ক'দিনের অনুপস্থিতিতে নিশ্চয় কিছু একটা ঘটে গেছে।

ছায়ার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমি বাড়ির এক কোণে এসে হাজির হলাম। কতকগুলো ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকা আর সমবেত নিঃশ্বাস শুনতে পেলাম। ঘরের ভিতরটা একেবারে অন্ধকার। আমি ভাবলাম আমি যেখানে শুতাম এর আগে সেইখানে গিয়ে নীরবে শুয়ে পড়ব। আর কাউকে কিছু জানাব না। পরদিন সকালে সকলকে তাক লাগিয়ে দেব। কিন্তু আমার বন্ধুদের পাহারার ব্যবস্থা খুব খারাপ মনে হলো। কোন শত্রুও ত ঢুকে পড়তে পারত।

একজন ঘুমন্ত লোকের পায়ে আমার পা পড়ে গেল। সে একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সিলভারের টিয়াপাখি ফ্লিন্ট 'আটমোহর আটমোহর' বলে সমানে চিৎকার করতে লাগল। আমি ব্যস্ত হয়ে বেরোতে গেলে একজনের গায়ে ধাক্কা লাগল।

টিয়াপাখির চিৎকারে সিলভার ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। তখন সকলেই জেগে উঠেছে। সিলভার বলে উঠল, কে যায়? ডিক, একটা আলো আন ত।

সঙ্গে সঙ্গে ডিক একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এল। আমি শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

১৫

আমি দেখলাম পুরো বাড়ি আর রসদের ভাণ্ডার এখন বিদ্রোহীদের দখলে। রুটি, মাংস আর মদের পিপে সব ঠিক আছে। আমি দেখলাম এখন বিদ্রোহীদের মধ্যে মোট ছজন জীবিত। তাও একজন আহত।

মিলভার তার পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, তাহলে জিম হকিন্স, তুমি আমাদের মধ্যে এসেছ। তাহলে আমার মনের কথাটা বলি। তোমাদের আমি ভালবাসি। তুমি কাজের ছেলে। তাই আমার বরাবরের ইচ্ছা তুমি আমাদের দলে যোগ দিয়ে তোমার প্রাপ্য অংশ বুঝে নাও। তুমি অবশ্য স্বাধীন। তুমি আমাদের দলে যোগ দিতে পার, আর না দিতেও পার।

আমি সাহস করে বললাম, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বল ত। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

সিলভার বলতে লাগল, গতকাল সকালে ডাক্তার লিভজি হঠাৎ শান্তি পতাকা নিয়ে এসে হাজির হয়। আমি ও ডাক্তার আলোচনায় বসলাম। শেষে এই ঠিক হলো। ওরা সংখ্যায় মাত্র চারজন। তাও একজন আহত। তোমার আশা ত ওরা ছেড়েই দিয়েছে। ওরা বাড়ি, রসদের ভাণ্ডার সব আমাদের ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রাণ নিয়ে চলে গেছে। গুপ্তধনের জায়গার চার্টটাও দিয়ে গেছে। কিন্তু তা বুঝতে পারছি না।

আমার বন্ধুরা অর্থাৎ ডাক্তার জমিদার ও ক্যাপ্টেন এখনো বেঁচে আছেন জানতে পেরে চরম বিপদের মাঝেও আনন্দ পেলাম আমি।

আমি ঠাণ্ডা মাথায় সিলভারকে বললাম, দেখ জন, তোমাদের অভিযানের বারোটা বেজে গেছে। তোমরা এখানে পড়ে আছ। জাহাজ গেছে, গুপ্তধন নেই, লোকজন অনেক মারা গেছে। এসব কার জন্য হয়েছে জান? একদিন রাত্রে আপেলের পিপের মধ্যে লুকিয়ে আমি তোমাদের সব কথা শুনে আমি ওদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। জাহাজের নোঙর আমিই ফেলে দিয়েছি। যে দুজন পাহারাদার ছিল জাহাজে আমি তাদের হত্যা করেছি। তারপর জাহাজটাকে আমি এমন এক জায়গায় রেখেছি যেখানে তোমরা কোনদিন খুঁজে পাবে না। আমি তোমাদের মোটেই ভয় করি না। তোমরা যদি আজ আমায় খুন করো তাহলে তাতে তোমাদের কোন উপকারই হবে না। আমার যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে তুমি ডাক্তারকে আমার এই কথাগুলো বলো।

মর্গান নামে একটা বিদ্রোহী নাবিক চেঁচিয়ে বলে উঠল, বেনবোর সরাইখানায় একেই আমি দেখেছিলাম। ও কালো কুকুরটাকে চিনত।

সিলভার বলল, ও-ই, বিলের কাছ থেকে চর্টটা নিয়ে নিয়েছিল! প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই জিম হকিন্সই শত্রুতা করে আমাদের সর্বনাশ করে এসেছে।

মর্গান লাফিয়ে উঠে কোমর থেকে ছোরা বার করে বলল, তাহলে এখনই ওকে শেষ করে দেওয়া উচিত।

সিলভার তখন গর্জন করে উঠল, থাম এখন। তুই কি ভাবছিস তুই ক্যাপ্টেন? তুই যদি আমার বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা করিস তাহলে তোকে উচিত শিক্ষা দেব।

মর্গান থেমে গেল। আর একজন বলে উঠল, মর্গান ঠিক বলেছে।

বাকি সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে কি সব বলাবলি করতে লাগল। একজন বলল, শোন জন সিলভার, তোমার কথায় এতদিন ওঠানামা করে এসেছি, আর না।

সিলভার আবার গর্জে উঠল, তোরা কি আমার সঙ্গে লড়তে চাস, পরিষ্কার করে বল। আমি তৈরি। তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আয় যদি সাহস থাকে। আমি ক্রাচ নিয়েই তার পেট ফাঁসিয়ে দেব।

আর কেউ কোন কথা বলল না। কেউ নড়ল না।

সিলভার বলল, আমি ক্যাপ্টেন হয়েছি নির্বাচনের মাধ্যমে। আমি তোদের থেকে অনেক উঁচুদরের। যে ওর গায়ে হাত দেবে তাকে দেখে নেব।

ঘরের কোণে তখন বিদ্রোহীরা ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগল চাপা গলায়।

সিলভার বলল, যা বলছিস জোরে বল না হয়ত চেপে যা।

এরপর ওরা সবাই সিলভারের অনুমতি নিয়ে বাইরে চলে গিয়ে আলোচনা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

সিলভার এবার আমাকে বলল, শোন জিম হকিন্স, ওরা এখন আমাকে ক্যাপ্টেনের পদ থেকে সরাতে চাইছে। সত্যিই এখন আমি জমিদারের পক্ষে। এখন জাহাজ নেই। এতদিন লক্ষ্য করিনি। ওরা সব ভীরু কাপুরুষ। ওদের হাত থেকে তোমার প্রাণ বাঁচাবই। তুমি আমাকে ভবিষ্যতে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবে।

আমি বললাম, আমার পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব আমি করবই। আগে তোমার সঙ্গে হাত মেলালে কত কি আমি করতে পারতাম।

একপাত্র মদ খেয়ে সিলভার আবার বলল, কিন্তু ডাক্তারবাবু আমায় চার্টটা দিয়ে গেল কেন কিছু বুঝতে পারছি না।

কথাটা শুনে আমিও আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

বিদ্রোহীদের বৈঠক শেষে একদল লোক এসে ঘর থেকে মশালটা এক মিনিটের জন্য ধার চেয়ে নিয়ে গেল। বাইরে অগ্নিকুণ্ডের আগুন তখন নিবে গেছে। চারদিকে অন্ধকার। একজনের হাতে মশাল। বাকিরা দাঁড়িয়ে আছে গোল হয়ে। একজন একহাতে ছোরা আর একহাতে বাইবেল নিয়ে নতজানু হয়ে বসে আছে। এমন সময় হঠাৎ লোকটা উঠে দাঁড়াল। এবার সকলে বাড়ির দিকে আসতে লাগল।

আমি সিলভারকে বললাম, ওরা আসছে।

সিলভার বলল, আসতে দাও। আমার হাতে এখনো একটা তুরুপের তাস আছে।

দরজা ঠেলে একজন আসতে গিয়ে থেমে গেল।

সিলভার বলল, আসতে পার। প্রতিনিধির উপর কোন পীড়ন করব না।

একজন তখন সাহস করে এগিয়ে এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেল সিলভারের হাতে।

সিলভার খুলে দেখল, কালো দাগ। সিলভার বলল, একি, বাইবেলের পাতা ছিঁড়ে এনেছিস? এর ফল কখনো ভাল হয় না। কোন্ বোকা এ কাজ করেছিস?

মর্গান বলল, আমি করেছি।

সিলভার বলল, তোদের রফা হয়ে গেল। তোরা ফাঁসিকাঠে ঝুলবি।

জর্জ বলল, কালো দাগের উল্টোদিকে কি লেখা আছে দেখ। তুমি পদচ্যুত। আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত। প্রথম কারণ, তুমিই এই সমুদ্র যাত্রার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ। তোমার জন্যই ব্যর্থ হয়েছে এ অভিযান। দ্বিতীয় কথা, শত্রুদের এই ফাঁদ থেকে পালাতে দিয়েছ। তৃতীয় কারণ ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না দিয়ে তুমি আমাদের আটকেছ। চতুর্থ কারণ, জিম হকিন্স নামে এই ছেলেটাকে তুমিই মারতে দাওনি।

সিলভার বলল, এইসব অভিযোগের উত্তর দেব। দিতে না পারলে তবে পদচ্যুতির প্রশ্ন ওঠে। তোরা সবাই জানিস আমি সে রাতে জাহাজে থাকতে চেয়েছিলাম। তাহলে সবাই জীবিত থাকত। আমার কথামত কাজ হলে গুপ্তধন এতক্ষণ উঠে যেত জাহাজের খোলে। আমি ক্যাপ্টেন হওয়া সত্ত্বেও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে জন এ্যাণ্ডারসন, হ্যাণ্ডস আর এই জর্জ।

জর্জ চুপ করে রইল।

সিলভার আবার বলতে লাগল, এবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগের উত্তরে বলছি, তোরা আমার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এসে ওদের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য প্রার্থনা করিসনি, ভিক্ষে চাসনি আমার অনুগ্রহ? ওদের যদি নিরাপদে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে না দিতাম তাহলে না খেয়ে মরে যেতিস তোরা। এরপর চতুর্থ অভিযোগ। আরে বোকার দল, ছেলেটা এখন আমাদের বন্দী। বন্দীকে কেউ মারে? এই ত আমাদের বাঁচবার সুযোগ। ওদের সাহায্য করার জন্য আর একটা জাহাজ আসছে। গুপ্তধন পেলেও তা নিয়ে যাবি কি করে? তাছাড়া একজন বড় ডাক্তার তোদের সবাইকে দেখে যাচ্ছে রোজ এসে। চুক্তি না করলে তোরা রোগে ও অনাহারে সব মরে যেতিস। তাছাড়া এই চার্টটাও পেতাম না।

ওরা সবাই ম্যাপটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মর্গান বলল, আমাদের তো জাহাজ নেই। ধনরত্ন পেলে নিয়ে যাব কি করে?

সিলভার বলল, জাহাজ নেই, আমি পদত্যাগ করলাম। তোরা বেরোতে পারবি না এখান থেকে। যাকে খুশি তোরা ক্যাপ্টেন কর।

সকলে তখন একবাক্যে চিৎকার করে উঠল, বাববিকিউ দীর্ঘজীবি হোক। বাববিকিউ লং জন আমাদের ক্যাপ্টেন।

সিলভার তাচ্ছিল্যভরে বলল, তোদের সুর যে পাল্টে গেল।

সে রাতে আর কিছু হলো না। সকলে একপাত্র করে মদপান করে শুয়ে পড়লাম।

১৬

জঙ্গলের ধারে খুঁটির বেড়ার ওপার থেকে ডাক্তার লিভজির স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম পরদিন সকালে। বুঝলাম, ডাক্তার এই সময় রোজ এদের দেখতে আসেন।

সিলভারও বলে উঠল, এই যে ডাক্তারবাবু সুপ্রভাত স্যার। একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেছে। এখানে আমাদের এক আগন্তুক রয়েছে। এক নতুন অতিথি।

কথাটা শুনে ডাক্তার কোন গুরুত্ব না দিয়েই রোগী দেখতে শুরু করলেন।

রোগী দেখা শেষ করে ডাক্তার বললেন, আমার কাজ শেষ। এবার ছেলেটার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

সিলভার ডাক্তারকে বলল, আপনি যান বেড়ার ওপারে জিমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কথা বলবেন।

এরপর সিলভার আমাকে শপথ করিয়ে নিল যাবার আগে। আমি যেন না পালাই অর্থাৎ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার পর যেন ফিরে আসি তার কাছে।

আমি তাঁর কাছে গেলে ডাক্তারবাবু বললেন, ক্যাপ্টেন স্মলেট অসুস্থ হলে তোমার চলে আসা উচিত হয়নি।

আমি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম, ডাক্তারবাবু, আমার অন্যায় হয়েছে ঠিক, কিন্তু অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জাহাজ দখল করে উত্তরের খাড়িতে দক্ষিণে বেলাভূমিতে লুকিয়ে রেখেছি।

ডাক্তার বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চল।

আমি বললাম, আমি সিলভারকে কথা দিয়েছি তার কাছেই ফিরে যাব।

ডাক্তার বললেন, তুমি বারবার আমাদের বাঁচিয়েছ। ষড়যন্ত্রের কথা তুমিই ফাঁস করেছ। বেলগানের খবর তুমিই দিয়েছ। তবে শোন সিলভার, গুপ্তধন খোঁজার জন্য বেশী তাড়াহুড়ো করো না।

সিলভার বলল, কিন্তু ডাক্তারবাবু, গুপ্তধন তোমার উপরে নির্ভর করছে আর আমার উপর জিমের জীবন।

ডাক্তার বললেন, আমার একটা কথা সিলভার, ছেলেটার দিকে একটু নজর রাখবে। সাহায্যের দরকার হলে চিৎকার করবে। বিদায় জিম।

ডাক্তার চলে গেলে সিলভার আমাকে বলল, জিম, আমি যেমন তোমার জীবন বাঁচিয়েছি। আমি নিজে শুনেছি, ডাক্তার তোমাকে বেড়া টপকে চলে যেতে বললেও তুমি যাওনি। আমি ভুলব না একথা।

প্রাতরাশ করার পর সিলভার সকলকে নিয়ে গুপ্তধনের খোঁজে বার হলো। আমাদের পরনে ছিল ময়লা নাবিকের পোশাক। প্রত্যেকের হাতেই ছিল বন্দুক আর গুলি। সিলভারের হাতে আর পিঠে একটা বন্দুক। কোমরে তলোয়ার আর দু পকেটে দুটো পিস্তল। কয়েকজন কোদাল আর শাবল কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। এইসব জিনিসগুলো জাহাজ থেকে আসার সময় নামিয়ে এনেছিল।

সমুদ্রতীরে গিয়ে প্রথমে নৌকোয় চাপলাম। নৌকোয় চেপে চার্টটা ভাল করে দেখতে লাগল সিলভার। উঁচু গাছ, স্পাইগ্লাসের খাঁজ, উত্তর ও উত্তর পশ্চিম তীর বোঝায়। কঙ্কালদ্বীপ, পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব দিক ঘেঁষে। দশ ফুট। প্রধান চিহ্ন একটা উঁচু গাছ। পোতাশ্রয়ের প্রান্ত বরাবর একটা দু তিনশো ফুট উঁচু মালভূমি যা উত্তর প্রান্তে গিয়ে মিশেছে স্পাইগ্লাসের দক্ষিণ খাঁজে। মালভূমির উপরে পাইন গাছের ঘন জঙ্গল।

প্রচণ্ড এঁটেল মাটির জমি এবং এক ধরনের আঠালো আগাছা থাকার ফলে আমাদের উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

এইভাবে প্রায় আধ মাইল যাওয়ার পর হঠাৎ দূরে বাঁদিকে যে কজন গিয়েছিল তারা প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। আমরা সবাই সেইদিকে দৌড়তে শুরু করলাম।

আমরা গিয়ে দেখলাম পাইনগাছের নিচে একটা মানুষের কঙ্কাল। একটা মোটা লতা গাছ গাছের গা বেয়ে উঠে গেছে। কঙ্কালটার পরনে কিছু কাপড় লেগেছিল।

সিলভার বলল, ফ্লিন্ট যে দুটো লোককে খুন করেছিল এ কঙ্কালটা হয়ত তাদেরি এক জনের।

জর্জ কঙ্কালটার কাপড়ে কিসের খোঁজ করল। চারদিকে বিরাজ করছিল আরণ্যক নিস্তব্ধতা। ফ্লিন্টের অশরীরী আত্মার ভয়ে নাবিকরা ফিসফিস করছিল।

হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ গলায় কে গান গেয়ে উঠল,

মরা মানুষের সিন্দুকে পনেরটা নাবিক—
হো হো হো রামের বোতল

মর্গান মাটির উপর শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। জর্জ বলল, এ যে ফ্লিন্টের কণ্ঠস্বর।

একজন বলল, খুব হয়েছে। চল পালাই।

সিলভার তখন বলল, ভাই সব, আমি এখানে এসেছি ধনরত্ন নিয়ে যাব বলে। মানুষ বা শয়তান যেই হোক কারো বাধা আমি শুনতে রাজী নই।

কিন্তু তার সঙ্গীরা এতে সাহস ফিরে পেল না। আমার কিন্তু সন্দেহ হলো ভূতের যেমন ছায়া পড়ে না, তেমনি প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হয় না। কিন্তু এই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

সিলভার বলল, গলাটা ফ্লিন্টের মত। কিন্তু আসলে এটা বেলগানের গলা।

মালভূমি থেকে কিছুটা নেমে ম্যাপ দেখে সেই উঁচু গাছটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করল সিলভার। ক্রাচে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এসেছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম গুপ্তধনের কাছাকাছি এসে সিলভার সব ভুলে গেছে। আমার মনে হলো ও সব ধন নিয়ে ওর সব সঙ্গীদের খুন করে জাহাজটাকে পার করে একা চলে যাবে তাতে করে।

সামনে কয়েকজন ছুটছিল হঠাৎ আমাদের কাছ থেকে দুশো গজ দূরে থেমে গেল। সিলভার ও আমি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমাদের সামনে ছিল একটা বড় গর্ত। বেশ বোঝা গেল কিছুদিন আগে ওই গর্ত খুঁড়ে কে গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে গেছে। সে ধনের পরিমাণ হলো সাতলক্ষ পাউণ্ড। গর্তের মধ্যে ঘাসের উপর পড়ে আছে শাবলের একটা ভাঙ্গা হ্যাণ্ডেল আর প্যাকিং বাক্সের টুকরো।

সিলভার এক মুহূর্তে বুঝে নিল এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরিণাম কি

হবে। আমার হাতে একটা সোনালী পিস্তল দিয়ে সে বলল, এই নাও জিম গোলমালের জন্য তৈরি থাক।

বিদ্রোহী নাবিকগুলো খালি গর্তের মধ্যে নেমে মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিল। একটি দুটি গিনি মুদ্রা পেয়ে জর্জ সেটা সিলভারের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এই তোমার সাত লক্ষ পাউণ্ড।

সিলভার গম্ভীরভাবে জর্জকে বলল, যা খুঁড়ে যা, দু একটা নাট বল্টু পেতে পারিস। তুই আবার ক্যাপ্টেন পদের জন্য দাঁড়াবি নাকি?

বাকি সবাই জর্জের দিকে। গর্তটার ওপারে অর্থাৎ সিলভারের উল্টো দিকে দাঁড়াল জর্জ। সবাইকে বোঝাল, ভাই সব ওরা মাত্র দুজন।

ওরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল আমাদের দুজনের উপর। ওরা ছিল মোট পাঁচ জন।

এমন সময় হঠাৎ জঙ্গলের দিক থেকে তিনটে বন্দুকের গুলি ছুটে এল। জর্জ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা লোকটা উল্টে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। বাকি তিনজন ছুটে পালাল। হঠাৎ ডাক্তার লিভজি, গ্রে আর বেলগান ধূমায়িত বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলেন ঝোপ থেকে।

আমরা তখন সবাই মিলে বিদ্রোহী নাবিকদের পিছনে ছুটতে লাগলাম। তাদের আর পাওয়া গেল না

আসলে ডাক্তার আমাদের সঙ্গে সেদিন সকালে দেখা করে গিয়েই বেলগানের গুহায় গিয়ে জমিদারকে সব কিছু বলে গ্রে ও বেলগানকে সঙ্গে করে গুপ্তধনের কাছে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। তিনি বেশই বুঝতে পেরেছিলেন গুপ্তধন পাওয়া না গেলে সিলভার ও আমি বিপদে পড়ব।

আমরা সমুদ্রতীরে চলে গেলাম। একটা নৌকোয় চেপে বসলাম আমরা। পরে জানলাম বেলগানই সব গুপ্তধন তুলে তার গুহায় রাখে। সেই গুহাতেই ডাক্তার, জমিদার, ক্যাপ্টেন প্রমুখ আমার সঙ্গীরা গিয়ে ওঠে কাঠের বাড়ি ছেড়ে।

অবশেষে আমরা বেলগানের সেই গুহায় গিয়ে উঠলাম। ফ্লিন্টের রেখে যাওয়া সব গুপ্তধন গুহার মধ্যে ছিল। পরদিন ভোরবেলায় আমরা আমাদের জাহাজ হিসপ্যানিওলাকে দেখে এসে তার উপর সব গুপ্তধন তুলতে লাগলাম একে একে। পাহাড়ের খাঁজে একজন পাহারাদারকে বন্দুক হাতে বসিয়ে দেওয়া হলো। বিদ্রোহী তিনজন নাবিক দ্বীপে তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু এদিকে আসতে আর সাহস করবে না তারা।

সব গুপ্তধন জাহাজে তুলে সেই বিদ্রোহী নাবিক তিনজনকে দ্বীপে ফেলে রেখে জাহাজে চাপলাম আমরা। সিলভারকে আমরা ক্ষমা করে সঙ্গে নিলাম। জাহাজ ছেড়ে দিল। সিলভার জাহাজ চালাতে লাগল।

আমরা ব্রিস্টলে ফেরার আগেই আমাদের জাহাজ স্প্যানিশ আমেরিকার একটি সুন্দর বন্দরে থামালাম। সেখানে একদিন আমরা বেলগান আর সিলভারকে রেখে বেড়াতে গেলে সেই অবসরে সিলভার একটা থলেতে করে চারশো গিনি নিয়ে পালিয়ে যায়।

বেলগান বলল, ও গেছে ভালই করেছে। সে থাকলে আমাদের জীবন বিপন্ন হত।

আমরা প্রত্যেকেই গুপ্তধনের যথেষ্ট করে ভাগ পেলাম। বেলগানকে তার কথামত এক হাজার পাউণ্ড দেওয়া হলো। ক্যাপ্টেন স্মলেট সামুদ্রিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেন একেবারে।

সিলভারের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। তার স্ত্রী ব্রিস্টল থেকে সরাইখানা তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে কোথায়।

এখন আমি সুখে শান্তিতে থাকলেও মাঝে মাঝে রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন দেখি। স্বপ্নে দেখি কূলের উপর আছড়ে পড়ছে অসংখ্য অশান্ত ঢেউ আর সিলভারের টিয়াপাখিটা ক্যাপ্টেন 'ফ্লিণ্ট আটমোহর' আটমোহর বলে চিৎকার করেছে সমানে।


বিদুর পণ্ডিত
জাতক

বিদুরপণ্ডিত জাতক

পুরাকালে কুরুরাজ্যের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। বিদুর পণ্ডিত নামে এক অমাত্য এই রাজার অর্থ ও ধর্মের অনুশাসক ছিলেন। তাঁর বুদ্ধলীলা বর্ণনা ও ধর্মকথা শুনে শুধু ধনঞ্জয়রাজ নয়, জম্বুদ্বীপের সব রাজাই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এই সব রাজাদের অনেকে বিদুরের মুখ থেকে মধুর ধর্মকথা শোনবার জন্য নিজেদের রাজ্যে ফিরে না গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থেই থেকে যেতেন।

সেই সময় বারাণসীতে চারজন ঐশ্বর্যবান গৃহী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁরা পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। এই সব ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ভোগসুখে নিরাসক্ত হয়ে ওঠেন। বিষয়ভোগই যত কিছু দুঃখের কারণ একথা জানতে পেরে তারা সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে গিয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁরা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ফলমূল আহার করে হিমালয়েই বাস করতে থাকেন।

সেখানে বহুদিন কাটানোর পর একবার অন্ন ও লবণ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষা করতে করতে অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত কালচম্পানগরে এসে উপস্থিত হন তাঁরা। সেখানকার চারজন ধনী জমিদার এই তাপসদের চালচলন দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের এক একজনকে এক একজনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভোজন করালেন। তারপর জমিদারেরা তাঁদের উদ্যানে থাকার জন্য তাপসদের অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন।

এইসব তাপসরা এক একজন জমিদারের বাড়িতে দুপুরে আহার করার পর এক একটি ভবনে গিয়ে বিশ্রাম করতেন। একজন তাপস যেতেন দেবলোকের ত্রয়ত্রিংশ বা তেত্রিশতম ভবনে, একজন যেতেন নাগলোকের নাগভবনে, একজন যেতেন সুপর্ণরাজের সুপর্ণভবনে এবং একজন কৌরবরাজের মৃগদাবির নামক উদ্যানে যেতেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁরা আপন আপন আশ্রয়দাতার কাছে এক একটি ভবনের ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করতেন।

জমিদারগণ সেই সব ভবনের ঐশ্বর্যের কথা শুনে সেইভাবে মৃত্যুর পর জন্মলাভ করার বাসনা করেন। জন্মান্তে এই ধরনের সৌভাগ্য লাভ করার জন্য অনাসক্তি ও পুণ্যকর্মের দ্বারা সৎ জীবন যাপন করতে থাকেন তাঁরা।

মৃত্যুর পর তাঁদের প্রত্যেকের এই বাসনা পূরণ হয়। একজন জমিদার মৃত্যুর পর দেবলোকের ত্রয়ত্রিংশ ভবনে শক্র বা দেবরাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। আর একজন নাগলোকের নাগভবনে, একজন সুপর্ণরাজার ভবনে সুপর্ণরাজ-

রূপে এবং একজন কৌরবরাজ ধনঞ্জয়ের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে জন্মান্তরে তাঁরা এক একটি দিব্যস্থান লাভ করেন।

পরে সেই তাপস চারজন কালক্রমে দেহত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

ধনঞ্জয়ের পুত্র বড় হয়ে পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং যথাধর্ম রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তিনি প্রধান অমাত্য ও ধর্মার্থানুশাসক বিদুরের উপদেশ অনুসারে দান করতেন, শীল রক্ষা করতেন, পোষধ বা উপবাসব্রত পালন করতেন।

একদিন রাজা পোষধব্রত গ্রহণ করে কিছুক্ষণ নির্জনে অবস্থান করার জন্য তাঁর উদ্যানে গিয়ে এক রমণীয় জায়গায় বসলেন। তারপর শ্রমণধর্ম অনুসারে ধ্যান করতে লাগলেন।

দেবরাজ শক্রও সেদিন পোষধব্রত গ্রহণ করেছিলেন। দেবলোকে কোন নির্জন শান্তির জায়গা না পেয়ে মর্ত্যলোকে এসে সেই উদ্যানের এক রম্যস্থানে বসে জপ তপ করতে লাগলেন। নাগরাজ বরুণও সেদিন পোষধ পালন করে জপতপের জন্য সেই উদ্যানের একধারে এসে বসলেন। সুপর্ণরাজও সেদিন পোষধব্রত পালন করে শান্তি ও নির্জনতার সন্ধানে সেই উদ্যানের এক সুরম্য স্থানে এসে বসলেন।

এই চারজন সন্ধ্যাকালে আপন আপন আসন ত্যাগ করে মদনপুষ্করিণীর তীরে সমবেত হলেন। পূর্বজন্মে তাঁরা পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। এ জন্মেও তাঁরা পরস্পরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত হলেন। পূর্বজন্মের মৈত্রী ও ভালবাসার ভাব জাগল তাঁদের মনে। পরস্পরকে প্রীতি সম্ভাষণ করে এক একটি জায়গায় বসলেন তাঁরা। দেবরাজ শক্র বসলেন মদনশিলার উপরে। বাকি তিনজন আপনআপন মর্যাদা অনুসারে এক একটি আসন গ্রহণ করলেন।

দেবরাজ শক্র প্রথমে বললেন, আমরা চারজনই রাজা। এবার দেখতে হবে আমাদের মধ্যে কার শীল সবচেয়ে মহৎ।

একথা শুনে নাগরাজ বরুণ বললেন, আপনাদের তিনজনের থেকে আমার শীল সবচেয়ে বেশী মহৎ।

শক্র বললেন, এর কারণ?

নাগরাজ বরুণ বললেন, এই সুপর্ণ বা গরুড় জাতীয় রাজা সব নাগের শত্রু এবং প্রাণনাশক। কিন্তু আমি আমাদের শত্রু ও প্রাণনাশককে দেখেও

ক্রুদ্ধ বা হিংসাভাবাপন্ন হইঁনি। তাই আমার শীল মহত্তম। যে জন তার ক্রোধের পাত্রকে দেখেও ক্রুদ্ধ হয় না, তাকেই লোকে প্রকৃত শ্রমণ বলে।

একথা শুনে সুপর্ণরাজ বললেন, এই নাগরাজ আমার ভক্ষ্য। কিন্তু এমন ক্ষুধার খাদ্যকে দেখেও আমি আমার ক্ষুধা সংবরণ করে আছি, আহারহেতু কোন পাপ করছি না। এইজন্যই আমার শীল মহত্তম। ক্ষুধার সময় যে ক্ষুধা সহ্য করতে পারে, মিতাহার জিতেন্দ্রিয় আহারের জন্য কোন পাপকাজ করে না সে-ই প্রকৃত শ্রমণ।

দেবরাজ শক্র বললেন, আমি আমার জীবনের নানাবিধ ভোগ সুখ এবং দেবলোকের ঐশ্বর্য পরিহার করে নরলোকে এসেছি শীল রক্ষার জন্য, এই কারণেই আমার শীল মহত্তম। আমোদ প্রমোদ, বেশভূষা প্রভৃতি ভোগকে যে ত্যাগ করতে পারে সে-ই প্রকৃত শ্রমণ।

রাজা ধনঞ্জয় বললেন, আমি আমার রাজ ঐশ্বর্য ও ষোড়শ সহস্র নর্তকী ত্যাগ করে এই উদ্যানে এসে শীলধর্ম পালন করছি। এজন্য আমার শীলই মহত্তম। যে ব্যক্তি লোভনীয় কাম্যবস্তু পরিহার করে নিজেকে অনাসক্ত ও সংযত রাখতে পারে সে-ই প্রকৃত শ্রমণ।

এইভাবে চারজন রাজাই যখন আপন আপন শীলকে মহত্তম বললেন তখন চারজনের মধ্যে কার শীল মহৎ তার কোন বিচার হলো না।

তখন দেবরাজ শক্র কুরুরাজ ধনঞ্জয়কে বললেন, মহারাজ, আপনার সভায় এমন কোন পণ্ডিত আছেন কি, যিনি আমাদের সব সংশয় দূর করে আমাদের শীলের বিচার করতে পারেন।

ধনঞ্জয় বললেন, বিদুর পণ্ডিত নামে এক অমাত্য আমার ধর্ম ও অর্থের অনুশাসক। তিনিই এর বিচার করবেন। চলুন আমরা তাঁর কাছে যাই।

এই প্রস্তাব সকলে মেনে নিয়ে উদ্যান হতে তখনি কুরুরাজের ধর্মসভায় গেলেন। বোধিসত্ত্ব বিদুর পণ্ডিতকে একটি পালঙ্কের উপর বসিয়ে প্রীতি সম্ভাষণ করে ধনঞ্জয় বললেন, পণ্ডিতবর, আমাদের মধ্যে কার শীল সবচেয়ে বড় সে বিষয়ে একটা সংশয় দেখা গেছে। আপনি আপনার প্রজ্ঞাবলে সে সংশয় দূর করুন।

বিদুর বললেন, বিবাদের মূল কারণ জানতে পারলে পণ্ডিতরা তার মীমাংসা করতে পারেন। সুতরাং আপনারা আপন আপন শীল সম্বন্ধে যেসব গাথা বলেছিলেন সেইগুলি আমাকে বলুন।

দেবরাজ শক্র তখন সব গাথাগুলি বলে শোনালেন বিদুরকে। শেষে

তিনি বললেন, নাগরাজের মতো ক্ষান্তি ও সংযমই মহত্তম শীল, সুপর্ণরাজের মতে মিতাহার বা আহারে সংযম, দেবরাজ শক্রের মতে কাম্যবস্তু পরিহার আর কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের মতে অকিঞ্চনই শ্রেষ্ঠ শীল।

এই কথা শুনে বিদুর বললেন, আপনারা সকলেই যেসব শীলের কথা বলেছেন, সেই সব শীল প্রায় একই ধরনের। এককভাবে বিচার করলে কোনটিই মহত্তম নয়। যে জন এই চারটি শীলে সিদ্ধ হয়েছেন অর্থাৎ এই চারটি শীলকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন জীবনে তাঁর শীলই মহত্তম এবং তিনিই প্রকৃত শ্রমণ। তিনিই সবার চেয়ে শীলবান ব্যক্তি। চাকার নাভিতে যেসব দণ্ড থাকে সেগুলি যেমন চাকার শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তেমনি এই চারটি শীল অন্তরে নিহিত থাকলে চরিত্রের দৃঢ়তা বেড়ে যায়।

বোধিসত্ত্বের এই বিচার ও মীমাংসার কথা শুনে প্রীত হলেন চারজন রাজা।

তাঁরা সকলেই তখন একটি গাথায় বিদুরের প্রশস্তি করে বললেন, হে পণ্ডিতবর, নরকুলে তুমি সত্যিই শ্রেষ্ঠ। তুমি আপন প্রজ্ঞাবলে আমাদের সব সংশয় নিরসন করেছ।

এরপর মণি মুক্তো সোনা প্রভৃতি নানারকমের উপহার দিয়ে বিদুর পণ্ডিতের সম্মান করলেন তাঁরা।

নাগরাজ তাঁর বাড়িতে ফিরে গেলে তাঁর স্ত্রী বিমলা তাঁর গলায় মণি দেখতে না পেয়ে বলল, মহারাজ, আপনার মণি কোথায়?

আমি সেই মণি বিদুর পণ্ডিতকে দান করেছি। তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

বিমলা বলল, তিনি কি ধর্মকথায় খুবই পটু?

নাগরাজ বললেন, তিনি ধর্মকথায় এমনই পটু যে জম্বু দ্বীপের একশো জন রাজা তাঁর ধর্মকথা শোনার জন্য নিজেদের রাজ্য ছেড়ে কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের রাজসভায় আছে।

বিদুর পণ্ডিতের প্রশংসা শুনে বিমলার ইচ্ছা হলো সেও বিদুর পণ্ডিতের মুখ থেকে ধর্মকথা শোনে। কিন্তু নাগরাজ তার কথা শুনে পণ্ডিতকে কিছুতেই আনলেন না। তাই বিমলা অসুখের ভাণ করে রাজাকে বলল, বিদুর পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ডের মাংস না খেলে আমার এ রোগ সারবে না। যদি তাঁকে বুঝিয়ে এখানে আনতে না পার তাহলে আমার প্রাণ বাঁচবে না।

সেদিন স্ত্রীর মুখ থেকে একথা শুনে ভাবতে লাগলেন নাগরাজ। তিনি বুঝতে পারলেন না কিভাবে বিদুরের মত মহাপণ্ডিতকে তিনি নিয়ে আসবেন।

রাজা যখন একথা ভাবছিলেন তখন রাজার একমাত্র কন্যা ইরন্দতি বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। রাজাকে বিষণ্ণ দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা বললেন, তোমার মা বিদুর পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড খেতে চান। তা না হলে তাঁর রোগ সারবে না। তার প্রাণ বাঁচবে না। সুতরাং যে বিদুর পণ্ডিতকে এখানে আনতে পারে এমন একজন লোককে তোমার পতিরূপে বেছে নাও।

একথা শুনে ইরন্দতি হিমালয়ের পর্বতকন্দরে গিয়ে ফুলের বনে নৃত্য করতে লাগল। নাচতে নাচতে একটি গাথার মাধ্যমে সে বলতে লাগল, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ বা নর এমন কোন পুরুষ আছেন যিনি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারবেন, যিনি একাধারে পণ্ডিত ও সর্বকামপ্রদ অর্থাৎ সব বাসনা পূরণ করতে পারেন।

ঐ সময় সেই পার্বত্যপথ দিয়ে বৈশ্রবণের ভাগিনেয় পূর্ণক নামে এক যক্ষ সেনাপতি এক মায়াবী ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। সে ইন্দরতির কথা শুনে ও নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে বলল, ভদ্রে, কোন ভয় নেই, চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি প্রজ্ঞাবলে, ধর্মবলে ও চরিত্রবলে বিদুরের হৃৎপিণ্ড আনতে পারব।

যক্ষসেনাপতি পূর্ণক মায়াশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন বলেই সে ইন্দরতির মনের আসল কথাটা বুঝতে পেরেছিল।

সে আবার ইরন্দতিকে আশ্বাস দিয়ে বলল, আমি বুদ্ধিবলে তোমার মনের বাসনা পূরণ করব। তুমি আমাকে পতিরূপে গ্রহণ কর।

পূর্বজন্মে ইরন্দতি পূর্ণকেরই স্ত্রী ছিল। তাই পূর্ণককে দেখে তাঁর প্রতি আসক্তি ভাব জাগল তার মনে। সে পূর্ণকের কাছে গিয়ে নিজেকে সঁপে দিলে পূর্ণক তাকে সঙ্গে করে নাগরাজের ভবনে গিয়ে তাঁর কাছে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থনা করল।

নাগরাজ বললেন, কন্যার মাতা ও আমার পাত্রমিত্রের সঙ্গে পরামর্শ না করে কাউকে কন্যা সম্প্রদান করতে পারব না।

এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রী বিমলাকে গিয়ে বললেন কথাটা।

বিমলা বলল, আমার কন্যা ইন্দরতিকে ধন বা বিত্ত দ্বারা কেউ লাভ করতে পারবে না। যে লোক ধর্মবলে কোন এক পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড এই নাগভবনে আনতে পারবে সেই লোক হবে তার পতি।

বিমলার এই কথাটি পূর্ণকের কাছে গিয়ে তাকে বললেন নাগরাজ।

পূর্ণক একথা শুনে রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, কোন পণ্ডিতের কথা বলছেন আপনি ?

নাগরাজ উত্তর দিলেন, কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের সভাপণ্ডিত বিদুর। বিচক্ষণ সেই সুপণ্ডিতকে তুমি সদুপায়ে এখানে নিয়ে এস। তারপর আমার কন্যাকে লাভ করো।

নাগরাজ বরুণের কথা শুনে যক্ষসেনাপতি পূর্ণক তখনি আসন থেকে উঠে তার অনুচরকে ডেকে তার আজানেয় সৈন্ধব অশ্বটিকে সজ্জিত করতে বলল।

অনুচর অশ্বটিকে আনলে তার পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ আকাশপথে বৈশ্রবনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো পূর্ণক। বৈশ্রবনের কাছে প্রথম নাগলোকের অতুল শোভা ও সম্পদের কথা বর্ণনা করল সে। পদ্মরাগ বৈদুর্য প্রভৃতি কত সব মণি মাণিক্য দিয়ে তৈরি হিরণ্যবতী নামে সেই নাগপুরীর ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না। তারপর রাজকন্যা ইন্দরতিকে বিয়ে করার শর্তের কথাও বলল পূর্ণক। বলল রাজমহিষী বিমলার রূপগুণের কথা।

পূর্ণকের মামা বৈশ্রবণ তখন দুজন দেবপুত্রের সঙ্গে কথা বলতে থাকায় পূর্ণকের কথা ভাল করে শুনলেন না। দেবপুত্রদের সঙ্গে কথা শেষ করে তাদের বিদায় দিয়ে যেতে বললে পূর্ণক ভাবল তাকেই যেতে বলছেন তার মামা।

সে তখন যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই চলে গেল আকাশপথে। পথে সে ভাবল বিদুর পণ্ডিতের বহু অনুচর আছে। সে কুরুরাজের আশ্রিত। তাঁকে বলপ্রয়োগে ধরে আনতে পারা যাবে না। তাই সে ঠিক করল কুরুরাজকে পাশাখেলায় পরাজিত করে বিদুরকে নিয়ে আসবে নাগলোকে।

কিন্তু কোন সামান্য ধন পণ রেখে এ পাশা খেলা চলবে না। তাই রাজগৃহ নগরের কাছে বিপুলগিরি নামে এক পাহাড়ের গুহায় যে এক মহামূল্যবান মণি আছে সেটি সে নিয়ে এল। ঐ মণির অদ্ভুত শক্তি দেখিয়ে পাশাখেলায় প্রবৃত্ত করবে রাজাকে।

কুরুরাজের কাছে গিয়ে পূর্ণক তার উদ্দেশ্যের কথা জানাল। রাজা তখন তাকে তার নাম ধাম ও বংশপরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

পূর্ণক ভাবল, সে কুবেরের দাস একথা বললে রাজার কাছে তার গুরুত্ব কমে যাবে। তাই সে তার পূর্বজন্মের পরিচয় দিয়ে বলল, আমার নাম মানবক, আমার গোত্রের নাম কাত্যায়ন। আমার আত্মীয়স্বজন অঙ্গদেশে বাস করে। আমি অশ্বক্রীড়া বা পাশাখেলার জন্য এখানে এসেছি।

রাজা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাশাখেলায় কি পণ তুমি রাখতে চাও ?

পূর্ণক বলল, এই রত্নশ্রেষ্ঠ মণি আর আমার আজানেয় অশ্ব পণ রাখতে চাই। যে আমাকে পাশাখেলায় পরাজিত করতে পারবে সে এই দুটি সম্পদ পাবে।

তা শুনে রাজা বললেন, এক মণি, এক অশ্ব নিয়ে কি হবে ? তুমি নিশ্চয় জান প্রত্যেক রাজার রাশি রাশি মহামূল্যবান মণি আর শত শত বেগবান অশ্ব থাকে।

পূর্ণক তখন বলল, কিন্তু মহারাজ, আপনার মণি ও অশ্ব যতই থাক, আমার মণি ও অশ্ব সহস্রের মধ্যে এক। তাদের কোন তুলনা নেই।

এই বলে পূর্ণক তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে নগরপ্রাচীরের উপর উঠে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এত দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল ঘোড়াটা যে মনে হতে লাগল সাতযোজন ব্যাপী বৃত্তাকার নগরপ্রাচীরের উপর অসংখ্য ঘোড়া ছুটছে। তারপর পূর্ণক তার ঘোড়ার বেগ আরো বাড়িয়ে দিলে মনে হলো নগর-প্রাচীরের উপর ঘোড়া বা কোন প্রাণীই নেই। শুধু কুয়াশাজালের মত একটা জিনিস আচ্ছন্ন করে আছে গোটা প্রাচীরটাকে।

এর পর পূর্ণক তার ঘোড়া থেকে নেমে বলল, এখনো এর সবগুণ ও যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়নি।

এই বলে তার ঘোড়াটাকে প্রাসাদের বাইরে একটি পুকুরের উপর দিয়ে চালিয়ে দিল পূর্ণক। জলের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল ঘোড়াটা। তবু ক্ষুরে একটুও জল লাগল না।

তারপর ঘোড়াটাকে পদ্মপাতার উপর দিয়ে হাঁটাল। শেষে হাততালি দিয়ে হাতের তালুর উপর ঘোড়াটাকে চার পা জড়ো করে দাঁড় করাল।

পূর্ণক এবার রাজাকে বলল, দেখুন মহারাজ, আমার এই ঘোড়াকে অশ্বরত্ন বলা যায় কি না।

রাজা সেকথা অকুণ্ঠভাবে মেনে নিলে তার মণিরত্নের ক্ষমতা দেখাতে লাগল পূর্ণক।

পূর্ণক বলল, এই মণির ভিতর নগর, অট্টালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, পশু, নাগ, গরুড়, চতুরঙ্গ সেনাদল প্রভৃতির বিচিত্র মূর্তি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যা দেখে শত্রুদের হৃদয় কম্পিত হয়।

এইভাবে তার মণির গুণ বর্ণনা করার পর পূর্ণক বলল, আমি পাশাখেলায়

পরাজিত হলে এই মণি আপনাকে দেব। কিন্তু আপনি পরাজিত হলে কি দেবেন বলুন।

রাজা বললেন, আমার মহিষী এবং রাজছত্র ছাড়া আর সবই পণ রাখলাম।

এর পর কুরুরাজ একশো মিত্ররাজাকে নিয়ে পূর্ণককে সঙ্গে করে দ্যূত-সভায় গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

পূর্ণক বলল, মহারাজ, পাশাখেলায় মানিক, সাতট প্রভৃতি চব্বিশ রকমের দান আছে। আপনার ইচ্ছামত যে কোন দান ফেলুন। আপনিই প্রথম দান ফেলবেন।

কুরুরাজের পূর্বজন্মের এক মাতা তাঁর রক্ষাকারিণী দেবতারূপে তাঁর কাছে কাছে থাকতেন। তাঁরই জন্য তিনি সব পাশাখেলায় জয়লাভ করতেন। রাজা সেই দেবতাকে স্মরণ করে পাশা খেললেন। কিন্তু যক্ষসেনাপতি পূর্ণকও মায়াশক্তির অধিকারী ছিল বলে রাজার রক্ষাকারিণী দেবতা কিছুই করতে পারলেন না।

পাশাখেলায় পরাজিত হলেন কুরুরাজ।

রাজা তখন বললেন, আমার যত গরু, ঘোড়া, রত্ন. মণি আছে সব নিয়ে চলে যাও।

পূর্ণক বলল, আপনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রত্ন হলো বিদুরপণ্ডিত। আমি ত সেই রত্ন চাই। আমি পণ দ্বারা তাঁকে লাভ করেছি।

রাজা বললেন, বিদুর একজন জীবন্ত মানুষ, পণের ধনের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। বিদুরপণ্ডিত আমার আত্মা, আমার শরণ। তাকে আমি ছাড়তে পারি না।

পূর্ণক বলল, বিদুরকে নিয়ে বাদ প্রতিবাদের প্রয়োজন নেই। তাঁর কাছে চলুন। তিনিই বিচার করে ঠিক করে দেবেন।

রাজা তাতে সম্মত হয়ে পূর্ণককে নিয়ে বিদুরের ধর্মসভায় চলে গেলেন। রাজাকে দেখে আসন ছেড়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন বিদুর।

পূর্ণক বিদুরকে বললেন, পণ্ডিতবর, ত্রিভুবনে আপনার কীর্তিকথা শোনা যায়। আপনি ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী। নিজের প্রাণরক্ষার খাতিরেও মিথ্যা বলেন না আপনি। আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। তার সদুত্তর দান করুন। এর দ্বারা আপনার ধর্মপরীক্ষা হবে।

বিদুর তাতে রাজী হলে পূর্ণক বলল, আপনি রাজার দাস না, জ্ঞাতি? কি ধরনের সামাজিক মর্যাদা ভোগ করেন আপনি?

বিদুর বললেন, সমাজে চার রকমের দাস আছে। গর্ভদাস অর্থাৎ দাসীর গর্ভে যার জন্ম, ক্রীতদাস অর্থাৎ যাকে টাকা দিয়ে কেনা হয়, স্বেচ্ছাদাস অর্থাৎ যে নিজের স্বার্থে অপরের দাসত্ব করে আর ভয় দাস অর্থাৎ শত্রুর ভয়ে যে প্রবলের দাসত্ব করে। আমি হচ্ছি রাজার গর্ভদাস বা দাসীর পুত্র। আমি রাজার জ্ঞাতি নই। আমার কোন কুলগৌরব বা সামাজিক মর্যাদা নেই।

বিদুরের কথা শুনে রাজা ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু পূর্ণক খুশি হলো। রাজা বললেন, ইনি যদি দাস হন তাহলে তুমি ওঁকে নিয়ে যেতে পার।

পূর্ণক বিদুরকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে রাজা বিদুরকে বললেন, আমি আপনাকে ঘরবাস সম্পর্কে প্রশ্ন করছি, তার উত্তর দিন।

রাজা প্রশ্ন করলেন, গৃহস্থেরা যখন তাদের আপন আপন ঘরে বাস করে তখন কি করলে তারা সর্বজনপ্রিয় হয়?

বিদুর উত্তরে বললেন, যে সব গৃহস্থ সৎ পথে চলে, যাদের কোন হিংসা ও অহঙ্কার নেই, যারা সংযমী এবং বৃথা তর্কবিতর্ক বা ঝগড়াবিবাদ করে না, যারা গুনবান ও মিষ্টভাষী তারাই সর্বজনপ্রিয় হয়। মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে তারা সকল দুঃখ হতে মুক্তি পায়।

এর পর রাজা প্রীত হয়ে চলে গেলেন ধর্মসভা থেকে। পূর্ণক বিদুরকে বলল, এবার চল আমরা যাই। রাজা তোমাকে দান করেছেন আমার হাতে।

বিদুর বললেন, জানি, এখন আমি আপনার দাস। আপনি যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। তবে মাত্র তিন দিন আমি ভিক্ষা চাই আপনার কাছে। আমি তিন দিন আমার বাড়িতে থেকে আমার পুত্রদের উপদেশ দেব।

পূর্ণক বলল, ঠিক আছে, আমিও তিন দিন তোমার বাড়িতেই থাকব। তারপর তোমাকে নিয়ে চলে যাব।

বিদুর বা বোধিসত্ত্ব তিন ঋতুতে ক্রৌঞ্চ, ময়ূর ও প্রিয়কের নামে তিনটি প্রাসাদে বাস করতেন। পূর্ণককে সঙ্গে নিয়ে তা সব দেখালেন বিদুর। তারপর একটি সুসজ্জিত প্রাসাদে গিয়ে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এর পর বিদুর তার সব পুত্রদের ডাকিয়ে আনিয়ে এক জায়গায় সমবেত করে তিন দিন ধরে তাদের উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন।

বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্মপালকে বললেন, রাজা আমাকে পূর্ণকের হাতে

দান করেছেন। ইনি আমাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবেন। তোমাদের সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তোমরা সারাজীবন ভালভাবে যাতে রাজার সেবা করে যেতে পার সেজন্য 'রাজপরিচর্যা' সম্বন্ধে আমি তোমাদের কিছু উপদেশ দেব।

একথা শুনে বিতুরের স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা কাঁদতে লাগল। বিতুর তাদের শান্ত করে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, যারা জ্ঞানবান, শীলবান, ক্রোধহীন, অহঙ্কারহীন, হিংসাশূন্য এবং সর্বদা রাজহিত পরায়ণ তারাই রাজার প্রকৃত সেবক। রাজকার্যসাধনে যে সব সময় তৎপর হয়, রাজার থেকে হীনভাবে চলতে পারে, ঐশ্বর্য ও ভোগসুখে যার কোন লালসা নেই সেই রাজার প্রকৃত সেবক। যে ব্যক্তি শীলবান, সুপণ্ডিত ও শ্রমন-ব্রাহ্মণদের সেবা করে ভক্তিভরে, সেই রাজকুলের প্রকৃত সেবক।

এইভাবে পুত্রদের উপদেশ দিতে দিতে তিন দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন সকালে পূর্ণকের সঙ্গে যাবার আগে রাজার কাছে বিদায় নিতে গেলেন।

রাজাকে সেকথা বলতেই রাজা তুঃখিত হলেন। বিতুরপণ্ডিতকে ছাড়তে কিছুতেই মন চাইছিল না রাজার।

রাজা বললেন, পণ্ডিতবর, আপনি চলে যাবেন শুনে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আমি কৌশলে মানবককে ডাকিয়ে আনিয়ে বধ করে সব কথা চাপা দিয়ে দেব।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব বললেন, আপনার মত লোকের পক্ষে এ কাজ শোভা পায় না রাজা।

এই বলে রাজাকে প্রণাম করে রাজকর্মচারিদের উপদেশ দিয়ে রাজভবন থেকে বেরিয়ে এলেন বিতুর। সকলেই হাহাকার করতে লাগল: অনেকে কেঁদে ফেলল তুঃখে।

পূর্ণকের কাছে বিতুর ফিরে এলে পূর্ণক বলল, আমি যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাব সেই ঘোড়ার পুচ্ছ তুহাতে ধরে নির্ভয়ে দীর্ঘপথ তোমায় যেতে হবে পণ্ডিত। জীবলোকের সঙ্গে এই তোমার শেষ দেখা।

বিতুর দৃঢ়ভাবে বললেন, কায়মনোবাক্যে আমি যদি কখনো কোন তুষ্কর্ম না করে থাকি তাহলে আমার কোন তুর্গতি হবে না: আমি ভয় পাব কেন?

এই বলে বিতুর ঘোড়ার লোমগুলিকে তুভাগ করে তুহাতে ধরে নিজের পা তুটিকে ঘোড়ার উরুর উপর চেপে রেখে বললেন, এবার চল।

পূর্ণকের ঘোড়াটি লাফ দিয়ে আকাশে উঠল। আকাশপথে সে ঘোড়া

ছুটলেও কোন পাহাড়ে বা গাছে আঘাত লাগল না বিদুরের। অবশেষে কালাগিরির পাহাড়ে গিয়ে থামল পূর্ণক।

এরপর পাহাড়ের উপর বিদুরকে দাঁড়াতে বলে পূর্ণক ভাবল বিদুর পণ্ডিত জীবিত থাকলে তার মন বাসনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই তাকে বধ করতে হবে। তাছাড়া বিদুরের হৃৎপিণ্ডটা নাগলোকে গিয়ে বিমলাকে দিলে ইন্দরতিকে সে বিয়ে করতে পারবে। ইন্দরতিকে নিয়ে সে দেবলোকে যেতে পারবে।

পূর্ণক ভাবল একে নিজের হাতে বধ না করে ভীষণাকার মূর্তি দেখিয়ে এমনভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করতে হবে যাতে নিজেই মারা যায় বিদুর। এই ভেবে সে ভীষণাকার রাক্ষস হয়ে বিদুরকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাকে মুখে পুরে ফেলল। এমনভাব দেখাল যাতে মনে হলো সে বিদুরকে গ্রাস করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু তাতে কোন ভয় পেলেন না বিদুর।।

এর পর সিংহের রূপ ধারণ করল পূর্ণক। দাঁত বার করে ভয় দেখাল। কিন্তু তাতে ভয়ের কোন রোমাঞ্চ জাগল না বিদুরের মধ্যে।

তারপর মহামত্ত হস্তীরূপ ধারণ করে বিদুরকে পা দিয়ে পিষে ফেলতে গেল পূর্ণক। কিন্তু তাতেও ভয় পেলেন না বিদুর।

তখন বিশালকায় এক ভয়ঙ্কর সর্পরূপে বিদুরকে জড়িয়ে ধরল পূর্ণক। তার মাথার উপর ফণা বিস্তার করে রইল। কিন্তু ভয়ের কোন চিহ্ন দেখালেন না বিদুর।

তখন পূর্ণক ভাবল পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে তার দেহের অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। কিন্তু পাহাড় থেকে বিদুরকে ফেলে দিতে গেলেও বিদুর ভয় পেলেন না।

তখন পাহাড়টাকে দোলাতে লাগল পূর্ণক। কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না।

পূর্ণক এবার পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে মহাশব্দ করতে লাগল। সে শব্দে সমস্ত পাহাড় কাঁপতে লাগল। পূর্ণক ভাবল সেই ভয়ঙ্কর শব্দে বিদুরের হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে। কিন্তু বিদুর কিছুমাত্র ভয় পেলেন না তাতে। কারণ তিনি ভাবলেন পূর্ণকই নানাভাবে ভয় দেখাচ্ছে তাঁকে।

পূর্ণক এবার ভাবল বিদুরকে নিজের হাতে বধ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সে তাই বিদুরকে ধরে উপর দিকে পা আর নিচের দিকে মাথা করে দোলাতে দোলাতে উপরে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু বিদুরের তাতে কোন ক্ষতি হলো না। তিনি শূন্য থেকে পড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পূর্ণক তখন বিদুরকে বলল, আমিই সেই কুবেরের প্রধান সচিব পূর্ণক। নাগরাজ বরুণের কন্যার আমি পানিপ্রার্থী। কিন্তু তোমার হৃৎপিণ্ড নাগ-রাজের মহিষীকে না দিলে তার কন্যাকে আমি লাভ করতে পারব না।

বিদুর বললেন, তুমি মূঢ়ের মত আচরণ করো না যক্ষ। আমাকে বধ করলে তোমার প্রিয়ার কোন ইষ্টই সাধিত হবে না।

পূর্ণক বলল, আমি মূঢ় নই। সুতন্বী, সুনেত্রা, সুচারুবদনা, শুচিস্মিতা, ইন্দরতির মত রত্নকে লাভ করার জন্যই আমি এ কাজ করছি। এত চেষ্টা করছি। তোমার হৃৎপিণ্ড বিমলাকে দান করলেই তুষ্ট হয়ে তাঁর কন্যাকে দান করবেন তিনি।

পূর্ণকের কথা শুনে বিদুর ভাবলেন, আমার হৃৎপিণ্ডের দ্বারা বিমলার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। তাছাড়া নাগরাজ বরুণ একদিন আমার ধর্মকথা শুনে মণি দিয়ে আমাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। তিনি বাড়ি গিয়ে মহিষী বিমলাকে সেকথা বললে বিমলা হয়ত আমার মুখ থেকে ধর্মকথা শুনতে চেয়েছিলেন। বিমলার মনের ভাব বরুণ বুঝতে না পেরেই হয়ত পূর্ণককে আমায় বধ করার নিষ্ঠুর আদেশ দান করেন।

এই ভেবে বিদুর পূর্ণককে বললেন, সত্যই যদি আমার হৃৎপিণ্ডে তোমার প্রয়োজন থাকে তাহলে যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয় ততক্ষণ আমি তোমার কাছে সাধনধর্ম বর্ণনা করব। তুমি তা মন দিয়ে শোন।

এ কথা শুনে পূর্ণক ভাবল, আমি বিখ্যাত বিদুর পণ্ডিতের মুখ থেকে সেই ধর্মকথা শুনব যা কোন দেবতা বা মানুষ এর আগে বলেনি।

তাই সে পাহাড়ের মাথার উপর বিদুরকে বসিয়ে নিজে তাঁর সামনে বসল।

বিদুর বললেন, আমার গা ধূলো কাদায় মলিন হয়ে উঠেছে। আমি ক্ষুধার্ত। এমন অবস্থায় ধর্মকথা বলতে পারি না।

পূর্ণক তখন বিদুরকে স্নান করিয়ে দিব্য বেশভূষায় ভূষিত করল। তারপর উত্তম খাদ্য ভোজন করতে দিল।

বিদুর তখন পাহাড়ের উপর একটি উত্তম আসন রচনা করালেন। তারপর তার উপর বসে তিনি সাধু নরধর্মের কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, গতানুগতিক হও, আর্দ্রহস্ত দাহন করো না, মিত্রদ্রোহী হয়ো না আর অসতী নারীর কাছে কখনো যেও না। এই চারটি হলো সাধু মানুষের ধর্ম।

কিন্তু বিদুর সংক্ষেপে এই ধর্মকথা বলায় তা বুঝতে পারল না পূর্ণক।

সে বিস্তারিতভাবে সে কথা বলতে বলল বিদুরকে। সে জিজ্ঞাসা করল, কি করে লোকে গতানুগতিক হয়? আর্দ্রহস্তের দাহন কিভাবে হয়? মিত্র-দ্রোহী কাকে বলে আর অসতীই বা কে?

বিদুর বললেন, যে ব্যক্তি বাড়িতে কোন অপরিচিত অতিথি এলে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে, ঘরে অন্ন না থাকলেও তাকে বসতে আসন দেয় এবং তার কল্যাণসাধনে রত হয় তাকেই বলা হয় গতানুগতিক।

যে হস্ত কখনো কোন যথার্থ অপরাধ করেনি বা কারো ক্ষতি করেনি তাকে বধ করা তার ক্ষতি করাকেই আর্দ্রহস্ত দাহন বলে।

যার ঘরে একটি রাত্রি যাপন করে অন্ন গ্রহণ করা হয় তার অনিষ্ট চিন্তা কখনো করতে নেই। যে গাছের ছায়ায় একবার শয়ন করা হয় সে গাছের কোন শাখা ভাঙ্গতে নেই। যে উপকারীর অনিষ্ট করে সে-ই মিত্রদ্রোহী।

কোন পুরুষের কাছ থেকে ধনরত্ন গ্রহণ করার পরেও যে নারী তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সেই নারীই অসতী।

এ কথা শুনে নিজের ভুল বুঝতে পারল পূর্ণক। সে বুঝতে পারল, বিদুর তাকেই মিত্রদ্রোহী বলছেন। কারণ সে যখন বিদুরের বাড়িতে তিন দিন থাকে তখন বিদুর তার পরম আদর যত্ন করেন। সুতরাং আমি যদি এই পণ্ডিতের অনিষ্ট সাধন করি তাহলে সাধুনরধর্ম হতে ভ্রষ্ট হব। নাগকন্যার আমার প্রয়োজন কি? আমি বরং এই পণ্ডিতকে কুরুরাজের কাছে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দেব তাঁর হাতে। নগরবাসীদের বিষন্ন মুখে হাসি ফুটে উঠবে আবার।

পূর্ণক এবার বিদুরকে বলল, তোমার বাড়িতে আমি তিন দিন অবস্থান করেছি। কত তৃপ্তি পেয়েছি তোমার আপ্যায়নে। তুমি আমার পরম মিত্র। আমি তোমার আর কোনরূপ শত্রুতা করব না। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। নাগদের কথা আর আমি ভাবি না। নাগরাজকন্যার কোন প্রয়োজন নেই আমার।

বিদুর বললেন তুমি এখন আমাকে আমার বাড়িতে না পাঠিয়ে নাগভবনে নাগরাজের কাছে নিয়ে চল।

পূর্ণক বলল, শত্রুতে ভরা সে পুরীতে যাওয়া উচিত হবে না।

বিদুর বললেন, আমি তো জীবনে কোন পাপ করিনি। যা হিতকর নয় এমন কাজ কখনো করিনি। সুতরাং আমি ভয় পাই না। তাছাড়া তোমার মত নিষ্ঠুর যক্ষের কঠিন মনকে যখন ধর্মকথা শুনিয়ে বিগলিত করেছি তখন

নাগরাজ ও তাঁর মহিষীর মনকেও ধর্মকথা শুনিয়ে নরম করব। তুমি নিয়ে চল আমায়।

পূর্ণক তখন ঘোড়ার পিঠে নিজের পিছনে বিদুরকে বসিয়ে নাগভবনে নিয়ে গেল। নাগভবনের ভিতরে গিয়ে পূর্ণক রাজার সামনে দাঁড়ালেন। তার পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন বিদুর পণ্ডিত।

রাজা তখন পূর্ণককে বললেন, পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড আনার জন্য মর্ত্যলোকে গিয়েছিলে তুমি? পণ্ডিতকে এনেছ?

পূর্ণক বলল, আমি তাঁকে সদুপায়ে এনেছি। তিনি আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

বিদুর নাগরাজকে কোন প্রীতি সম্ভাষণ না করায় নাগরাজ বললেন, পণ্ডিত আমাকে দেখে ভয় পেয়ে কোন কথা বলছেন না।

তা শুনে বিদুর বললেন, ভয় পাইনি। মৃত্যুভয়ে কাতর হইনি আমি। আমি বধ্য, আপনি বধার্থী। কোন বধ্য কখনো বধার্থীকে প্রীতি সম্ভাষণ করে না। এইজন্যই নীরব আছি আমি। আবার বধার্থীও কখনো বধ্যকে প্রিয় ভাষণ করে না।

একথা শুনে নাগরাজ বরুণ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, সত্য কথাই বলেছ হে পণ্ডিতবর। বধ্য ও বধার্থীর মধ্যে কখনো কোন প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময় হয় না।

বিদুর এবার রাজাকে প্রীতি সম্ভাষণ করে বললেন, হে রাজন, তোমার এই ঐশ্বর্য, এই বল বীর্য শাশ্বত মনে হলেও ত প্রকৃত পক্ষে তা নয়। তা মিথ্যা সব। কিন্তু তোমার এই মহারাজভবনটি কে নির্মাণ করছ, দেবতাগণ কি তোমাকে তা দান করেছেন না তুমি হঠাৎ পেয়ে গেছ অথবা তুমি কি নিজে নির্মাণ করেছ?

নাগরাজ বললেন, এ মহাভবন, এই বিপুল ঐশ্বর্য আমি দৈবাৎ পাইনি। দেবগণও আমায় দেননি। পূর্বজন্মের ধর্মকর্ম ও পুণ্য অনুষ্ঠানের বলেই এই সব পেয়েছি ও ভোগ করছি।

বিদুর বললেন, কি ব্রত পালন করেছ? কোন সুকৃতির ফলে এই ঋদ্ধি, এই মহিমা ও এই অর্থবল লাভ করেছ?

নাগরাজ বললেন পূর্বজন্মে যখন আমি ও আমার স্ত্রী নরলোকে নরদেহ ধারণ করেছিলাম, তখন শ্রদ্ধাশীল ও ধর্মপরায়ণ হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম করতাম। প্রথমে ব্রাহ্মণদের সেবা করতাম। এই সুকৃতির জন্যই এই ঋদ্ধি, মহিমা ও বীর্যবল লাভ করেছে।

বোধিসত্ত্ব বললেন, পুণ্যের ফল তাহলে তুমি জান। তাহলে সাবধানে এ জন্মের ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করো যাতে পরজন্মেও এই ঐশ্বর্য লাভ করতে পার।

নাগরাজ বললেন, নাগলোক শ্রমণ ব্রাহ্মণ নেই। এখানে কি করলে পরজন্মে আবার এই সব ঐশ্বর্য লাভ করতে পারব ?

বোধিসত্ত্ব বললেন, দুষ্টভাব ত্যাগ করে আশ্রিতপালনে ও পুণ্যকর্মে রত হও। তাহলে মৃত্যুর পর দিব্যধামে যেতে পারবে।

রাজা ভাবলেন, এই পণ্ডিতকে এবার বিমলার কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। এঁর মুখ থেকে ধর্মকথা শুনলে তার মনের পীড়া দূর হবে।

এরপর তিনি বিদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, পূর্ণক কি ভাবে নিয়ে এল আপনাকে ?

বিদুর বললেন, ইন্দ্রপ্রস্থধামে রাজা পাশাখেলায় পূর্ণকের কাছে পরাজিত হন। দ্যূতপণরূপে রাজা আমায় দান করেন পূর্ণককে। পূর্ণক কোন অসাধু উপায় প্রয়োগ করেনি।

বিদুরের এই সত্য কথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন নাগরাজ। তিনি তাঁর হাত ধরে বিমলার কাছে নিয়ে গেলেন।

নাগরাজ বিমলার কাছে গিয়ে তাকে বললেন, যার হৃৎপিণ্ড খেতে চেয়েছিলে, অতুল যাঁর প্রজ্ঞা, যার ধর্মকথা শুনে জীবগণ অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে মুক্ত হয় সেই সুপণ্ডিত বিদুর তোমার সামনে।

বিদুরকে দেখে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করল বিমলা। কিন্তু বিদুর কোন কথা না বলায় বিমলা বলল আমাকে ভয় পেয়ে কোন প্রীতি সম্ভাষণ করলেন না পণ্ডিত !

এর আগে নাগরাজকে এ কথার উত্তরে যা বলেছিলেন বিদুর এখানেও তাই বললেন।

এর পর একে একে নাগরাজ ও বিদুর পণ্ডিতের মধ্যে যা যা কথাবার্তা হয়েছিল বিমলা ও বিদুরের মধ্যেও তাই হলো। নাগরাজের মতো বিদুরের কথাতে সন্তুষ্ট হলো বিমলা। বরুণের মত বিমলাকেও ধর্মকথা শুনিয়ে বিদুর সন্তোষ সাধন করলেন তার।

তবু বিদুর রাজাও রাণীকে বললেন, মিত্র বলে আমাকে বধ করতে পারবে না এ চিন্তা ত্যাগ করো। যদি আমার হৃৎপিণ্ডে তোমাদের কোন উপকার

হয়, যদি কোন প্রয়োজন সাধিত হয় তাহলে বল, আমি নিজের হাতে সে হৃৎপিণ্ড উপড়ে দেব।

নাগরাজ বরুণ বললেন, প্রজ্ঞাই হলো পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড। আপনার সেই অতুল প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়ে পরম সন্তোষ লাভ করেছি আমরা।

এই বলে কন্যা ইন্দরতিকে পূর্ণকের হাতে সম্প্রদান করলেন নাগরাজ।

ইন্দরতির মত স্ত্রীরত্ন লাভ করে মহা আনন্দ লাভ করল পূর্ণক। আনন্দের সঙ্গে বিতুরের সঙ্গে শিষ্টালাপ করতে লাগল সে। সে বলল, আজ তোমার দয়াতেই ইন্দরতিকে লাভ করলাম আমি। এই উপকারের উপযুক্ত প্রতিদান-স্বরূপ এই মহামণি দান করলাম তোমায়। এটি গ্রহণ করো। আমি তোমাকে এখনি কুরুদেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।

বোধিসত্ত্ব বিতুর ও পূর্ণককে আশীর্বাদ করে বললেন, সুখে শান্তিতে সংসার করো। এবার আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থধামে পৌঁছিয়ে দাও।

এবার পূর্ণক তার ঘোড়ার পিঠে তার সামনে বিতুরকে বসিয়ে আকাশপথে কিছুক্ষণের মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলো।

ঐদিন ভোরবেলা ঘুমের ঘোরে এক স্বপ্ন দেখেছিলেন কুরুরাজ। সে স্বপ্নের অর্থ এই যে পূর্ণক বিতুর পণ্ডিতকে নিয়ে গিয়েছিল। সে-ই আবার তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে।

তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আজই বিতুর পণ্ডিত ফিরে আসবেন নগরে। সেই উপলক্ষে সমস্ত নগর ও প্রাসাদভবন সুসজ্জিত করার আদেশ দিলেন কুরুরাজ! নগরবাসীদেরও জানিয়ে দিলেন বিতুর পণ্ডিতের ফিরে আসার কথা।

সেই দিনই একসময় তার পক্ষিরাজ ঘোড়া থেকে বিতুর পণ্ডিতকে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে নামিয়ে দেয় পূর্ণক। তারপর সে ইন্দরতিকে নিয়ে দেবনগরে চলে যায়।

বিতুর পণ্ডিত ফেরার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট উল্লাসে ফেটে পড়ল নগরবাসীরা। কুরুরাজ সিংহাসন হতে উঠে এসে তুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন বিতুরকে। তারপর তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পূর্ণকের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে কি করে ফিরে আসতে পারলেন সে কথাও জিজ্ঞাসা করলেন।

বিতুর তখন প্রথম থেকে সব কথা খুলে বললেন। প্রথমে নাগরাজ আমার ধর্মকথা শুনে আমাকে একটি মণি উপহার দেন। তাঁর স্ত্রী বিমলা সেই মণির কথা জিজ্ঞাসা করলে আমার কথা বলেন তাকে। সে আমাকে দেখতেও আমার

মুখ থেকে ধর্মকথা শুনতে চায়। কিন্তু রাজা এমনিতে আমাকে নিয়ে যাবেন না বলে বিমলা বলে, আমার হৃৎপিণ্ড না খেলে তার রোগ সারবে না। সে এক দুরারোগ্য ব্যাধির ভান করতে থাকে। রাজা তখন তাঁর কন্যাকে এমন এক লোককে বিয়ে করতে বলেন যে বিদুরের হৃৎপিণ্ড আনতে পারবে। নাগরাজ-কন্যা ইন্দরতির সঙ্গে হঠাৎ এক পাহাড়ে উপর পূর্ণকের সঙ্গে দেখা হয়। পূর্ণক হচ্ছে যক্ষ সেনাপতি এবং কুবেরের প্রধান সচিব।

পূর্ণক আমাকে প্রথমে কালগিরি নামে এক পাহাড়ে নিয়ে আমাকে নানাভাবে বধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই আমায় বধ বরতে না পারায় আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। পূর্ণকের কাছ থেকে সে কথা শুনে আমি সাধু নর ধর্মকথা শোনালাম। পূর্ণক সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে মুক্তি দিতে চাইল। আমি কিন্তু তাকে নিয়ে নাগভবনে গেলাম। সেখানে নাগরাজ বরুণ ও তাঁর মহিষী বিমলাকে ধর্মকথা শুনিয়ে সন্তুষ্ট করলাম। তাঁর দুজনেই পরম প্রীত হলেন। পূর্ণক নাগরাজ কন্যা ইন্দরতিকে স্ত্রীরূপে লাভ করল এবং সানন্দে আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল।

বিদুরের কথা শুনে রাজা ও উপস্থিত সকলেই প্রীত হলেন। রাজার আদেশে প্রায় একমাস ধরে প্রাসাদে ও নগরমধ্যে উৎসব চলতে থাকল। রাজার আদেশে নগরবাসীরা সাধ্যমত নানা রকমের উপহার দিয়ে তাদের সম্মান দেখাল বিদুরের প্রতি।

এর পর থেকে শুধু রাজাকে নয়, রাজ্যের সব লোককে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগলেন বিদুর পণ্ডিতরূপী বোধিসত্ত্ব। এইভাবে বাকি জীবন কাটিয়ে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করলেন তিনি। কুরুরাজাও যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি বিদুরের উপদেশ অনুসারে দানাদি পুণ্য কর্ম করে দিন যাপন করতেন।



রবিন হুড

রবিন হুড

হাওয়ার্ড পাইল

সে আজ বহুকাল আগের কথা। ইংলণ্ডে তখন চলছিল রাজা হেনরির রাজত্ব। সেই সময় নটিংহামের কাছে শেরউড বনের মধ্যে রবিন হুড নামে এক নামকরা ডাকাত বাস করত। তার মত কুশলী তীরন্দাজ আর একটাও ছিল না সারা দেশের মধ্যে। তার দলে ছিল দেড়শো জন সুদক্ষ ও সুযোগ্য লোক। তারা সবাই ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত।

রবিন হুড ও তার দলের সব লোক ডাকাত হলেও দেশের লোক তাদের ভালবাসত। তাদের কাছে কখনো কোন লোক সাহায্য চাইতে গেলে শূন্য হাতে ফিরে আসত না কখনো কেউ।

কিন্তু রবিন হুড প্রথম থেকেই ডাকাত ছিল না। কি করে সে ডাকাত হলো সেই নিয়েই এক কাহিনী।

রবিন যখন ছিল আঠারো বছরের এক বলিষ্ঠ চেহারার সাহসী কিশোর তখন নটিংহামের শেরিফ তীরন্দাজদের এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করে। যে এই প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করবে সে পুরস্কার হিসাবে পাবে এক পিপে ভাল মদ আর একটি তীর ধনুক।

প্রতিযোগিতার কথাটা শুনে রবিন বলল, আমি আমার তীর ধনুক নিয়ে এতে অংশ গ্রহণ করব। আমি শুধু এক পিপে মদ চাই না, মেড মেরিয়ানের মুখে হাসি ফোটাতে চাই।

তখন বসন্তকাল। আপেল গাছে কুঁড়ি ফুটেছে। ফোটা ফুলের মিষ্টি গন্ধভরা বাতাস বন থেকে ছুটে এসে লুটোপুটি খেলে বেড়াচ্ছে ফাঁকা মাঠে।

সেদিন সকালবেলায় মেড মেরিয়ানের কথা ভাবতে ভাবতে শিষ দিতে দিতে বনপথ ধরে এগিয়ে চলেছিল রবিন। সহসা সে দেখল পথের ধারে একটা বিরাট গাছের তলায় রাজার বনবিভাগের পনের জন কর্মচারী বসে বসে মদ আর মাংস খাচ্ছে। তাদের পরনে ছিল উজ্জ্বল সবুজ পোশাক।

তাদের মধ্যে একজন খেতে খেতে রবিনকে ডেকে বলল, ওহে রবিন, তীর ধনুক নিয়ে কোথা যাচ্ছ?

রবিন তাদের বলল সে যাচ্ছে নটিংহামে তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে। রবিনের কথা শুনে তারা হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, ওহে অহংকারী ছোকরা, জয়ের কোন আশা নেই তোমার।

একথায় রেগে গেল রবিন। সে বাজী রেখে বলল, আমি কেমন তীর ছুঁড়তে পারি তা যদি দেখতে চাও তাহলে অদূরে যে একদল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হরিণটাকে আমি তীর নিয়ে বিদ্ধ করব।

এই বলে তার ধনুকে তীর জুড়ে তীর ছুঁড়ল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে তীরটা গিয়ে বিদ্ধ করল একটা হরিণকে।

গর্বের সঙ্গে রবিন বলল, দেখলে তো? কি মশাই, কেমন লাগল?

কিন্তু রবিনের এই সাফল্যে রেগে গেল রাজকর্মচারীরা। কারণ তারা হেরে গেছে বাজীতে। তার উপর রাজার যে হরিণ দলের ভার ছিল তাদের উপর সেই দলের একটা হরিণকে বধ করেছে সে।

কিন্তু রবিনের এই কৃতিত্বকে স্বীকার করল না রাজার লোকেরা। কোন কথাই বলল না তারা। তাদের দিকে একবার বিষন্ন মুখে তাকিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখান থেকে চলে গেল রবিন। রাগে দুঃখে ভারী হয়েছিল তার মনটা। রাজার লোকেরা তাকে উপহাস করছে অকারণে। মিথ্যা বাজী রেখে ঠকিয়েছে তাকে।

আপন মনে চলে যাচ্ছিল রবিন। কিন্তু যে লোকটা প্রথম কথা বলেছিল তার সঙ্গে সে বাজী হেরে গিয়ে রেগে গেল। তার উপর মদের নেশায় মাতাল হয়েছিল সে। সে তাই তার মাথা ঠিক রাখতে না পেরে হঠাৎ পিছন থেকে একটা তীর ছুঁড়ল রবিনকে লক্ষ্য করে। তীরটা রবিনের মাথায় বিঁধে তিন ইঞ্চি গর্ত করে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকিয়ে লোকটাকে দেখে রবিন বলল, তখন তুমি বলেছিলে আমি তীর ছুঁড়তে জানি না, তীরন্দাজ হিসাবে স্বীকার করতে চাওনি আমাকে। এবার তা অবশ্যই করবে।

রবিন এবার লোকটাকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা লোকটার বুকে বিঁধতেই সে আর্তনাদ করে পড়ে গেল। তার সঙ্গীরা উঠে দাঁড়াবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল রবিন বনের গভীরে।

সমস্ত আনন্দ আর উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেল রবিনের জীবন থেকে। সবুজ বনের মধ্য দিয়ে পাগলের মত ছুটতে লাগল সে। সে একটা মানুষকে খুন করেছে।

সেই থেকে বনের মধ্যেই রয়ে গেল রবিন বছরের পর বছর ধরে। সে ডাকাত হয়ে উঠল। শেরউড বন হয়ে উঠল তার ঘর। খুনের দায়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হলো রবিনের নামে। তাকে ধরে দিতে পারলে দুশো পাউণ্ড

পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করা হলো। নটিংহামের শেরিফ জোর গলায় শপথ করে বলল, সে রবিনকে বিচারের জন্য আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করবেই। শুধু পুরস্কারের লোভ নয়। রবিনের তীরে নিহত হয়ে ছিল শেরিফের আত্মীয়।

পুরো একটা বছর শেরউড বনের মধ্যে লুকিয়ে রইল রবিন। আরো অনেক ডাকাত সংগ্রহ করতে লাগল সে। অনেকে যারা খাদ্যের জন্য রাজার হরিণ মারার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে, যারা করের বোঝা বইতে পারত না, যাদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের খামার থেকে তারা সবাই রবিনের দলে চলে এল। রাজার নানারকমের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল তারা সবাই।

সেই বছর প্রায় একশো জন এইরকম ধরনের লোক এসে রবিনকে তাদের দলের নেতা নির্বাচিত করল। যে সব ধনী তাদের সর্বনাশ করেছিল, পথে সুযোগ পেলেই তাদের সবকিছু কেড়ে নিত তারা। তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া টাকাকড়ি দিয়ে গরীবদের সাহায্য করত তারা। সাধারণ মানুষ রবিন বা তার দলের লোকদের মোটেই ভয় করত না। তারা তার কথা নানা জায়গায় বলাবলি করত। এইভাবে রবিনের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল লোকের মুখে।

২

একদিন সকালবেলায় বনের মধ্যে যখন পাখি ডাকছিল গাছে গাছে তখন রবিন ও তার লোকেরা জেগে উঠল ঘুম থেকে। উঠেই একটা ছোট নদীর জলে মুখ হাত ধুয়ে ফেলল তারা।

রবিন তাদের বলল, আজ আমি একটা অভিযানে যাব এক জায়গায়। তোমরা এই খানেই থাকবে। দরকার হলে আমি তিনবার শিঙা বাজিয়ে ডাকব তোমাদের। তখন তাড়াতাড়ি আমার কাছে চলে যাবে।

শেরউড বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে বড় রাস্তাটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল রবিন। পথে অনেক রকম লোকের সঙ্গে দেখা হলো তার—এক সুন্দরী মহিলা, একটা মোটা ধর্মযাজক, এক বীর নাইট, গোলগাল এক কিশোরী। একে একে এদের দেখতে পেল সে।

অবশেষে একটা ঝর্ণার উপর একটা কাঠের সাঁকোর উপর এসে পড়ল সে।

রবিন দেখল ওধার থেকে লম্বা চওড়া একটা অচেনা লোক সাঁকোটা আগে পার হওয়ার জন্য ওপারে এসে হাজির হয়েছে। সাঁকোটায় একজন করে লোক পার হতে হয়। লোকটা রবিনের থেকেও লম্বা।

রবিন লোকটাকে বলল, দাঁড়াও। আগে আমি পার হব।

লোকটা বলল, আগে আমি পার হব। কারণ আমি তোমার থেকে ভাল।

দুজনেই বীরত্বের আস্ফালন করতে লাগল। রবিন তখন তাকে বলল, ঠিক আছে, সাঁকোর উপরেই লাঠি দিয়ে আমাদের লড়াই হোক। যে হারবে সে পড়ে যাবে ঝর্ণার জলে।

লোকটা হেসে বলল, ঠিক আছে, তুমি একটা লাঠি বানিয়ে নাও, আমি অপেক্ষা করছি।

লাঠি দিয়ে জোর লড়াই চলল সাঁকোর উপর। দুজনেই ঘুঁষি আর লাঠি চালাতে লাগল ভয়ঙ্করভাবে।

অচেনা লোকটি একসময় তার লাঠি দিয়ে রবিনের মাথায় মারতেই রবিন ঘুরতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল নদীর জলে। তাকে হারিয়ে দিতে পেরে হাসতে লাগল লোকটা।

রবিন জল থেকে উঠেই তার শিঙাটা বাজিয়ে দলের লোকদের ডাক দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তিরিশ জন সশস্ত্র লোক ছুটে এল রবিনের সাহায্যে।

রবিন অবশ্য লোকটিকে বলল, তুমি সত্যিই এক সাহসী এবং বীর যোদ্ধা।

লোকটি রবিনকে বলল, তুমিও বীরের মতই লড়াই করে আঘাত সহ্য করেছ।

রবিনের দলের লোকরা যখন শুনল অচেনা লোকটা তাদের নেতাকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে তখন তারাও তাকে জোর করে ফেলে দিতে যাচ্ছিল নদীর জলে। কিন্তু লোকটার গায়ের জোর এত বেশী যে তারা কিছুতেই তাকে জলে ফেলতে পারল না। উল্টে তাদের মধ্যে দু চারজন লোকটার লাঠির ঘায়ে আহত হলো।

রবিন তখন লোকটার শক্তি আর সাহসের পরিচয় পেয়ে বলল, তুমি আমাদের দলে যোগ দাও।

লোকটা বলল, যদি তোমাদের কেউ আমার থেকে ভাল তীর ছুঁড়তে পারার পরিচয় দিতে পারে তাহলে আমি অবশ্যই যোগ দেব তোমাদের দলে।

রবিন বলল, ঠিক আছে তুমি আগে তীর ছোঁড়। পরে আমি ছুঁড়ব।

রবিনের লোকরা বলল, আমাদের নেতা সবচেয়ে ভাল তীর ছুঁড়তে পারে। ঠিক আছে, তুমি আগে তীর ছোঁড়।

লোকটি তখন একটা বড় তীর ধনুক নিয়ে প্রায় আশী গজ দূরের একটা ওক গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা গাছের গুঁড়িতে বিঁধে রইল।

রবিনের লোকেরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল লোকটাকে।

এবার রবিন নিজে একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা গাছের গুঁড়িতে বিঁধে থাকা তীরটার উপর লেগে সেটাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিল।

রবিনের লোকরা আনন্দে লাফিয়ে উঠে মাথার টুপি নাড়তে লাগল।

আগন্তুক লোকটিও বলল, সত্যিই তীরটা খুব ভাল ছোঁড়া হয়েছে। আমিও তোমাদের দলের একজন হব। আমার নাম হলো জন।

তখন রবিনের দলের একজন লোক ঠাট্টা করে বলল, তোমার চেহারাটা ত বেশ ছোট আর বেঁটে খাটো, তাই আমরা তোমাকে 'ক্ষুদে জন' বলে ডাকব।

এই বলে রবিনের সেই লোকটি জনের মাথায় একপাত্র মদ ঢেলে দিল। সকলে হো হো করে হাসতে লাগল!

জন প্রথমে কিছুটা রেগে গিয়েছিল। কিন্তু পরে সব কিছু বুঝতে পেরে সেও তাদের সঙ্গে যোগ দিল হাসিতে। রবিন তখন তাকে অন্য সকলের মত একটা সবুজ রঙের পোশাক আর একটা ভাল ইউকাঠের তৈরী ধনুক দিল।

এইভাবে রবিনের দলের একজন সদস্য হয়ে গেল ক্ষুদে জন।

৩

নটিংহামের শেরিফ রবিনের নামে পরোয়ানা বার করে তাকে ধরিয়ে দিয়ে দুশো পাউণ্ড পুরস্কার নেবে একথা জোর গলায় বলেছিল। কিন্তু রবিন ও তার দলের লোকেরা কোথায় থাকত তার কিছুই জানত না। সে ভেবেছিল শহরের লোকরা তাকে সাহায্য করবে রবিনকে ধরার ব্যাপারে।

নটিংহাম শহরের সব লোকই রবিন কোথায় থাকত তা জানত। কিন্তু কেউ শেরিফের পরোয়ানা তার হাতে পৌঁছে দেবার জন্য গেল না। সবাই বলল, আমরা জানি না রবিন কোথায় থাকে।

রবিন হুডের কাছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠাবার মত কোন লোক নটিংহামশায়ারে না পেয়ে শেরিফ বনবেরিতে তার দূত পাঠাল।

সেখানে শেরিফের দূত গিয়ে এক কামারকে ঠিক করল। সে ফুটো বাসনপত্র মেরামত করে বেড়াত। সে বলল, আমি রবিনকে ধরে দেব।

একদিন সকালে নটিংহামের খবরাখবর নেবার জন্য শহরের মধ্যে এসে হাজির হলো রবিন। তার পিস্তলটা কোমরের মধ্যে ঝোলানো ছিল আর তীর ধনুকটা ছিল পিঠের উপর। তার হাতে ছিল ওক কাঠের এক লাঠি।

একটা গলির ভিতর দিয়ে যাবার সময় রবিন দেখল উল্টো দিক থেকে এক বাসন ঝালাইওয়ালা গান করতে করতে আসছে। তার পিঠে ঝোলানো ছিল একটা ব্যাগ আর হাতুড়ি।

রবিন তাকে ডাকতেই দুজনে মিলেমিশে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। তারপর কিছু মদ খাবার জন্য এক পান্থশালার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

রবিন লোকটিকে বলল, তুমি ত অনেক জায়গায় যাও। কি খবর বল।

বাসন ঝালাইকারী লোকটি বলল, আমার কাছে শেরিফের দেওয়া এক পরোয়ানা আছে। রবিন হুড নামে এক সাহসী ডাকাতের খোঁজ করছি আমি। তাকে ধরে দিতে হবে। তুমি জান এই লোকটাকে ?

রবিন বলল, আজ সকালেই দেখেছি রবিন হুড নামে লোকটাকে। সবাই বলে খেঁকশিয়ালের মত ধূর্ত লোকটা। খুব সাবধানে থাকবে। লোকটা তোমার কাছ থেকে পরোয়ানাটাই চুরি করে নিয়ে পালাতে পারে।

লোকটা বলল, আমিও কম ধূর্ত নই। কিন্তু তাকে দেখতে কেমন বলতে পার ?

অনেকটা আমার মত। আমার সমবয়সী এবং চেহারাটাও তার আমারই মত। এমনকি তার চেহারাটাও আমারই মত নীল।

ঝালাইকারী লোকটা বলল, আমি ত ভেবেছিলাম লোকটার মুখে বড় দাড়ি আছে।

দাড়িটা তত বড় নয়। সবাই বলে সে নাকি একজন বড় যোদ্ধা।

এইভাবে কথা বলতে বলতে 'ব্লু বোর ইন' নামে পান্থশালার মধ্যে প্রবেশ করল তারা। গ্রীষ্মকালে শীতল ছায়ায় ঘেরা আর শীতকালে গরম ও আরামদায়ক এই পান্থশালাটা রবিনের চেনা। সে ও তার দলের লোকেরা শীতকালে বরফ পড়তে থাকলে এখানে প্রায়ই আসত।

পান্থশালার মালিকও রবিনকে চিনত। রবিন জানত তার সঙ্গী মদ খেয়ে

বেহুঁস হয়ে পড়বে। সে কিন্তু বেশী মদ খেল না। শুধু ঠোঁটদুটো নামমাত্র ভিজিয়ে নিল।

তার সঙ্গী লোকটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মদ খেয়ে নেশার ঘোরে গান গাইতে লাগল। তার মাথাটা টলতে লাগল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। রবিন তখন হাসতে হাসতে লোকটার কাছ থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা বার করে নিল।

পরদিন এক রাস্তার মোড়ে লোকটার সঙ্গে দেখা হলো রবিনের।

রবিন তাকে হাসিমুখে সম্ভাষণ জানালে গম্ভীর হয়ে মুখটা ভার করে রইল লোকটা। সে বলল রবিন শুধু গতকাল পান্থশালায় মদের দাম না দিয়েই চলে আসেনি, তাকে ফেলে রেখে তার কাছ থেকে চাতুরী করে পরোয়ানাটা বার করে নিয়েছে।

এই বলে সে লাঠি দিয়ে আক্রমণ করল রবিনকে। রবিনও সঙ্গে সঙ্গে তার লাঠি দিয়ে তার আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটার লাঠির ঘায়ে তার লাঠি ভেঙ্গে গেল।

রবিন তখন তার শিঙাটা নিয়ে তিনবার বাজাল।

লোকটা বলল, যত খুশি শিঙা বাজাও। কিন্তু শেরিফের কাছে তোমায় যেতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে জন ও রবিনের দলের ছয়জন লোক বনের ভিতর থেকে ছুটে এল।

জন রবিনকে জিজ্ঞাসা করল, শিঙা বাজাচ্ছিলে কেন মালিক? কি হয়েছে?

রবিন বলল, এই ঝালাইকারী লোকটা আমাকে ফাঁসি দেবার জন্য নটিংহাম নিয়ে যেতে চায়।

জন বলল, তাই নাকি?

এই বলে সে ঝালাইকারী লোকটার হাত দুটো বেঁধে ফেলল।

কিন্তু রবিন জনকে বাধা দিয়ে বলল, না না বেঁধো না। লোকটা ভাল এবং সাহসী। তার উপর ভাল গান গায়।

এই বলে লোকটার পানে তাকিয়ে সে বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে? বছরে তিনটে সবুজ পোশাক আর চব্বিশ মার্ক বেতন পাবে।

লোকটা তাতে রাজী হয়ে গেল। তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা বনের গভীরে ঢুকে গেল। সেই থেকে রবিনদের দলে থেকে গেল ঝালাইকারী লোকটা।

৪

এদিকে শেরিফের পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় দারুণ রেগে গেল সে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, ঝালাইকারী লোকটাকে একবার ধরতে পারলে ফাঁসি দেবে তাকে। সেই থেকে ঘর থেকে কোথাও বেরোত না শেরিফ। কারো সঙ্গে কোন কথা বলত না। দিনরাত ঘরের মধ্যে ভেবে ভেবে রবিনকে ধরার জন্য নতুন করে এক ফন্দী আঁটতে লাগল সে।

অবশেষে সে এক অব্যর্থ উপায় খুঁজে পেল।

শেরিফ ঠিক করল, তীর ছোঁড়ার এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করবে। তাতে বিজয়ী তীরন্দাজদের জন্য এক লোভনীয় পুরস্কারের কথা ঘোষণা করবে। সে পুরস্কারের কথা শুনে রবিন নিশ্চয় সব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসবে। সে এলে এমনভাবে তাকে ঘিরে ফেলবে শেরিফ যে পালাবার কোন পথ পাবে না সে।

এই ভেবে চারদিকে দূত পাঠিয়ে প্রতিযোগিতার কথাটা ঘোষণা করে দিল শেরিফ। সেই সঙ্গে ঘোষণা করে দিল এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তীরন্দাজকে পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে একটি খাঁটি সোনার তীর।

রবিন প্রথমে কথাটা শুনল লিঙ্কন শহরে। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শেরউড বনে চলে গেল সে। তার দলের লোকদের ডেকে বলল, শেরিফ তীর ছোঁড়ার এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেছে। আমি তাতে অংশগ্রহণ করতে চাই। তোমরা কি বলতে চাও বল।

ডনকাস্টারের তরুণ যুবক ডেভিড বলল, আমি ব্লুস্টার ইনে আমার ঈভম নামে এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি শয়তান শেরিফ তোমাকে ধরার জন্য এক ফাঁদ পেতেছে। সুতরাং যেও না মালিক। সে তোমার ক্ষতি করতে চায়।

রবিন তখন ডেভিডকে বলল, তোমরা শুধু তোমাদের কানগুলোকে খাড়া করে মুখগুলোকে বন্ধ করে রাখবে। জেনে রাখবে, আমি শেরিফকে ভয় করি না। সে আমার সঙ্গে ছলনা করলে আমিও তার সঙ্গে ছলনা করব। আমরা সবাই সেখানে যাব ছদ্মবেশ ধারণ করে। সোনার তীরটা আমায় নিতেই হবে। যদি আমি জয়লাভ করি তাহলে তীরটা আমি একটা গাছে ঝুলিয়ে রাখব।

প্রতিযোগিতার দিন অনুষ্ঠানের জায়গাটাকে নানা রঙের ফুল আর ফিতে

দিয়ে সাজানো হলো। জায়গাটার চারদিকে বেঞ্চ পাতা ছিল। সেগুলো দর্শকদের ভিড়ে ভরে গেল।

শেরিফ মঞ্চের উপর বসে চোখ মেলে প্রতিযোগীদের পানে তাকিয়ে রবিনের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু রবিন ও তার দলের লোকেরা লিঙ্কন সাজের যে পোশাক পরত সে পোশাকপরা একজনকেও দেখতে পেল না।

প্রথম দু রাউণ্ডের পর তিনজন তীরন্দাজ জিতল। তারা হলো গিল অফ দি রেড ক্যাপ, এ্যাডাম অফ দি ডেল আর একজন অচেনা লোক যার পরণে ছিল ছেঁড়া লাল পোশাক। এই অচেনা লোকটার চেহারাটা ছিল রবিনহুডের মত দেখতে। তার মাথার উচ্চতা আর দেহের গঠন ছিল রবিন হুডের মত। তবে তার মাথার চুল আর দাড়িটা ছিল বাদামী রঙের। রবিন হুডের চুল দাড়ির রংটা ছিল সোনালি।

ছেঁড়া ফাটা পোশাকপরা অচেনা লোকটা যখন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এগিয়ে গেল তখন দর্শকরা হাসতে লাগল। কারণ তার একটা চোখ কানা। কিন্তু একটা চোখ দিয়ে তীর ছুঁড়ে সে যখন লক্ষ্য বিদ্ধ করে প্রথম স্থান অধিকার করল তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সবাই।

শেরিফ তার হাতে বিজয়ীর পুরস্কারস্বরূপ সোনার তীরটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

অচেনা লোকটি বলল, আমাকে জন অফ টেডিওৎডেল বলে ডাকে।

শেরিফ বলল, সেই কাপুরুষ রবিন হুডটার থেকে তুমি ভাল তীর ছুঁড়তে পার। সে আজ আমার ভয়ে আসেনি এখানে। তুমি আমার কাছে কাজ করবে?

সেই অচেনা লোকটি বলল. না, আমি কারো অধীনে কাজ করি না।

সেদিন শেরউড বনে এক ভোজসভার আয়োজন হলো। ছদ্মবেশী রবিনের সঙ্গে তার দলের যেসব লোকেরা ধর্মযাজক, ভিখারী ও চাষীর বেশে গিয়েছিল প্রতিযোগিতা দেখতে, তারা ফিরে গিয়ে সেই ভোজসভায় যোগ দিল।

ভোজসভার পর রবিন জনকে ডেকে বলল, শেরিফ আমাকে কাপুরুষ বলুক এটা আমি চাই না।

জন বলল, আমি গিয়ে শেরিফকে এমন খবর দেব যা সে আশা করতে পারে নি কখনো।

এদিকে শেরিফ যখন তার প্রাসাদে ভোজসভায় টেবিলের ধারে বসে

খাচ্ছিল তখন হঠাৎ জানালা দিয়ে একটা তীর এসে পড়ল তার খাবারের টেবিলে। তীরটার মুখের কাছে একটা লেখা কাগজ জড়ানো ছিল।

শেরিফের একজন লোক কাগজটা তীর থেকে খুলে নিয়ে সেটা পড়ল। "শেরউড বনের সকলে আজ প্রার্থনা জানাচ্ছে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কারণ আজ তুমি আনন্দোচ্ছল রবিন হুডকে নিজের হাতে পুরস্কার দান করেছ।"

শেরিফ বলল, কোথা থেকে এল তীরটা?

লোকটি বলল, জানালা দিয়ে প্রভু।

৫

শেরিফ যখন আইন বা চাতুরীর দ্বারা রবিনকে ধরতে পারল না তখন সে শক্তি প্রয়োগ করতে চাইল। সে তখন তিনশো জন সৈন্যকে শেরউড বনটাকে ঘিরে ফেলে রবিনকে জীবন্ত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনার হুকুম দিল। আর বলে দিল, একাজ করতে পারলে তিনশো পাউণ্ড ওজনের রূপো পুরস্কার দেওয়া হবে।

শেরিফের এই পরিকল্পনার কথা শুনে রবিন বলল, শক্তির লড়াইয়ে শুধু রক্তপাত হয়। আমি জীবনে শুধু একবার একটা লোক খুন করেছি। আর আমি কোন লোক খুন করতে চাই না।

সুতরাং সে তার দলবল নিয়ে সাতদিন ধরে লুকিয়ে রইল বনের গভীরে। আর এই সাতদিন ধরে শেরিফের সৈন্যরা সারা বন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াল। কিন্তু লিঙ্কন সবুজ পোশাকপরা একটা লোককেও দেখতে পেল না কোথাও।

আটদিনের দিন রবিন তার লোকদের বলল, আজ আমি জানতে চাই শেরিফের লোকরা এখন কোথায় আছে। উইল স্টিউটলি, তুমি গিয়ে জেনে এস।

এক ধর্মযাজকের বেশ ধরে ব্লু বোর ইনে চলে গেল উইল। তার পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখল এক তরবারি।

ব্লু বোর ইনে গিয়ে উইল ভিতরে এক জায়গায় বসল। যাজকের আলখাল্লার ভিতরে তার সবুজ পোশাকটা ঢাকা ছিল।

উইল দেখল শেরিফের লোকরা সেই ঘরেরই একধারে বসে মদ খাচ্ছে আর হৈ হট্টগোল করছে।

একসময় উইলের পায়ের কাছে এসে একটা ধেড়ে ইঁদুর তার পায়ে মুখটা ঘষতে লাগল। তখন তার পোশাকটা একটু সরে যেতেই শেরিফের লোকরা তার ভিতরের সবুজ পোশাকটা দেখতে পেল। উইল সঙ্গে সঙ্গে তার উপরের পোশাকটা নামিয়ে দিল। কিন্তু তার আগেই শেরিফের লোকেরা চিনতে পারল সে রবিন হুডের লোক।

এদিকে রবিন যখন বনের মধ্যে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল তখন তার দুজন লোক মেকেন নামে পান্থশালার মালিকের মেয়েকে সঙ্গে করে এনে রবিনকে খবর দিল শেরিফের লোকদের হাতে উইল ধরা পড়েছে। রবিন উইলের কথাই তখন ভাবছিল।

মেকেন আরও বলল, উইল আহত হয়েছে। শেরিফের লোকরা বলছে আগামী কালই তার ফাঁসি হবে।

রবিন বলল, না, তার ফাঁসি হবে না। আগামী কালই তাকে আমি ছাড়িয়ে আনব, না পারি ত তার সঙ্গে মরব।

এই বলে সে জোরে তার শিঙা বাজাল।

পরদিন রবিন তরুণ ডেভিডকে উইলের কোথায় ফাঁসি হবে তা জানার জন্য পাঠিয়ে দিল। তারপর তার দলের লোকদের বলল, আমরা সবাই বিভিন্ন পথ দিয়ে নটিংহামে যাব। সেখানকার জনগণের সঙ্গে মিশে সব কথা বলব তাদের।

কাউকে অকারণে বা বিনা প্রয়োজনে আঘাত করবে না। ওখানে গিয়ে সবাই মিলিত হবে। সকলে কাছে কাছে থাকবে। কেউ কাউকে ফেলে রেখে পালিয়ে আসবে না।

এদিকে নটিংহাম শহরের পথে পথে তখন লোকের ভিড় জমে উঠেছে। সকলেই জেনে গেছে রবিনের দলের উইলের ফাঁসি হবে। শেরিফের লোকদের কড়া পাহারার মধ্যে একটা গাড়ির উপর বসিয়ে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উইলকে। তার মুখটা ম্লান দেখাচ্ছিল। তার মাথার চুলগুলো রক্তে জট পাকিয়ে গিয়েছিল।

উইল চারদিকে জনতার পানে তাকাচ্ছিল। জনতার মধ্য থেকে অনেকেই দয়া এবং সহানুভূতি দেখাচ্ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন চেনা মুখ দেখতে পেল না উইল। হতাশার মধ্যে মনটা ডুবে গেল তার। তার মাথাটা নুয়ে পড়ল। শেরউড বনের কথা, হাসিখুশিভরা উজ্জ্বল জীবনের কথা মনে পড়ছিল তার। এখন মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই।

সহসা জনতার মধ্যে প্রচুর গোলমাল দেখা গেল। অশান্ত জনতার ভিড় ঠেলে প্রহরীদের সরিয়ে একজন গাড়ির কাছে এল। উইল দেখল তাদের দলের লোক জন তাকে উদ্ধার করতে এসেছে। সে তার গাড়ির চারদিকে তাদের দলের লোকদের দেখতে পেল। জীবনের আশা ফিরে পেল উইল।

জন তৎক্ষণে একজন প্রহরীর মাথায় মেরে তাকে ঘায়েল করে গাড়ির উপর লাফ দিয়ে উঠে উইলের হাতের বাঁধন কেটে দিল।

শেরিফের লোকরা তখন তরবারি বার করে রবিনের লোকদের আক্রমণ করল। শেরিফ নিজে ঘোড়ায় চড়ে জনকে মারবার জন্য তরবারি উঁচিয়ে তেড়ে এল। কিন্তু জন সরে গেল। রবিনের লোকরা তীর ছুঁড়তে লাগল শেরিফের লোকদের লক্ষ্য করে।

তীরের ঘায়ে শেরিফের লোকদের অনেকে আহত হলো। তার লোকরা ছুটে পালিয়ে গেল।

উইলের চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছিল তখন। সে জনকে জড়িয়ে ধরে বলল, হে আমার প্রিয় বন্ধু, আমি ভাবছিলাম আর দেখা হবে না তোমাদের সঙ্গে।

জনের চোখেও জল এসেছিল।

রবিন তখন তার দলের লোকদের ডেকে জড়ো করে শেরউড বনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সকলে মিলে। শেরিফের দশজন লোক আহত হয়ে পড়ে রইল সেখানে। শেরিফ নিজে মরতে মরতে বেঁচে গেল।

এইভাবে শেরিফ রবিন হুডকে তিনবার ধরতে গিয়ে তিনবারই ব্যর্থ হলো। তার জারি করা পরোয়ানায় কোন কাজ হলো না। তার পাতা ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে পড়ল সে। তার সেনাদলও কিছুই করতে পারল না। এমন কি সে নিজে মরতে মরতে বেঁচে গেল। লজ্জায় বাড়ি থেকে বার হতে পারত না সে। বাড়িতেই দিনরাত বসে বসে ভাবতে লাগল শুধু।

৬

এরপর থেকে শেরউড বনে হাসিখুশিতে দিন কাটাতে লাগল রবিন হুড আর তার দলের লোকেরা। দেখতে দেখতে এইভাবে শান্তিতে একটা বছর কেটে গেল।

কিন্তু শেরিফের উপর প্রতিশোধ নেবার কথাটা ভুলতে পারল না রবিন। একথা প্রায়ই ভাবত সে।

অবশেষে একদিন অধৈর্য হয়ে উঠল সে। ঠিক করল সে নটিংহামে যাবে। তারপর একটা অভিযানের কথা ভাববে।

নটিংহামে যাবার পথে মাংস বিক্রেতা এক কসাইকে দেখতে পেল সে। তাকে দেখেই তার মনে হলো সে যে সুযোগ খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে। কসাই একটা গাড়িতে করে অনেক মাংস নিয়ে বিক্রি করতে যাচ্ছিল শহরে।

রবিন ভাবছিল নটিংহামে যেতে হলে কোন না কোন ছদ্মবেশ ধরে যেতে হবে। এবার সে ঠিক করল সে এক মাংসবিক্রেতা হিসাবে শহরে যাবে। সে তাই ছয় মার্ক দিয়ে সেই কসাইএর কাছ থেকে তার গাড়ি, ঘোড়া এবং সব মাংস কিনে নিল।

শহরের বাজারে গিয়ে মাংসের একটা দোকান খুলে ফেলল রবিন। খুব কম দরে মাংস বিক্রি করতে লাগল। কোন গরীব মেয়ে বা কোন গরীব বিধবা এলে বিনা পয়সাতেই মাংস দিয়ে দিত তাকে।

ফলে অন্য সব দোকানগুলোতে কিছুই বিক্রি হতো না। তাদের অনেকে রেগে গেলেও রবিনকে ভালবাসত তারা। তারা ভাবল রবিন হয়ত মোটা টাকা পেয়েছে কোনভাবে। তাই সে কিছু আমোদ প্রমোদ করতে চায়।

একজন কসাই রবিনকে বলল, আজ শেরিফ তার বাড়িতে শহরের সব কসাইদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল রবিন। সে খুশি হলো শেরিফের ভোজসভায় যোগদান করার সুযোগ পেয়ে।

কসাই-এর ছদ্মবেশে রবিন শেরিফের ভোজসভায় গেলে তাকে চিনতে পারল না শেরিফ। শেরিফ তাকে তার পাশে বসার জন্য ডাকল। কারণ সে শুনেছিল এই কসাই যুবক ধনী এবং তার অনেক টাকা আছে। কোন ভাবে তার কিছু টাকা হাত করে নিতে চাইছিল সে।

ভোজের টেবিলে খাবার পরিবেশন করা হলে শেরিফ রবিনকে প্রার্থনা করতে বলল। রবিন প্রার্থনায় বলল, ঈশ্বর আমাদের সকলের মঙ্গল করুন, এবং আমার মত সব কসাই ভাইরা সৎ হয়ে উঠুক।

তার এই প্রার্থনার কথা শুনে হাসতে লাগল সকলে।

খাবার সময় রবিন সব সময় শেরিফকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে হাসাহাসি করতে লাগল। শেরিফ শুধু তার কি পরিমাণ টাকা আছে তা ভাবতে লাগল। সে তা জানতে চাইলে রবিন বলল, আমার ও আমার ভাইদের পাঁচশো হরিণ আছে। কিন্তু সেগুলোর একটাও বিক্রি করতে পারিনি।

এ কথা শুনে শেরিফ তাকে বলল, তোমাদের সব হরিণগুলো দিয়ে দাও। আমি তোমাদের তিনশো পাউণ্ড দেব।

অন্যান্য কসাইরা তা শুনে ভাবল শেরিফ একজন গরীব যুবককে ঠকাতে চাইছে। কারণ অতগুলো হরিণের দাম কম করে সাতশো পাউণ্ড হবে।

কিন্তু রবিন এতে রাজী হয়ে গেল। মনে মনে সে একটা ফন্দী আঁটল শেরিফকে ঠকাবার জন্য।

রবিন শেরিফকে টাকা নিয়ে তার সঙ্গে শেরউড চলে যেতে বলল। শেরিফ তাকে শেরউড বনের ডাকাতদের কথা বলল। সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল শেরউড বনের কথা শুনে।

কিন্তু রবিন বলল, ভয়ের কিছু নেই। আমি রবিন হুডকে চিনি।

অবশেষে যেতে রাজী হলো শেরিফ।

দুজনে শেরউড বনের মধ্যে ঢুকল। শেরিফ ঘোড়ায় চড়ে ছিল। রবিন তার ঘোড়ার লাগামটা ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বনপথে একসময় অনেকগুলো হরিণ দেখতে পেল শেরিফ।

শেরউড বনে ঢোকার পর থেকে অস্বস্তি বোধ করছিল শেরিফ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরে চলে যেতে চাইছিল সে।

কিন্তু রবিন বলল, থামুন আমার ভাইদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি।

এই বলে সে তিনবার শিঙাটা বাজাল আর সঙ্গে সঙ্গে একশো জন লোক নিয়ে জন এসে হাজির হলো।

রবিন জনকে শেরিফের ঘোড়ার লাগামটা দিয়ে বলল, এই লাগামটা ধর। শেরিফ আজ আমাদের ভোজসভায় যোগদান করবেন।

ভোজের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল শেরিফ। কারণ সে জানত এই সব বুনো লোকগুলো ভোজের নামে মদ খেয়ে অতিথিদের টাকাকড়ি সব ছিনিয়ে নেয়। তবু সে কিন্তু রবিন হুড বা তার দলের লোকদের চিনতে পারল না।

শেরিফকে সেই গাছটার তলায় নিয়ে যাওয়া হলো যার ডালে রবিনের লাভ করা সেই সোনার তীরটা ছিল।

যাই হোক, ওদের সকলের সঙ্গে বসে খেল শেরিফ। হাসি তামাশাও করতে লাগল ওদের সঙ্গে।

এই ভাবে খাওয়া দাওয়ার ও আমোদ আহ্লাদের মধ্য দিয়ে দিনটা কেটে গেল। শেরিফ ভাবছিল কসাইরূপী রবিন হয়ত সেই তিনশো পাউণ্ড টাকার কথাটা ভুলে গেছে।

কিন্তু রবিন তা ভুলে যায়নি। সে জনকে ডেকে ঠিক সময়েই বলল, শেরিফের কাছ থেকে টাকাটা গুনে নাও।

হরিণগুলো বিক্রি না করেই টাকাটা নিয়ে নিল রবিন। তারপর সে শেরিফকে বিদায় দিয়ে বলল, বিদায় স্যার। এর পর যদি কখনো কোন গরীব লোককে ঠকাতে যান তাহলে শেরউড বনের এই ভোজসভার কথা মনে রাখবেন।

শেরিফ তখন নিজের ভুল বুঝতে পারল। বুঝতে পারল অতি লোভ করার জন্যই আজ তিনশো পাউণ্ড হারাতে হলো তাকে।

৭

বসন্ত আর গ্রীষ্ম কেটে গিয়ে অক্টোবর মাস এসে গেল। তখন আপেল পেকেছে গাছে গাছে। মাঠে মাঠে শুরু হয়ে গেছে ফসল তোলার কাজ। বাতাসটা যেমন শীতল তেমনি সজীব।

এই মাসেই প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এক বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হয় নটিংহাম শহরে। এই মেলাতে তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবার। শেরিফ এই প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করতে ইতস্তত: করছিল। ভাবছিল ভাল পুরস্কারের কথা ঘোষণা করলেই রবিন হুড তাতে যোগদান করে বিব্রত করে তুলবে তাকে।

তাই শেরিফ এবার এমন এক পুরস্কারের কথা ঘোষণা করল যার কথা শুনে এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চাইল না রবিন। শেরিফ ঘোষণা করল বিজয়ী প্রতিযোগীকে দেওয়া হবে দুটো মোটা হরিণ।

উইল আর জন একথা সেই পান্থশালায় শুনে এসেছিল। জন রবিনকে বলল তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় সে অংশ গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু রবিনের ইচ্ছা ছিল তার দলের অন্য কেউ যাক সেখানে।

রবিন জনকে বলল, তুমি আমার ডান হাত। তোমার শক্তি আছে। তুমি চতুর না হলেও তোমাকে আমি হারাতে পারি না।

জন বলল, আমি অন্য পোশাক পরে ছদ্মবেশে যাব। ওরা আমাকে চিনতেই পারবে না।

অবশেষে জনকে যেতে মত দিল রবিন। মেলায় গিয়ে প্রথমে একটা দোকানে ভাব করে মদ খেল। তার চারপাশের সবাইকে বলল, মদ খেয়ে ফুর্তি করো। আশা মিটিয়ে মদ খাবার পর সে এক জায়গায় নাচতে গেল।

নাচের ঘরে ও গিয়ে দেখল তিনটে লোক ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে। জন তখন তার তীর ধনুক নামিয়ে রেখে মঞ্চে উঠে নাচতে লাগল। তার নাচ দেখে অনেকে মুগ্ধ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ এভাবে নাচার পর জন চলে গেল আর এক জায়গায়। সেখানে লাঠি খেলা হচ্ছিল। জন এবার তার লাঠি খেলার কলাকৌশল দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেকালে এরিক লিঙ্কন নামে এক বিরাট চেহারার লোক ছিল। তার গায়ে ছিল প্রচুর জোর। কেউ তার সঙ্গে লাঠি খেলতে এলে তার মাথা ফাটিয়ে দিত লিঙ্কন।

জন সেখানে গিয়ে দেখল লাঠি খেলার জায়গায় একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরিক লিঙ্কন।

এরিক লিঙ্কন জনকে দেখেই বলল, তোমার পাদুটো অত লম্বা কেন? তুমি একটা কাপুরুষ।

লিঙ্কনের আস্ফালন শুনে রেগে গেল জন। সে তাকে একটা শিক্ষা দিতে চাইল। সে বলল, এখানে এমন কেউ আছে কি যে আমাকে একটা লাঠি দিয়ে সাহায্য করবে? তাহলে এই লোকটার সঙ্গে একবার লড়তাম।

জনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দশজন লাঠি দিতে এগিয়ে এল। সবচেয়ে ভারি লাঠিটা বেছে নিল জন। তারপর মঞ্চের উপর উঠে গেল।

এরপর দুজনের মধ্যে শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। এমন লড়াই নটিংহামের কেউ কখনো দেখেনি আগে।

এরিক লিঙ্কন আর জন মোট তিন রাউণ্ড খেলা খেলল। প্রথমে দু রাউণ্ডে কেউ কাউকে আঘাত করতে পারল না। তৃতীয় রাউণ্ড শুরু হতেই জন এরিকের মাথায় লাঠির একটা ঘা দিল। এরিক টলতে লাগল। তখন জন আবার একটা ঘা তার গায়ে বসিয়ে দিতেই সটান পড়ে গেল এরিক। মনে হলো সে যেন আর কখনো উঠতে পারবে না।

এর পর শুধু লম্বা পাল্লার তীর প্রতিযোগিতা। তাতেও প্রথম স্থান অধিকার করল জন।

এই সব খেলা শেরিফ তার আসনে বসে দেখছিল। খেলা শেষ হলে সে তার আসন থেকে নেমে এসে জনকে বলল, তোমায় এর আগে কোথায় দেখেছি যেন।

জন বলল, আমি ত আপনাকে প্রায়ই দেখি। আমার নাম রেনল্ড গ্রীনলীফ।

শেরিফ বলল, তোমার তীর ছোঁড়ার হাত খুবই ভাল। শয়তান রবিন হুডের পরেই তোমার স্থান। তুমি আমার কাছে চাকরি করবে? খাওয়া পরা ছাড়া ভাল মাইনে দেব।

জন তাতে রাজী হয়ে গেল। সে ভাবল শেরিফের বাড়িতে কাজ করলে বেশ মজা হবে।

শহরের অনেক লোক যখন সে রাতে আগুন জ্বালিয়ে হরিণের মাংস আর মদ খেয়ে নাচগান করতে লাগল, জন তখন রেনল্ড গ্রীনলীফ নাম ধারণ করে শেরিফের সঙ্গে চলে গেল তার প্রাসদে।

৮

জন প্রথমে ভেবেছিল যে শেরিফের বাড়িতে কাজের ভান করে দুচারদিন একটু মজা করে আবার ফিরে যাবে শেরউড বনে। কিন্তু শেরিফের বাড়িতে থাকা খাওয়ার প্রচুর সুযোগ সুবিধা আর আরাম উপভোগের ব্যবস্থা দেখে সে একরকম স্থায়ীভাবে রয়ে গেল।

শীতকালে শেরিফের বাড়িতে আগুন জ্বলে সব সময়। তাছাড়া মাংস ও মদ পাওয়া যায় প্রচুর। শেরিফ তাকে ভালবাসে। খাওয়ার টেবিলে তাকে পাশে বসাত। তাকে নিয়ে প্রায়ই শিকার করতে যায়।

এইভাবে ছটা মাস শেরিফের বাড়িতে কেটে গেল জনের। ভাল খাওয়া দাওয়া করে করে ষাঁড়ের মত মোটা হয়ে উঠল সে।

একদিন সকালে হঠাৎ জনের খোঁজ করতে লাগল শেরিফ। সে কয়েকজন সামন্তকে জনের কলাকৌশল দেখাতে চাইছিল। কিন্তু জন তখনো বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তখন বেলা হয়ে গেছে।

অবশেষে ঘুম থেকে জাগলেও বিছানা থেকে উঠল না জন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল সে। প্রথম বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস আসছিল জানালা দিয়ে।

সহসা দূরে শিঙা বাজানোর শব্দ শুনতে পেল জন। শিঙাধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে রবিন হুডের কথা মনে পড়ে গেল তার। মনে পড়ে গেল ডেভিড ও সঙ্গী সাথীদের কথা।

ঠিক তখনি সে শিঙা বাজানোর শব্দটা শুনতে পেল। শব্দটা প্রথমে অস্পষ্ট ও পরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার রবিন ও উইলের কথা মনে পড়ে গেল। এই উইলকে সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত। তারপর ডেভিডের

কথাও মনে পড়ল। ডেভিডকে সে নিজের হাতে সব খেলা শেখায়। তাদের সবাইকে দেখার জন্য এক তীব্র বাসনা জাগল তার মনে। জলে ভরে উঠল তার দুচোখ।

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে সে আপন মনে চিৎকার করে উঠল, আমি তাদের কাছে ফিরে যাব এবং যতদিন আমার জীবন থাকবে তাদের ছাড়ব না কখনো।

নিচে নেমে এল জন। দেখল রান্নাঘরের দরজার সামনে চাবির থোকা হাতে মোটা ম্যানেজার দাঁড়িয়ে আছে। শেরিফ জনকে বেশী ভালবাসত বলে ম্যানেজার ঘৃণার চোখে দেখত জনকে। সে তাই রান্নাঘরের দরজায় তালা দিয়ে রেখেছিল। সে জনকে কিছুই খেতে দেবে না। সে জনকে পিছন থেকে ধরে চাবির থোকা দিয়ে মারতে লাগল।

জন তখন ম্যানেজারকে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরের তালা খুলে প্রাতরাশ খেতে লাগল।

এদিকে উঠোনে ওপাশ হতে রাঁধুনি গোলমাল শুনে ছুটে এল। সে দেখল ম্যানেজারকে ফেলে দিয়েছে জন। সে একটা লোহার রড নিয়ে এল।

ম্যানেজার রাঁধুনিকে তার হয়ে জনকে উচিত শিক্ষা দিতে বলল। তাহলে সে তাকে দশ শিলিং দেবে।

রাঁধুনি তাতে রাজী হয়ে গেলে ম্যানেজার সরে গিয়ে মজা দেখতে লাগল। সে ভাবল এবার দুজনের মধ্যে তরবারির লড়াই শুরু হবে।

কিন্তু জন লড়াই না করে রাঁধুনিকে বলল, এখানে অনেক খাবার আছে। এস, আমরা দুজনে খেয়ে নিই পেট ভরে। পরে লড়াই করা যাবে।

রাঁধুনিরও জনের মত ভাল খাবারের উপর লোভ ছিল। সে তাই জনের কথায় রাজী হয়ে গেল।

দুজনে তখন তরবারি নামিয়ে রেখে মনের সুখে খেতে লাগল। খাবার পর তারা গান করতে লাগল দুজনে। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল।

তারপর রাঁধুনি বলল, এবার আমাকে রান্না করতে হবে শেরিফ ফিরে আসার আগেই আমাকে সব খাবার তৈরি করতে হবে। সুতরাং, এস লড়াইটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যাক।

তখন দুজনেই তরবারি বার করে লড়াই করতে লাগল। তরবারি চালনায় দুজনেই বেশ পটু। কেউ কাউকে হারাতে পারল না।

তখন জন রাঁধুনিকে বলল, থাম, তোমার মত তরবারি খেলায় দক্ষ লোক

আমি দেখিনি। তুমি কি আমার সঙ্গে শেরউড বনে গিয়ে রবিন হুডের দলে যোগ দেবে? আমি হচ্ছি জন।

একথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল রাঁধুনি। সে বলল, হ্যাঁ আমি যাব তোমার সঙ্গে।

এইভাবে তারা দুজনে শেরউড বনে চলে গেল। বনের গভীরে চলে গিয়ে দেখল, রবিন হুড তার দলের ষাটজন লোক নিয়ে এক জায়গায় বসে গল্প করছিল একটা গাছের তলায়।

জনকে দেখেই লাফিয়ে উঠল রবিন আর দলের লোকেরা। তারা সাদর অভ্যর্থনা জানাল জনকে।

রবিন বলল, বহুদিন তোমার কোন খবর পাইনি। অবশ্য আমরা জানতাম, তুমি শেরিফের প্রাসাদে আছ।

জন তখন প্রথম থেকে যা যা ঘটেছিল সব খুলে বলল। এরিক লিঙ্কনকে কিভাবে সে ধরাশায়ী করে তাও বলল। তারপর শেরিফের রাঁধুনির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তাদের।

জন আর রাঁধুনি দুজনে মিলে শেরিফের যে রূপোর থালা নিয়ে এসেছিল তা দেখাল জন। তা দেখে রবিনের লোকেরা হাসতে লাগল। কিন্তু রবিন গম্ভীরভাবে বলল, শেরিফ আগেই অনেক শাস্তি পেয়েছে। আবার তার রূপোর থালা আনার কোন দরকার ছিল না।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জন লাফ দিয়ে ছুটে গেল শেরিফের কাছে।

শেরিফ তখন তার দলবল নিয়ে সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে এক জায়গায় শিকার করছিল।

জন শেরিফের কাছে গিয়ে একজন সাধারণ লোক হিসাবে বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। বনের গভীরে এক ধরনের সবুজ হরিণ শিকার করতে পারবেন।

শেরিফ জনকে প্রথমে চিনতে না পেরে তার সঙ্গে একা এল।

রবিনের কাছে ওরা এসে পড়লে শেরিফের সন্দেহ হলো। সে ভাল করে খুঁটিয়ে জনকে দেখে চিনতে পারল। সে বলল, জন, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ।

জন বলল, আমি আপনার বাড়ি থেকে আসতাম না। আজ সকালে আপনার ম্যানেজার আমাকে খেতে দেয়নি। আপনার এই রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করুন।

শেরিফ এবার রাঁধুনিকে দেখে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারল। সে চুপ করে রইল।

রবিন এবার শেরিফকে বলল, চলুন, আপনাকে আমি আপনার দলের লোকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই নেব না। আপনি আজ আমাদের কোন ক্ষতি করতে আসেননি।

এই বলে সে একটা ব্যাগের মধ্যে শেরিফের রুপোর জিনিসগুলো ভরে আগে নিয়ে যেতে লাগল।

শেরিফের শিকারের জায়গা থেকে কিছু দূরে রবিন থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এবার আপনি যেতে পারবেন। আমি ফিরে যাচ্ছি। এবার থেকে আপনার চাকরবাকরদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবেন।

শেরিফ হতবুদ্ধি হয়ে সেইখানে রবিনের দেওয়া ব্যাগটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

৯

তখন মে মাস। খুব গরম পড়েছে। মন্থর বাতাসে ছিল আর্দ্রতা। রবিনের দলের বেশীর ভাগ লোকেরা যে যার কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। রবিন বসে ছিল গ্রীনউড গাছের তলায়। তার সঙ্গে তখন ছিল জন, উইল, স্কেদলক আর ডেভিড। তারা অলসভাবে ঝিমোচ্ছিল গাছের ছায়ায়।

হঠাৎ রবিন দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের ভাঁড়ারে কোন সবুজ কাপড় নেই। শোন জন, তুমি এখনি আলকাষ্টারের লংশ্যাঙ্কন-এর কাছে চলে যাও। তাকে গিয়ে বল সে যেন চারশো গজ সবুজ কাপড় পাঠিয়ে দেয় আমাদের এখানে। শেরিফের বাড়িতে খেয়ে খেয়ে গায়ে তোমার অনেক চবি জমেছে। পথ হেঁটে সেটা কিছুটা কমাও।

জন বলল, আমি এত মোটা হইনি যে একটা সরু সাঁকোর উপর পা রাখতে পারব না।

একদিন সাঁকোর উপরেই জনের সঙ্গে দেখা হয় রবিনের, এই কথা ভেবে সকলে হাসতে লাগল।

জন প্রায় সাত ফুট লম্বা একটা লাঠি নিয়ে তখনি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলো।

রবিন তখন একটা পাহাড়ের তলায় গুহার মত একটা ঘরের কাছে চলে

গেল। ঘরটায় একটা তালাবন্ধ দরজা ছিল। এই ঘরটার মধ্যে তার টাকাকড়ি ও সোনাদানা থাকত।

রবিন সেই ঘরটার মধ্যে ঢুকে কিছু সোনা এনে জনের হাতে দিল। তাই নিয়ে তখনি রওনা হয়ে পড়ল জন।

সে একটা বনপথ ধরে কসি পর্যন্ত গেল। তারপর দেখল পথ দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। একটা পথ গেছে আলকাস্টারের দিকে আর একটা পথ পথ গেছে ব্লু বোর ইনের দিকে।

জন ভাবল রাতটা পান্থশালায় কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলায় রওনা হবে।

এদিকে তখন আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড নামে একজন নামকরা কুস্তিগির নটিংহাম থেকে তার বাড়ি ফিরছিল। তার বাড়ি ছিল ব্লাইথ-এ। যেতে যেতে বন হরিণ ধরার জন্য পথের ধারে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল আর্থার।

হঠাৎ জন তাকে দেখতে পেয়ে লড়াইয়ে আহ্বান জানাল তাকে। তখন দুজনে দুজনকে আক্রমণ করল লাঠি দিয়ে। দুজনেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকল।

এদিকে রবিনের কাছে খবর যায় জন আলকাস্টারের পথে না গিয়ে ব্লু বোর ইন এর দিকে যাচ্ছে। তা শুনে রেগে গিয়ে নিজে ব্যাপারটা কি তা দেখতে আসে।

ব্লু বোর ইন এর দিকে আসতে আসতে জনের গলা শুনতে পায় রবিন। জনের ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনে রবিনের মনে হয় জন হয়ত রাজার লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তখন সে নিজের রাগের কথা ভুলে যায়। সে জনের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে বনের মধ্য দিয়ে আসতে থাকে।

বনটা পার হয়েই রবিন দেখে একটা ফাঁকা জায়গায় আর্থার আর জন দুটো পাগলা ষাঁড়ের মত লড়াই করছে। দেখল জনের দেহটা ভারী হয়ে ওঠায় সে ঠিক পেরে উঠছে না আর্থারের সঙ্গে।

এমন সময় আর্থারের এক লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল জন। লাঠিটা পড়ে গেল তার হাত থেকে।

মাটিতে পড়ে গিয়ে জন বলল, আজ তুমি যা করলে সারা নটিংহামের মধ্যে এমন কোন লোককে আমার জানা নেই যে এ কাজ করতে পারে।

বনের আড়াল থেকে সব কিছু দেখে রবিন এবার বেরিয়ে এসে বলল, আমারও তা জানা নেই।

রবিন এবার আর্থারের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নাম কি?

লোকে আমাকে এ ব্র্যাণ্ড বলে।

তোমার কথা আমার মনে পড়ছে। গত অক্টোবরে এলির মেলাতে আমার এক বন্ধুকে কুস্তিতে হারিয়ে দিয়েছিলে তুমি। তার নাম হলো উইল স্কেদলক। যে লোকটিকে তুমি এইমাত্র মাটিতে ফেলে দিলে সে লাঠিখেলায় সারা ইংলণ্ডের মধ্যে অদ্বিতীয়। তার নাম হলো জন আর আমার নাম রবিন হুড।

এর পর জন উঠে দাঁড়াল। রবিন আর্থারকে এবার তার দলে যোগ দিতে বলল এবং আর্থারও রাজী হয়ে গেল তাতে।

আর্থার বলল, শেরউড বনে এমন একটা হরিণও থাকবে না যে আমার তীরধনুকের মর্ম বুঝতে না পারবে।

রবিন এবার জনকে বলল, এবার তোমাকে আবার আলকাস্টারের পথে রওনা হতে হবে। তবে আমরাও তোমার সঙ্গে কিছুটা যাব।

১০

রবিন, আর্থার আর জন তিন জনে উজ্জ্বল রোদে ভরা পথের উপর এগিয়ে যেতে লাগল।

কিছুদূর যাওয়ার পর গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা। ওদের দারুণ পিপাসা পেয়েছিল। পথের ধারে একটা ঝর্ণা থেকে হাতে করে জল খেল। তারপর একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

তাদের সামনে ধূলোভরা পথটা একটা সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। রবিন সেই পথটার পানে তাকিয়ে রইল। অন্য দুজন অর্থাৎ জন আর আর্থার তন্ময় হয়ে ভাবছিল।

সহসা রবিন পথপানে তাকিয়ে বলল, দেখ দেখ, পাখির মত কে আসছে।

ওরা তখন দেখল, বড় রাস্তার উপর দিয়ে এক অচেনা যুবক আসছে। ঘোর লাল রঙের রেশমী আর মখমলের পোশাক ছিল তার পরনে। একটা চওড়া পালক ছিল তার মাথার টুপিতে। তার তরবারির খাপটা সোনালি ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল তার কোমরে। তার লম্বা সোনালি চুলগুলো ঘাড়ের উপর ছড়ানো ছিল। তাকে খুশিতে উজ্জ্বল দেখাছিল।

তাকে দেখে রবিন বলল, আমার মনে হয় ওর পথের সামনে একটা ইঁদুর দেখা দিলে ও মূর্ছা যাবে।

আর্থার যুবককে দেখে বলল, কিন্তু ওর কাছে দেখ অস্ত্র রয়েছে। ও খুব

ভাল পোশাক পরে থাকলেও ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দুর্বল নয়। ওর পেশীগুলো শক্ত বলেই মনে হয়।

জন বলল, আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ আর্থার।

রবিন বলল, আমি দেখব লোকটা কে। তোমরা এখানে লুকিয়ে থাক। আমি তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করব।

এই বলে সে পীচ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পথের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রথমে যুবকটি গ্রাহ্য করল না রবিনকে। সে তার পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল। কিন্তু পথ ছেড়ে দিতে না চাইলে যুবক বলল, বন্ধু, আমাকে যেতে দাও শান্তিপূর্ণভাবে। তা না হলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।

এই বলে সে তার তরবারি বার করল খাপ থেকে।

রবিন বলল, কিন্তু তোমার তরবারি আমার লাঠির আঘাত সহ্য করতে পারবে না। কাছেই ওক গাছের জঙ্গল রয়েছে। বরং একটা লাঠি তৈরি করে নাও।

অচেনা যুবকটি প্রথমে রবিন ও তার লাঠিটাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর তার হাতে যে গোলাপ ফুলটা ছিল সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার তরবারিটা ঢুকিয়ে রাখল খাপের মধ্যে। তারপর পথের ধার থেকে একটা ছোট চারাগাছ শিকড় সমেত উপড়ে তুলে নিল।

জন আর আর্থার তা দেখে শিষ দিতে লাগল। রবিন পথের মাঝখানে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। যুবকটি এবার তার সামনে এল। দুজনে দুজনের মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

এবার তাদের লড়াই শুরু হলো। তাদের দুজনের দাপাদাপিতে ধুলো উড়তে লাগল পথে। একদিকে ছিল রবিনের কৌশল আর বুদ্ধি আর অন্য দিকে ছিল যুবকের শক্তি।

রবিন একসময় পড়ে গেল ধুলোভরা পথের উপর।

রবিন বলল, থাম, আমি হার মানছি।

রবিন পথের উপরেই কনুইএর উপর ভর দিয়ে শুয়ে রইল। তার অবস্থা দেখে জন হাসতে হাসতে তার সাহায্যে এগিয়ে এল। কিন্তু তার সাহায্য নিল না রবিন। সে যুবককে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি ?

যুবকটি উত্তর করল, আমার নাম গ্যামওয়েল। আমি আমার মার ছোট ভাইকে খুঁজতে এসেছি লোকে যাকে....

রবিন বলল, উইল গ্যামওয়েল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

যুবকের কাঁধের উপর হাত রেখে রবিন বলল, আমাকে ভাল করে দেখ।

গ্যামওয়েল এবার বলল, বুঝেছি, তুমিই আমার মামা রবিন।

এইবলে সে রবিনের গলাটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার গালে চুম্বন করতে লাগল।

রবিন বলল, আট অথবা দশ বছর আগে আমি তোমাদের ছেড়ে এসেছি। তবে তার আগে আমি তোমাকে ভালই শিক্ষা দিয়েছি। আমি যত বীর যোদ্ধা দেখেছি জীবনে তুমি হচ্ছ তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। কিন্তু তুমি এখন তোমার মা আর স্যার এডওয়ার্ডের কাছে থাক না?

গ্যামওয়েল বলল, সে এক কাহিনী মামা। তুমি জান আমার বাবা সরল প্রকৃতির লোক, সহজে রাগেন না। তাঁর ম্যানেজারটা বড় উদ্ধত প্রকৃতির লোক। সে আমার বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। আমি এটা লক্ষ্য করতাম। একদিন আমি থাকতে না পেরে ম্যানেজারটার গালে একটা চড় বসিয়ে দিই। বিশ্বাস করবে লোকটা তাতে মারা যায়। তার ঘাড়টা নাকি ভেঙ্গে যায়। তাই আমার বাবা মা আইনের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য পালিয়ে যেতে বলল।

রবিন বলল, তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি উইল। কিন্তু যে লোক আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ায় সে কখনো বড় রাস্তার উপর দিয়ে গোলাপ ফুল শুঁকতে শুঁকতে যায় না। আমরা এখন তোমার নাম পাল্টে দেব। তোমার লাল পোশাকের জন্য তোমার নাম হবে উইল স্কারলেট।

জন এগিয়ে এসে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমাদের মাঝে তোমাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত উইল স্কারলেট। আমার নাম জন আর এই লোকটার নাম আর্থার। কিছুক্ষণ আগে যোগ দিয়েছে আমাদের দলে।

রবিন জনকে বলে দিল, আজ যা যা ঘটে গেছে তা যেন আর কাউকে বলো না। আজ আমরা দুজনেই হেরে গেছি।

এরপর রবিন জনকে বলল, আজ থাক। অন্য দিন আল্লকাস্টার যাবে। চল, ফিরে যাই।

এবার তারা সকলে মিলে শেরউড বনের দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

১১

তখন ভর দুপুর। শেরউড বনের পথে যেতে যেতে দারুণ ক্ষিদে পেল

ওদের। জন আর্থারকে দু পেনি দিয়ে কাছাকাছি একটা পান্থশালায় পাঠিয়ে দিল কিছু খাবার কিনে আনার জন্য।

আর্থারকে পাঠিয়ে দিয়ে পথের ধারে বনের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। আর্থার কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু রুটি, মাখন আর মদ নিয়ে এল।

খাওয়ার পর গান গাইতে লাগল তারা। একে একে ওরা সবাই যখন একটা করে গান গাইছিল, রবিন তখন হঠাৎ ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, একটা লোক আসছে। জন, দেখত ওকে চিনতে পার কিনা।

জন সেদিকে তাকিয়ে বলল, ও হচ্ছে একটা ময়দা কলের মালিক। আমি ওকে দেখেছি শেরউড বনের ধারে। ও আমাদের গানটা মাটি করে দিল।

রবিন বলল, লোকটা বলবান। আমি দু সপ্তাহ আগে দেখেছি ও ব্র্যাডফোর্ডের নেদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

মিলের লোকটা তখন ওদের কাছে এসে পড়েছে। তার পোশাকে ময়দার গুঁড়ো লেগে ছিল। তার ঘাড়ের উপর এক থলে খাবার ছিল। একটা মোটা লাঠির ডাগায় থলেটা ঝোলানো ছিল। সে ছিল বয়সে যুবক। তার হাতদুটো ছিল লাল। চুলগুলো ঈষৎ সোনালি। মুখে সবেমাত্র দাড়ি গজিয়েছে।

রবিন বলল, ওকে নিয়ে আমরা একটু মজা করব। আমরা ওকে দেখাব আমরা চোর। তারপর আমরা ওকে বনের ভিতর নিয়ে গিয়ে খাওয়াব। ওকে খাইয়ে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তোমরা কি বল?

সকলেই রাজী হয়ে গেল রবিনের কথায়। শুধু জন রাজী হলো না। কারণ সেদিন আর লড়াই করতে চাইছিল না ও। পাছে আবার হেরে যায় এই ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল সে।

তবু সবাই মিলারকে ঘিরে ধরল।

মিলার বলল, কি চাও তোমরা? তোমরা রবিন হুডের মহল্লার মধ্যে আছ। যদি সে জানতে পারে আমার মত একজন নিরীহ লোকের কাছে ছিনতাই করেছ তাহলে সে তোমাদের কান কেটে নেবে।

রবিন বলল, আমি রবিন হুডকে ভয় করি না। আমরা চারজন সদাশয় খৃষ্টান। তোমার ভারী বোঝার কিছুটা কমিয়ে ফেলতে চাই।

মিলার তখন ময়দার বস্তাটা নামিয়ে তার মুখটা খুলল। তারপর বস্তার ভিতর তার হাতটা ঢুকিয়ে দিল। মনে হলো সে যেন কিছু বার করছে। সবাই ভাবল ময়দার ভিতরে হয়ত কিছু টাকা পয়সা আছে।

হঠাৎ মিলার হাতে করে একমুঠো ময়দা নিয়ে ওদের সকলের চোখে মুখে ছড়িয়ে দিল। ওদের চোখে মুখে ময়দা লাগায় ওরা কাশতে লাগল। চোখতুটো কানা হয়ে যাবার উপক্রম হলো।

মিলার পরপর আরো কয়েকবার ময়দা ছড়িয়ে দিল এইভাবে। ওদের পোশাকগুলো সব বরফের মত সাদা হয়ে গেল।

রবিন তখন তার শিঙাটা ধরে তিনবার বাজাতেই উইল আর ডেভিড ছুটে এল। তারা দেখল পাঁচটা সাদা লোক একটা সাদা বস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

যাই হোক, রবিন এবার শান্তিতে ব্যাপারটা মিটিয়ে মিলারকে তাদের সঙ্গে দলের ভিতর নিয়ে গেল। ভোজসভার পর আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে রবিন ঘোষণা করল, আজ আমরা তিনজন বলবান লোককে আমাদের দলে পেয়েছি।

মিলারও ওদের দলে যোগ দিয়েছে।

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে আমোদ আহ্লাদ করার পর আপন আপন জায়গায় শুয়ে পড়ল ওরা। এক নিবিড় স্তব্ধতা নেমে এল শেরউডের নৈশ বনভূমিতে।

১২

এরপর তুদিন কেটে গেছে। সেদিন সকালটা ছিল বেশ উজ্জ্বল। তখন ও শিশির ফোঁটা লেগেছিল ঘাসের উপর। রবিন গ্রীনউড গাছের তলায় বসে ছিল। তার একপাশে উইল স্কারলেট আকাশের পানে তাকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। আর একদিকে জন বসে বসে একটা গাছের ডাল থেকে একটা লাঠি তৈরি করছিল। দলের অন্যান্যরা কেউ বসে বা শুয়ে ছিল।

রবিন বলল, বেশ কিছুদিন আমরা কাউকে পাইনি। আমাদের টাকা পয়সা ফুরিয়ে এসেছে। স্নুতরাং জন, তুজন লোক বেছে নিয়ে কসির বড় রাস্তায় চলে যাও। একজন কাউকে মোটা টাকার থলে সমেত আমাদের ভোজসভায় নিয়ে এসো। আমরা মোটা রকমের একটা ভোজের আয়োজন করছি। উইল স্কারলেটকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাদের রীতিনীতি তাকে শিখিয়ে দাও।

উইল বলল, আমি মিলার আর আর্থারকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তারা ভাল যোদ্ধা। ভাল লাঠি চালাতে পারে।

সবাই হাসতে লাগল। রবিন বলল, আমি কিন্তু আমার ভাগ্নে স্কারলেট আর মিলারের পক্ষে ওকালতি করছি। আজ সকালে দেখলাম আমার হাড় পাঁজরায় এখনো নীলচে দাগ আছে।

উইল স্টিউটলি তার দলের ছয়জনকে নিয়ে কসির রাস্তার ধারে বনের মধ্যে ওৎ পেতে লুকিয়ে বসে রইল। পথিকরা কেউ বুঝতে পারল না সাতজন বলিষ্ঠ ডাকাত বনের আড়ালে লুকিয়ে আছে। কিন্তু মোটা টাকার কোন ধনী লোক বা কর আদায়কারী বা যাজককে পেল না তারা, যার কাছ থেকে বেশ মোটা টাকার একটা থলে পাওয়া যাবে। তাই তারা সারাদিন ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

উইল স্টিউটলি বলল, আমাদের আজ বড় দুর্ভাগ্য। আজ আর কিছু হবে না। ফিরে চল ছোকরারা।

এরপর তারা শেরউড বনে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হলো। উইল স্টিউটলি সবার আগে আগে পথ চলতে লাগল।

সহসা থমকে দাঁড়াল উইল। চুপি চুপি বলল, থাম, আমি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার কানগুলো খেঁকশিয়ালের কানের মত পাতলা।

তারা সবাই কান খাড়া করে শুনতে পেল কে যেন নিচু গলায় কাঁদছে।

উইল স্কারলেট বলল, কোন এক আর্ত মানুষ হয়ত আমাদের সাহায্য চায়।

এই বলে এগিয়ে গেল স্কারলেট শব্দটা লক্ষ্য করে। কিছুদূর গিয়ে সে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা জলাশয় দেখতে পেল। সেই জলাশয়ের ধারে একটা উইলো গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এক যুবক চেঁচিয়ে কাঁদছে। তার রুক্ষ সোনালি চুলগুলো জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকগুলো কুঁচকে গিয়েছিল। তাকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল দুঃখে ভারী হয়ে উঠেছে তার অন্তরটা। তার মাথার উপরে উইলো গাছের একটা ডালে একটা বাদ্যযন্ত্র ঝোলানো ছিল। যন্ত্রের পালিশ করা কাঠটা সোনা ও রূপোয় খচিত ছিল। তার পাশে ছিল একটা ধনুক আর দশটা ভাল তীর।

উইল স্টিউটলি যুবকটির কাছে গিয়ে বলল, কি হে ছোকরা, এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? কেন তোমার চোখের লবণাক্ত জল ফেলে নিরীহ ঘাসগুলোকে মেরে ফেলছ?

উইলের কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে তার ধনুকে তীর লাগাল যুবক।

উইলের দলের একজন বলল, আমি যুবকটিকে চিনি। ও একজন চারণ কবি। মাসখানেক আগে আমি ওকে হাসিখুশিতে ভরা অবস্থায় দেখেছিলাম।

উইল স্টিউটলি এবার যুবকটির কাছে গিয়ে বলল, নাও, তোমার চোখ মোছ। একজন বলিষ্ঠ চেহারার এমন যুবককে একটি বালিকার মত কাঁদতে দেখতে চাই না আমি।

উইল স্কারলেট যুবকের কাছে গিয়ে তার কাঁধের উপর একটা হাত রাখল। তার ছেলেমানুষের মত মুখখানা দেখে মায়া হলো তার।

স্কারলেট তাকে বলল, এদের কথায় কিছু মনে করো না। এদের অন্তরগুলো খুব কড়া। তবে মানুষ হিসাবে এরা খারাপ নয়। যাই হোক, আমাদের কাছে এস। আমরা তোমায় সাহায্য করব।

উইল স্টিউটলিও বলল, হ্যাঁ আমরা তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইনি। আমরা তোমার ভালই করব। তোমার বাদ্যযন্ত্রটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে শেরউড বনে চলে এস।

যুবকটি বিষণ্ণ মনে ধীর মন্থর গতিতে মাথা নত করে উইল স্কারলেটের সঙ্গে পথ চলতে লাগল।

সবাই নীরবে পিছু পিছু চলতে লাগল। সব চুপচাপ। রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার নেমে এসেছে তখন সারা বনভূমিতে। তাদের পায়ের শব্দ আর পাতা ঝরার খসখস শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।

ওরা নিঃশব্দে বনপথ পার হয়ে রবিনের সামনে নিয়ে এল যুবকটিকে।

যুবকটি রবিনকে দেখে বলল, তুমি বিখ্যাত রবিন হুড না?

যুবকটি তাকে চেনে দেখে খুশি হলো রবিন। কিন্তু যখন জানতে পারল যুবকটির কাছে টাকা নেই তখন উইল স্টিউটলির উপর রেগে গেল। তখন স্কারলেট যুবকের কথা সব বুঝিয়ে বলল। বলল, ও আমাদের সাহায্য চায়।

রবিন যুবককে খুঁটিয়ে দেখে বলল, তোমার মুখখানা সত্যিই সুন্দর।

রবিনের সহানুভূতিমূলক কথা শুনে যুবকের চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

রবিন তখন উইল স্কারলেট আর জন ছাড়া সকলকে সরে যেতে বলল।

যুবকটি এবার তার দুঃখের কথা সব বলতে লাগত রবিনের কাছে। সে বলল, এলেন নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে আমি ভালবাসি। সেও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু তার বাবা আমার সঙ্গে তার বিয়ে না দিয়ে এক বুড়ো নাইটের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে যাচ্ছে। আগামী কালই বিয়ে হবে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক পরিকল্পনা খাড়া করল রবিন। কিন্তু এমন একজন ধর্মযাজক চাই যাকে বিশ্বাস করে নির্ভর করা যায় তার উপর।

উইল স্কারলেট বলল, আমি একজন ধর্মযাজককে জানি যে বেশ সাহসী। সে যেখানে থাকে সে জায়গা এখান থেকে আধ বেলার পথ।

রবিন বলল, আগামী কাল সকালেই রওনা হওয়া যাবে।

যুবকটি এবার তার চোখের জল মুছল। ওরা সবাই তাকে একটা গান গাইতে বলল।

যুবকটির গলা খুবই মিষ্টি। তার বাজনাও ভাল। তার গান শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। রবিন তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করল।

যুবকটি বলল, আমার নাম এ্যালান এ ডেল।

তখন জন ও উইল স্কারলেট হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। এই-ভাবে এ্যালান ডেল রবিনের দলের একজন সদস্য হয়ে গেল।

১৩

পরদিন সকাল হলে ইস্পাতের জালের একটা কোট পরল রবিন। কোটটার উপরে একটা সবুজ আলখাল্লা চাপিয়ে নিল। মাথায় পরল ইস্প্যাতের টুপি এবং তার উপর মোরগের পালকওয়ালা একটা সাদা চামড়া ছিল। তার তরবারির পাতের উপর ড্রাগনদের মূর্তি আর পাখনাওয়ালা কিছু নারীমূর্তি আঁকা ছিল।

এইরকম পোশাক পরে উইল স্কারলেট, ডেভিড আর আর্থারকে সঙ্গে নিয়ে আর উইল স্টিউটলিকে রেখে রওনা হলো রবিন। রবিনের অনুপস্থিতিতে উইল স্টিউটলি দলের নেতা হিসাবে কাজ করবে।

উইল স্কারলেট পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তখন ভর দুপুর। দারুণ গরম। পথ চলতে চলতে ওরা কাঁচের মত স্বচ্ছ জলে ভরা একটা নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলো। নদীর বুকের উপর চাতক পাখি আর বড় বড় মাছি উড়ে বেড়াচ্ছিল।

নদীর ধার দিয়ে অনেকক্ষণ পথ চলার পর উইল স্কারলেট রবিনকে বলল, শোন, সামনে ঐ নদীর ঐ বাঁকটার কাছে একটা সরু সাঁকো আছে। তার ওপারেই ফাউন্ট ডেলএর ধর্মযাজক বাস করে।

রবিন তার সঙ্গীদের সেইখানে অপেক্ষা করতে বলে একা যাজকের সন্ধানে

যেতে চাইল। জনও তার সঙ্গে যাবার জন্য জেদ ধরল। কিন্তু রবিন শুনল না। সে একা যাবে।

রবিন একাই চলে গেল। রবিন হাঁটতে হাঁটতে তার সঙ্গীদের চোখের আড়াল হয়ে এক জায়গায় গিয়ে তুজনের কথা বলার শব্দ শুনতে পেল। তুজনে কথা বলছে মনে হলো, গলার স্বরটা কিন্তু এক।

ঘাসে ঢাকা নদীর তীরে জলের কাছে অনেকটা এগিয়ে গেল রবিন। নদীর কিনারায় গিয়ে দেখল জলের মত চওড়া কাঁধওয়ালা একজন যাজক মাংস খাচ্ছে আর একা একা নিজের সঙ্গে কথা বলছে। নিজে প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অন্য লোক।

রবিন চুপচাপ ঘাসের উপর বসে লক্ষ্য করতে লাগল। খাওয়ার পর যাজক গান গাইতে শুরু করতে রবিনও সে গানে যোগ দিল। তারপর উঠে যাজকের সঙ্গে আলাপ করতে গেল।

রবিন হাসতে হাসতে বলল, হে সদাশয় ধর্মপিতা, আপনি এ অঞ্চলের সব কিছু জানেন ?

ধর্মযাজক বললেন, হ্যাঁ, কিছুটা জানি।

ফাউন্টেন ডেল নামে জায়গাটা কোথায় তা জানেন ?

সেখানকার মঠের ফ্রায়ারকে চেনেন ?

হ্যাঁ, কিছুটা জানি।

রবিন বুঝল ফাউন্টেন ডেল জায়গাটা নদীর ওপারে। কিন্তু সেখানে কোন সাঁকো বা সেতু না থাকায় নদীতে নেমে নদীটা পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। সে তার পোশাকটা নদীর জলে ভেজাতে চাইছিল না। তাই ফ্রায়ারকে তাকে কাঁধে করে নদী পার করে দিতে বলল।

কথাটা শুনেই প্রথমে রেগে গেল ফ্রায়ার। বলল, তুমি আমাকে কাঁধে করে নদী পার করে দিতে বলছ ? তোমার খুব সাহস ত ?

কিন্তু পরমুহূর্তেই রবিনের পানে মিট মিট করে তাকিয়ে নরম হয়ে বলল, সে তাকে বয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু নদীর মাঝখানে জল যেখানে গভীর সেখানে এসে ফ্রায়ার রবিনকে তার মাথার উপর তুলে ফেলে দিল নদীর জলে।

ওপারে উঠেই তরবারি বার করল রবিন। ফ্রায়ারও তরবারি বার করল। তুজনের মধ্যে শুরু হল জোর লড়াই। একঘণ্টা ধরে সে লড়াই চললেও কেউ কাউকে হারাতে পারল না।

রবিন তখন তার কপাল থেকে ঘাম মুছে ভাবল, এ লোক খুবই সাহসী। ওকে আঘাত করা বা নিজে আহত হওয়া দুটোই খারাপ হবে। তাই সে বলল, তুমি কি চাও আমি শিঙা বাজাব ?

ফ্রায়ার বলল, হ্যাঁ বাজাও। সে দেখতে চাইল তার শিঙা বাজানোর ফল কি হয়। সে যখন দেখল শিঙার শব্দ শুনে চারজন লম্বা লোক সবুজ পোশাক পরে ধনুকে তীর জুড়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে তখন সেও একটা বাঁশি বার করে বাজাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে চারটে বড় বড় শিকারী কুকুর ছুটে এল। রবিন তখন ভয় পেয়ে তার তরবারি ফেলে রেখে একটা গাছের উপরে উঠে পড়ল।

এবার কুকুরগুলো রবিনের দলের চারজন লোককে তাড়া করল। একমাত্র উইল স্কারলেট ছাড়া সকলে তীর ছুঁড়ল কুকুরগুলোকে লক্ষ্য করে। কিন্তু কুকুর চারটি তীরগুলোকে মুখে ধরে ফেলে সেগুলোকে ভেঙ্গে দুটুকরো করে ফেলল।

রবিনের লোকেরা তখন সত্যিই মুস্কিলে পড়ল। কিন্তু এমন সময় উইল স্কারলেট কুকুরগুলোকে ডাকতেই তারা শান্ত হয়ে তার হাত চাটতে লাগল।

তা দেখে ফ্রায়ার আশ্চর্য হয়ে বলল, একি, এই সব লোকের সঙ্গে উইলিয়ম গ্যামওয়েলকে দেখছি কেন ?

স্কারলেট বলল, না ফ্রায়ার টাক, এখন আমার নাম হলো উইল স্কারলেট। এই হচ্ছে আমার মামা রবিন হুড।

রবিন তখন গাছ থেকে নেমে পড়ল। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। বুঝল এই ফ্রায়ার স্কারলেটের বন্ধু বলে তার কাছে তাকে যেতে বলেছিল।

ফ্রায়ারও আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, গ্যামওয়েলের মত বড় ঘরের ছেলে এই সব ডাকাত দলের সঙ্গে কেন মিশছে আর যে লোকটাকে সে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল সেই লোকটাই রবিন হুড।

ফ্রায়ার এবার রবিনকে বলল, কি চাও তুমি আমার কাছে ?

রবিন বলল, বেলা শেষ হয়ে আসছে। এখন সময় নেই। তুমি আমাদের সঙ্গে শেরউড বনে চল। পথে যেতে যেতে সব বলব।

এর পর তারা সকলে মিলে শেরউড বনের দিকে এগোতে লাগল। ফ্রায়ারের কুকুরগুলোও আসতে লাগল তাদের পিছু পিছু।

রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার অনেক পরে শেরউড বনের মধ্যে পৌঁছল তারা।

১৪

এলেনের বিয়ের দিন এসে গেল। কিন্তু রবিন প্রতিজ্ঞা করল এ্যালান ডেলের সঙ্গেই এলেনের বিয়ে হবে।

রবিন উইল স্কারলেটকে নেতা হিসাবে তাদের ডেরায় রেখে জন. উইল স্টিউটলি ও আরো কয়েকজন অনুগত লোককে নিয়ে সে অঞ্চলের ছোট গ্রাম্য চার্চটির পথে রওনা হয়ে পড়ল। রবিন একজন কবির মত নীল, হলদে আর সবুজ রঙের পোশাক পরল।

অনেকক্ষণ যাওয়ার পর একটা পাঁচিলের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে করতে লাগল। এক সময় ডেভিডকে রবিন পাঁচিলের উপর উঠে দূরে যতদূর দেখা যায় দেখতে বলল।

ডেভিড পাঁচিলের উপর উঠলে রবিন তাকে বলল, কি দেখছ ডেভিড ?

ডেভিড বলল, আমি দেখছি মেঘ আর কিছু কালো কাক উড়ে বেড়াচ্ছে।

এর পর অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। অবশেষে রবিনের প্রশ্নের উত্তরে ডেভিড বলল, আমি দেখছি চায়ের ক্ষেতে বাতাস ঢেউ খেলে যাচ্ছে আর পাহাড়ের উপর থেকে একজন ফ্রায়ার চার্চের দিকে এগিয়ে আসছে।

ফ্রায়ার টাক তখন পাঁচিলের ধারে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। এ্যালান ডেল তাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলল।

রবিন তাকে বলল, তোমরা চার্চে যাও। আমি. জন, আর উইল স্টিউটলি পরে যাচ্ছি।

ফ্রায়ার টাক চার্চে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। রবিন এ্যালানের বাদ্য যন্ত্রটা হাতে নিয়ে চারণ কবিরূপে চার্চের দরজার ধারে বসে রইল। রবিনের দেওয়া দু থলে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চার্চে ঢুকে ছিল ফ্রায়ার টাক।

এলেনের বিয়ে দেবার জন্য তার বাবা, তার বর ও উভয় পক্ষের লোকেরা আসতে লাগল। তাদের সবার আগে ছিল হিয়ারফোর্ডের বিশপ। সে ধনী এবং একটা দামী ঘোড়ায় চেপে আসছিল। তার পরে ছিল বিশপের এক খুড়তুতো ভাই, স্যার স্টিফেন। এই বুড়ো নাইট স্যার স্টিফেনের সঙ্গেই এলেলেন বিয়ে দিতে চায় তার বাবা। সেই সঙ্গে এলেন ও তার বাবাও ছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এলেনের বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল বলে ম্লান দেখাছিল তার মুখখানাকে।

হিয়ারফোর্ডের বিশপ চার্চে ঢুকতে গিয়ে দরজার পাশে চারণ কবির বেশে রবিনকে বসে থাকতে দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল।

রবিন বলল, আমি একজন গায়ক। গান গেয়ে বেড়াই। আজ আমি এখানে এমন এক গান গাইব যা শুনে যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তাকে সারাজীবন ভালবেসে যাবে বিয়ের পরে।

বিশপ বললেন, তুমি যদি তেমন গান গাইতে পার তাহলে তুমি যা চাইবে তোমাকে তাই আমি দেব।

রবিন হেসে বলল, পরে নেব।

রবিন এবার সামনে গিয়ে বিয়ে বন্ধ করতে বলল। তখন এ্যালান ডেল ও রবিনের লোকেরা চার্চের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। স্যার স্টিফেন রেগে গিয়ে বেরিয়ে গেল চার্চ থেকে।

রবিন এবার এলেনের বাবাকে দু থলে স্বর্ণমুদ্রা দিল বিয়ের যৌতুক হিসাবে। খুশি হয়ে তা গ্রহণ করল এলেনের বাবা। তাছাড়া তার বাবা জানত সে মত না দিলেও এ্যালানকেই বিয়ে করবে তার মেয়ে।

এরপর ফ্রায়ার টাক এগিয়ে এলেন ও এ্যালান ডেলের বিয়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলো করতে লাগল। সে মন্ত্রপাঠ করে যথারীতি বিয়ের কাজ সম্পন্ন করল। এ্যালান খুব খুশি হলো।

রবিন এবার বিশপকে বলল, আমি আমার কাজ করেছি। এবার আপনি আপনার কথা রাখুন। আপনি এখন আপনার গলার সোনার হারটা দিন আমাকে। আপনি বলেছিলেন আমি যা চাইব তাই দেবেন।

কথাটা শুনে বিশপের রাগ হলেও তাঁর গলার হারটা রবিনের হাতে দিয়ে দিলেন। রবিন সেটা এলেনের গলায় পরিয়ে দিল।

রবিন এবার বিশপের সামনে নত হয়ে বলল, এই সুন্দর উপহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যেহেতু এখন ঘটনাক্রমে শেরউড বনের কাছে চলে এসেছেন তখন আশা করি আমাদের ভোজসভায় যোগদান করবেন।

বিশপ এতে রাজী হলো না। করণ সে জানত কোন ধনী লোককে পেলে তাকে ভোজসভায় নিয়ে গিয়ে তার সব কিছু কেড়ে নেয় রবিন হুড আর তার দলের লোকেরা।

যাই হোক, বরকনে ও তার দলের লোকদের নিয়ে শেরউড বনে চলে গেল রবিন। ফ্রায়ার টাকও তাদের সঙ্গে গেল। সে খুব আমোদপ্রিয় লোক। সে নিজে থেকেই রবিনদের দলে থাকতে চাইছিল।

রবিনও খুশি হয়ে রাজী হয়ে গেল তার প্রস্তাবে।

১৫

শীত গিয়ে বসন্ত এল। শেরউডে বসন্তটা ওদের বেশ ভালই লাগে। দিনগুলো আরামে কেটে যায়।

সেদিন রবিন তার প্রিয় গ্রীণউড গাছের তলায় হরিণের চামড়ার উপর বসে ছিল। জন তখন ধনুকের ছিলার জন্যে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল। আর জানুর উপর রেখে এ্যালান ডেল বাদ্যযন্ত্রের একটা তার ঠিক করছিল।

জন যখন ধনুকের ছিলাটাকে মৌচাকের মোম দিয়ে ঘসছিল রবিন তখন তার সঙ্গে ব্লু বোর ইন নিয়ে কথা বলতে লাগল। গত বছর শীতকালে বেশ কিছুদিন আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে কাটায়। নানান লোকের সঙ্গে মেশে। যে সব লোক ভাল জীবন যাপন করে তাদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয় তাদের।

জন বলল, সে এক ফ্রায়ার বা ধর্মযাজকের মত ঘুরে বেড়াতে চায়। সে যদি দস্যু না হত তাহলে ফ্রায়ার হয়ে পরিভ্রমণ করত।

ফ্রায়ার টাক যাজকের জীবনের উপর একটা গান গাইল। কিন্তু রবিন বলল, যাজকদের থেকে ভিখারিরা আরো আনন্দময় জীবন যাপন করে।

এর পর রবিন জনকে বলল, আচ্ছা জন, আজ একটা অভিযান করলে কেমন হয়? তোমাতে আমাতে বার হব পথে। তুমি একটা ফ্রায়ারের পোশাক ধার করে আন। ভিখারির পোশাক আমাদের নেই। আমি ভিখারির পোশাক কিনে নেব।

পোশাকের ভাণ্ডার থেকে জন একটা পোশাক পরে বেরিয়ে এলে সকলে হাসতে লাগল তাকে দেখে। কারণ ফ্রায়ারের পোশাকটা ছোট হয়েছে তার গায়ে।

রবিন ভিখারির পোশাক কেনার জন্য কিছু টাকা নিল সঙ্গে। তারপর বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

বনটা পার হয়ে ক্রমে তারা বড় রাস্তায় এসে উঠল। তারপর রাস্তাটা যেখানে দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে সেখানে ওরা দুজনে দুদিকে চলে গেল। রবিন গেল সেলসলেবোর দিকে আর জন গেল ব্লাইমের দিকে।

রবিন ঠাট্টা করে জনকে বলল, বিদায় হে ধর্মপিতা আবার আমাদের দেখা হবে তার আগে তোমাকে তোমার জীবনের জন্য কোন প্রার্থনা করতে হবে না।

জন রবিনকে বলল, বিদায় ভিক্ষুকমাশাই। আমাদের আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে দয়াভিক্ষা করতে হবে না।

এদিকে সে রাতে শেরউড বনের মধ্যে আগুন জ্বেলে রবিনের দলের লোকেরা রবিন আর জনের মুখ থেকে তাদের সারাদিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা দুজনে ফিরে আসার পর প্রথমে জন বলল, তিনটি কিশোরী মেয়ের কথা। সে পথে তাদের বাজার যেতে দেখেছিল। তারা তিনজনে হেসে গল্প করতে করতে বাজারে যাচ্ছিল।

এর পর রবিন বলল, একজন ভিখারির কথা। রবিন তার পোশাকটা দাম দিয়ে কিনে নেয় তার কাছ থেকে।

জন আরও বলল, পথে একজন বাসন ঝালাইকারী ও একজন ফেরিওয়ালার সঙ্গেও দেখা হয় তার। তারা তাকে এক পান্থশালায় নিয়ে গিয়ে পয়সা খরচ করে মদ খাওয়ায়।

রবিন বলে, পরে তার সঙ্গে আরো চারজন ভিখারির দেখা হয়। একজন ভিখারি কানা, একজন বোবা, একজন কালা আর একজন খোঁড়ার ভান করে। কিন্তু রবিন পরে জানতে পারে কালা শুনতে পায়, বোবা কথা বলতে পারে, কানা দেখতে পায় এবং খোঁড়া হাঁটতে পারে। আসলে তারা পথিকদের ভুলিয়ে সহজে ভিক্ষা পাবার জন্য এই সব ছলনার আশ্রয় নেয়। রবিন রেগে গিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করে। তারই জয় হয়। তখন ভিখারিরা তাদের কাছে যে সব টাকা পয়সা ছিল তা রবিনকে দিয়ে দেয়।

জন আরও বলে সে দুজন ফ্রায়ারের দেখা পায়। সে খাবারের জন্য কিছু টাকা চায় তাদের কাছে। কিন্তু তারা বলে তাদের কাছে কোন টাকা নেই। জন পরে তাদের পোশাক হতে টাকা বার করে। জন সেই টাকা দেখাল তাদের দলের লোকদের।

রবিন তারপর বলল, শেষে একজন গ্রাম্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হয় তার। গরীবদের ঠকিয়ে ধনী হয়ে ওঠে সে। রবিন তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাকে বলে সেও একজন ধনী লোক। কিন্তু ডাকাত রবিন হুডের ভয়ে ভিখারির পোশাক পরে পথে বার হয়েছে। ব্যবসাদারটা তখন তাকে বিশ্বাস করে বলের বিন হুডের ভয়ে তার জুতোর ভিতরে পায়ের তলায় টাকা লুকিয়ে রেখেছি। রবিন তখন তার জুতোজোড়াটা নিয়ে নেয়।

জুতোজোড়াটা তার দলের লোকেদের দেখাল রবিন।

দুজনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে দলের সবাই হাসতে লাগল। কেউ কেউ ফ্রায়ারের জীবন আর কেউ ভিখারির জীবনকে পছন্দ করল।

১৬

তখন গ্রীষ্মকাল। গরম ধুলোয় ভরা সাদা রাস্তাটা প্রসারিত হয়ে আছে সামনে। রাণীর খাস চাকর রিচার্ড পার্টিংটন দুধের মত সাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল শেরউড়ের দিকে। মুক্তোখচিত রেশম আর মখমলের পোশাক ছিল তার পরনে। তার ছোরাটা চকচক করছিল রোদের ছটায়। তার বয়স মাত্র ষোল বছর।

রোদে গরমে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। তাই বনের পাশে শীতল ছায়াঘেরা ব্লু বোর পান্থশালাটা দেখতে পেয়ে তার সামনে ঘোড়াটা থামাল সে।

তখন সেই পান্থশালার কাছে পাঁচজন লোক একটা ওকগাছের তলায় মদ খাচ্ছিল। তাদের দুজনের পরনে ছিল সবুজ পোশাক। একজনের চেহারা খুব লম্বা এবং বলিষ্ঠ। একজনের চেহারা দেখতে খুবই সুন্দর। তার মুখটা রোদেপোড়া তামাটে আর চুলগুলো ছিল কোঁচকানো আর বাদামী রঙের।

পান্থশালার মালিক পার্টিংটনকে টোস্ট আর মদ এনে দিল। ঘোড়ার উপর বসেই তা খেল সে। সে বলল, সে রবিন হুডের খোঁজে এসেছে।

তা শুনে যে পাঁচজন লোক ওকগাছের তলায় বসে মদ খাচ্ছিল তাদের একজন অন্য একজনকে বলল, আমার মনে হয় ওকে রবিনের কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে উইল।

এদিকে শেরউড বনে তখন সেই গ্রীণউড গাছের শীতল ছায়াতলে নরম ঘাসের উপর শুয়ে ছিল রবিন আর তার দলের লোকেরা। এ্যালান ডেল একটা মিষ্টি গান গাইছিল তার বাদ্যযন্ত্রটা বাজিয়ে। আর সবাই একমনে শুনছিল তা।

এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল ওরা। পরে দেখল জন আর উইল স্টিউটলি মাঝখানে রাণীর ভৃত্য পার্টিংটনকে নিয়ে দুদিকে দুজন ঘোড়ায় চড়ে আসছে।

রবিন সঙ্গে সঙ্গে উঠে অভ্যর্থনা জানাল রাণীর ভৃত্যকে।

পার্টিংটন নেমে পড়ল তার ঘোড়া থেকে। তার হাতে ছিল একটা মখমলের বাক্স।

রবিন পার্টিংটনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার পর বলল, আপনার মত এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের গরীবের কুটিরে পদার্পণ করেছেন কি কারণে?

পার্টিংটন রবিনকে বলল, রাজা হেনরি লণ্ডন শহরে এক তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। রাণীর ইচ্ছা রবিন হুড এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করুক। রাণী তাঁর আঙুল থেকে একটি সোনার আংটি খুলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রবিন এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে না। এই আংটিটি এবিষয়ে রাণীর শুভেচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির প্রতীক।

রবিন হুড আংটিটি নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে চুম্বন করে তার আঙ্গুলে পরল। তারপর বলল রাণীর আদেশমত আমি আপনার সঙ্গে লণ্ডনে যাব।

পার্টিংটন বলল, আমাদের এখন হাতে সময় নেই। আমাদের ওখানে যেতে চারদিন লাগবে।

রবিন বলল, আমার তিনজন লোক যাবে আমার সঙ্গে। জন আমার ডান হাত। আমার ভাগনে উইল স্কারলেট আর চারন কবি এ্যালান এ ডেল। অনুপস্থিতিকালে উইল স্টিউটলি এখানে নেতা হিসাবে কাজ করবে।

অবশেষে তারা লণ্ডনে গিয়ে পৌছাল। রবিন একটি নীল পোশাক পরেছিল। জন আর উইল স্কারলেট লিঙ্কন সবুজ পোশাক পরেছিল আর এ্যালান ডেলের পরনে ছিল এক ঘোর লাল পোশাক। পালিশ করা চকচকে ইস্পাতের টুপি ছিল সকলের মাথায়।

রাজার প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের একটি ঘরে রবিন আর তার তিনজন সহচর রাণীর সামনে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করল রাণীকে। জানালা দিয়ে সোনালি আলো এসে পড়েছিল ঘরের ভিতরে। বাগান থেকে মিষ্টি গোলাপের গন্ধ আসছিল বাতাসে।

রাণী তাদের প্রচুর খাওয়াল। খাওয়ার পর রাণী তাদের নানারকম অভিযানের কথা শোনাতে বললেন। তারা কতকগুলি অভিযানের কথা বললে রাণী ও তাঁর সহচরীরা হাসতে লাগল। এ্যালান ডেল গান গাইল। এইভাবে প্রতিযোগিতার আগে পর্যন্ত সময়টা আনন্দে কেটে গেল তাদের।

প্রতিযোগিতার মাঠটাকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। তাতে নানারকমের রঙীন পতাকা উড়ছিল তাদের সামনে।

ছয়জন লোক জয়ঢাক বাজাচ্ছিল। অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার কিছু আগে রাজা হেনরি, রাণী এলিনর ও সভাসদরা এসে আসন গ্রহণ করল।

রাণী রাজার সঙ্গে বাজী রাখলেন। তিনি বললেন, আমি জানি তিনজন বাইরের তীরন্দাজ রাজার সব তীরন্দাজদের হারিয়ে দেবে। তাদের মধ্য থেকেই জয়ী হবে একজন।

কিন্তু সবার মুখে একই প্রশ্ন, কারা এই তিনজন তীরন্দাজ? রবিন প্রতিযোগী হিসাবে নিজের নাম বলল লক্‌সলে। লক্‌সলে শহরেই তার জন্ম হয়।

রবিন তার পরিচয় গোপন করে অন্য পরিচয় দিলেও হিয়ারফোর্ডের বিশপ তাকে দেখেই রবিন হুড বলে চিনতে পারল।

মোট আটশো তীরন্দাজ যোগদান করল। বহু তীর জড়ো হলো লক্ষ্য-স্থলে। কিন্তু রবিন হুড ও তার দুজন সঙ্গীর সঙ্গে পেরে উঠল না কেউ।

রবিন হুড ও তার সঙ্গী দুজন জয়ী হলে দর্শকরা তাদের ঘিরে ধরল। রবিন রাজার তীরন্দাজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গিলবার্টের সঙ্গে যখন কথা বলছিল, তখন হঠাৎ একজন এসে রবিনকে একটা কাগজ দিয়ে বলল, রিচার্ড পার্টিংটন এটা তোমাকে দেবার জন্য দিয়েছে।

রবিন দেখল কাগজে লেখা আছে, 'সিংহ গর্জন করছে তোমাকে দেখে, তোমার মাথা বাঁচাতে চাও ত সরে যাও।'

রবিন বুঝল, রাণী এলিনর তাকে সাবধান করে দিয়েছে। হিয়ারফোর্ডের বিশপ হয়ত তার কথা বলে দিয়েছে রাজাকে। রাজা তাকে গ্রেপ্তার করবে।

একথা বুঝতে পেরে রবিন তার লোকদের নিয়ে জনতার ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। তারপর লণ্ডন শহর পার হয়ে উত্তর দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

১৭

তখন রাত্রি হয়ে গেছে। চাঁদ ভেসে চলেছে নীল আকাশে। চাঁদের আলোভরা নির্জন পথের উপর দিয়ে চারটি ছায়ামূর্তি পথ চলছিল চুপিসারে।

অবশেষে তারা একটা পান্থশালার কাছে এসে থামল। রবিন বলল, রাতটা এইখানেই কাটানো যাক।

উইল স্কারলেট বলল, এ জায়গাটা কিন্তু লণ্ডনের খুব কাছে।

তবু তারা ঢুকে পড়ল পান্থশালার মধ্যে।

তারা যখন নীরবে খাচ্ছিল তখন হঠাৎ মালিক এসে রবিনকে বলল, আপনাদের মধ্যে নীল পোশাকপরা একজনের সঙ্গে রিচার্ড পার্টিংটন দেখা করতে চান।

রবিন তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেল বাইরে।

পার্টিংটন রবিনকে বলল, হিয়ারফোর্ডের বিশপ তোমার বিরুদ্ধে রাজার মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেই মাঠ থেকেই তোমাদের গ্রেপ্তার করার জন্য রাজা তাঁর লোকদের হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু তার আগেই পালিয়ে এসেছ তোমরা। এখন বিশপের নেতৃত্বে এক হাজার সৈনিক তোমাকে ধরতে আসছে এই পথে। বিশপ প্রতিজ্ঞা করেছে যে তোমাকে ফাঁসি দেবেই। রাণী তাই তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্য পাঠিয়েছেন আমাকে।

রবিন বলল, আমি এই রাতেই অন্য পথ দিয়ে চলে যাব। আমার লোকদের পাঠিয়ে দেব অন্য আর এক পথে। পান্থশালার মালিককে বলল, আমরা সবাই আনবানস্ এর পথে যাচ্ছি। যাই হোক, তুমি আবার আমার জীবন রক্ষা করলে। তোমার কথা কখনো ভুলব না জীবনে।

রবিনের সঙ্গে করমর্দন করে তাকে বিদায় জানিয়ে পার্টিংটন লণ্ডনের পথে তার ঘোড়াটাকে চালিয়ে দিল।

রবিন তার লোকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পান্থশালা থেকে। বলল, খুব সাবধান। স্কারলেট তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

কিছুদূর যাওয়ার পর রবিন অন্য তিনজনকে অন্য পথে পাঠিয়ে দিয়ে সে একা চলে গেল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার কুড়িজন সৈনিক রবিনদের খোঁজে পান্থশালায় এসে পড়ল। মালিক বলল, রবিন আর তার লোকেরা সেণ্ট আনবানস্ এর পথে চলে গেছে।

উইল স্কারলেট, এ্যালান এ ডেল আর জন আট দিন পর শেরউড বনে পৌঁছল। পথে তারা কোন বাধা পায়নি। কিন্তু তারা গিয়ে দেখল রবিন তখনো ফিরে আসেনি।

বিশপ যখন দেখল রবিন মিথ্যা কথা বলে সেণ্ট আনবানস্এ না গিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে গেছে তখন সে তার লোকদের নির্দেশ দিল, শেরউড যাবার সব পথ বন্ধ করে দাও। পথে পথে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করো।

বিশপের সেনাদলে শেরিফও যোগদান করল। রবিন দেখল সে যেখানে

আছে সেখান থেকে শেরউড বন একদিনের পথ। কিন্তু তখনো সে বুঝতে পারল না শেরউড যাবার সব পথ বন্ধ তার কাছে।

একদিন পথ চলতে চলতে পথের ধারে একটা নদী থেকে সে জল খাচ্ছিল তখন হঠাৎ একটা তীর পিছন থেকে এসে তার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। রবিন চমকে উঠে লাফ দিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিল। তারপর কোনরকমে ওপারে চলে গেল। অল্প কিছুর জন্য বেঁচে গেল সে।

ওপারে গিয়ে উঠলেও পরিত্রাণ পেল না রবিন। সে যখন ছুটে পালাচ্ছিল তখন ছটা তীর ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। একটা তীর গায়ে লাগল। কিন্তু গায়ে ইস্পাতের জামা ছিল বলে তীরটা তা ভেদ করতে পারেনি। সে অঞ্চলের পথঘাট রবিনের চেনা ছিল বলে সহজেই পালিয়ে যেতে পারল। তাকে ধরতে পারল না রাজার সৈন্যরা।

সেখান থেকে মাইলখানেক পথ যেতে না যেতেই রবিন দেখল একটা পাহাড়ের উপর রাজার সৈন্যরা তার জন্য বসে আছে। সৈনিকরা তাকে দেখতে পাওয়ার আগেই রবিন যে পথে এসেছিল সেই পথেই ছুটে পালিয়ে গেল।

এইভাবে দিনের পর দিন মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রবিন। আর সে হাঁটতে পারছিল না।

একদিন বনের ধারে একটা ঝোপের মধ্যে রবিন যখন বিশ্রাম করছিল তখন সে পথে একজন মুচিকে দেখে তার পোশাকটা নিয়ে তার নিজের পোশাকটা মুচিকে দিয়ে দিল। মুচির পোশাকটা পরে ফেলল রবিন সঙ্গে সঙ্গে। ছদ্মবেশ ধারণ করায় মুচি বলে মনে হলো তাকে। খুঁটিয়ে না দেখলে তাকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না রবিন হুড বলে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ঝড় উঠল। আর পথ চলতে পারছিল না সে। সে তখন একটা পান্থশালায় গিয়ে রাতটা কাটাল। সে যে ঘরে ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরেই একজন ফ্রায়ারও ছিল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রবিন দেখল সেই ঘরে একজন ফ্রায়ার ঘুমোচ্ছে। সে তখন তার সেই মুচির পোশাক ছেড়ে ফ্রায়ারের পোশাক পরে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

এদিকে সেই মুচির গায়ে রবিনের নীল পোশাকটা থাকায় তা দেখে তাকে গ্রেপ্তার করল রাজার লোকেরা।

সেদিন বিকালে স্যার রিচার্ড অফ লী নামে এক নাইটের সঙ্গে দেখা

হলো রবিনের। কয়েক বছর আগে একটা ব্যাপারে এই নাইটকে সাহায্য করেছিল রবিন।

রবিনের তখন পালাবার কোন পথ ছিল না। লুকিয়ে থাকার মত কোন জায়গা ছিল না। সামনে শেরিফের লোক। পিছনে রাজার লোক। তার ছদ্মবেশের কথাও জেনে গেছে রাজার লোকেরা।

রবিনের সব কথা শুনে দয়া হলো স্যার রিচার্ডের। তিনি সাহায্য করতে চাইলেন তাকে। তিনি তাকে তাঁরই একজন ভৃত্যের ছদ্মবেশ পরিয়ে রেখে দিলেন তাঁর প্রাসাদে।

এরপর একদিন রাণী কোন কারণে স্যার রিচার্ডের প্রাসাদে এলে রাণীর সামনে রবিনের কথা বললেন রিচার্ড। রবিনকে বললেন, রাণীকে সব কথা বলে তাঁর সাহায্য চাও।

বাগানের পাঁচিল থেকে হঠাৎ রবিন রাণীর সামনে লাফিয়ে পড়লে প্রথমে ঘাবড়ে যান রাণী। পরে রবিনের মুখ থেকে সব কথা শুনে তিনি বললেন, কোন ভয় নেই তোমার। আমি রাজার কাছে গিয়ে তোমার জন্য অনুরোধ করব।

একদিন রবার্ট নামে রাণীর এক বন্ধু এসে রবিনকে বলল, রাণীর জন্যই এযাত্রায় বেঁচে গেছ। তা না হলে বাঁচার কোন উপায় ছিল না তোমার। এই বিপদ থেকে তুমি দুটো শিক্ষা পেতে পার। প্রথমতঃ সৎভাবে জীবন যাপন করার চেষ্টা করো। দ্বিতীয়তঃ আরো সতর্কতা অবলম্বন করো। সাবধানে থাকবে। বেশী নির্ভীকতা দেখাবে না। ক্রুদ্ধ সিংহের মুখ থেকে কোনরকমে বেঁচে এসেছ। আর ওপথে যাবে না।

দু একদিনের মধ্যেই রাণী রাজার প্রধান ভৃত্য এডওয়ার্ড কানিংহামকে সঙ্গে নিয়েফিরে এলেন স্যার রিচার্ডের প্রাসাদে। তিনি ঘোষণা করলেন ক্যানিংহাম রবিনকে সঙ্গে করে নিরাপদে শেরউড বনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।কেউ তার ক্ষতি করবে না।

তিন দিন পর রবিন যাত্রা করল কানিংহামের সঙ্গে। পথে রবিন দেখল রাজার সৈনিকরা ফিরে যাচ্ছে লণ্ডনের পথে। কিন্তু কেউ তাদের বাধা দিল না। রবিন বুঝল, রাণীই দয়া করে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

রবার্টের উপদেশ মেনে চলতে লাগল রবিন। সে তখন থেকে শেরউড বন ছেড়ে দূরে কোথাও যেত না।

১৮

তার পর থেকে অনেকদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। রাজা হেনরি মারা গেছেন। রিচার্ড রাজা হয়েছেন। রিচার্ডের সিংহাসনলাভ এক রোমাঞ্চকর ঘটনা।

কিন্তু এই সব রাজনৈতিক ঘটনার কথা শেরউডে পেঁছিল না। রবিন ও দলের লোকেরা আগের মতই বাস করতে লাগল বনের মধ্যে।

তখন গ্রীষ্মকাল। একদিন সকালে পাখির ডাকে ঘুম থেকে জেগে উঠল রবিন।

তারপর জনকে জাগাল। কিছু পরে তুজনে এক অভিযানে বেরিয়ে গেল। জন গেল বাঁদিকের একটা পথ ধরে আর রবিন গেল ডান দিকের পথে।

এবার হিয়ারফোর্ডের বিশপ আর নটিংহামের শেরিফ তুজনে মিলে গীসবোর্ণের গী নামে একটা খুনীকে টাকা দিয়ে বশ করে রবিন হুডকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে আনতে বলল। সে ছিল চোর এবং খুনী।

বিশপ আর শেরিফ তাকে বলল, যদি তুমি একাজ করতে পার তাহলে তোমার সব দণ্ড মকুব করা হবে এবং তুশো পাউণ্ড পুরস্কার পাবে।

গীসবোর্ণের গীর পরনে ছিল লোমওয়ালা ঘোড়ার চামড়ার কোট। তার মাথায় ছিল ঘোড়ার চামড়ার টুপি। তুদিকে ধারওয়ালা এক তীক্ষ্ণ তরবারি আর একটা বড় ছোরা ছিল তার কোমরে। হাতে ছিল একটা ধনুক আর পিঠে তীরের তূণ।

একদিন পথে যেতে যেতে হঠাৎ গীসবোর্ণের গীর সামনে পড়ে গেল রবিন। গী সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা থেকে টুপিটা সরিয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল রবিনের দিকে। কালো ভয়ঙ্কর চোখ আর বাঁকা নাকওয়ালা তার রঙিন মুখখানা প্রকট হয়ে উঠল।

রবিনও তাকে দেখে গর্জন করে উঠল। রক্তচোষা শয়তান। তোর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে।

তুজনেই বুঝতে পারল একজনকে মরতেই হবে। কেউ কাউকে দয়া করবে না।

তাদের তরবারি তুটো চকচক করছিল। লড়াই শুরু হয়ে গেল। তাদের পায়ের ভারে ঘাসগুলো দলিত হতে লাগল। গীর দেহ থেকেই প্রথম রক্তপাত হলো।

গী এবার রবিনের গায়ের উপর এক জোর আঘাত দিতেই একটা গাছের শিকড়ে পা লেগে উল্টে পড়ে গেল রবিন। গী এবার রবিনকে লক্ষ্য করে তরবারির একটা ঘা দিল। কিন্তু রবিন হাত দিয়ে সেটা আটকে ফেলল। তার তালুর কিছুটা কেটে গেল।

রবিন এবার উঠেই তার তরবারিটা গীর পাঁজরে আমূল বসিয়ে দিল। গী সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়ে মারা গেল।

রবিন তখন গীর গা থেকে তার চামড়ার পোশাকটা খুলে সেটা পরল। তারপর তার তরবারি আর তীর ধনুক নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। সে ঠিক করল এবার সে শেরিফের উপর প্রতিশোধ নেবে।

গীর মৃত্যুতে অনেকে খুশি হলো। কারণ তাকে সবাই এমন ভয় করত যে তাকে দেখতে পেলেই লুকিয়ে পড়ত সবাই।

এদিকে জন ধরা পড়ে শেরিফের হাতে। সে তখন ফাঁসির দিন গুনছিল।

একদিন পথে যেতে যেতে জন দেখে এক বুড়ি পথের ধারে বসে বসে কাঁদছে। সে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে শেরিফের বন থেকে একটা হরিণ মারার জন্য বুড়ির তিন ছেলেকে ধরে ফাঁসি দিতে যাচ্ছে শেরিফ। তাদের মৃত্যুদণ্ড দান করা হয়েছে।

জনের অন্তরটা বড় নরম ছিল বলে সে বুড়িকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল।

বুড়ি জনকে বলল; শেরিফ তার ছেলেদের ফাঁসি দেবেই। সে শুধু তার যে লোকটা রবিন হুডকে ধরতে গেছে তার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে। তা শুনে এক ফ্রায়ারের পোশাক পরে ছদ্মবেশ ধারণ করে শেরিফের কাছে গেল জন।

একটা ওক গাছের তলায় তিনটে যুবক ফাঁসির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। গাছের একটা ডাল থেকে তিনটে ফাঁসের দড়ি ঝুলছিল। ফাঁসগুলো তাদের গলায় আলগা করে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

জন ফ্রায়ারের বেশে শেরিফের কাছে গিয়ে বলল, আমি এই যুবকদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিতে পারি কি ?

জনের চুল আর দাড়ি দুটোই ফ্রায়ারের মত সাদা ছিল। তাকে খুঁটিয়ে দেখেও চিনতে পারল না শেরিফ।

জন যুবকদের কাছে গিয়ে চুপি চুপি তাদের পালাতে বলল। সে তাদের সব বাঁধন কেটে দিল। শেরিফ ও তার লোকেরা সেদিকে নজর দিল না।

যুবকরা পালিয়ে গেলে জন শেরিফকে লক্ষ্য করে এক তীর জুড়ল ধনুকে। কিন্তু তীরটা ছোঁড়ার আগেই ভেঙ্গে গেল তীরটা।

শেরিফ তখন ঘোড়া ছুটিয়ে জনকে তেড়ে এল। তার উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে জন মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

জ্ঞান ফিরে এলে জন দেখল তার হাত পা বাঁধা। আঘাতে অসাড় হয়ে আছে সর্বাঙ্গ। সে আরও দেখল তার সামনে কুখ্যাত খুনী গীসবোর্ণের গী দাঁড়িয়ে আছে। তার পোশাকে ছিল রক্তের দাগ। তার হাতে ছিল রবিনের শিঙা আর ধনুক।

জনের চোখে জল এল। সে ভাবল নিশ্চয় গীর হাতে নিহত হয়েছে রবিন।

এদিকে রবিনের মৃত্যু সংবাদ শুনে শেরিফ আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

গী এবার শেরিফকে বলল, আমি জনকেও মারতে চাই।

এই বলে সে জনের দিকে এগিয়ে এল। তারপর জনের কানে কানে বলল, গীর পোশাক পরেছি বলে চিনতে পারছ না? আমি রবিন।

এই বলে জনের সব বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিল তাকে।

রবিন তার শিঙাটা বাজাতে লাগল। শেরিফ এবার চিনতে পারল রবিনকে। কিন্তু সশস্ত্র জন আর রবিনের সামনে তাদের দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। তাই তারা ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল।

রবিনের দলের কয়েকজন লোক শিঙার শব্দ শুনে ছুটে এসে রবিন আর জনকে জীবিত অবস্থায় দেখে খুশি হলো।

১৯

এর দুমাস পর সোরগোল পড়ে গেল নটিংহাম শহরে। রাজা রিচার্ড নিজে আসছেন নটিংহামের শেরিফের বাড়িতে। শহরের রাস্তাগুলো সব সাজানো হয়েছে। রং বেরঙের পতাকা উড়ছে এখানে সেখানে।

জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রাসহকারে ঘোড়ায় চড়ে শহরে প্রবেশ করলেন রাজা রিচার্ড। পথের দুপাশে ভিড় করে দাঁড়াল শহরবাসীরা। রাজার পিছনে ছিল বর্ম পরিহিত নাইট আর সশস্ত্র প্রহরীর দল। সব শেষে ছিল রেশম ও মখমলের পোশাকপরা রাজার ভৃত্যরা। রাজার পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে

যাচ্ছিল শেরিফ। তার মাথাটা রাজার থেকে লম্বা। তার চুল আর দাড়িটা ছিল সোনালি রঙের। তার গলায় ছিল একটা চওড়া হার।

সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানাচ্ছিল রাজাকে। সেই জনতার ভিড়ের মধ্যে রবিন হুড ও তার দলের লোকেরাও ছিল। কারণ তারা রাজার প্রতি অনুরক্ত ছিল। রাজাকে অনুগত প্রজার মতই ভালবাসত তারা।

সেরাতে শেরিফের প্রাসাদে গিল্ড হলে ভোজসভায় রাজা শেরিফকে রবিন হুড সম্বন্ধে কিছু বলতে বললেন। তার জীবনকাহিনী শুনতে চাইলেন। শেরিফ ও হিয়ারফোর্ডের বিশপ দুজনেই চুপ করে রইল।

তখন হেনরি অফ লী নামে রাজার এক প্রিয়পাত্র রাজাকে বলল, রবিন হুড একবার বিশপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রাজার পিতা রিচার্ড অফ লীকে সাহায্য করে। এর পর কয়েকজন রাজাকে রবিন হুডের নানারকমের অভি-যানের কাহিনী শোনাল।

সে রাতে রাজা শুধু রবিন হুডের কথাই ভাবতে লাগলেন। স্যার রবার্ট অফ কিংহাম নামে এই নাইট রাজাকে হেসে বলল, রবিন হুডের দেখা পাওয়া এমন কিছু শক্ত নয় মহারাজ। টাকা ভর্তি থলে নিয়ে ফ্রায়ারের পোশাক পরে শেরউড বনে গেলেই তার দেখা পাব আমরা এবং তার ভোজসভায় যোগদান করতেও পারব।

এই পরিকল্পনাটা মনে লেগে গেল রাজার।

পরদিন সকালেই সাতজন লোক নিয়ে শেরউড বনের দিকে রওনা হয়ে পড়লেন রাজা।

বিকালের দিকে শেরউড বনের সীমানার মধ্যে গিয়ে পড়লেন তাঁরা। রাজা তখন বললেন, এখানে মদ পাওয়া যাবে কি? আমি পঞ্চাশ পাউণ্ড দেব।

রাজার কথা শেষ হতেই সোনালি চুল আর দাড়িওয়ালা লম্বা চেহারার একজন লোক বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রায়ারবেশী রাজার ঘোড়ার লাগামটা ধরল। তার চোখগুলো ছিল নীল।

লোকটি রাজাকে বলল, হে ধর্মভাই, আমার অনুরোধ, নিকটে একটা পান্থশালা আছে। পঞ্চাশ পাউণ্ড দিলে আমরা আপনাদের জন্য ভাল পান ভোজনের ব্যবস্থা করব।

এই বলে সে তার শিঙাটা বাজাতেই ষাট জন লোক এসে হাজির হলো তার কাছে।

রাজা গম্ভীরভাবে বললেন, বলপ্রয়োগের কোন দরকার নেই। এই নাও টাকার থলে।

আসলে সেই লম্বা লোকটি ছিল রবিন হুড। সে রাজাকে চিনতে না পেরে বলল, এমন উদ্ধতভাবে কথা বলো না। তুমি কি ইংলণ্ডের রাজা নাকি? উইল, টাকার থলেটা নাও ত।

উইল স্কারলেট থলেটা নিয়ে টাকাগুলো গুণে রবিনকে বলল। রবিন তাকে বলল, অর্ধেক টাকা নিয়ে বাকিটা ফেরৎ দাও।

এর পর রবিন রাজাকে তাঁর মাথার টুপিটা খুলতে বলল। কিন্তু রাজা বললেল, তিনি ধর্মীয় কারণে সে টুপি খুলবেন না। রবিন তখন আর চাপ দিল না।

রবিন এবার ফ্রায়ারবেশী রাজা ও তাঁর দলের সাতজনকে শেরউড বনের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেল।

এদিকে জনও ষাট জন লোক নিয়ে একজন ধনী অতিথিকে ধরে আনতে গেছে। সে তখনো ফেরেনি।

গ্রীণউড গাছের তলায় ফ্রায়ার টাক চল্লিশ জন লোক নিয়ে বসে ছিল। টাক আগন্তুক আট জন ফ্রায়ারকে সাদর অভার্থনা জানাল।

এরপর শুরু হলো রবিনের ভোজসভা। উপস্থিত সকলেই রাজা রিচার্ডের স্বাস্থ্যপান করল। রাজা নিজেও তাই করলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর খেলাধূলার আসর বসল। চার আঙুল চওড়া একটা লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে রবিন তার দলের সবাইকে বলল, প্রত্যেকে একে একে তীর ছুঁড়ব। কিন্তু লক্ষ্যটা বিদ্ধ করতে না পারলে উইল স্কারলেট তাকে ঘুষি মেরে ফেলে দেবে।

রাজা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু রবিনের দলের কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। শেষে রবিনের পালা এল। কিন্তু রবিনের তীরে পালক গাঁথা ছিল বলে তীরটা লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারল না। তার দলের লোকেরা সবাই হাসতে লাগল।

উইল স্কারলেট তাকে বলল, এস মামা, তোমাকে ঘুঁষি মেরে ফেলে দিই।

রবিন বলল, আমি তোমাকে ঘুষি মারতে দেব না। আমি বরং ঐ লম্বা ফ্রায়ারের হাতে ঘুষি খাব। উনি যদি আমাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিতে পারেন তাহলে আমি ওঁর সব টাকা ফেরৎ দেব।

রাজা রবিনকে ঘুষি মেরে ফেলে দিতেই উইল স্কারলেট তাঁর টাকার থলেটা দিয়ে দিল।

এমন সময় জন তার ষাট জন লোকসহ স্যার রিচার্ড লীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল সেখানে।

স্যার রিচার্ড অফ লী রবিনকে বললেন, তুমি তোমার দলবল নিয়ে আমার সঙ্গে আমার প্রাসাদে চলে এস। রাজা এই বনে আসছে তোমাদের ধরতে। তোমাদের বিপদ না কাটা পর্যন্ত আমার ওখানেই থাকবে।

সহসা ফ্রায়ারবেশী রাজাকে ভাল করে দেখেই তাঁকে চিনতে পারল রিচার্ড? সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হলো রাজার সামনে। রাজা তখন তাঁর মাথা থেকে যাজকের টুপিটা সরিয়ে দিলেন।

তখন রবিন হুড ও তার দলের সব লোকই নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানাল রাজাকে।

রাজা এবার স্যার রিচার্ডকে ভর্ৎসনা করলেন। রবিন হুডের মত একজন ডাকাতকে তার বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে বলা উচিত হয়নি তার। কিন্তু স্যার রিচার্ড ও তার ছেলে হেনরি লী দুজনে রবিন হুডের পক্ষ অবলম্বন করে বলল, রবিন একদিন তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সেইদিনই শেরউড বনে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল চিরকালের মত। কারণ রাজা রবিন হুড, তার ভাগনে উইল স্কারলেট, জন আর এ্যালান ডেলকে লণ্ডনে তার রাজ-দরবারে থাকার জন্য আদেশ করলেন। তারা তাঁর প্রাসাদেই বাড়ির লোকের মত থাকা খাওয়া করবে। রবিনের দলকে সম্পূর্ণরূপে মার্জনা করা হলো। রবিন হুডের দলের বাকি লোকেরা ভাড়াটে খেলোয়াড় রূপে গণ্য হবে।

দু এক বছর পর জন একদিন রাজদরবার থেকে নটিংহামে ফিরে এসে শেরউড বনের কাছাকাছি এক জায়গায় বাস করতে লাগল। উইল স্কারলেট তার বাড়ি ফিরে গেল। রবিনকে রাজা হান্টিংডনের আর্ল করে দিলেন। রাজা যখনই কোন যুদ্ধে যেতেন রবিন তাঁর সঙ্গে যেত। রবিন যতদিন রাজার কাছে ছিল এ্যালান ডেল ও তার স্ত্রী এলেনও তার কাছেই বাস করত।

কিন্তু শেরউড বনে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল রবিনের মনটা।

২০

কোন এক যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন রাজা রিচার্ড। বীর যোদ্ধা রিচার্ডের মৃত্যুর পর জন রাজা হলেন।

রাজা জনের কাছে রবিন হুড একদিন শেরউড বনে একবার যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

রাজা জন তাকে মাত্র তিন দিনের জন্য শেরউড বনে থাকার অনুমতি দিলেন। তারপরই তাকে চলে আসতে হবে।

রবিনের সঙ্গে এ্যালান ডেলও শেরউড বনের পথে রওনা হলো। যাবার পথে তার সঙ্গে অতীত দিনের কথা বলতে লাগল রবিন।

শেরউড বনের কাছে এসে রবিন একটা গাছ দেখিয়ে এ্যালানকে বলল, ঐ দেখ ঐ গাছটার এক জায়গায় একটা ক্ষত রয়েছে। তুমি একটা হরিণকে মারার জন্য তীর ছুঁড়লে তীর ঐ গাছে লেগে খানিকটা ছাল উঠিয়ে দেয় তীরটা। আমরা একবার এক ঝড়ের কবলে পড়ে এক চাষীর কুঁড়েতে আশ্রয় নিই।

এই ধরনের কত কথা বলল রবিন। অতীতের কত কথা মনে পড়ল তার একে একে। এই সব পথ, এই সব গাছ তার কত চেনা। কতদিন এখানে কাটিয়েছে সে। জন ও তার প্রিয় সহচরদের কথাও মনে পড়ল তার।

অবশেষে তারা সেই রবিনের অতিপ্রিয় গ্রীণউড গাছের তলায় এসে হাজির হলো। সেই বনভূমি, সেই সব গাছপালা যেখানে যা ছিল তা সব ঠিকই আছে। তবু তার মনে হলো সব কিছু যেন বদলে গেছে একেবারে। অতীত সুখের যে সব দিন হারিয়ে গেছে সে সব দিন আর ফিরে পাবে না সে। এই সব ভাবতে ভাবতে চোখে জল এল রবিনের।

হঠাৎ কি মনে হলো সে তার কাঁধে ঝোলানো শিঙাটা নিয়ে বাজাতে লাগল রবিন।

এদিকে জন নটিংহাম শহর আর শেরউড বনের মাঝখানে একজায়গায় বাস করত কুঁড়ে বেঁধে। সেদিন সে বেড়াতে বেরিয়েছিল একা একা। সহসা সে দূরে তার পরিচিত শিঙা বাজানোর শব্দ শুনতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল।

জোর চিৎকার করে সাড়া দিয়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছুটতে লাগল সে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে অবশেষে গ্রীণউড গাছের তলায় সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে হাজির হলো। সেখানে রবিনকে দেখতে পেয়ে আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরে মাটি থেকে তুলে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে বনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে উইল স্টিউটলির নেতৃত্বে একটা বড় দল এসে হাজির হলো। স্কেদলক আর মিজ মিলারও এল।

তাদের দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল রবিন। আত্মহারা হয়ে সে বলে উঠল, আমি শপথ করছি আর আমি এই বন ছেড়ে কোথাও যাব না। রবার্ট ও আর্ল অফ হান্টিংডনকে ভুলে যাব আমি। আমি আবার হয়ে উঠব সেই রবিন হুড।

এদিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রবিন ফিরে না যাওয়ায় প্রচণ্ডভাবে রেগে গেলেন রাজা জন। স্যার উইনিয়ম ডেল নামে এক নাইট আর নটিংহামের শেরিফের উপর রবিনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনার হুকুম দিলেন তিনি।

কিন্তু রবিন বিনা যুদ্ধে ধরা দিতে চাইল না। দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। শেরিফ মারা গেল সে যুদ্ধে। স্যার উইলিয়ম ডেল আহত হলো। কিন্তু রবিন ধরা পড়ল না। তবে তার দলের অনেক লোক এ যুদ্ধে মারা যাওয়ায় একেবারে দেহেমনে ভেঙ্গে পড়ল রবিন।

এক দূষিত জ্বরে আক্রান্ত হলো রবিন। সে জ্বর আর ছাড়ল না। অনেকে বলল, দেহের মধ্যে কিছুটা রক্ত সঞ্চার করতে পারলেই জ্বর ভাল হয়ে যাবে রবিনের।

কার্দিজের মঠে এক সন্ন্যাসিনী বাস করত। সম্পর্কে সে এক বোন হত রবিনের। রবিন জানত সে মানুষের দেহে রক্ত সঞ্চার করতে পারে।

জন রবিনকে নিয়ে তার কাছে গেল। কিন্তু সন্ন্যাসিনী ভাবল রবিনের জ্বর সে সারিয়ে দিলে রাজা রেগে যাবেন তাঁর উপর।

সন্ন্যাসিনী সবচেয়ে উপরতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল রবিনকে। তারপর রক্ত দেবার নাম করে রবিনের একটা হাত বেঁধে দিয়ে হাতের শিরা কেটে দিল সে। এর পর ঘরে বাইরে থেকে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। রবিন একা হাতের শিরাকাটা অবস্থায় পড়ে রইল।

রবিন নিরুপায় হয়ে তালাবন্ধ ঘরটার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এল না। তার বোন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জনও তার ডাক শুনতে পাচ্ছে না।

কাটা শিরা থেকে অবিরাম রক্ত ঝরতে লাগল রবিনের। ক্রমশঃই ভয়ঙ্করভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল সে।

রবিন তখন অতি কষ্টে উঠে সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে শিঙাটা তিন বার বাজাল।

জনকে সন্ন্যাসিনী মঠের মধ্যে ঢুকতে না দেওয়ায় সে মঠের বাইরে

অপেক্ষা করছিল রবিনের জন্য। সহসা সে শিঙার আওয়াজ শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। তবে বুঝল রবিন নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে।

কিন্তু মঠের দরজা বন্ধ। শিঙার শব্দ শুনে পাগলের মত হয়ে গেল জন। সে একটা বড় পাথর এনে সেই রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেলল। তারপর ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরতলার ঘরের সামনে গিয়ে দেখল সে ঘরের দরজাও তালাবন্ধ। সন্ন্যাসিনী ভয়ে পালিয়ে গেল।

সে ঘরের দরজাটাও লাথি মেরে ভিতরে ঢুকল জন। ঢুকেই দেখল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে রবিন। তার মুখ ও হাত পা সব রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। দেখল তার হাতের কাটা শিরা থেকে রক্ত ঝরছে।

জন তাড়াতাড়ি কাটা জায়গায় একটা কাপড় জড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। তাকে সেই ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল।

জন তখন রবিনকে তার ঘাড়ের উপর উঠিয়ে জানালার ধারে নিয়ে গিয়ে বনটা দেখাতে লাগল। তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

কিন্তু রবিন বলল, না জন, আর আমরা ওই বনপথে কোনদিন বেড়াতে পারব না একসঙ্গে। তুমি একটা তীর ধনুক দাও আমার হাতে।

তাকে তা দিলে রবিন তার ধনুক থেকে একটা তীর জানালা দিয়ে ছুঁড়ল। বলল, ঐ তীরটা যেখানে পড়বে সেইখানে মাটি খুঁড়ে কবর দেবে আমাকে।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল রবিনের। কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এল।

অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল রবিন হুড। তখন ১২৪৭ সাল।

রবিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছায়াান্ধকার শেরউড বনের গভীরে অসংখ্য শোকার্ত কণ্ঠের কান্না একসঙ্গে কেঁদে উঠল যেন। মিশে গেল বনমর্মরের সঙ্গে।

রবিনের মৃত্যুর পরেও তার দলের অনেকে দীর্ঘদিন ধরে বাস করে সে বনের মধ্যে। তারা সকলে রবিনের বীরত্বের কথা বলে যায় তাদের সন্তানদের। তাদের সেই সন্তানরা আবার সে কথা বলে যায় তাদের বংশধরদের। এইভাবে যুগ যুগ ধরে রবিনের কথা ও কাহিনী চলে আসছে লোকের মুখে মুখে।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল

ওয়াশিংটন আরভিং



তিনশো বছরেরও বেশী আগেকার কথা। তখন উত্তর আমেরিকা ছিল ইংলণ্ডের রাজার শাসনে। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক থেকে দেড়শো মাইল দূরে ক্যাটস্কিন নামে একটা পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের পাদদেশে ছিল ছোট্ট একটা গাঁ।

সেই গাঁয়ের সব মানুষই জাতিতে ছিল ওলন্দাজ। অনেক কাল আগে তারা ইউরোপ থেকে এসে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে থাকে। ইউরোপে নিজেদের দেশে থাকাকালে যে ধরনের পোশাক তারা পরত তাদের পোশাক ছিল সেই ধরনের। তাদের ঘরবাড়িও ছিল ইউরোপের ঘরবাড়ির মতনই।

সেই গাঁয়ের একটি বাড়িতে রিপ ভ্যান উইঙ্কল নামে একটি লোক বাস করত। সে লোকটি ছিল সরল প্রকৃতির এবং বড় দয়ালু। পরের উপকার করতে ভালবাসত সে। গাঁয়ের সব লোকের সে ছিল বন্ধু। যে কোন ব্যাপারে গাঁয়ের লোকদের সাহায্য করার জন্য সে ছিল সব সময় প্রস্তুত।

কিন্তু তার স্ত্রী ছিল বড় মুখরা এবং ঝগড়াটে। রিপ বাড়ির কাজকর্ম বিশেষ করত না। সংসারের কিসে উন্নতি হবে সেদিকেও খেয়াল করত না। তাই তার স্ত্রী তাকে কুড়ে এবং অপদার্থ বলে প্রায়ই বকাবকি করত বাড়িতে যতক্ষণ থাকত সে।

স্ত্রীর বকুনি এড়াবার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত রিপ। তার মনে হত তার স্ত্রী অকারণে তার উপর নিষ্ঠুর। সে যতক্ষণ বাড়িতে থাকত তার স্ত্রীর কথামত তার অনেক কাজকর্ম করে দিত। তবু তার স্ত্রী নানা তুচ্ছ কারণে বকত তাকে। তাই যতদূর সম্ভব স্ত্রীকে এড়িয়ে চলত সে।

তবে রিপ অলস প্রকৃতির ছিল একথা বলা চলে না। আসল কথা, যে কাজ তার ভাল লাগত না সে কাজ সে করতে চাইত না কিছুতেই। অথচ যে সব কাজ তার ভাল লাগত সে সব কাজ করার জন্য কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করতে কখনই পিছ পা ছিল না।

যেমন মাছ ধরতে ও শিকার করতে ভালবাসত রিপ। তাই সারাদিন একটা ভিজে পাথরের উপর বসে মাছ ধরতে কোন কষ্টবোধ করত না। এক একদিন তার বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে শিকারের জন্য ঘুরে বেড়াত সে পাহাড়ে জঙ্গলে।

তাছাড়া গাঁয়ের লোকদের নানা কাজে সাহায্য করত সে। সেজন্য অনেক

সময় অনেক পরিশ্রম করতে হত তাকে। অনেক সময় গাঁয়ের কোন লোককে মাঠে ফসল কাটতে দেখলে বা ঘরের দেওয়াল তৈরি করতে দেখলে নিজে থেকে তার কাছে গিয়ে তার কাজ করে দিত রিপ। যথাসাধ্য সাহায্য করত তাকে।

অনেক সময় গাঁয়ের মেয়েদেরও অনেক কাজ করে দিত রিপ। কোন মেয়েকে তার বাগানে কাজ করতে দেখলে সে সেখানে গিয়ে তার কাজ করে দিত। কোন মেয়েকে কোন দোকান থেকে অনেক জিনিযপত্র কিনতে দেখলে সে তার সেই সব জিনিস তার বাড়িতে বয়ে দিয়ে আসত।

এত খেটে পরের কাজ করে দিলেও নিজের বাড়ির কোন কাজ করত না। সে তার নিজের ক্ষেত খামার বা বাগানে কাজ করতে যেত না। ফলে তার ক্ষেতে ও বাগানে ঘাস জমত। ভাল ফসল হত না। তার উপর অনেক সময় বাগানে গরু ঢুকে অনেক চারাগাছ খেয়ে নিত। সে দিকে মোটেই নজর দিত না রিপ।

রিপের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। ছেলের নামও ছিল রিপ। কিন্তু ছেলে মেয়ে তুজনেই ছোট ছিল। তারা কোন কাজ করতে পারত না। নিজের ছেলেমেয়ের দিকেও কোন নজর দিত না। ছেলেমেয়ের পোশাক-গুলো পুরানো আর নোংরা হলেও রিপ তা দেখেও দেখত না।

এই সব কারণেই তার স্ত্রী তাকে বকত। কথায় কথায় তাকে গঞ্জনা দিত। নিজের বাড়ির কোন বিষয়ে দেখাশোনা করত না বলেই তার স্ত্রী তাকে ভৎ‍র্সনা করত।

কিন্তু স্ত্রী তাকে যাই বলুক, স্ত্রীর কথার উত্তর দিত না রিপ। তার কথায় রাগ হলেও সব রাগ চেপে রেখে দিত মনে। বিশেষ অসহ্য ঠেকলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত নিঃশব্দে। তার স্ত্রী তখন আগের মতই বকে যেত।

রিপের একটা কুকুর ছিল। তার নাম নেকড়ে। রিপ তাকে খুব ভালবাসত। কিন্তু তার স্ত্রী মোটেই দেখতে পারত না কুকুরটাকে। রেগে গেলেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। হাতের কাছে যা কিছু পেত তাই ছুঁড়ে মারত।

গাঁয়ের বাইরে একটা সরাইখানা ছিল। তার নাম ছিল রাজা তৃতীয় জর্জ। তার সামনে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের একখানা ছবি টাঙ্গানো থাকত।

গাঁয়ের লোকেরা সেই সরাইখানায় এসে মদ খেত আর আড্ডা দিত।

নানা রকমের গল্প গুজব করত বসে বসে। সরাইখানাটার মালিকের নাম ছিল নিকোলাস ডোভার।

সরাইখানায় যারা নিয়মিত আসত তাদের একজন ছিল ডেরিক ক্রমেল। সেই গাঁয়েরই স্কুলে মাস্টারি করত। তার পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু লোকটা ছিল বড় অহঙ্কারী। কথায় কথায় জ্ঞান বিদ্যার বড়াই করত। সব সময়, বড় বড় কথা বলত গাঁয়ের লোকদের কাছে। সারাদিনের মধ্যে তার অবসর সময়টা সরাইখানাতে বসেই কাটাত সে। সব সময় একটা লম্বা পাইপ থাকত তার মুখে।

রিপ ভ্যান উইঙ্কলও সেই সরাইখানাটায় গিয়ে বসে থাকত অনেক সময়। তার স্ত্রী সেটা জানতে পেরে সেখানে গিয়ে হামলা করে। সেখানে গিয়ে রিপকে তাড়িয়ে দেয়। বলত বাড়ির কোন কাজ না করে কুড়ে মানুষদের মত আড্ডা মারছ এখানে?

স্ত্রীর তাড়া খেয়ে বন্দুক নিয়ে মাঠে ও বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত রিপ।

একদিন বিকাল বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে রিপ। বন্দুক ঘাড়ে করে মাঠে বনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অবশেষে সেই ক্যাটস্কিল পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়।

তার কি মনে হলো পাহাড়টাতে উঠতে শুরু করল। পাহাড়টার উপর উঠতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পাহাড়ের মাথায় অতি কষ্টে ওঠার পর ঘাসে ঢাকা একটা পাথরের উপর বসে পড়ল।

পাহাড়টার নীচে হাডসন নদী বয়ে যাচ্ছিল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে নদীটাকে দেখতে পেল সে।

দৃশ্যটা সত্যিই বড় চমৎকার। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল পশ্চিম দিগন্তে। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ে গলা সোনার মত দেখাচ্ছিল নদীর জলটাকে।

হাডসন নদীর নাম হয় ক্যাপ্টেন হেনরি হাডসনের নাম অনুসারে। হাডসন ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। ১৬১৩ সালে তিনি একদল ওলন্দাজ নাবিক নিয়ে জাহাজে করে ঘুরতে ঘুরতে এই নদীতে এসে উপস্থিত হন।

হাডসন নদীর ধারে এই জায়গাটা দেখে এখানে শীতকালটা কাটিয়ে যেতে চান। তখন শীতকাল শুরু হয়েছে সবেমাত্র। কিন্তু তাঁর সঙ্গের নাবিকরা তাতে রাজী হলো না। তারা তখন হাডসন ও আর একজন নাবিককে একটা নৌকোতে তুলে এখানে ফেলে রেখে জাহাজ চালিয়ে চলে যায়।

সেই থেকে হাডসন ক্যাটস্কিন পাহাড়ের পাদদেশে এই জায়গাতেই থেকে যান এবং তাঁর নাম অনুসারেই এই নদীর নাম হয় হাডসন নদী।

এই সব কথা রিপদের গাঁয়ের সবাই জানত। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়ল রিপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গলে রিপ দেখল বেলা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। সে দেখল, অনেকক্ষণ আগে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার তাকে ফিরে যেতে হবে গাঁয়ে।

এই ভেবে তখনি গাঁয়ের পথে রওনা হয়ে পড়ল রিপ। পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল।

কিন্তু পাহাড় থেকে নামতে থাকার সময় হঠাৎ পিছন থেকে কার এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রিপ। সে স্পষ্ট শুনতে পেল, রিপ ভ্যান উইঙ্কল বলে কে তাকে ডাকছে।

রিপ চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। এই জনমানবহীন পার্বত্য প্রদেশে কে তার নাম ধরে ডাকছে।

তার মনে হলো ওটা সত্যিকারের কোন মানুষের কণ্ঠস্বর নয়। তবু সে স্পষ্ট শুনতে পেল। কিন্তু আর সেখানে না দাঁড়িয়ে কুকুর নেকড়েকে সঙ্গে করে নামতে লাগল পাহাড় থেকে।

কিছুটা নামার পর আবার শুনতে পেল ডাকটা, 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল'। অথচ এবারও কাউকে কোন দিকে দেখতে পেল না রিপ।

রিপ এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। তার কুকুর নেকড়েও ভয় পেয়ে তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

ভয়ে ভয়ে নীচের দিকে তাকাল রিপ। দেখতে অদ্ভুত চেহারার অচেনা একটা লোক সেই পথেই পাহাড়ে উঠে আসছে। তার পিঠে ছিল একটা ভারী বোঝা। এবার আর ভয় পেল না রিপ। ভাবল, যেই হোক একটা মানুষ ত বটে। কিন্তু আপন মনে বলতে লাগল, কে এই লোকটা? এই নির্জন পাহাড়ে কেউ ত আসে না। আবার ভাবল, হয়ত গাঁয়ের কোন লোক তার খোঁজে এসেছে। হয়ত সে তার কাছে কোন সাহায্য চায়।

এই ভেবে তাড়াতাড়ি সে নীচে নামতে লাগল।

নীচে নেমে লোকটার কাছে আসতেই রিপ দেখল গাঁয়ের কেউ নয়। এমন অদ্ভুত চেহারার লোক জীবনে কখনো দেখেনি সে। লোকটা ভীষণ বেঁটে, মাথাটা খুব বড়। চেহারাটা চৌকো ধরনের। মাথায় লম্বা লম্বা চুল,

সব পেকে গেছে। মুখের দাড়িটাও লম্বা এবং পাকা। তার পরনের পোশাক তিনশো বছর আগেকার ওলন্দাজদের পোশাকের মত। তার পিঠে একটা ছোট পিপে ছিল।

লোকটা বুড়ো এবং অশক্ত। পিপেটা বইতে হয়ত কষ্ট হচ্ছে। রিপও তার সঙ্গে পাহাড়ে উঠল। রিপ ভাবল পাহাড়ের উপর হয়ত লোকটার কোন কাজ আছে।

অবশেষে পাহাড়ের একটা সংকীর্ণ জায়গায় এসে উপস্থিত হলো তারা। উপরে উঠতে একটা গুরুগম্ভীর গর্জন শুনতে পেল রিপ। শব্দটা অনেকটা কামানের গোলা বা বজ্র গর্জনের মত।

রিপ উপরে তাকিয়ে দেখল আকাশে কোন মেঘ নেই। বজ্র বিদ্যুতের কোন চিহ্ন বা সম্ভাবনা নেই।

লোকটার সঙ্গে আরও উপরে উঠে রিপ দেখল তাদের সামনে দুটো টিলা রয়েছে। তার মনে হলো শব্দটা সেই টিলার ওপার থেকে আসছে।

রিপের মনে এবার প্রশ্ন জাগল, লোকটা মদের এই পিপেটা নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠছে কেন? কোথায় যাচ্ছে ও? কি কাজ আছে তার?

কিন্তু লোকটাকে প্রশ্ন করতে ভয় হলো রিপের।

যাই হোক, টিলাদুটোর মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে থামল তারা। জায়গাটা চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। কোনদিকে কোন ফাঁক নেই। সেখানে ছিল অনেক বড়বড় গাছ। সেই গাছের ডালপালাগুলো এমনভাবে ঢেকে রেখেছিল জায়গাটাকে যে আকাশ দেখা যাচ্ছিল না।

রিপ দেখল সেখানেও অদ্ভুত চেহারার কতকগুলো লোক বসে ও দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের পরনেও তিনশো বছর আগের ওলন্দাজদের পোশাক। তাদের মুখগুলো অদ্ভুত রকমের দেখতে। একজনের মাথাটা খুব বড়, কিন্তু চোখগুলো খুব ছোট ছোট। আর একটা লোকের নাকটা খুব বড়। তাদের সকলের মুখেই ছিল লম্বা লম্বা দাড়ি।

তাদের মধ্যে একজনকে দেখে রিপের মনে হলো সেই ওদের দলনেতা বা সর্দার। লোকটার চেহারাটা খুব মোটা আর গোলগাল। তার গায়ে ছিল চমৎকার একটা কোট। মাথায় খাড়া পালকওয়ালা একটা টুপি। তার পায়ে ছিল উঁচু গোড়ালিওয়ালা আর সামনে গোলাপ লাগানো একজোড়া জুতো।

তারা সবাই ন-পিনের খেলা নামে একটা খেলা দেখছিল। কিন্তু মুখে

কেউ কোন কথা বলছিল না। তাদের বলগুলো যখন নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল তখন বজ্রাঘাতের মত আওয়াজ হচ্ছিল।

রিপ আর সেই বুড়ো লোকটা যখন তাদের কাছে এসে উপস্থিত হলো তখন তারা খেলা থামিয়ে তাদের দিকে তাকাল। তারা বিশেষ করে রিপকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তাদের চোখগুলোর দৃষ্টি ছিল ঠাণ্ডা আর মরা মানুষের মত পলকহীন।

তার সঙ্গের সেই বুড়োটা রিপকে ইশারা করে পিপে থেকে মদ ঢেলে সকলকে দিতে বলল। রিপ সকলকে মদ ঢেলে দিল। মদ খেয়ে আবার তারা খেলায় মেতে উঠল।

রিপ দেখল কেউ আর তার পানে তাকাচ্ছে না। তখন সেও পিপে থেকে একপাত্র মদ ঢেলে খেয়ে দেখল। দেখল মদটা ভারী কড়া, কিন্তু খেতে বেশ সুস্বাদু।

খেতে ভাল লাগায় এবং কেউ কোন নিষেধ না করায় পর পর কয়েকপাত্র মদ খেল রিপ। মদ খুব কড়া বলে তার নেশা ধরল। দুচোখ বুজে এল তার। সঙ্গে সঙ্গে এক গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল রিপ।

কতক্ষণ পরে ঘুম ভাঙ্গল রিপের তা বুঝতে পারল না সে। চোখ মেলে দেখল, তখন সকাল হয়েছে। উজ্জ্বল রোদ ঝলমল করছে চারদিকে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে।

রিপ চারদিকে তাকিয়ে দেখল একমাত্র সেই বুড়ো লোকটা যেখানে তাকে প্রথম দেখেছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আর কোন লোক নেই।

রিপ ভাবতে লাগল, আমি সারারাত ঘুমিয়ে ছিলাম অঘোরে।

তখন সে ঘুমিয়ে পড়ার আগে এখানে যা যা ঘটেছিল সব মনে করার চেষ্টা করল। সেই বুড়ো লোকটার সঙ্গে পাহাড়ের উপর ওঠা, দুটো টিলার মাঝখানে লোকগুলোর ন-পিন খেলা। শেষে মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া—একে একে সব মনে পড়ল তার।

রিপ এবার বাড়ি যাবার কথা ভাবল। সে ভাবতে লাগল, আমার স্ত্রীকে বাড়ি গিয়ে কি বলব?

সে উঠে পড়ে বাড়ি যাবার সংকল্প করে তার কুকুর নেকড়ে আর তার বন্দুকটার খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু তার কুকুরটাকে নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করলেও তার কোন খোঁজ পেল না সে। আশেপাশে অনেক

খোঁজাখুঁজি করল সে। কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ শুনতে পেল না। শুধু কতকগুলো পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

রিপ দেখল একটা বন্দুক যেখানে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেখানেই রয়েছে। কিন্তু এটা তার সে বন্দুক নয়। তার তেল লাগানো চকচকে ঝকঝকে বন্দুকটার পরিবর্তে সেখানে রয়েছে বহুদিনের পুরনো মরচে পড়া একটা বন্দুক। মরচেপড়া লাল বন্দুকটা দেখে তার মনে হলো সেটা রোদবৃষ্টিতে বহুদিন ধরে পড়ে আছে। তার কাঠের বাঁটটা পচে গেছে।

রিপ ভাবল, ন-পিনের খেলা খেলতে থাকা সেই লোকগুলোই তার মদের নেশার সুযোগ নিয়ে তার ভাল বন্দুকটা নিয়ে পালিয়েছে।

তার কুকুরটার আবার খোঁজ করতে লাগল রিপ। আবার তার নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগল চিৎকার করে। কিন্তু এবারেও কোন খোঁজ পেল না তার। তখন সে ভাবল সেই লোকগুলো তার কুকুরটাকেও ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

রিপ এবার মনে মনে ঠিক করল, সে সেই টিলাস্তূপটার মাঝখানে গিয়ে খোঁজ করবে লোকগুলোর। তাদের দেখা পেলে তার বন্দুক আর কুকুরটাকে ফিরিয়ে দিতে বলবে।

কিন্তু টিলাস্তূপটার মাঝখানে যাবার পথটা লতাপাতায় এমনভাবে ঢেকে গেছে যে তার মধ্য দিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল রিপের। মনে হচ্ছিল এ পথে বহুদিন কেউ যাওয়া আসা করেনি।

অবশেষে সেই জায়গাটায় গিয়ে দেখল কেউ নেই। সেই ফাঁকা জায়গাটায় যেখানে বসে তারা খেলছিল সেখানটাও ঘন আগাছায় ঢেকে গেছে।

লোকগুলোকে দেখতে না পেয়ে নেকড়ের নাম ধরে অনেক ডাকল রিপ। কিন্তু তার কুকুরটার কোন সন্ধান না পেয়ে ভাবল কুকুরটা হয়ত পথ চিনে বাড়ি ফিরে গেছে। অথবা দূরে কোথাও চলে গেছে।

নিরুপায় হয়ে তার বন্দুক আর কুকুরের আশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো রিপ। সে দেখল বেলা হয়ে গেছে অনেকখানি। গত রাত থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। ক্ষিদেও পেয়েছে।

তাই পুরনো মরচে পড়া সেই বন্দুকটা ঘাড়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তার গাঁয়ের পথ ধরল।

রিপ গাঁয়ের কাছে আসতেই অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হলো তার। কিন্তু কাউকে সে চিনতে পারল না।

আশ্চর্য হয়ে গেল রিপ। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল আমারই গাঁয়ের কোন লোককে চিনতে পারছি না আমি। এরা তো সব গাঁয়েরই লোক, এরাতো বিদেশী নয়।

আগে তার গাঁয়ের লোকেরা যে ধরনের পোশাক পরত এ লোকগুলোর পরনে সে রকম পোশাক ছিল না। তারা যে পোশাক পরেছিল সে পোশাক সে দেখেনি কখনো।

লোকগুলো রিপকে দেখেই তাদের মুখে হাত দিয়ে রিপের মুখপানে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল নীরবে।

এর অর্থ বুঝতে পারল না রিপ। কিন্তু এরপর কি মনে হতে তার মুখে সে হাত দিতেই দেখল এক লম্বা দাড়ি গজিয়ে উঠেছে তার মুখে।

রিপ বুঝে উঠতে পারল না মাত্র এক রাতের মধ্যে এতবড় দাড়ি কি করে গজাতে পারে। এর আগে ত কোন দাড়ি ছিল না তার মুখে।

তাই গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল রিপ। গাঁয়ের পথে পথে যে সব ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল তারা কেউ চিনতে পারল না রিপকে। রিপও তাদের কাউকে চিনতে পারল না। ছেলেমেয়েদের পোশাকগুলোও ছিল অদ্ভুত ধরনের। অথচ এ গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা আগে কত ভালবাসত তাকে।

রিপের মুখে লম্বা দাড়ি দেখে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তাকে পাগল ভেবে চেঁচামিচি করতে করতে ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু।

গাঁয়ের কুকুরগুলোও চিনতে পারল না রিপকে। তারা রিপকে দেখে রাগে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। অথচ আগে গাঁয়ের সব কুকুরগুলোই চিনত রিপকে। রিপ তাদের ভালবাসত। তারা সবাই বন্ধু ভাবত রিপকে। রিপ তাদের গাগুলোকে একবার ছুঁতে গেলে তারা তাদের গা ছুঁতে দিল না।

রিপের মনে হলো শুধু মানুষগুলো নয়, গোটা গাঁটাই যেন বদলে গেছে একেবারে। আগের থেকে গাঁটা অনেক বড় হয়েছে। লোকসংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। আগের তুলনায় অনেক বেশী লোক বাস করে গাঁয়ে।

কিন্তু সারা গাঁয়ের মধ্যে যেমন পুরনো চেনা লোক একটাও দেখতে পেল না রিপ, তেমনি আগেকার চেনা ঘরবাড়ি একটাও খুঁজে পেল না। সব বাড়িই নতুন ধরনের। এ ধরনের বাড়ি আগে দেখেনি রিপ। নতুন বাড়ি-

গুলোর প্রত্যেক দরজায় একটা করে অচেনা নাম লেখা আছে। জানালা দিয়ে অচেনা নারী পুরুষের উকি ঝুঁকি।

রিপ ভেবে পেল না মাত্র একটি রাতের মধ্যে একটা গোটা গাঁ কিকরে আমূল বদলে যেতে পারে এমনভাবে? গাঁয়ের চেনা জানা মানুষগুলোই বা বদলে গেল কি করে?

রিপ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, তবে কি এটা আমার গাঁ নয়? আমি কি অন্য কোন দেশে এসে পড়েছি পথ ভুলে?

রিপ দূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেখল, ক্যাটস্কিন পাহাড়টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আগের মত। ভাবল আমি ত ঐ পাহাড়েই গিয়েছিলাম। ক্যাটস্কিন পাহাড় তাদের গাঁ থেকে ত মাত্র দেড় মাইলের পথ। গাঁয়ের চারদিকের পথঘাট ত তার সব চেনা। সে পথ ত ভুল হবার কথা নয়।

রিপ আরও দূরে তাকিয়ে দেখল ক্যাটস্কিন পাহাড়ের পাদদেশে হাডসন নদীটা আগের মতই বয়ে চলেছে।

এবার সে তার বাড়ির পথটা চিনতে পারল। বাড়ির পথে পা চালিয়ে দিল রিপ।

বাড়ির কাছে গিয়ে নিঃশব্দে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল সে। তার ভয় হতে লাগল, তাকে দেখেই তার স্ত্রী হয়ত রাগে চিৎকার করে উঠবে।

কিন্তু বাড়ির সামনে গিয়ে রিপ দেখল বাড়িতে কোন লোকজন নেই। ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে পরিত্যক্ত বাড়িটা। কোন ঘরে দরজা নেই। জানালাগুলো সব ভেঙ্গে গেছে। হাড় জিরজিরে একটা রোগা কুকুর শুয়ে আছে উঠোনে। কিন্তু সে কুকুর নেকড়ে নয়। একবার তার মনে হলো। এই কুকুরটার হয়ত তার নেকড়ে।

কিন্তু রিপ তাকে ডাকতে পালিয়ে গেল কুকুরটা। রিপের মনে দুঃখ হলো। কুকুরটাও তাকে চিনতে পারল না।

যাই হোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল রিপ। দেখল গোটা বাড়িটা একেবারে শূন্য। কোন ঘরে কোন আসবাবপত্র বা কোন জিনিস নেই। পুরু ধূলো জমে আছে শূন্য ঘরগুলোতে। মনে হলো অনেকদিন এ বাড়িতে কেউ পা দেয়নি।

বাড়িটা একেবারে পরিত্যক্ত দেখেও রিপ প্রথমে তার স্ত্রীকে ও পরে তার ছেলে রিপকে ডাকতে লাগল বারবার। কিন্তু কারো কোন সাড়াশব্দ পেল না।

তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে কোথায় গেল কিছুই বুঝতে পারল না রিপ।

এবার সে সত্যিই হতাশ হয়ে উঠল। তার মনটা একেবারে দমে গেল। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে? তারা কোথায় গেল, এবাড়ির এদশা কি করে হলো তা কে বলবে তাকে?

এখানকার প্রতিবেশীদের কাউকেই চেনে না সে। এমন কি সারা গাঁয়ের মধ্যেও একটা চেনা জানা লোককে দেখতে পায়নি।

রিপ তখন আকাশ পাতাল অনেক ভাবার পর ঠিক করল সে গাঁয়ের বাইরে সেই সরাইখানায় চলে যাবে। সেখানে গেলে তার দু একজন বন্ধুবান্ধবকে নিশ্চয় দেখতে পাবে। তাহলে তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে সবকিছু।

কিন্তু গাঁয়ের বাইরে সেই সরাইখানাটার কাছে গিয়ে দেখল সেখানে কোন সরাইখানা নেই এখন। সরাইখানাটার জায়গায় এক নতুন কাঠের বাড়ি দেখতে পেল রিপ। বাড়ির সামনে একটা কাঠের সাইনবোর্ডে লেখা আছে, দি ইউনিয়ন হোটেল, মালিক জোনাথন ডুলিটল।

সরাইখানার সামনে আগে একটা গাছ ছিল। কিন্তু সরাইখানার মত সেই গাছটাও উধাও হয়ে গেছে কোথায়।

এইভাবে একটার পর একটা রহস্যের গভীরে ডুবে গেল রিপের মনটা। সে রহস্যের কূল কিনারা খুঁজে পেল না কোন।

আগে সরাইখানাটার নাম ছিল 'রাজা তৃতীয় জর্জ'। তার সামনে ছিল রাজা তৃতীয় জর্জের একটা বড় ছবি। আগে সরাইখানার সামনে যে একটা বড় গাছ ছিল সে গাছের পরিবর্তে এখন সেখানে আছে একটা বড় থাম। থামের উপর ঝুলছে কত সব রঙীন চিহ্ন আঁকা একটা পতাকা।

এখন ছবিটাও পাল্টে গেছে। আগের ছবিতে রাজা জর্জের গায়ে ছিল লাল কোট, মাথায় মুকুট। এখন সে ছবির বদলে যে ছবি রয়েছে তার গায়ে আছে নীল কোট। মাথায় টুপি। ছবিটার নীচে লেখা আছে, 'জর্জ ওয়াশিংটন।'

রিপ গিয়ে দেখল সরাইখানার দরজার সামনে কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে তাদের কাউকে চিনতে পারল না। এখনকার লোকগুলো আগের লোকদের মত নয়। আগে যারা সরাইখানায় আসত, তারা বড় শান্ত ও ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিল। এখন যে লোকগুলোকে দেখতে পেল রিপ তারা বড় উগ্র ও চঞ্চল প্রকৃতির। কথায় কথায় গোলমাল করছিল তারা। তাদের গলার স্বর চড়া ছিল।

এইসব লোকগুলোর পানে তাকিয়ে রিপ ভাবতে লাগল, আগের

সরাইখানার মালিক লম্বা পাইপ মুখে নিকোলাস ভোডার কোথায়? গাঁয়ের স্কুলের মাস্টার ডেরিক ক্রমেলই বা গেল কোথায়?

একতাড়া কাগজ নিয়ে একটা বেঁটেখাটো চেহারার লোক বসেছিল। রিপ দেখল লোকটা কত সব অদ্ভুত কথা বলছে। সে সব কথা জীবনে কখনো শোনেনি রিপ। লোকটা বলছিল জনগণের অধিকারের কথা, কংগ্রেসের কথা। বিশেষ করে সে বলছিল কংগ্রেসের একজন সদস্য নির্বাচনের কথা। কংগ্রেসে তাদের একজন প্রতিনিধিকে পাঠাতে হবে।

রিপ ভাবতে লাগল, এই কংগ্রেসটা কি? এটা কি কোন জন্তু না কোন জায়গার নাম? সেখানে লোক পাঠিয়ে কি হবে?

আর একটা লোক বলছিল যুদ্ধের কথা। ছিয়াত্তরের যুদ্ধের কথা। কিন্তু রিপ ভেবে পেল না কোন ছিয়াত্তর সালের যুদ্ধ? তবে কি ১৬৭৬ সাল? সে ত অনেক কাল আগের কথা। আর ১৭৭৬ সাল আসতে ত এখনো অনেক দেরি। লোকটা তাহলে কোন সালের যুদ্ধের কথা বলছে?

রিপ যখন গাঁ থেকে সরাইখানায় আসে তখন কতকগুলো ছেলেমেয়ে আর মহিলা তার পিছু পিছু আসে।

সরাইখানার সামনে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো রিপকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তার লম্বা দাড়ি, অদ্ভুত পোশাক, পুরনো অকেজো বন্দুক আর তার পিছনে কৌতূহলী নারী ও ছেলেমেয়েদের ভিড় দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল তারা।

একজন রিপকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোন পক্ষে?

রিপ বলল, কিসের পক্ষ?

নির্বাচনে আপনি কোন পক্ষের জয় চান?

রিপ বলল, নির্বাচন আবার কি?

দেশের জন্য আইন তৈরি করতে কংগ্রেসে কাকে আপনি প্রতিনিধি করে পাঠাতে চান?

রিপ কিছু বুঝতে পারল না।

এরপর চমৎকার পোশাকপরা উঁচু টুপিওয়ালা এক বুড়ো ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে রিপকে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনি বন্দুক নিয়ে নির্বাচনে এসেছেন কেন? আর আপনার পিছনের লোকগুলোই বা কারা? আপনি কি লড়াই করতে এসেছেন?

রিপ বলল, আমি গরীব, শান্তিপ্রিয় মানুষ। রাজা তৃতীয় জর্জ আমার রাজা, ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন।

সকলে আশ্চর্য হয়ে এক বাক্যে বলল, রাজা জর্জ! ও আমাদের দেশের লোক না। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও। পুলিশ ডাক।

সেই ধনী বুড়ো লোকটি এবার রিপকে বলল, আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন বলুন ত? আপনি কি কাউকে খুঁজতে এসেছেন?

রিপ বলল, আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে খুঁজতে এসেছি। আগে তারা এই সরাইখানায় নিয়মিত আসত।

সেই বুড়ো লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তাদের নাম কি?

রিপ বলল, নিকোলাস ডোভার কোথায়? সে ছিল আগেকার সরাইখানার মালিক।

সে ত আঠারো বছর আগে মারা গেছে।

ব্রোম ডাক্তার কোথায়?

যুদ্ধের গোড়ার দিকে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। পরে এক যুদ্ধে হয় সে মারা যায় অথবা সমুদ্রে ডুবে যায়। মোট কথা তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঠিক কি হয়েছিল তা জানি না। তবে সেই যুদ্ধ থেকে আর ফিরে আসেনি সে।

এই গাঁয়েরই স্কুল মাস্টার ডেরিক ক্রুমেল কোথায়?

সেও যুদ্ধে গিয়েছিল। তার বেশ উন্নতি হয়েছিল। এখন সে কংগ্রেসে আছে। একজন সদস্য।

এইসব কথা শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেল রিপ। সে ভাবতে লাগল, আমার বাড়ি, গোটা গাঁ, গাঁয়ের মানুষ সব বদলে গেছে। এই অদ্ভুত পৃথিবীতে আমি একা।

রিপ এবার অধৈর্য্য হয়ে বলল, এখানে কি কেউ রিপ ভ্যান উইঙ্কল নামে কোন লোককে চেনে না?

দু তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ও রিপ ভ্যান উইঙ্কল, হ্যাঁ চিনি। ওই ত গাছের তলায় বসে আছে। এরই নাম রিপ ভ্যান উইঙ্কল।

রিপ দেখল যুবক বয়সী একটি লোক বসে রয়েছে গাছের তলায়। ও আগে যেমন ছিল ঠিক সেইরকম। তেমনি অলস। পরনে তেমনি পুরানো আর নোংরা পোশাক।

নিজের মনকে নিজেই প্রশ্ন করল রিপ, ও-ই কি আমি? তাহলে

আমি কে ? কে আমার স্থান দখল করে নিল ? গতকাল রাত পর্যন্ত ত আমি আমিই ছিলাম। কিন্তু পাহাড়ের উপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর ওরা আমার বন্দুকটা চুরি করে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে সবকিছু বদলে গেছে।

এবার লোকগুলো বলাবলি করতে লাগল, ওর মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে। ওর কাছে আবার একটা বন্দুক রয়েছে। তার থেকে কোন বিপদ হবে না ত ?

সেই ধনী বুড়ো লোকটি তাড়াতাড়ি কোথায় চলে গেল।

রিপ ভাবল, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না তার পক্ষে।

এই ভেবে রিপ আবার সরাইখানা থেকে গাঁয়ের দিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

এমন সময় এক বিবাহিত সুন্দরী তরুণী কোলে একটি ছেলে নিয়ে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে রিপকে দেখছিল।

মেয়েটিকে চেনা চেনা মনে হলো রিপের। তার কোলের শিশুটি রিপের দাড়ি দেখে ভয়ে কাঁদছিল। কিন্তু মেয়েটি তার ছেলেকে বোঝাচ্ছিল, চুপ কর রিপ। বোকা ছেলে কোথাকার ! বুড়ো তোকে মারবে না।

মেয়েটি তার ছেলেকে রিপ বলে ডাকতে রিপ মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকাল। তার গলার স্বর এবং কথা বলার ভঙ্গিমা চেনা মনে হলো রিপের।

রিপ তখন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি মেয়ে ?

মেয়েটি বলল, আমার নাম জুডিথ গার্ডনার।

রিপ আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবার নাম কি ?

আমার বাবার নাম ছিল রিপ ভ্যান উইঙ্কল। আহা বেচারা কোথায় যে গেল ! আজ হতে বিশ বছর আগে উনি ওঁর বন্দুকটি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তারপর উনি আর ফিরে আসেননি। ওঁকে কেউ দেখেনি। ওঁর কুকুরটি একাই ফিরে আসে। উনি আত্মহত্যা করেছেন, না ইণ্ডিয়ানরা ওঁকে ধরে নিয়ে গেছে তা কেউ জানে না। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম।

রিপ তখন তাকে প্রশ্ন করল, তোমার মা কোথায় ?

জুডিথ বলল, কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। একটা ফেরিওয়ালার উপর খুব রেগে গিয়ে মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর।

রিপ ভাবল, এখন তাহলে সে তার স্ত্রীর পীড়ন থেকে চিরদিনের মত মুক্ত।

এর পর রিপ বলল, আমি তোর বাবা। আগে আমিই ছিলাম যুবক রিপ ভ্যান উইঙ্কল। এখন বুড়ো হয়েছি। এখানে রিপ ভ্যান উইঙ্কলকে কি কেউ চেনে না?

এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বুড়ী এগিয়ে এসে রিপকে পা মাথা পর্যন্ত খুটিয়ে দেখে বলল, হ্যাঁ ও-ই ত রিপ ভ্যান উইঙ্কল। এতদিন কোথায় ছিলে বাছা? এতদিন পরে তুমি তাহলে বাড়ি ফিরে এলে? এই বিশ বছর কোথায় ছিলে?

রিপ একবারে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বলল, আমি কাল বাড়ি থেকে গেছি। আমি ত এর কিছুই জানি না।

রিপ এবার ক্যাটস্কিন পাহাড়ে সে যাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছিল তা সব বলল। সে কথা ও কাহিনী বেশী নয়। কারণ বিশ বছর ছিল তার কাছে একটা রাতমাত্র।

রিপের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইল না। অনেকেই বলল, ও কি ভেবেছে ওর এই কাহিনী আমরা বিশ্বাস করব?

সেই বুড়ো ধনী লোকটি বলল, না, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারা যায় না।

ঠিক সেই সময় গাঁয়ের প্রাচীন লোক বুড়ো পিটার ভাণ্ডারডঙ্ক সেই দিকে যাচ্ছিল। অনেকে তাকে রিপের কথা জিজ্ঞাসা করল।

পিটার ভাণ্ডারডঙ্ক ছিল গাঁয়ের সবচেয়ে প্রাচীন ব্যক্তি। সে অতীতের আগে কথা জানত। বংশানুক্রমিকভাবে যে সব কথা ও কাহিনী এ গাঁয়ে চলে আসছে তা সব ছিল তার নখদর্পণে।

পিটার বুড়ো বলল, হ্যাঁ আমার ঠাকুরদা ক্যাটস্কিন পাহার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতেন। তিনি বলতেন ক্যাটস্কিন পাহাড়ে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। বিশ বছর পর পর হেনরি হাডসন নাকি তাঁর আটজন সঙ্গী নিয়ে ঐ পাহাড়ের নীচে হাডসন নদীতে ফিরে আসেন। যে নদীটা তিনি একদিন আবিস্কার করেছিলেন সেই নদীটার উপর নজর রাখার জন্যই উনি ফিরে আসেন। আমার বাবা একবার ক্যাটস্কিন পাহাড়ের উপর হাডসনের আটজন সঙ্গীকে নপিনের খেলা খেলতে দেখেছিল। তাদের বলগুলোর আওয়াজ নাকি বজ্রের গর্জনের মত শোনায়।

লোকজন যে যার কাজে চলে গেল। রিপের মেয়ে তার বাবাকে তার

বাড়িতে নিয়ে গেল। রিপের মেয়ের সেই গাঁয়েতেই একটা চমৎকার বাড়ি ছিল। রিপকে তার মেয়ে তার সেই বাড়িতেই রেখে দিল।

আগে রিপ পাড়ার যে সব ছেলেদের খেলনা তৈরি করে দিত সেই সব ছেলেদের মধ্যে একজন বিয়ে করে তার মেয়েকে।

রিপের ছেলে হয়েছে ঠিক তার বাবার মত। সে ও কাজের কাজ কিছুই করত না। শুধু তার, সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়াত আর নানা কাজে তাদের সাহায্য করত। যে কাজ সে ভালবাসত না সে কাজ কিছুতেই করতে চাইত না সে। গাঁয়ের যুবকরা তাকে ভালবাসত।

রিপ আগে যেভাবে ঘুরে বেড়িয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছে সেই ভাবেই জীবন কাটাতে লাগল। সে ডুলিটলের হোটেলে গিয়ে বসে থাকত রোজ। যে সব লোক সে হোটেলে যেত তাদের কাছে যুদ্ধের আগের পুরনো দিনের অনেক কাহিনী শোনাত। তারা তা শুনতে ভালবাসত।

রিপ তাদের কাছ থেকে শুনত যুদ্ধের পরের যত সব ঘটনার কথা। সে সব কথা অদ্ভুত লাগত রিপের। কারা দেশ শাসন করছে কারা কি আইন কানুন তৈরি করছে দেশের জন্য তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইত না সে।

মিঃ ডুলিটলের সরাইখানায় রিপ তার যে জীবনকাহিনী বলে সেই কাহিনী শুনেই আমি তার কথা লিখেছি।

অনেকে বলত, তার সে কাহিনী সত্য নয়, আজগুবি এবং বানানো। কিন্তু বুড়ো ওলন্দাজরা রিপের কাহিনী বিশ্বাস করত অক্ষরে অক্ষরে। যখনি তারা বজ্রগর্জন শুনত তখন তারা বলাবলি করত হেনরি হাডসন আর তার নাবিকরা ন-পিনের খেলা খেলছে।

বেতাল পঞ্চবিংশতি


বেতাল
পঞ্চবিংশতি

উপক্রমণিকা

উজ্জয়িনীর রাজা গন্ধর্বসেনের চার রাণী ও ছয় পুত্র। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কু রাজা হন। রাজার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগী, ন্যায়পরায়ণ ও শাস্ত্রজ্ঞ হলেও রাজ্য-লোভ সামলাতে না পেরে তাঁর বড় ভাই শঙ্কুকে হত্যা করে নিজেই রাজা হয়ে বসেন। তারপর আপন শক্তিবলে লক্ষযোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে প্রভূত নামযশ অর্জন করেন।

রাজা হওয়ার পর বিক্রমাদিত্য একদিন ভাবতে লাগলেন, রাজার কাজ হলো প্রজাদের কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু আমি আত্মসুখে মগ্ন হয়ে মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছি। রাজ্যের প্রজাদের হিতাহিত ও সুখ সুবিধার কথা কিছু ভাবি না। আমার রাজ্যের প্রজারা কি অবস্থায় আছে, রাজকর্মচারীরা প্রজাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে তা স্বচক্ষে দেখার জন্য সারা রাজ্য ঘুরে বেড়ানো উচিত আমার। তা না করলে রাজধর্ম যথাযথ ভাবে পালন করা হবে না।

এই ভেবে তিনি তাঁর এক ভাই ভর্তৃহরির হাতে রাজ্যভার দিয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সারা রাজ্যময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

সেকালে উজ্জয়িনী নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁর দারিদ্র্য দূর করার জন্য কঠোর তপস্যা করছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে ইষ্টদেবতা তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে একটি ফলদান করেন।

এই ফল পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, দেবতা আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে এই ফল দিয়ে বলেছেন, এই ফল খেলে যে কোন মানুষ জরাব্যাধি হতে মুক্ত হয়ে অমর হবে।

একথা শুনে ব্রাহ্মণী রেগে গিয়ে বলল, পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকা মানেই ত কষ্টভোগ করে যাওয়া অনন্তকাল ধরে। এখন বরং মৃত্যু হলে সংসার চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। তুমি বরং এই ফল রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়ে তার বিনিময়ে কিছু অর্থ নিয়ে এস যাতে আমরা ভালভাবে সংসার চালাতে পারি।

ব্রাহ্মণ তখন রাজার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, এই ফলটি খেলে আপনি অমরত্ব লাভ করবেন। তাহলে রাজ্যের মঙ্গল হবে। এই ফলটি নিয়ে আমায় কিছু অর্থ দিন।

রাজা তখন সেই ফলটি নিয়ে একলক্ষ মুদ্রা দিলেন ব্রাহ্মণকে।

রাজা সেই ফলটি তাঁর রাণীকে দিয়ে বললেন, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। এই ফল খেয়ে তুমি অমর ও চিরযৌবনা হবে।

মথুরা থেকে আনা এক ভৃত্য সেই রাণীর প্রিয়পাত্র ছিল। রাণী তাকে সেই ফলটি দিয়ে দিল। সেই ভৃত্য আবার তার প্রেমিকা এক বারাঙ্গনাকে দিয়ে দিল ফলটি।

বারাঙ্গনা ফল পেয়ে ভাবল, এই ফল খেয়ে আমি অমর হলে তাতে কোন লাভ হবে না। তাতে আমার বিড়ম্বনাই বাড়বে। কারণ আমাকে হীন কাজ করে সারা জীবন কাটাতে হবে। তার থেকে রাজাকে এই ফলটি দিলে তা খেয়ে তিনি অমর হলে দেশের মঙ্গল হবে।

এই ভেবে রাজার কাছে গিয়ে সেই বারাঙ্গনা বলল, মহারাজ, এই ফল খেলে মানুষ অমর হয়। আপনি এই ফলটি নিয়ে খান।

বারাঙ্গনার হাতে ফলটি দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন রাজা। যে ফল তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে দিয়েছেন তা কি করে বারাঙ্গনার হাতে এল তা বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি।

তখন সেই বারাঙ্গনা ও রাণীর প্রিয়পাত্র ভৃত্যের কাছ থেকে একে একে সব কথা জানতে পারলেন রাজা।

সব কিছু জেনে তিনি রাণীমহলে সেই রাণীর কাছে গিয়ে বললেন, তোমাকে যে ফলটি দিয়েছি তা কোথায় ?

রাণী বলল, আমি তা খেয়ে ফেলেছি।

রাজা তখন সেই ফলটি রাণীকে দেখিয়ে বললেন, এ ফল বারাঙ্গনার হাতে কি করে গেল ?

রাণী তখন তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় ও ভয়ে চুপ করে রইল।

রাজা তখন আর কিছু না বলে রাণীমহল থেকে চলে এলেন। যাকে তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁর সঙ্গে। সংসার অনিত্য, অসার। সেখানে প্রেম প্রীতি ও বিশ্বাসের কোন দাম নেই।

এই সব ভেবে রাজবেশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেলেন রাজা ভর্তৃহরি। বনে গিয়ে নির্জনে যোগসাধনা করতে লাগলেন।

উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন শূন্য হয়ে থাকায় দেশে অরাজকতা চলতে লাগল। তা দেখে দেবরাজ ইন্দ্র একজন যক্ষকে নগররক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। যক্ষ নগর রক্ষা করতে লাগল।

এদিকে রাজা ভর্তৃহরি রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করে তপস্বী হয়ে বনে চলে

গেছেন এবং রাজসিংহাসন শূন্য পড়ে আছে এই সংবাদ দেশে দেশে প্রচার হয়ে গেল। ক্রমে সে সংবাদ রাজা বিক্রমাদিত্যেরও কানে গেল।

এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে এলেন বিক্রমাদিত্য। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন রাত্রি গভীর। নগররক্ষক যক্ষ নগর পাহারা দিচ্ছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্যকে চিনতে না পেরে যক্ষ বলল, দেবরাজ আমায় এই নগরের রক্ষক নিযুক্ত করেছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া অসময়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেব না নগরে।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। দেশভ্রমণের পর আমার রাজ্যে ফিরে এসেছি আমি।

যক্ষ বলল, তুমি যদি রাজা হও তাহলে আমার সঙ্গে যুদ্ধে তার পরিচয় দাও।

এই কথা শুনে রাজা যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে যক্ষকে হারিয়ে দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসলেন রাজা।

যক্ষ তখন বলল, মহারাজ, আমি পরাজিত। আমি বুঝতে পারলাম, তুমি যথার্থই রাজা। এখন তুমি আমায় ছেড়ে দাও। তার বিনিময়ে আমি তোমার জীবন রক্ষা করব।

রাজা বললেন, তুমি আমার জীবন রক্ষা করবে কি করে? ইচ্ছা করলে আমিই ত তোমার প্রাণনাশ করতে পারি।

যক্ষ বলল, একথা সত্য। তবে সত্যিই তোমার মৃত্যু আসন্ন। আমার সব কথা শুনে সেইমত কাজ করলে তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে রাজত্ব করতে পারবে।

একথা শুনে কৌতূহলী হয়ে রাজা যক্ষের বুক থেকে উঠে পড়লেন।

যক্ষ তখন বলতে লাগল, ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি মৃগয়া করতে বনে গিয়ে দেখেন, এক সাধু একটি গাছের সঙ্গে পা দুটি বেঁধে নিচের দিকে মাথা করে ঝুলতে ঝুলতে ধ্যান করছে। রাজা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, সাধু এইভাবে অনেক বছর ধরে তপস্যা করছে, সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। যাই হোক, তিনি তখনি বাড়ি ফিরে এলেন।

পরদিন রাজসভায় রাজা তাঁর মন্ত্রীদের বললেন, গতকাল বনে গিয়ে এক অদ্ভুত মৌনী সাধুকে দেখেছি। যদি কেউ সেই সাধুকে এখানে আনতে পারে তাহলে তাকে এক লক্ষ মুদ্রা উপহার দেব।

নগরে এই কথা ঘোষণা করে দেওয়া হলো। এক বারবনিতা তা শুনে রাজার কাছে এসে বলল, মহারাজ, আপনি অনুমতি দিলে আমি ঐ সাধুকে বশ করে ঐ সাধুর ঔরসে এক পুত্র জন্মিয়ে সেই পুত্রকে তার কাঁধে চাপিয়ে আপনার রাজসভায় নিয়ে আসব।

রাজা একথা শুনে আশ্চর্য হলেন। তিনি বারবনিতাকে অনুমতি দিলে সে তখনি বনের মধ্যে সাধুর আশ্রমে চলে গেল। সে দেখল, সত্যিই সাধু একটি গাছে নিচের দিকে মাথা করে ঝুলছে। কোন কথা বলছে না।

হঠাৎ সাধুর তপস্যা ভঙ্গ করা উচিত হবে না ভেবে বারবনিতা কাছাকাছি একটা কুঁড়ে তৈরি করে বাস করতে লাগল। পরদিন সে কিছু মোহনভোগ তৈরি করে এনে সাধুর মুখে তুলে দিল। সাধু তা খেতে লাগল। বারাঙ্গনা তাকে খাইয়ে দিতে লাগল। এইভাবে রোজ সে সাধুকে মোহনভোগ খাওয়াতে লাগল।

সাধু তখন শরীরে বল পেয়ে একদিন বারাঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? কিজন্য এখানে এসেছ?

বারাঙ্গনা সাধুর মন ভোলাবার জন্য মিথ্যা করে বলল, আমি এক দেব-কন্যা। আমি তীর্থ করার জন্য মর্ত্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছুদিন হলো এই বনে এসে এক আশ্রম তৈরি করে যোগসাধনা করছি।

বারাঙ্গনার রূপ ও মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হয়ে গেল সাধু। সে বলল, আমাকে তোমার আশ্রমে নিয়ে চল।

বারাঙ্গনা সাধুকে তার আশ্রমে নিয়ে গিয়ে ভাল মিষ্টি খেতে দিল। সাধু তার সাধনা ছেড়ে সেই দিনই বিয়ে করল বারাঙ্গনাকে। কালক্রমে তাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল।

এর কিছুদিন পর বারাঙ্গনা সাধুকে বলল, আমরা যোগসাধনা ছেড়ে অনেকদিন এক জায়গায় বাস করছি। ভোগসুখে মত্ত হয়ে আছি। এখন তীর্থযাত্রা করে দেহ পবিত্র করা উচিত।

বারাঙ্গনার কথায় সাধুও রাজী হয়ে গেল। একদিন তারা আশ্রম ছেড়ে তীর্থ যাত্রা করল। বারাঙ্গনা কৌশলে সাধুর কাঁধে তার ছেলেটাকে চাপিয়ে দিল। এইভাবে দুজনে পথ চলতে লাগল তারা।

বারাঙ্গনা সোজা চন্দ্রভানুর রাজসভায় গিয়ে উঠল। সাধু কিছু বুঝতে পারল না।

এদিকে বারাঙ্গনা আর সাধুর কাঁধে ছেলে দেখে রাজার সব কথা মনে পড়ল। তিনি বললেন, বারাঙ্গনা একদিন যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আজ তা পূরণ করে ফিরে এসেছে। সে কৌশলে সাধুকে বশ করে শুকনো গাছে যেন ফুল ফুটিয়েছে।

সকলেই বারাঙ্গনাকে দেখে তাকে চিনতে পারল। রাজার কথা শুনে সাধুর চৈতন্য হলো। সে বুঝতে পারল এই বারাঙ্গনা রাজার সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করে তার তপস্যা ভেঙ্গেছে। সে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তাকে মুগ্ধ করে গৃহী করে তুলেছে।

সে মনে মনে বলতে লাগল, আমিও অধম। তাই বারাঙ্গনার রূপের মোহে এতদিনের সাধনার সব ফল বিনষ্ট করলাম।

এর পর সে রেগে গিয়ে ছেলেটাকে তার কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। অন্য এক দূর বনে গিয়ে নতুন করে তপস্যা শুরু করল। পরে রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করে সেই সাধু।

এই কাহিনী শেষ করে যক্ষ বলল, তুমি, রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ সাধু এক নগরে, এক নক্ষত্রে ও এক লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলে। তুমি রাজা হয়েছ, চন্দ্রভানু তেলীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে রাজা হয়েছে। আর ঐ সাধু কুমোরের ঘরে জন্মে যোগসাধনা করে সাধু হয়েছে। ঐ সাধু রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করে ও তাঁকে বেতাল করে শ্মশানের কাছে এক শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। এবার তোমাকে হত্যা করার চেষ্টায় আছে এবং তোমাকে হত্যা করতে পারলে তার সংকল্প পূর্ণ হবে। তুমি যদি তার হাত থেকে কোনরকমে নিস্তার পেতে পার তাহলে বিনা বাধায় অনেকদিন রাজত্ব করতে পারবে।

এই বলে সেখান থেকে চলে গেল যক্ষ।

পরদিন সকালেই সিংহাসনে বসে সভাসদদের নিয়ে রাজ্যশাসন করতে শুরু করলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

কিছুদিন পর শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী একটি ফল এনে রাজাকে তা দিয়ে চলে গেল। সন্ন্যাসী চলে গেলে রাজা ভাবতে লাগলেন, যক্ষ যে সাধুর কথা বলেছিল এই সন্ন্যাসী সেই সাধু কিনা।

যাই হোক, ফলটি তখন না খেয়ে কোষাধ্যক্ষকে ডেকে ফলটি কোষাগারে রেখে দিতে বললেন রাজা।

এর পর থেকে প্রতিদিন রাজাকে একটি করে ফল দিয়ে যেতে লাগল সন্ন্যাসী।

একদিন রাজা যখন অশ্বশালা পরিদর্শন করেছিলেন তখন সন্ন্যাসী এসে রোজকার মত একটি ফল দিলেন তাঁকে। ফলটি রাজার হাতে দেবার সময় রাজার হাত থেকে তা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফলটি ফেটে গেল এবং তার থেকে একটি উজ্জ্বল রত্ন বার হলো।

তা দেখে রাজা আশ্চর্য হয়ে সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আপনি কিজন্য আমাকে এই রত্নগর্ভ ফলটি দিলেন ?

সাধু বলল, মহারাজ, শাস্ত্রে আছে রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ আর চিকিৎসকের কাছে খালি হাতে যেতে নেই। এইজন্যই আমি রত্নগর্ভ শ্রীফল নিয়ে এসেছিলাম। আমি আপনাকে এর আগে প্রতিদিন যে সব ফল দিয়েছি তাদের মধ্যেও একটি করে রত্ন আছে।

রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে যত ফল রাখতে দিয়েছি। সেগুলি সব নিয়ে এস।

কোষাধ্যক্ষ সব ফল নিয়ে এলে রাজা সেগুলি ভেঙ্গে দেখলেন প্রতিটি ফলের মধ্যেই একটি করে রত্ন আছে। তা দেখে রাজা আশ্চর্য ও আনন্দিত হলেন।

এর পর তিনি রাজসভায় গিয়ে একজন স্বর্ণকারকে ডেকে বললেন, এই সব রত্নগুলি পরীক্ষা করে এদের সঠিক মূল্য ঠিক করে দাও।

স্বর্ণকার রত্নগুলি পরীক্ষা করার পর রাজার কাছে এসে বলল, মহারাজ, এগুলি অমূল্য রত্ন, এক কোটি টাকারও বেশী।

রাজা তখন সাধুকে সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, প্রভু, আমার সমগ্র সাম্রাজ্যও এই রত্নগুলির সমান হবে না। আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এই রত্নগুলি কোথায় পেলেন এবং কেনই বা এগুলি আমায় দান করলেন তা জানতে ইচ্ছা করছে।

সন্ন্যাসী বলল, যদি অনুমতি দেন ত নির্জনে গিয়ে বলি।

রাজা তখন সন্ন্যাসীকে নির্জনে নিয়ে গেলে সন্ন্যাসী বলল, মহারাজ, গোদাবরী নদীর তীরে আমি এক শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধ করব বলে ঠিক করেছি। তাহলে আমার অনেক ক্ষমতা লাভ হবে। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, একদিন আপনি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারা রাত্রি আমার কাছে উপস্থিত থাকবেন। তাহলেই আমার মন্ত্রসিদ্ধ হবে।

রাজা বললেন, আমি নিশ্চয়ই যাব। আপনি দিন ঠিক করে দিন।

সন্ন্যাসী বলল, আপনি আগামী ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন সন্ধ্যা-বেলায় একা সেখানে যাবেন।

রাজা বললেন, আমি অবশ্যই আপনার আশ্রমে যথাসময়ে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।

রাজাকে এইভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে সন্ন্যাসী তার আশ্রমে ফিরে গেল।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন সন্ধ্যাবেলায় ধ্যানে বসল সন্ন্যাসী। রাজা বিক্রমাদিত্য যথাসময়ে একা তরোয়াল হাতে সাহসের সঙ্গে অন্ধকার আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

আশ্রমে গিয়ে রাজা দেখলেন, সন্ন্যাসী শ্মশানে বসে একটি মাথার খুলি বাজাচ্ছে আর যত সব ভূত প্রেত পিশাচ নাচছে।

রাজা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললেন, প্রভু, ভৃত্য উপস্থিত। আদেশ দিন, কি করতে হবে।

সন্ন্যাসী রাজাকে একটি পাতার আসনে বসিয়ে বলল, মহারাজ, আপনার কথায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। বুঝলাম সৎ লোকেরা প্রাণ দিয়েও সত্য পালন করে। এসেছেন যখন একটা কাজ করুন। এখান থেকে দুই ক্রোশ দূরে দক্ষিণ দিকে একটা শ্মশান আছে। সেখানে একটা শিরীষ গাছে একটা মড়া ঝুলছে। সেই মড়াটাকে অবিলম্বে নিয়ে আসুন আমার কাছে।

রাজাকে এই আদেশ দিয়ে যোগাসনে বসল সন্ন্যাসী। রাজা তখনি চলে গেলেন সেখান থেকে।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে একা এগিয়ে যেতে লাগলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। তিনি বরাবরই নির্ভীক। কোন অবস্থাতেই ভয় পান না তিনি। একে অন্ধকার। তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। পথের দুদিক থেকে ভূত প্রেতদের চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ আসছিল।

অবশেষে সেই শ্মশানে গিয়ে রাজা দেখলেন, সত্যিই একটা শিরীষ গাছে উপর দিকে পা আর নিচের দিকে মাথা করে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা মড়া ঝুলছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য তখন বুঝতে পারলেন যক্ষের কথাই ঠিক। এই মড়াটি হলো সেই তেলী রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ সন্ন্যাসীই সেই কুমোর যে যোগসিদ্ধির দ্বারা মৃত রাজা চন্দ্রভানুকে বেতাল করে রেখেছে।

কোন রকম ভয় না করে গাছে উঠে তরোয়াল দিয়ে মড়ার বাঁধনগুলো কেটে দিলেন রাজা। মড়াটা গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েই কাঁদতে লাগল মানুষের মত। রাজা বিক্রমাদিত্য তখন আশ্চর্য হয়ে মড়াটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি, কিকরে তোমার এ অবস্থা হলো ?

কথাটা শুনে হাসতে লাগল মড়াটা। সে আবার গাছে উঠে ঝুলে রইল তেমনি করে। রাজা আবার গাছে উঠে দড়ির বাঁধন কেটে দিতে মড়াটা আবার পড়ে গেল। রাজা তাকে আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু মড়াটা এবার কোন উত্তর দিল না দেখে চাদর জড়িয়ে মড়াটাকে কাঁধের উপর তুলে নিলেন তিনি।

রাজা দুপা এগিয়ে যেতেই মড়া বা বেতাল বলে উঠল, কে তুমি বীর-পুরুষ ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায় ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসীর আদেশে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি তাঁর কাছে।

বেতাল বলল, চুপ করে পথ চলতে নেই। বুদ্ধিমানরা কথা বলতে বলতে পথ চলে। আমি তোমাকে পথ চলতে চলতে কতকগুলি গল্প বলব। প্রত্যেকটি গল্প শেষ করে প্রশ্ন করব। যদি তার সঠিক উত্তর দিতে পার তাহলে আমি আবার গাছে ফিরে যাব আর যদি তুমি জেনেও ভুল উত্তর দাও তাহলে বুক ফেটে মারা যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

রাজা এ কথায় বাধ্য হয়ে রাজী হয়ে পথ চলতে লাগলেন। বেতালও তার প্রথম গল্প বলতে শুরু করল।

প্রথম কাহিনী

সেকালে বারানসী নগরে প্রতাপমুকুট নামে এক রাজা ছিলেন। বজ্রমুকুট নামে রাজার একটিমাত্র ছেলে ছিল। রাজা রাণী দুজনেই তাঁদের ছেলেকে খুব ভালবাসত।

একদিন রাজপুত্র বজ্রমুকুট তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে করে মৃগয়া করতে গিয়ে এক গভীর বনে ঢুকে পড়ে। সেই বনের মধ্যে একটা গাছে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এক সরোবরে স্নান করল রাজপুত্র। স্নান সেরে কাছে একটি শিবমন্দির দেখে সেই মন্দিরে গিয়ে পূজা করে বেরিয়ে এসে

দেখল এক রাজকন্যা তার সহচরীদের সঙ্গে সরোবরের অপর পারে স্নান ও পূজো করে গাছের ছায়ায় বেড়াচ্ছে।

রাজপুত্র ও রাজকন্যা দুজনেই দুজনকে দেখে মুগ্ধ হলো। রাজকন্যা রাজপুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার মাথায় খোঁপা থেকে একটি পদ্মফুল নিয়ে কানে পরল। তারপর কান থেকে ফুলটি খুলে দাঁতে কাটল। শেষে মাটিতে ফেলে দিয়ে যাবার সময় আবার ফুলটি কুড়িয়ে নিজের বুকে রাখল। সাথীদের সঙ্গে যাবার সময় রাজকুমারের দিকে বারবার তাকাতে লাগল।

রাজকন্যার এই সব কাজের কোন মানে বুঝতে পারল না রাজপুত্র বজ্রমুকুট। সে মন্ত্রীপুত্রকে ডেকে রাজকন্যার কথা বলল।

রাজপুত্র প্রাসাদে ফিরে গিয়ে শুধু রাজকন্যার কথা ভাবতে লাগল। কোন কাজ বা আমোদ প্রমোদে মন দিতে পারল না সে। স্নান খাওয়া প্রায় ত্যাগ করল। দিনে দিনে শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল তার। তার এই অবস্থা দেখে মন্ত্রীদের ভাবনা হতে লাগল।

একদিন রাজপুত্র তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে বলল, আমি ঐ রাজকন্যাকে বিয়ে করতে না পারলে বাঁচব না। আমি এ প্রাণ আর রাখব না।

মন্ত্রীপুত্র বলল, রাজকন্যা যাবার সময় তোমায় কোন কথা বলে গিয়েছিল?

রাজপুত্র বলল, না মুখে কোন কথাই বলেনি আমাকে।

এরপর পদ্মফুলের ঘটনাটি সব বলল।

মন্ত্রীপুত্র খুশি হয়ে বলল, এই সব সঙ্কেতের মাধ্যমেই রাজকন্যা তার সব কথা জানিয়ে গেছে।

বজ্রমুকুট উৎসুক হয়ে বলল, কিকরে বুঝলে?

মন্ত্রীপুত্র বলল, মাথার খোঁপা থেকে ফুল নিয়ে কানে পরার মানে হলো, রাজকন্যা কর্ণাট নগরে থাকে। সেই ফুল দাঁতে কাটার মানে হলো তার বাবার নাম দন্তকাট। মাটিতে ফুল ছোঁড়ার মানে তার নাম পদ্মাবতী। আবার সেই ফুল কুড়িয়ে বুকে তুলে নেওয়ার মানে তুমি তার হৃদয় বল্লভ।

রাজপুত্র বজ্রমুকুট তখন বলল, বন্ধু, আমাকে তাহলে কর্ণাট নগরে নিয়ে চল।

তখন তারা দুই বন্ধুতে মিলে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চেপে কর্ণাটের পথে রওনা হয়ে গেল।

কর্ণাট নগরের সামনে এসে একটি কুঁড়ে ঘর দেখে তারা নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। দেখল, সেই কুঁড়ের সামনে একজন বুড়ী বসে আছে। তারা

বুড়ীকে বলল, আমরা ব্যবসা করতে এসেছি এই নগরে। আমাদের থাকবার জায়গা দিতে পার ?

বুড়ী বলল, তোমরা এটাকে নিজের বাড়ি মনে করে যতদিন খুশি থাকতে পার।

তারা বলল, এই ঘরে তোমার আর কে কে থাকে ?

বুড়ী বলল, আমার একটিমাত্র ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। আমার ছেলে রাজবাড়িতে কাজ করে। আমি আগে রাজকন্যা পদ্মাবতীর ধাইমা ছিলাম। এখন বুড়ো হয়েছি বলে ঘরে থাকি। তবে রাজা আমায় অন্নবস্ত্র দেন। আজও আমি রোজ একবার করে রাজকন্যাকে দেখতে যাই।

রাজকুমার বজ্রমুকুট তখন বুড়ীকে বলল, তুমি কাল রাজবাড়িতে গিয়ে রাজকন্যাকে বলবে শুক্লাপঞ্চমীতে সরোবরের ধারে সে যে রাজপুত্রকে দেখেছিল সে তার সংকেত বুঝে এখানে এসেছে।

বুড়ী বলল, কাল কেন আমি এখনি যাচ্ছি।

এই বলে সে লাঠি হাতে তখনি রাজবাড়ি চলে গেল। গিয়ে দেখল রাজকন্যা পদ্মাবতী একা একা বসে কি ভাবছে।

বুড়ী তাকে বলল, বাছা, তুমি সরোবরের ধারে যে রাজপুত্রকে দেখেছিলে সে এখন আমার বাড়িতে আছে। সে রূপে গুণে সব দিক দিয়ে তোমার যোগ্য। তুমি তাকে বিয়ে করতে পার।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা রেগে গিয়ে বুড়ীর দুই গালে দুই চড় মেরে তাকে তাড়িয়ে দিল।

বুড়ী ফিরে এসে রাজপুত্রকে এ কথা জানাল। তা জেনে হতাশ হয়ে পড়ল রাজপুত্র।

কিন্তু মন্ত্রীপুত্র বলল, এতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। বুড়ীর দুই গালে দু চড় মেরে দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে রাজকন্যা বোঝাতে চেয়েছে দশ দিন পর শুক্লপক্ষের শেষে তার সঙ্গে দেখা হবে তোমার।

দশদিন পর বুড়ী আবার রাজবাড়িতে গিয়ে রাজকন্যাকে আবার সেই কথা বলল। কিন্তু রাজকন্যা তাকে এবার গলাধাক্কা দিয়ে খিড়কী দরজা দিয়ে বার করে দিল।

বুড়ী ফিরে এসে সেকথা রাজপুত্রকে জানাতে আবার সে ভেঙ্গে পড়ল হতাশায়।

মন্ত্রীপুত্র বলল, ভেবো না, এটাও একটা সঙ্কেত। বুড়ীকে খিড়কী দরজা

দিয়ে বার করে দেবার মানে হলো রাতে তুমি খিড়কী দরজা দিয়ে রাজবাড়ির অন্দরমহলে যাবে।

রাজপুত্র খুশি হয়ে সন্ধ্যা হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যার সময় ভাল পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল সে। মন্ত্রীপুত্র তাকে রাজবাড়ির খিড়কী দরজা পর্যন্ত দিয়ে এল।

অন্দরমহলে গিয়ে রাজপুত্র দেখল সত্যিই রাজকন্যা পদ্মাবতী তারই প্রতীক্ষায় বসে আছে। রাজপুত্রকে দেখে সে খুশি হলো। সেই রাতেই গন্ধর্ব মতে বিয়ে হলো তাদের। সুখে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে রাজকুমার চলে যেতে চাইলে রাজকন্যা তাকে ছাড়ল না। ফলে রাজকুমার বজ্রমুকুট রাজকন্যার কাছেই রয়ে গেল।

এইভাবে এক মাস কেটে যাবার পরও রাজকন্যা দেশে ফিরতে দিল না রাজপুত্রকে। অথচ দেশে ফেরার ও তার বন্ধুকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল রাজপুত্রের মন। সে দিনরাত শুধু তার বন্ধুর কথা ভাবত। সে শুধু ভাবত, যে বন্ধুর জন্য আমি এই রাজকন্যাকে লাভ করলাম সেই বন্ধু আমাকে স্বার্থপর ভাবছে। তার সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করতে পারছি না।

একদিন রাজকন্যা রাজপুত্রকে তার এই দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজপুত্র তাকে তার বন্ধুর কথা সব বলল।

রাজকন্যা বলল, তুমি এখনি গিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এস। আমি কিছু ভাল মিষ্টি তৈরি করে আমার সখীকে দিয়ে তা পাঠাচ্ছি তোমার বন্ধুর জন্য।

রাজপুত্র চলে গেলে রাজকন্যা ভাবল, এই রাজপুত্রের নিজস্ব কোন বুদ্ধি নেই, তার বন্ধুর বুদ্ধিতেই সে আমাকে পেয়েছে। এই বন্ধুর কথাতে সে আমাকে ত্যাগ করতেও পারে যে কোন সময়ে। সুতরাং তার বন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না।

এই ভেবে সে সেই সব মিষ্টির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তার সখীকে দিয়ে সেই বুড়ীর কুঁড়েতে পাঠিয়ে দিল।

এদিকে রাজপুত্র সেই বুড়ীর কুঁড়েঘরে গিয়ে মন্ত্রীপুত্রকে সব কথা বলল। দুই বন্ধুতে যখন কথা বলছিল তখন রাজকন্যার দেওয়া অনেক মিষ্টি নিয়ে সখী সেখানে গেল। রাজপুত্র তার বন্ধুকে বলল, আমার স্ত্রী পদ্মাবতী তোমার পরিচয় জেনে খুশি হয়েছে। সে নিজের হাতে এই সব খাবার তৈরি করে

পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার জন্য। সে-ই আমাকে পাঠিয়ে দেয় তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। তুমি এগুলি খাও।

মন্ত্রীপুত্র মিষ্টি দেখে দুঃখিত হয়ে বলল, কিন্তু বন্ধু আমি ত এগুলি খেতে পারব না। এতে বিষ মেশানো আছে। তুমি রাজকন্যার কাছে আমার পরিচয় দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করনি। তুমি ওদের স্বভাব জান না। রাজকন্যারা তাদের স্বামীর প্রিয়পাত্রকে সহ্য করতে পারে না বলে তার জীবননাশের চেষ্টা করে।

কিন্তু রাজপুত্র একথা বিশ্বাস করতে চাইল না। সে তখন তার বন্ধুর কথা পরীক্ষা করার জন্য একটা মিষ্টি বুড়ীর একটা পোষা বিড়ালকে খেতে দিল। তা খাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল বিড়ালটা।

তা দেখে দুঃখে ভেঙে পড়ল রাজপুত্র। সে মর্মাহত হয়ে বলল, সেই পাপিষ্ঠা রাক্ষসীর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি। আমি আর তার কাছে যাব না কখনো।

মন্ত্রীপুত্র বলল, না। তাকে ত্যাগ না করে কৌশলে তাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। তুমি তার কাছে গিয়ে বল, আমি তার দেওয়া মিষ্টি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তাহলে সে ভাববে আমি মরে গেছি। তারপর রাত্রিবেলায় সে ঘুমিয়ে পড়লে তার গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে একটা পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে তার বাঁ পায়ে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়ে চলে আসবে।

রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের কথামত সব কাজ করে সেই রাতের মধ্যেই ফিরে এল বুড়ীর কুটিরে।

পরদিন সকালে মন্ত্রীপুত্র শ্মশানে গিয়ে সন্ন্যাসী সেজে রাজপুত্রকে তার শিষ্য করল। তারপর বলল এই গয়নাগুলো রাজবাড়ির কাছে এক স্যাকরার দোকানে বিক্রি করবে। কেউ রাজকন্যার গয়না চিনতে পেরে তোমাকে ধরলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। বলবে আমার গুরু বলেছে।

রাজপুত্র সেই গয়নাগুলো রাজবাড়ির কাছে এক স্যাকরার দোকনে বিক্রি করতে গেলে স্যাকরা গয়নাগুলো চিনতে পারল। সে দেখল এই গয়নাগুলো কিছুকাল আগে সে রাজকন্যার জন্য তৈরি করেছে।

স্বর্ণকার তখন রাজপুত্রকে বলল, এ সব গয়না রাজকন্যার। তুমি কোথায় কি করে পেলে?

ক্রমে দোকানের সামনে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। নগর রক্ষক

খবর পেয়ে এসে রাজপুত্রকে জেরা করতে লাগল। রাজপুত্র বলল, আমি কিছুই জানি না। আমার গুরু শ্মশানে থাকেন। তিনিই এগুলো আমায় বেচতে পাঠিয়েছেন।

তখন নগররক্ষক রাজপুত্রকে নিয়ে শ্মশানে এসে গুরু ও শিষ্যকে বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

রাজা সব কিছু শুনে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী মন্ত্রীপুত্রকে নির্জনে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সব গয়না তুমি কোথায় পেলে ?

সন্ন্যাসীরূপী মন্ত্রীপুত্র বলল, কৃষ্ণচতুর্দশীর রাতে আমি শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করছিলাম। মন্ত্রের প্রভাবে এক ডাকিনী এসে তার গা থেকে সব গয়না খুলে দিয়ে যায়। আমার যোগসিদ্ধির প্রমাণ হিসাবে তার বাঁ পায়ে ত্রিশূলচিহ্ন এঁকে দিয়েছি। এই সেই গয়না।

রাজা তখন অন্দরমহলে গিয়ে রাণীকে বললেন, দেখ ত পদ্মাবতীর বাঁ পায়ে কোন চিহ্ন আছে কি না।

রাণী মেয়েকে দেখে এসে বলল, তার বাঁ পায়ে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

তা শুনে রাজা রেগে গিয়ে বললেন, এই রকম পাপিষ্ঠা মেয়েকে রাজ-বাড়িতে রাখা উচিত নয়। একে প্রাণদণ্ড না নির্বাসন কি শাস্তি দেব তা ভেবে পাচ্ছি না।

সন্ন্যাসীরূপী মন্ত্রীপুত্র বলল, নারী ও বালকদের প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত না। আপনি ওকে নির্বাসনদণ্ড দিন।

রাজা তখন বললেন পদ্মাবতীকে আমি নির্বাসনদণ্ড দিলাম। ওকে আমার রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাও। ও থাকলে আমার রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

রাজার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতীকে পাল্কিতে করে নগর বাইরে এক গভীর বনে রেখে এল।

এদিকে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র পদ্মাবতীর খোঁজে সেই বনে চলে গেল। তারা গিয়ে দেখল পদ্মাবতী একটি গাছের তলায় একা বসে বসে ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় কাঁদছে। রাজপুত্র তখন তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তার বন্ধুর সঙ্গে দেশের পথে রওনা হলো।

অনেকদিন পর ছেলে ও পুত্রবধূকে দেখে আনন্দিত হলেন রাজা প্রতাপমুকুট।

কাহিনী শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, এবার বল

মহারাজ! পদ্মাবতী, তার বাবা রাজা দন্তকাট আর মন্ত্রীপুত্র—এই তিনজনের মধ্যে কার অপরাধ সবচেয়ে বেশী?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজা দন্তকাটের।

বেতাল বলল, কেন?

রাজা বললেন, পদ্মাবতী শত্রু ভেবে মন্ত্রীপুত্রের নাশ করতে চেয়েছে। শত্রুবধে পাপ হয় না। মন্ত্রীপুত্র পদ্মাবতীকে শত্রু ভেবে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল তার সঙ্গে। তাতে কোন দোষ হয়নি। কিন্তু রাজা দন্তকাট উপযুক্ত বিচার না করে প্রমাণ না নিয়ে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে স্নেহ ভুলে মেয়েকে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল। রাজা বিক্রমাদিত্য আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে রওনা হলেন।

বেতাল তখন দ্বিতীয় কাহিনী বলতে শুরু করল।

দ্বিতীয় কাহিনী

পুরাকালে যমুনানদীর তীরে জয়স্থল নামে এক গ্রামে কেশববর্মা নামে এক মেয়েটির ব্রাহ্মণ বাস করত। এই ব্রাহ্মণের এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। নাম ছিল মধুমালতী। সে ছিল পরমাসুন্দরী। ক্রমে মেয়েটির বিয়ের বয়স হলে ব্রাহ্মণ ও তার ছেলে চারদিকে উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ করতে লাগল।

একদিন ব্রাহ্মণ কোন এক বিয়ে উপলক্ষে অন্য কোন এক গ্রামে যায়। তার ছেলে তখন গুরুর বাড়িতে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল। এমন সময় ত্রিবিক্রম নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে আতিথ্য গ্রহণ করে। বাড়িতে তখন ছিল মধুমালতী আর তার মা।

ব্রাহ্মণের স্ত্রী দেখল ছেলেটি দেখতে সুন্দর, শিক্ষিত এবং তার ব্যবহারও ভাল। তার বংশও ভাল।

ব্রাহ্মণের স্ত্রী ভাবল, ছেলেটি সব দিক দিয়ে উপযুক্ত পাত্র। তার সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হলে ভাল হয়। এই ভেবে বলল, তোমার ইচ্ছা থাকলে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়ে দেব।

মধুমালতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ত্রিবিক্রমও এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। তখন তারা ব্রাহ্মণের বাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষায় রইল।

কিছুদিন পর কেশববর্মা ও তার ছেলে দুটি পাত্র সঙ্গে করে নিয়ে এল। তাদের নাম বামন ও মধুসূদন।

এইভাবে মধুমালতীর বিয়ের জন্য তিনটি পাত্র যোগাড় হলো। তারা তিনজনই রূপে গুণে, বিদ্যা বুদ্ধিতে ও বংশমর্যাদায় সমান।

কেশববর্মা তখন মহা সমস্যায় পড়ল। তিনটি পাত্রের মধ্যে কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে এই নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

এমন সময় তার স্ত্রী এসে খবর দিল, মধুমালতীকে সাপে কামড়েছে।

তা শুনে কেশববর্মা ও তার ছেলে পাঁচ জন বিষবৈদ্য নিয়ে এল।

কিন্তু মধুমালতীকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। বিষবৈদ্যরা ব্যর্থ হয়ে চলে গেল। মধুমালতী বিষক্রিয়ায় মারা গেল। সকলে শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল।

কেশব, তার ছেলে ও সেই তিনটি পাত্র সকলে মিলে মধুমালতীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাকে দাহ করে এল।

এদিকে তিনটি পাত্রই মধুমালতীকে ভালবেসেছিল। তারা কেউ মধু-মালতীকে ভুলতে পারল না। ত্রিবিক্রম নিবে যাওয়া চিতা থেকে হাড়গুলো কাপড়ে বেঁধে তার বাড়ি গিয়ে ঘরের কোণে রেখে দিয়ে দেশ ঘুরে বেড়াতে লাগল। বামনও গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগল। মধুসূদন সেই শ্মশানের একধারে এক পাতার কুঁড়ে তৈরি করে মধুমালতীর চিতা থেকে ছাইগুলো জড়ো করে ঘরের এককোণে রেখে যোগসাধন করতে লাগল।

এদিকে বামন ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুরে এক গাঁয়ে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে উঠল। খাওয়ার সময় সন্ন্যাসীকে দেখে ব্রাহ্মণ তাকে যত্ন করে খেতে দিল। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণের পাঁচ বছরের একটি ছেলে তার মাকে জ্বালাতন করতে লাগল। ব্রাহ্মণী তাকে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই শান্ত হলো না। সে কান্নাকাটি করে সমানে জ্বালাতন করে যেতে লাগল তার মাকে।

তখন ব্রাহ্মণী রাগ সামলাতে না পেরে ছেলেটিকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আবার নিশ্চিন্ত মনে নির্বিকারভাবে খাবার পরিবেশন করতে লাগল।

ব্রাহ্মণীর এই নিষ্ঠুর কাজ দেখে সন্ন্যাসীরূপী বামন ভাতের থালা ফেলে উঠে পড়ল।

তা দেখে ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হয়ে বলল, একি, উঠে পড়লেন কেন ?

বামন বলল, যে ঘরে এমন রাক্ষসীর মত মা আছে সে ঘরে কি করে অন্নগ্রহণ করি বলুন।

ব্রাহ্মণ তখন হেসে একটি পুঁথি নিয়ে এসে সঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আগুনে পোড়া মৃত ছেলেটি আবার প্রাণ ফিরে পেয়ে তার মাকে তেমনি জ্বালাতন করতে লাগল।

বামন বিস্ময়ে অবাক হয়ে তার খাওয়া শেষ করল। সে ভাবতে লাগল, এই পুঁথিতে যে সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে তা জানতে পারলে তার সাহায্যে মধুমালতীকে আবার বাঁচিয়ে তোলা যাবে। এ পুঁথিটিকে যেমন করে হোক চুরি করে নিয়ে যেতে হবে।

মনে মনে সংকল্প করে ব্রাহ্মণকে বলল, দিন শেষ হয়ে আসছে। রাত্রিবেলায় কোথায় যাব ? সুতরাং রাতটা আজ এখানেই থাকব।

ব্রাহ্মণ তার থাকার জায়গা করে দিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হলে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। বামন তখন সুযোগ বুঝে পাশের ঘর থেকে সেই পুঁথিটি বার করে এনে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বামন এবার সোজা জয়স্থল গ্রামের সেই শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে তখন মধুসূদন সেই পাতার কুঁড়েতে থেকে যোগসাধনা করছিল। এমন সময় ত্রিবিক্রমও সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

বামন তখন তাদের বলল, আমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখেছি। তোমরা যে সব হাড় ও ছাই রেখে দিয়েছ তা নিয়ে এসে এক জায়গাতে জড়ো করো। আমি মধুমালতীকে আবার বাঁচিয়ে তুলব।

ত্রিবিক্রম ও মধুসূদন ব্যস্ত হয়ে হাড় ও ছাই নিয়ে এল। বামন তখন সেই পুঁথি খুলে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই হাড় ও ছাই থেকে মধুমালতীর সুন্দর দেহ আবার জীবন্ত হয়ে উঠল।

তখন তারা তিনজনেই মধুমালতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে মধুমালতীকে বিয়ে করার জন্য ঝগড়া করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

বেতাল এবার তার কাহিনী শেষ করে রাজা বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল, বলত মহারাজ, মধুমালতীর সঙ্গে কোন পাত্রের বিয়ে হওয়া উচিত ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, যে মধুসূদন শ্মশানে পাতার কুটির তৈরি করে বাস করে তার সঙ্গেই মধুমালতীর বিয়ে হওয়া উচিত।

বেতাল বলল, ত্রিবিক্রম যদি হাড় সংগ্রহ না করত আর বান যদি মৃত

সঞ্জীবনী মন্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করতে না পারত তাহলে কি করে মধুমালতীর প্রাণ ফিরে পেত?

বিক্রমাদিত্য বললেন, ত্রিবিক্রম অস্থি বা হাড় সংগ্রহ করে ছেলের কাজ করেছে। বামন তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে বাবার কাজ করেছে। একমাত্র মধুসূদনই ছাই সংগ্রহ করে পাতার কুঁড়ে বেঁধে এতকাল অপেক্ষা করে প্রেমিক স্বামীর মত কাজ করেছে। সুতরাং তারই সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হওয়া উচিত।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। বিক্রমাদিত্য তার পিছু পিছু গিয়ে গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার তৃতীয় কাহিনী বলতে শুরু করল।

তৃতীয় কাহিনী

সেকালে বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, তেমনি ধার্মিক ও দয়ালু।

একদিন বীরবর নামে দক্ষিণদেশীয় এক যোদ্ধা এসে রাজা রূপসেনের কাছে কাজ চাইল।

বীরবরের বীরোচিত চেহারা ও ভাল ব্যবহার দেখে রাজা তাকে বললেন, তুমি কত টাকা বেতন চাও?

বীরবর বলল, রোজ একহাজার মোহর বা সোনার টাকা পেলেই আমার চলে যাবে।

রাজা বললেন, তোমাদের পরিবারে কত জন লোক আছে?

বীরবর বলল, আমার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই।

রাজা তখন ভাবতে লাগলেন, এর সংসার ছোট হলেও যখন এত টাকা বেতন চাইছে তখন নিশ্চয়ই এর কোন অসাধারণ গুণ আছে। অতএব একে চাকরি দিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

এই ভেবে রাজা বীরবরকে নৈশ প্রহরী নিযুক্ত করে কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, একে প্রতিদিন এক হাজার সোনার মোহর বেতন হিসাবে দেবে।

বীরবর প্রতিদিন এক হাজার সোনার টাকা নিয়ে তার বাসায় এসে অর্ধেক টাকা সন্ন্যাসী ও সাধু তপস্বীদের দান করত। বাকি টাকায় গরীব দুঃখী ও অনাথদের পেট ভরে খাইয়ে সংসারের ব্যয়ভার চালাত।

সারাদিন এইভাবে দানধ্যান করে রাত্রিতে রাজবাড়ি পাহারা দিত বীরবর। তার শক্তি ও সাহস পরীক্ষা করার জন্য রাজা মাঝে মাঝে কঠিন কাজ করতে পাঠাতেন তাকে। সে কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে ফিরে আসত বীরবর।

একদিন গভীর রাতে নারীকণ্ঠের এক কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন রাজা। তিনি বীরবরকে ডেকে বললেন, দক্ষিণদিক থেকে নারী কণ্ঠের কান্না শোনা যাচ্ছে। তুমি, এখনি গিয়ে এর কারণ জেনে এসে আমাকে জানাও।

'যথা আজ্ঞা' বলে তখনি চলে গেল বীরবর। বীরবরের সাহস ও শক্তি দেখার জন্য রাজাও গোপনে তার পিছু পিছু গেলেন।

দক্ষিণ দিকে কান্না লক্ষ্য করে নগরের বাইরে শ্মশানে গিয়ে বীরবর দেখল পরমাসুন্দরী এক নারী দামী কাপড় ও গয়না পরে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদছে।

বীরবর তা দেখে আশ্চর্য হয়ে তার কাছে গিয়ে বলল, কে আপনি মা? কেনই বা একা শ্মশানে বসে কাঁদছেন?

নারী কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

বীরবর বারবার সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করল সেই নারীকে।

অবশেষে নারী বলল, আমি রাজলক্ষ্মী, রাজবাড়িতে ছিলাম। কিন্তু রাজার প্রাসাদে নানা অন্যায় কাজ হচ্ছে বলে আমি আর থাকতে পারছি না সেখানে। আমি চলে গেলেই অলক্ষ্মী আসবে এবং রাজার অমঙ্গল হবে। রাজার মৃত্যু হবে। তাই আমি কাঁদছি।

বীরবর তখন বলল, এর কি কোন প্রতিকার নেই?

রাজলক্ষ্মী বললেন, সে বড় কঠিন কাজ। এখান থেকে আধ যোজন দূরে একটি মন্দিরে এক দেবী আছেন। কেউ যদি তার নিজের ছেলেকে সেই দেবীর সামনে বলি দিতে পারে তাহলে তাঁর দয়ায় রাজার সব বিপদ কেটে যাবে।

বীরবর তখন তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে জাগিয়ে সব কথা বলল।

ছেলে বীরবরকে বলল, এতো সৌভাগ্যের কথা বাবা। প্রথমতঃ তোমার

আদেশমত কাজ করছি। তার উপর তোমার কর্তব্যপালনে সাহায্য করছি আর আমার এই নশ্বর দেহ দেবতাকে নিবেদন করছি।

এরপর সকলে পূজার উপচার নিয়ে সেই মন্দিরে চলে গেল। রাজাও তাদের রাজভক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে তাদের পিছু পিছু গোপনে সেই দেবীর মন্দিরে গেলেন।

মন্দিরে গিয়ে পূজা শেষ করে বীরবর হাতজোড় করে বলল, হে দেবী, তোমাকে তুষ্ট করার জন্য আমি আমার পুত্রকে বলি দিচ্ছি। এতে যেন রাজার আয়ু ও রাজ্য শক্তিশালী হয়।

এই বলে খড়্গ তুলে ছেলের মাথা কেটে দেবীর চরণে অর্ঘ্য দিল বীরবর।

বীরবরের স্ত্রী ও তার মেয়ে দুঃখে সেই খড়্গ দিয়ে আত্মহত্যা করল। বীরবর তখন ভাবল স্ত্রী ও পুত্রকন্যা হারিয়ে সংসারে থাকা বা জীবনধারণ করার কোন অর্থ হয় না।

এই ভেবে সেও খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

এই দৃশ্য দেখে দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে গেল রাজার হৃদয়। তিনি তখন মনে মনে বলতে লাগলেন, যে রাজ্যে একজন প্রভুভক্ত সেবকের প্রাণ গেল সে রাজ্য আমি আর ভোগ করতে চাই না। এ প্রাণও আর আমি রাখতে চাই না।

রাজা এবার খড়্গ তুলে নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হলেন। তখন দেবী দুর্গা স্বশরীরে আর্বিভূত হয়ে রাজার হাত ধরে বললেন, থাম তোমার সাহস ও ক্ষমতায় আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি বর দিতে চাও ত এই মৃত চারজনকে প্রাণ দান করো।

দেবী 'তথাস্তু' বলে স্বর্গ হতে অমৃত এনে মৃত চারজনের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে দিলেন। তারা যেন সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠে বসল।

বীরবর ও তার স্ত্রী পুত্রদের বেঁচে উঠতে দেখে রাজা আনন্দিত হয়ে দেবীর স্তব করতে লাগলেন ভক্তিভরে। রাজার ভক্তি দেখে দেবী খুশি হয়ে আশীর্বাদ করে অন্তর্ধান করলেন।

পরদিন সকালে রাজসভায় সভাসদদের সামনে গতরাতের ঘটনার কথা সব বললেন। তারপর প্রভুভক্ত বীরবরকে অর্ধেক রাজ্য দান করলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল, বল রাজা! এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী মহৎ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে রাজাই বেশী মহৎ।

বেতাল বলল, কেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, বীরবর প্রাণ দিয়ে তার প্রভুর প্রতি কর্তব্য পালন করেছিল। আর তার স্ত্রীও স্বামীর জন্য এবং ছেলেমেয়েরা তাদের পিতার জন্য প্রাণ বলি দিয়েছিল। এরা সবাই আপন আপন কর্তব্য ও ধর্ম পালন করেছিল। কিন্তু রাজা তাঁর সেবকের জন্য প্রাণবলি দিতে চেয়েছিলেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলে রইল। রাজা আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে হাঁটতে শুরু করলেন।

এদিকে বেতালও তার চতুর্থ গল্প শুরু করল।

চতুর্থ কাহিনী

সেকালে ভোগবতী নগরে অনঙ্গসেন নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার চূড়ামণি নামে এক শুক পাখি ছিল। পাখিটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা সব জানত।

রাজা একদিন চূড়ামণিকে বললেন, তুমি যদি তিনকালের কথা জান ত বল আমার মনের মত মেয়ে কোথায় আছে যাকে আমি বিয়ে করতে পারি।

চূড়ামণি বলল, মহারাজ, মগধের রাজা বীরসেনের সুন্দরী ও সুলক্ষণা কন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।

রাজা তখন রাজদৈবজ্ঞ চন্দ্রকান্তকে ডেকে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন।

চন্দ্রকান্তও গণনা করে একই কথা বলল। রাজা তখন সন্তুষ্ট হয়ে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে মগধে দূত হিসাবে পাঠালেন।

মগধের রাজকন্যা চন্দ্রাবতীরও মদনমঞ্জরী নামে এক শারি পাখি ছিল। সেও ছিল সর্বজ্ঞ।

একদিন চন্দ্রাবতী শারিকে বলল, শারি, তুমি যদি তিনকালের কথা জান ত বল, আমার যোগ্য বর কোথায় আছে।

শারি বলল, ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনই তোমার স্বামী হবেন।

অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী দুজনেই পাখির কাছ থেকে তাদের বিয়ের কথা জানতে পেরে পরস্পরকে ভালবাসতে লাগল মনে মনে।

কিছুদিনের মধ্যেই অনঙ্গসেনের দূত এল মগধরাজের কাছে। অনঙ্গসেনের বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হলেন মগধরাজ। দূতের সঙ্গে ব্রাহ্মণকে পাঠালেন বিয়ের দিনস্থির করার জন্য।

নির্ধারিত দিনে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। অনঙ্গসেন চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করে নিজের রাজধানীতে নিয়ে এসে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন। চন্দ্রাবতী তার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় তার প্রিয় শারিকা পাখিটিকে সঙ্গে করে আনে।

একদিন রাজা অনঙ্গসেন তাঁর রাণী চন্দ্রাবতীকে বললেন, আমরা বিয়ে করে সুখী হয়েছি। আমার ইচ্ছা আমাদের দুজনের প্রিয় শুক-শারি স্বামী-স্ত্রীর মত এক খাঁচায় থাক। ওরাও আমাদের মত সুখী হোক।

চন্দ্রাবতীও তাতে রাজী হলে সেদিন থেকে এক খাঁচায় রাখা হলো শুক-শারিকে।

কিন্তু শারি তাদের এই মিলনে খুশি হতে পারল না। সে প্রায়ই চুপচাপ মুখভার করে বসে থাকত। একদিন শুক তাকে বলল, সংসারে ভোগই সারবস্তু। কিন্তু ভোগে তোমার উৎসাহ নেই কেন?

শারি বলল, পুরুষসঙ্গ আমার মোটেই ভাল লাগে না। কারণ পুরুষ-জাতি বড়ই স্বার্থপর। তারা শঠ, প্রবঞ্চক, অধার্মিক এবং হত্যাকারী।

শুকও রেগে গিয়ে বলল, মেয়েরাও কম স্বার্থপর নয়। তাদের কথা আর বলো না। মেয়েরা চপলমতি, কুটিলা, ছলনাময়ী, লোভী এবং স্বামীঘাতিনী।

শুক-শারির এই তর্ক বিতর্ক দেখে রাজা বললেন, তোমরা বৃথা তর্ক করে তিক্ততার সৃষ্টি করছ কেন?

শারি বলল, মহারাজ, বৃথা তর্ক করছি না বা মিথ্যা কথা বলছি না। পুরুষরা যে কত স্বার্থপর ও অধার্মিক তা আমার জানা আছে। এক সত্য কাহিনী বলছি শুনুন।

ইলাপুরে মহাধন নামে এক ধনী বণিক বাস করত। বিয়ের পর বহুদিন গত হলেও কোন সন্তান না হওয়ায় সে দুঃখিত হয়ে ওঠে। অবশেষে বেশী বয়সে এক পুত্রসন্তান প্রসব করে তার স্ত্রী। আনন্দের সীমা রইল না বণিকের। সে তার ছেলের নাম রাখল নয়নানন্দ। পরম যত্নে তাকে পালন

করতে লাগল বণিক ও তার স্ত্রী। তার বয়স পাঁচ হলে তার পড়াশুনোর জন্য এক শিক্ষক নিযুক্ত করল।

কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বড় দুষ্ট প্রকৃতির ছিল নয়নানন্দ। লেখাপড়ায় মোটেই মন বসত না তার। সে যত সব দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা নিয়ে থাকত। তার কুবুদ্ধির অন্ত ছিল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দোষ-গুলোও বেড়ে চলতে থাকে।

এমন সময় বণিকের মৃত্যু হওয়ায় অল্প বয়সেই অতুল ঐশ্বর্য ও ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলো নয়নানন্দ। উপার্জনের কোন চিন্তা না করে দুহাতে টাকা খরচ করে যেতে লাগল। এইভাবে বাজে খরচ করতে করতে সব টাকা খরচ হয়ে গেল। সব বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ল সে।

মহা দুর্দশার মধ্যে পড়ল নয়নানন্দ। বাড়ি ছেড়ে পথে ঘুরতে লাগল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্রপুরে তার বাবার এক বন্ধু হেমগুপ্তের বাড়িতে গিয়ে উঠল সে। সে তার পরিচয় দিলে বন্ধুপুত্র হিসাবে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল হেমগুপ্ত।

তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা কথা বলল নয়নানন্দ। সে বলল, কয়েকটা জাহাজ নিয়ে সিংহলে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলাম। সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজগুলো সব ডুবে যায়। কোনরকমে বেঁচে যাই। একটা কাঠ ধরে ঢেউ এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তীরে এসে পড়ি।

তার দুর্ভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে সে কপটতার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা জল ফেলল চোখ থেকে।

হেমগুপ্ত কিন্তু সরলভাবে নয়নানন্দের সব কথা বিশ্বাস করল। পরম যত্নে তার বাড়িতে থাকতে বলল।

হেমগুপ্তের রত্নাবতী নামে একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল। অনেক খুঁজেও মনের মত পাত্র পাচ্ছিল না মেয়ের জন্য। তাই নয়নানন্দকে পেয়ে খুশি হলো হেমগুপ্ত। ভাবল ঈশ্বরের কৃপায় সৎপাত্র তার ঘরে নিজে থেকেই হাজির হয়েছে। নয়নানন্দ সদ্বংশজাত এবং প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক। সুতরাং তার সঙ্গেই তার মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত।

স্ত্রীকে কথাটা বলতে স্ত্রীও রাজী হয়ে গেল। বিয়ের প্রস্তাবে নয়নানন্দও রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

শুভ দিনে নয়নানন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রত্নাবতীর। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতেই রয়ে গেল নয়নানন্দ। সুখে দিন কাটতে লাগল তার।

কিন্তু একঘেয়ে জীবনযাত্রা ভাল লাগছিল না নয়নানন্দের। আগেকার উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের দিনগুলির কথা মনে পড়তে লাগল তার। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে তার পুরনো সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল মনে মনে।

একদিন রত্নাবতীকে বলল সে, এখন আমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। অনেকদিন এসেছি বাড়ি থেকে। তুমি বাবা মাকে বলে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করো।

মেয়ে জামাই-এর কথা শুনে আনন্দিত হলো হেমগুপ্ত। জামাই-এর চিরদিন শ্বশুরবাড়িতে বাস করা ঠিক না, তাই হেমগুপ্ত এক শুভ দিনে সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিল। পালকিতে করে যাত্রা করল মেয়ে জামাই।

এদিকে নয়নানন্দের মনে এক কু-অভিসন্ধি দানা বেঁধে উঠেছিল। পথে এক বন পড়লে সে তার স্ত্রীকে বলল, এই বনে দস্যু আছে। পালকিতে করে গেলে তারা আমাদের ধনী ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর। আমরা বরং পালকি ছেড়ে দিয়ে লোকজনদের সব বিদায় দিয়ে হেঁটে যাব। তুমি তোমার গা থেকে সব গয়না খুলে একটা পুঁটলিতে বাঁধ। সঙ্গে টাকাকড়ি যা আছে পুঁটলিতে রেখে দাও। শহরে ঢুকে আবার সব গয়না পরবে।

সরল প্রকৃতির রত্নাবতী কিছু বুঝতে না পেরে সব কিছু পুঁটলিতে বেঁধে সেটা তার স্বামীর হাতে দিয়ে দিল।

পালকি ও লোকজনকে বিদায় দিয়ে গভীর বনের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলতে লাগল দুজনে। যেতে যেতে পথের ধারে একটি কূয়ো দেখে রত্নাবতীকে তার মধ্যে জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়ে গয়না ও টাকাকড়ির পুঁটলিটা নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল নয়নানন্দ।

রত্নাবতী সেই কূয়োর মধ্যে পড়ে তার বাবা মায়ের নাম করে জোরে চিৎকার করতে লাগল।

এমন সময় একটি লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে নারীকণ্ঠের কাতর চিৎকার শুনে কূয়োর পাশে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটি সুন্দরী মেয়ে উদ্ধারের জন্য আকুলভাবে কাঁদছে।

লোকটি অনেক কষ্টে রত্নাবতীকে উপরে তুলে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। বলল, কে তুমি? কেন এই বনের মধ্যে একা এলে?

রত্নাবতী দেখল সত্য কথা বললে স্বামীর নিন্দা করা হয়। তাই সে প্রকৃত কারণ গোপন করে বলল, আমার নাম রত্নাবতী। চন্দ্রপুরের বণিক হেমগুপ্ত আমার বাবা। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম। এই বনের মধ্যে পথ চলার সময় দস্যুরা আমার সব গয়না কেড়ে নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয় আমাকে। স্বামীকেও মেরে তাড়িয়ে দেয়।

সব কথা শুনে দয়া হলো লোকটির। সে যত্ন করে রত্নাবতীকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবা মার কাছে পৌঁছে দিল।

বাড়িতেও প্রকৃত ঘটনা গোপন করল রত্নাবতী। যাই হোক, বাবা মা মেয়েকে পেয়ে খুশি হলো। কিন্তু জামাইএর ভাগ্যে কি ঘটল তার জন্য দুঃখিত হলো। হেমগুপ্ত মেয়ের জন্য আবার সব গয়না গড়িয়ে দিল।

এদিকে নয়নানন্দ দেশে ফিরে স্ত্রীর সব গয়না বেচে মদ খেয়ে ও জুয়া খেলে সব টাকা অল্প দিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলল। আবার দুরবস্থার মধ্যে পড়ল। সে তাই ঠিক করল, আবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আসবে। সে ভাবল, রত্নাবতী হয়ত কুয়োতেই মারা গেছে। তার কুকর্মের কথা কেউ জানে না সেখানে।

কিন্তু একদিন শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই রত্নাবতীকে দেখে ভয় পেয়ে গেল সে। এই সংকট হতে কিভাবে উদ্ধার করবে নিজেকে তা ভাবতে লাগল।

কিন্তু রত্নাবতী সত্যি সত্যিই বড় পতিব্রতা মেয়ে ছিল। সে স্বামীকে দেখে খুশি হলো এবং ভাবতে লাগল, স্বামী যত মন্দই হোক, সে তার পরম গুরু। স্বামীর নিন্দা করা পাপ। ভুলক্রমে যে পাপ সে করেছে তার জন্য এখন তাকে অনাদর করলে পাপ হবে। তাছাড়া এত অন্যায় করেও সে তারই জন্য তাদের বাড়িতে এসেছে।

এইসব ভেবে রত্নাবতী স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, তুমি কিছু ভেবো না। আমি বাড়িতে কাউকে প্রকৃত ঘটনার কথা বলিনি। সবাইকে বলেছি, বনপথে দস্যুরা আমার সব গয়না নিয়ে আমাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার জন্য বাবা মা চিন্তায় ছিলেন। তোমাকে দেখে খুশি হবেন তাঁরা। তুমি যেন আমাকে আবার ফেলে পালিয়ে যেও না।

স্ত্রীর কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলো নয়নানন্দ। এতদিন পর জামাইকে দেখে শ্বশুর শাশুড়ীও আনন্দিত হলো।

রাত্রিতে রত্নাবতী ভাল কাপড় ও গয়না পরে শুতে গেল স্বামীর কাছে।

শোবার ঘরে ঢুকে সে দেখল তার স্বামী ঘুমোচ্ছে। সে ভাবল পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে নয়নানন্দ কিন্তু আসলে ঘুমোয়নি। ঘুমোবার ভান করে তার কুমতলব চরিতার্থ করার কথা ভাবছিল। সে তাই যখন দেখল রত্নাবতী গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে, তখন সে এক তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীকে হত্যা করে তার সব গয়না নিয়ে পালিয়ে গেল।

কাহিনী শেষ করে শারি বলল, মহারাজ, এই ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেই থেকে পুরুষজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মেছে আমার মনে। পুরুষরা কত বড় স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর, তার পরিচয় পেয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কোন পুরুষের সংস্পর্শে আমি থাকব না।

রাজা এবার তাঁর প্রিয় শুক চূড়ামণিকে বলল, এবার তুমি বল, কেন তুমি স্ত্রীজাতির উপর এত বিরক্ত।

তখন শুক তার কাহিনী শুরু করল।

কাঞ্চনপুরে সাগরদত্ত নামে এক বণিক ছিল। তার ছেলে শ্রীদত্ত ছিল রূপে গুণে সমান। তার স্বভাব ছিল খুবই অমায়িক। সকলেই তার প্রশংসা করত।

শ্রীদত্ত বড় হলে অনঙ্গপুরের বণিক সোমদত্তের কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর শ্রীদত্তকে বাণিজ্য করতে বিদেশে যেতে হয়। জয়শ্রী তখন তার বাপের বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকে।

কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে থাকতে মন চাইল না জয়শ্রীর। প্রায়ই সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখত। সব সময় চঞ্চল ও অশান্ত হয়ে থাকত তার মন। একদিন সে রূপবান ও সুন্দর বেশভূষা পরা এক যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। যুবকও তাকে দেখল। তার ফলে আরও চঞ্চল হয়ে উঠল জয়শ্রীর মন।

জয়শ্রী তার একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীকে ডেকে বলল, সখী, যেমন করে পার ঐ যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দাও।

সখী সেইদিন সেই যুবকের কাছে গিয়ে বলল, মহাশয়, সোমদত্ত বণিকের কন্যা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আজ সন্ধ্যায় আপনি আমার বাড়িতে আসুন। সেখানেই দেখা হবে তার সঙ্গে।

যুবক খুশী হয়ে তাতে রাজী হলো।

সখী জয়শ্রীর কাছে গিয়ে একথা বললে জয়শ্রী খুশি হয়ে তাকে একটা উপহার দিল।

সন্ধ্যার পর যুবক সখীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। সখী জয়শ্রীকে খবর দিলে জয়শ্রী বলল, তাকে বসতে বল। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি যাব।

এইভাবে সখীর বাড়িতে রোজ রাতে গিয়ে যুবকের সঙ্গে মিলিত হত জয়শ্রী।

কিছুদিন পর জয়শ্রীর স্বামী শ্রীদত্ত বাণিজ্য করে দেশে ফিরে এল। জয়শ্রীর বাবা মা অনেকদিন পর জামাইকে দেখে খুশি হলো। কিন্তু স্বামীকে দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না জয়শ্রী। সে সেই যুবককে ভুলতে পারল না।

রাত্রিতে শোবার ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বিদেশ থেকে আনা অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দিল শ্রীদত্ত। কিন্তু জয়শ্রী মুখভার করে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। তখন শ্রীদত্ত ক্ষুণ্ণ মনে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বামী গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে সখীর ঘরে গিয়ে সেই যুবকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বেরিয়ে পড়ল জয়শ্রী। সে যখন অন্ধকারে একা দামী কাপড় গয়না পরে সখীর বাড়িতে যাচ্ছিল তখন এক চোর তাকে দেখে তার পিছু নিল।

এদিকে সেই যুবকটি সখীর বাড়ির কাছে একটি শিরীষ গাছের কাছে দাঁড়িয়ে জয়শ্রীর জন্য যখন অপেক্ষা করছিল তখন অতর্কিতে এক বিষধর সাপের কামড়ে সে মারা যায়। তার মৃতদেহটি সেখানেই পড়ে ছিল।

জয়শ্রী সেখানে গিয়ে ভাবল যুবকটি ঘুমিয়ে পড়েছে। সে অনেক ডাকা-ডাকি করল। কিন্তু যুবক কোন সাড়া না দেওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়ল জয়শ্রী। অদূরে দাঁড়িয়ে চোর সব দেখল।

সেই শিরীষ গাছে এক পিশাচ থাকত। সে সব কিছু দেখে জয়শ্রীর মত এক দুশ্চরিত্রা মেয়েকে শিক্ষা দেবার জন্য গাছ থেকে নেমে এসে যুবকটির মৃতদেহটির মধ্যে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ দেখা গেল মৃতদেহটি লাফ দিয়ে উঠে জয়শ্রীর নাকের ডগাটা কামড়ে কেটে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। পিশাচ আবার গাছে উঠে পড়ল।

এবার জয়শ্রী বুঝতে পারল যুবকটি মারা গেছে। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে সখীর কাছে গিয়ে একথা বলল। সে বলল, তবু সে তার স্বামীকে মেনে নিতে পারবে না।

অবশেষে জয়শ্রী তার সখীকে বলল, স্বামীকে তাড়াবার একটা মতলব এঁটেছি আমি।

জয়শ্রী এবার বাড়ি ফিরে তার শোবার ঘরে চলে গেল। তার স্বামী তখনো ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ জয়শ্রী কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠল। বলতে লাগল, বাঁচাও, মেরে ফেলল আমাকে।

তার নাকের ডগার ক্ষত থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল। বাড়ির সব লোক তার চিৎকারে ছুটে এলে জয়শ্রী তার স্বামীকে দেখিয়ে বলল, ঐ খুনে লোকটা আমার নাক কেটে দিয়েছে, আমাকে মেরেছে।

গোলমালে তার স্বামী শ্রীদত্তরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। উঠে কিছুই বুঝতে পারল না। অথচ জয়শ্রীর কথা সকলেই বিশ্বাস করে তার স্বামীকেই দোষ দিতে লাগল একবাক্যে।

জয়শ্রীর বাবার অভিযোগে নগরকোটাল এসে ধরে নিয়ে গেল শ্রীদত্তকে।

শ্রীদত্ত এতক্ষণে বুঝতে পারল তার স্ত্রী নিশ্চয়ই চরিত্রহীনা। সে তাকে নিয়ে ঘর করতে চায় না। তাই তাকে বদনাম দিয়ে তাড়াতে চায়। তাই সে ফিরে এলে কথা বলেনি তার সঙ্গে।

বিচারক বাদী বিবাদীর কথা শুনে জয়শ্রীর কথাই বিশ্বাস করলেন এবং শ্রীদত্তকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে শূলে চড়াতে আদেশ দিলেন।

সেই চোরটি কিন্তু অদূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করে আসছিল। বিনা অপরাধে শ্রীদত্তের শাস্তি হচ্ছে দেখে তার দয়া হলো। সে বিচারকের সামনে গিয়ে বলল, হুজুর, আপনি প্রকৃত ঘটনা না জেনেই বিনা অপরাধে আসামীকে দণ্ড দিলেন। আমি এই পাপিষ্ঠা ব্যভিচারিণী নারীর সব কাজ নিজের চোখে দেখেছি।

বিচারক তখন বিস্মিত হয়ে চোরের মুখ থেকে সব কথা শুনে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি চোরের কথামত সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য সখীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা শিরীষ গাছের তলায় সেই যুবকের মৃতদেহটিকেও দেখতে পেলেন। এবার জয়শ্রীর নাকের ডগা কাটা সম্বন্ধে চোরের কথা বিশ্বাস করলেন বিচারক। তিনি জয়শ্রীর মাথা মুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার উল্টোদিকে বসিয়ে শহরময় ঘোরাতে আদেশ দিলেন। শ্রীদত্তকে পুরস্কারদানে সন্তুষ্ট করলেন সেই সঙ্গে।

কাহিনী শেষ করে শুক বলল, দেখলেন মহারাজ, কেন আমি স্ত্রীজাতিকে পছন্দ বা বিশ্বাস করি না।

গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল, এবার বল ত মহারাজ! কে বেশী পাপী—নয়নানন্দ না জয়শ্রী?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে দুজনেই সমান পাপিষ্ঠ।

ঠিক উত্তর পেয়ে গাছে উঠে ঝুলে রইল বেতাল। রাজা আবার তাকে ধরে এনে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার পঞ্চম কাহিনী শুরু করল।

পঞ্চম কাহিনী

প্রাচীনকালে ধারা নগরে মহাবল নামে এক রাজা ছিলেন। হরিদাস নামে এক ব্যক্তি এই রাজার অধীনে দূতের কাজ করত।

হরিদাসের মহাদেবী নামে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটি ক্রমে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে তার জন্য উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ করতে লাগল হরিদাস। এবিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করতে লাগল।

একদিন মহাদেবী তার বাবাকে বলল, বাবা, আমাকে এমন এক লোকের সঙ্গে বিয়ে দেবে যে সকল গুণে ভূষিত।

হরিদাস সেইমত পাত্রের খোঁজ করতে লাগল।

একদিন রাজা মহাবল হরিদাসকে ডেকে বললেন, শোন হরিদাস, দক্ষিণ দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে আমার এক বন্ধু আছে। অনেকদিন তার কোন খবর পাইনি। তুমি সেখানে গিয়ে তার খবর এনে দাও আমাকে।

রাজার আদেশে তখনি দক্ষিণদেশের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাছে চলে গেল হরিদাস। রাজার সঙ্গে দেখা করে তার আসার কারণ জানাল। বন্ধুর সংবাদ পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র। রাজা দূত হরিদাসকে উপযুক্ত উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করে তাঁর প্রাসাদে তাকে দুচারদিন থেকে যেতে বললেন।

একদিন রাজসভায় রাজা যখন সভাসদদের সঙ্গে বসেছিলেন তখন হরিদাসও সেখানে ছিল। রাজা হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা হরিদাস, তোমার কি মনে হয় কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে?

কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে বলেই সংসারে মিথ্যা বেড়েছে এবং সত্য হ্রাস পেয়েছে মহারাজ। আজকাল মানুষের মন প্রবঞ্চনা আর কপটতায় ভরা, বসুন্ধরা অনেক কম শস্য দিচ্ছে। এযুগের মানুষ শুধু মুখে মিষ্টি কথা বলে।

রাজারা প্রজাদের কল্যাণ ও সুখ সুবিধার দিকে না তাকিয়ে শুধু প্রজাদের শোষণ করে ধনভাণ্ডার পূর্ণ করতে চায়। ব্রাহ্মণরা পুণ্যকর্ম না করে লোভী হয়ে উঠেছে। নারীরা লজ্জা ত্যাগ করে স্বৈরিণী হয়ে উঠেছে। পুত্র পিতাকে শ্রদ্ধা করে না। ভাই ভাইকে ভালবাসে না। বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে সরল ও নিঃস্বার্থ ভাবে মেলামেশা করে না। সমাজের মানুষ শাস্ত্র আলোচনা বা শাস্ত্রমত কাজ করে না। সকলেই বিদ্যা ও বুদ্ধির অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বেদকে উপেক্ষা করে চলে। ফলে পৃথিবী থেকে ধর্ম চলে গিয়ে সেখানে অধর্ম এসেছে। তাই বলি, কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে।

রাজা এই কথা শুনে হরিদাসের জ্ঞানের প্রশংসা করলেন।

সভা ভঙ্গ হলে হরিদাস তার বাসায় গিয়ে দেখল একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণ যুবক তার ঘরে বসে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

হরিদাস তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে যুবক বলল, আপনার কাছে আমার কিছু চাইবার আছে।

হরিদাস বলল, বল, আমার পক্ষে যদি তা দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই তা দেব।

যুবক বলল, আপনার একটি পরমাসুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আছে। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। আপনি তাকে সম্প্রদান করুন আমার হাতে।

হরিদাস বলল, আমার কন্যার ইচ্ছা সে যাকে বিয়ে করবে সে হবে সর্ব-বিদ্যায় পারদর্শী এবং অসাধারণ গুণসম্পন্ন।

যুবক বলল, আমি ছোটবেলা থেকে জ্ঞান অর্জন করে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছি। তাছাড়া আমার এক অসাধারণ গুণ আছে। আমি এমন এক রথ নির্মাণ করেছি যার সাহায্যে এক বছরের পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া যায়।

হরিদাসকে দেখানর জন্য পরদিনই তার রথ নিয়ে এল যুবক।

রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে তখনই সেই যুবককে নিয়ে সেই রথে চড়ে দেশে রওনা হলো হরিদাস।

এদিকে বাড়ি ফিরে হরিদাস দেখল তার স্ত্রী ও পুত্র মহাদেবীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য দুটি পৃথক পৃথক পাত্র যোগাড় করে রেখেছে।

হরিদাস বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে শুনে পাত্র দুটি এসে দেখা করল তার সঙ্গে।

মহাবিপদে পড়ল হরিদাস। এক মেয়ের জন্য তিন পাত্র উপস্থিত। তিনজনই বিদ্বান ও অসাধারণ গুণের অধিকারী।

হরিদাস তাদের বলল, আজকের রাতটা এখানেই থাক তোমরা। আমি আমার স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।

কিন্তু সেই রাতেই অতর্কিতে বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস এসে মহাদেবীকে হরণ করে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে অনেক খোঁজ করেও মহাদেবীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

তখন সেই পাত্র তিনজনও এসে মহাদেবী হরণের ঘটনা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করতে লাগল।

এদের মধ্যে একজন বলল, আমি যোগবলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কথা জানতে পারি। আপনারা চিন্তিত হবেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি, এক রাক্ষস মহাদেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে রেখেছে। সেখান থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় তা ভেবে দেখুন।

দ্বিতীয় পাত্রটি বলল, আমিও এমন এক বিদ্যা জানি যার সাহায্যে কারো শব্দ লক্ষ্য করে তাকে হত্যা করা যায়। কিন্তু সেখানে কিভাবে যাওয়া যায় সেটাই হলো সমস্যা।

হরিদাসের আনা সেই তৃতীয় পাত্রটি বলল, কোন চিন্তা নেই। আমার এমন এক রথ আছে যার সাহায্যে অল্প সময়ে শতযোজন পথ অতিক্রম করা যায়।

এই বলে তারা তিনজনে রথে চড়ে তখনি রওনা হয়ে পড়ল বিন্ধ্যাচলের পথে। সেখানে গিয়ে দ্বিতীয় পাত্রের শব্দভেদী বাণের সাহায্যে সহজেই রাক্ষসকে বধ করে মহাদেবীকে উদ্ধার করে আনল তারা।

মহাদেবীকে বাড়িতে আনার পর তিনজন পাত্রই বিয়ে করতে চাইল তাকে। তারা বলল, আমাদের তিনজনের বিদ্যার সাহায্যে মহাদেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

বেতাল এইখানেই কাহিনী শেষ করে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ ! এই তিনজনের মধ্যে মহাদেবীর যোগ্য পাত্র কে ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, যে ব্রাহ্মণ যুবক রাক্ষসকে তার বাণের দ্বারা বধ করে সে-ই মহাদেবীর যোগ্য পাত্র।

বেতাল বলল, কিন্তু তিনজনের বিদ্যাই ত সমান। এই তিনজনের তিন

বিদ্যার কোন একটির অভাব ঘটলে মহাদেবীকে উদ্ধার করা যেত না। তাহলে শুধু দ্বিতীয় পাত্রই বা তার যোগ্য বর হবে কেন?

রাজা বললেন, তিনটি বিদ্যারই অবশ্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ঠিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় রাক্ষসকে বধ করতে না পারলে মহাদেবীকে উদ্ধার করা যেত না।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। রাজাও আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ হাঁটতে লাগলেন।

বেতালও তার ষষ্ঠ কাহিনী শুরু করল।

ষষ্ঠ কাহিনী

পুরাকালে ধর্মপুর নগরে ধর্মশীল নামে এক রাজা ছিলেন। তার অন্ধক নামে এক মন্ত্রী ছিল।

একদিন মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিলেন, দেবী কাত্যায়নীর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করুন মহারাজ। তাহলে আপনার মঙ্গল হবে।

রাজা খুশি হয়ে মন্দির নির্মাণের আদেশ দিলেন। মহাসমারোহে দেবীর পূজা চলতে লাগল।

তবু কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না রাজা। কারণ রাজার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় অতৃপ্ত রয়ে যায় তাঁর পুত্রকামনা।

অবশেষে একদিন মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে দেবীর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, হে দেবী, ত্রিলোক-জননী, তুমি সর্ব জীবের মনের ইচ্ছা পূরণ করো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তোমার আরাধনা করেন। আমি তোমার পরম ভক্ত। আমার মনের একটি-মাত্র বাসনা পূরণ করো।

ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দেবী আকাশবাণীতে বললেন, আমি তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হয়েছি। বল, কি বর চাও তুমি।

রাজা আনন্দের আবেগে বললেন, হে দেবী, কৃপা করে আমাকে এই বর দাও যেন আমি অবিলম্বে একটি পুত্রসন্তান লাভ করে সার্থক করে তুলতে পারি আমার জীবনকে।

দেবী বললেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি এমন একটি পুত্র লাভ করবে যে হবে শান্ত, সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী।

কালক্রমে রাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। রাজা ও রাণী নবজাত পুত্রকে নিয়ে মন্দিরে দেবী কাত্যায়নীর পূজা দিতে গেলেন।

দীনদাস নামে এক যুবক তার বন্ধুর সঙ্গে রাজধানী ধর্মপুরে বেড়াতে এসেছিল। একদিন সেই যুবক তার নিজের জাতির এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়। সে ঐ কন্যাকে বিয়ে করতে চায়।

লোকমুখে দীনদাস শুনতে পায় রাজা দেবী কাত্যায়নীর পূজা করে তাঁর কৃপায় বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। সে ভাবল সেও দেবীর কৃপা পেলে সেই কন্যাকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে পারবে।

এই ভেবে দীনদাস দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করল, হে দেবী, যদি আমি তোমার কৃপায় ঐ কন্যাকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে পারি তাহলে নিজের মাথা কেটে পূজা দেব।

দেবীর কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে বন্ধুর কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা বলল তাকে।

বন্ধু চিন্তিত হয়ে দীনদাসের বাবার কাছে গিয়ে সব কথা বলল। বলল, সেই কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে না হলে সে হয়ত আত্মঘাতী হবে।

একথা শুনে দীনদাসের বাবাও ভয় পেয়ে গেল। সে তখন ধর্মপুরে গিয়ে সেই কন্যার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার ছেলে দীনদাসের বিয়ের ঠিক করে ফেলল।

বিয়েতে প্রচুর যৌতুক এবং মনের মত স্ত্রী পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে উঠল দীনদাস। দেবীর কাছে করা শপথের কথা সে ভুলে গেল।

কিছুদিন পর স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ধর্মপুরে এল দীনদাস। তার বন্ধুকেও সঙ্গে নিয়ে কাত্যায়নীর মন্দিরের কাছে আসতে সেই শপথের কথা মনে পড়ে গেল তার। সে ভাবতে লাগল, আমি মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ। তাই শপথের কথা ভুলে গেছি। যাই হোক, এখন আর বিলম্ব না করে এই শপথ পালন না করে দেবীকে তুষ্ট করি।

এই কথা ভাবতে ভাবতে স্ত্রী ও বন্ধুকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে একা মন্দিরের মধ্যে চলে গেল দীনদাস।

মন্দিরে ঢুকে দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে দীনদাস বলল, হে দেবী তোমার কাছে একদিন যে শপথ করেছিলাম তার কথা ভুলে

গিয়ে যে পাপ করেছি তার জন্য উচিত শাস্তি আমায় দাও। তবে এই মুহূর্তে আমি সে শপথ পালন করে আমার মানসিক শোধ করছি।

এই বলে মন্দিরে যে বলির খড়্গ ছিল তাই দিয়ে নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে ফেলল দীনদাস।

এদিকে দীনদাসের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তার বন্ধু মন্দিরে ঢুকে দেখতে গেল। যাবার সময় দীনদাসের স্ত্রীকে বলে গেল, তুমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আমি দেখে আসছি বন্ধু এখনো এল না কেন।

মন্দিরের ভিতরে গিয়ে বন্ধু দেখল, দেবীমূর্তির সামনে মাথা কাটা অবস্থায় পড়ে আছে দীনদাস।

এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে একই সঙ্গে শোকে অভিভূত ও ভীত হয়ে পড়ল সেই বন্ধু। সে ভাবল এই দৃশ্য দেখার পর ফিরে গেলে লোকে বলবে আমিই বন্ধুর স্ত্রীর রূপের মোহে তাকে পাবার জন্য বন্ধুকে হত্যা করেছি। এই নিন্দা ও কলঙ্কের কথা কানে শোনার থেকে মৃত্যু অনেক ভাল।

এই চিন্তা করে সেও সেই খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

অনেকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে থাকার পর দীনদাসের স্ত্রী অধৈর্য হয়ে উঠল। দুই বন্ধু ফিরে আসছে না দেখে সেও মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়ল। দেখল দুই বন্ধুই মাথাকাটা অবস্থায় পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে ভয়ে ও দুঃখে অভিভূত হয়ে দরজার কপাট ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে। তার বুদ্ধি যেন লোপ পেয়ে গেল।

সে তখন ভাবতে লাগল, পূর্বজন্মের পাপের জন্যই হয়ত এ দৃশ্য নিজের চোখে দেখতে হলো। স্বামীকে অকালে হারিয়ে সারাজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করার থেকে মৃত্যুও অনেক ভাল। তাছাড়া লোকে এই দুটি মৃত্যুর জন্য আমাকেই দায়ী করবে। বলবে আমি দুঃশ্চচিত্রা, তাই নিজের স্বার্থে স্বামী ও তার বন্ধুকে খুন করেছি।

এই ভেবে সে খড়্গ তুলে নিয়ে নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হলেই দেবী তার সামনে আবির্ভূত হয়ে তার হাত ধরলেন। বললেন, বৎস! তোমার সাহস ও সততা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে আর আত্মহত্যা করতে হবে না। বল, কি বর চাও।

দীনদাসের স্ত্রী তখন বলল, হে দেবী, আমাকে যদি কৃপা করো তাহলে এই দুটি মৃতদেহের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে দাও।

দেবী হেসে বললেন, তাহলে তুমি নিজের হাতে এই দুজনের দেহ ও মাথা এক করে জোড়া লাগিয়ে দাও।

মেয়েটি তখন দেবীর বর পেয়ে আনন্দের আবেগে ভুল করে একজনের মাথা অন্য জনের দেহে লাগিয়ে দিল।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, এখন বল ত মহারাজ! এই দুজনের মধ্যে কে মেয়েটির স্বামী হবে?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, তার স্বামীর মাথাটি যে দেহতে লাগানো হয়েছে সে-ই তার স্বামী হবে। সব প্রাণীরই অন্য সব অঙ্গের মধ্যে মাথাই শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে তাই মাথাকে উত্তমাঙ্গ বলে।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। রাজাও তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার সপ্তম কাহিনী বলতে শুরু করল।

সপ্তম কাহিনী

সেকালে চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল সুলোচনা আর মেয়ের নাম ছিল ত্রিভুবনসুন্দরী। মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে তার বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন রাজা।

ত্রিভুবনসুন্দরী ছিল রূপে গুণে সমান। তার রূপ গুণের কথা দেশে বিদেশে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তা শুনে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠাতে লাগলেন রাজা চন্দ্রাপীড়ের কাছে। সেই সঙ্গে চিত্রকর দিয়ে নিজেদের ছবি আঁকিয়ে সেই সব ছবিও পাঠালেন। রাজা সেগুলি বিচারের জন্য মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু পাণিপ্রার্থীদের সেই সব ছবি দেখে একজনকেও পছন্দ হলো না ত্রিভুবনসুন্দরীর।

রাজা তখন মেয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করার মনস্থ করলেন। কিন্তু ত্রিভুবসুন্দরী তাতে রাজী হলো না। সে তার বাবাকে বলল, ও সবের কোন প্রয়োজন নেই। যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি এই তিন গুণের অধিকারী হবেন আমি তাঁকেই বিয়ে করব।

কিছুদিন পর চারজন যুবক রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো। রাজা তাদের আপন আপন পরিচয় দিতে বললেন।

প্রথম যুবক বলল, মহারাজ! আমি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। আর আমার একটি বিশেষ গুণ আছে। প্রতিদিন আমি অপূর্ব কারুকার্যখচিত এক কাপড় বুনে তা বিক্রি করে পাঁচটি করে রত্ন পাই। এই পাঁচটি রত্নের মধ্যে একটি ব্রাহ্মণকে ও একটি দেবতার উদ্দেশ্যে দান করি। একটি রত্ন আমি নিজে পরি। একটি আমার ভাবী স্ত্রীর জন্য যত্ন করে সঞ্চয় করে রাখি। বাকি একটি আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য খরচ করি। তাতে আমার ভালভাবেই চলে যায়। এমন গুণ আর কারো আছে বলে আমার মনে হয় না।

দ্বিতীয় যুবক বলল, আমি পশুপাখিদের ভাষা জানি যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার মত শক্তিশালী পুরুষ পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

তৃতীয় জন বলল, আমার মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর একজনও নেই। এমন কোন শাস্ত্র নেই যাতে আমার জ্ঞান নেই।

চতুর্থ জন বলল, আমিও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। এ ছাড়া আমার একটা বিশেষ গুণ আছে। আমি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করতে পারি।

চারজন যুবকের গুণের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন রাজা চন্দ্রাপীড়। বুঝতে পারলেন এই চারজন পাণিপ্রার্থীই পাত্র হিসাবে উপযুক্ত। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকে কিভাবে বেছে নেবেন তা ভেবে পেলেন না।

রাজা তখন নিজে কিছু ঠিক করতে না পেরে মেয়ের কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। ত্রিভুবনসুন্দরীও সব শুনে কোন কথা বলতে পারল না। বিহ্বল হয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, বল মহারাজ! এই চারজনের মধ্যে কে ত্রিভুবনসুন্দরীর সবচেয়ে যোগ্য পাত্র।

রাজা বললেন, যে কাপড় বুনে বিক্রি করে সে জাতে শূদ্র। যে পশুপাখির ভাষা শিখেছে সে বৈশ্য। যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েছে সে ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে শব্দভেদী বাণ মারতে শিখেছে সে জাতে ক্ষত্রিয় এবং রাজার স্বজাতীয়। সুতরাং শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখলে এই ক্ষত্রিয় পাত্রই রাজকন্যার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।

সঠিক উত্তর পেয়ে গাছে চলে গেল বেতাল। রাজাও তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পথ চলতে আরম্ভ করলেন।

বেতাল এবার অষ্টম কাহিনী বলতে লাগল।

অষ্টম কাহিনী

মিথিলায় গুণাধিপ নামে এক রাজা ছিলেন।

একদিন চিরঞ্জীব নামে এক রাজপুত যুবক চাকরির আশায় মিথিলা নগরে এসে উপস্থিত হয়। অবশেষে সে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

কিন্তু রাজা তখন রাজসভায় বসতেন না। অন্তঃপুরের মধ্যেই দিনরাত আমোদ প্রমোদ করে দিন কাটাতেন। সুতরাং রাজার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে পারল না চিরঞ্জীব।

মিথিলাতেই এক জায়গায় এক বছর রাজার সঙ্গে দেখা করার আশায় কাটাল চিরঞ্জীব। ক্রমে তার সঙ্গে যা টাকা পয়সা ছিল তা সব খরচ হয়ে গেল। সে দেখল, এরপর তার আর দিন চলবে না। তাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে। তার মত শক্ত সমর্থ লোকের পক্ষে ভিক্ষা করে খাওয়ার থেকে মৃত্যুও অনেক ভাল। অথচ রাজা ছাড়া কেউ তাকে চাকরি দিতে পারবে না এবং রাজার সঙ্গে কখন তার দেখা হবে তার কিছু ঠিক নেই।

সে তাই অনেক ভেবে ঠিক করল, এইভাবে হীন জীবন যাপন করার থেকে বনে গিয়ে ঈশ্বরের তপস্যা করা অনেক ভাল।

সে তাই আর বৃথা কালক্ষেপ না করে তপস্বীর বেশে বনে চলে গেল।

কিছুকাল পর রাজা গুণাধিপ অন্তঃপুর ছেড়ে আবার রাজকার্যে মন দিলেন। একদিন সৈন্যসামন্ত ও লোকজন নিয়ে বনে মৃগয়া করতে গেলেন রাজা। বনের মধ্যে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে একটি হরিণের পিছু ধাওয়া করে একা একা বনের গভীরে প্রবেশ করলেন রাজা। দেখলেন তাঁর সঙ্গে তখন কেউ নেই।

এদিকে তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হরিণটাকেও আর দেখতে পেলেন না। হরিণটা কোথায় কোন দিকে পালিয়েছে অন্ধকারে তাও বুঝতে পারলেন না। সেই অন্ধকারে গভীর বনের মধ্যে পথ খুঁজে বেরিয়ে আসাও সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। তার উপর সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছেন তিনি।

যাই হোক, সাহস করে এগিয়ে যাবার পর বনের মধ্যে একটি কুটির দেখতে পেলেন রাজা। আশা জাগল তাঁর মনে। ওখানে নিশ্চয় কোন মানুষ বাস করে।

কুটিরের সামনে গিয়ে দেখলেন একজন সাধু তপস্যা করছে। রাজা করজোড়ে কিছু জল চাইলেন তার কাছে।

জীবনে বীতশ্রদ্ধ সেই রাজপুত যুবকই হলো এই তপস্বী।

চিরঞ্জীব সমাদরের সঙ্গে জল ও ফলমূল এনে দিল রাজাকে। যত্ন করে বসাল তাঁকে।

খুশি হয়ে রাজা বললেন, আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। আমি চিরঋণী রইলাম আপনার কাছে। বাইরে আপনাকে তপস্বী বলে মনে হলেও আপনার চেহারা ও আচরণ দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। দয়া করে অকুণ্ঠভাবে আপনার আসল পরিচয় দান করে আমার মনের সংশয় দূর করুন।

চিরঞ্জীব তখন তার সব বৃত্তান্ত খুলে বলল।

সব শুনে রাজা লজ্জা পেলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় দিলেন না। সেই রাতটা তিনি চিরঞ্জীবের কুটিরেই কাটালেন।

পরদিন সকালে রাজা নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে চিরঞ্জীবকে নিয়ে যেতে চাইলেন। বললেন, এবার হতে তুমি আমার কাছেই চিরদিন থাকবে।

চিরঞ্জীবও আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে গেল রাজার কথায়। রাজার সঙ্গে সেও রাজপ্রাসাদে চলে গেল। রাজা তাকে তাঁর প্রিয়পাত্র হিসাবে রেখে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে রাজার একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল চিরঞ্জীব।

কোন এক বিশেষ কাজ দিয়ে চিরঞ্জীবকে একবার বিদেশে পাঠালেন রাজা। কাজ শেষ করে ফেরার পথে সমুদ্রের ধারে একটি মন্দির দেখে তার মধ্যে প্রবেশ করল সে। দেবীকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল চিরঞ্জীব।

মেয়েটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে বীর! এখানে তুমি কি কারণে এসেছ?

চিরঞ্জীব তার বিদেশে আসার কারণের কথা সব বলল।

মেয়েটি বলল, এই সমুদ্রে একবার ডুব দিয়ে এসে তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তা করব।

চিরঞ্জীব মেয়েটির কথামত সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে উঠে এসে দেখল, সেই মন্দির বা মেয়ে কিছুই নেই সেখানে এবং সে রাজধানীতে তার বাসস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধরনের আশ্চর্যজনক ঘটনা জীবনে কখনো দেখেনি চিরঞ্জীব। যাই হোক, সে রাজার কাছে গিয়ে সব ঘটনার কথা বলল।

সব শুনে এই অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখতে চাইলেন রাজা। বললেন, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

চিরঞ্জীব রাজাকে সঙ্গে করে সমুদ্রের ধারে সেই জায়গায় নিয়ে গেল। দেখল মন্দিরটা রয়েছে।

রাজা মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজা দিয়ে দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বাইরে এসেই সেই পরমাসুন্দরী মেয়েটিকে দেখতে পেলেন। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন রাজা।

সেই মেয়েটিও রাজাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলল, মহারাজ! আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তা করব।

রাজা বললেন, তুমি যদি আমার কথা শোন তাহলে আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবকে বিয়ে করো।

মেয়েটি বলল, আপনার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়েছি, অন্যকে কি করে বিয়ে করব?

রাজা বললেন, তুমি আগেই স্বীকার করেছ আমার আদেশ মেনে চলবে। সত্য ভঙ্গ করা উচিত নয়।

মেয়েটি তখন বাধ্য হয়ে রাজার কথায় সম্মত হলো। রাজা তখনি মেয়েটির সঙ্গে চিরঞ্জীবের গন্ধর্বমতে বিয়ে দিলেন। তারপর তাদের রাজধানীতে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

চিরঞ্জীবের ঘরসংসার করার জন্য প্রয়োজনীয় সব সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিলেন রাজা।

গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, বল মহারাজ! রাজা এবং চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশী মহৎ।

রাজা বললেন, চিরঞ্জীবই বেশী মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে।

বেতাল বলল, কি করে বুঝলে?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজা গুণাধিপ শেষের দিকে চিরঞ্জীবের উপকার করেছেন ঠিক, কিন্তু বনে মৃগয়া করার দিন সন্ধ্যাবেলায় সে রাজাকে খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছিল সত্যিই তার তুলনা হয় না। তা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ।

রাজার কাছে সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল গাছে চলে গিয়ে ঝুলতে লাগল। রাজাও তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে করে পথ চলতে লাগলেন।

বেতালও শুরু করল তার নবম কাহিনী।

নবম কাহিনী

প্রাচীনকালে মগধপুর নামে এক রাজ্যে বীরবর নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজ্যে হিরণ্যদত্ত নামে ধনী বণিক বাস করত। মদনসেনা নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল হিরণ্যদত্তের।

সেদিন ছিল বসন্ত উৎসবের দিন। নতুন সাজপোশাক পরে সখীদের সঙ্গে একটি উপবনে বেড়াচ্ছিল মদনসেনা। এমন সময় সোমদত্ত নামে এক বণিকপুত্র বসন্ত উৎসব উপলক্ষে সেখানে এসে মদনসেনাকে দেখে মুগ্ধ হয় তার রূপে।

সোমদত্ত সোজা মদনসেনার কাছে গিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করল। সে বলল, আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমাকে বিয়ে করে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো তুমি। তুমি আমার এই বাসনা পূর্ণ না করলে আমি তোমারই সামনে আত্মহত্যা করব।

মদনসেনা অনেক করে বোঝাতে লাগল সোমদত্তকে। অনেক সদুপদেশ দিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

কিন্তু যুবক সোমদত্ত কোন কথাই শুনতে চাইল না।

অগত্যা মদনসেনা একজন যুবকের প্রাণরক্ষাকে তার প্রধান ধর্ম বলে মনে করে বলল, আজ হতে পাঁচদিন পর আমার বিয়ে। তবে কথা দিলাম আমার বিয়ের পর তোমার সঙ্গে দেখা না করে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হব না।

এই কথায় কিছুটা শান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল সোমদত্ত।

যথাসময়ে বিয়ে হলো মদনসেনার। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বলল না মদনসেনা। বিছানার একপাশে চুপ করে বসে রইল। তার ব্যবহারে তার স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেলে মদনসেনা সোমদত্তের কথা সব খুলে বলল। বলল, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা আমাকে পালন করতেই হবে। তার সঙ্গে একবার আমাকে দেখা করতেই হবে। তুমি আমাকে অনুমতি দাও যাবার।

প্রথমে যেতে দিতে না চাইলেও পরে যাবার অনুমতি দিল মদনসেনার স্বামী।

তখন রাত্রি দুপুর। ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই একলা গয়না পরে সারা গা কাপড়ে ঢেকে সোমদত্তের বাড়ি যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল মদনসেনা।

এক চোর মদনসেনাকে দেখে তার সামনে এসে বলল, তোমার গায়ের গয়নাগুলো খুলে আমাকে সব দাও।

মদনসেনা তবু নির্ভয়ে বলল, আমি বণিক হিরণ্যদত্তের মেয়ে। স্বামীর অনুমতি নিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সোমদত্তের বাড়ি যাচ্ছি।

চোর তখন তার গা থেকে গয়নাগুলো খুলতে উদ্যত হলে মদনসেনা বলল, আমাকে একটু সময় দাও। আমি প্রতিজ্ঞা পালন করে এখনি ফিরে এসে তোমাকে সব গয়না দেব। তুমি একটু অপেক্ষা করো।

মদনসেনার কথায় বিশ্বাস করে চোর তাকে ছেড়ে দিল। পথের উপর সেইখানেই সে মদনসেনার ফিরে আসার অপেক্ষায় রইল।

মদনসেনা সোমদত্তের ঘরে গিয়ে সোমদত্তকে ঘুমোতে দেখে জাগাল তাকে।

গভীর রাতে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে সোমদত্ত বলল, এই গভীর অন্ধকার রাতে একা এলে কি করে ?

মদনসেনা বলল, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তাই কথা রাখতে এসেছি। আমার স্বামীর অনুমতি নিয়েই এসেছি। এখন কি চাও বল।

সোমদত্ত বলল, তুমি যে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য এতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ এবং এত কষ্ট স্বীকার করেছ এতেই আমি খুশি হয়েছি। আর কিছুই চাই না।

আমার সব কথা জেনেও তোমার স্বামী আমার কাছে আসার যে অনুমতি তোমায় দিয়েছে তাতে বোঝা যায় সেও মহৎ। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে তাকে সুখী করো।

মদনসেনা এবার সোমদত্তের ঘর থেকে বেরিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই ফিরে যেতে লাগল। দেখল চোর তার অপেক্ষায় সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

চোর ভেবেছিল মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছে। সে আর আসবে না। কিন্তু হঠাৎ তাকে তার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল চোরটি।

মদনসেনা তাকে তার ফিরে আসতে দেরি হওয়ার কারণ বললে চোর বলল, তোমার সততায় আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার গয়না আর আমি চাই না। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন কর।

কিন্তু স্বামীর কাছে মদনসেনা ফিরে গেলে স্বামী কোন কথা বলল না তার সঙ্গে। সে তার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, মহারাজ! মদনসেনা, সোমদত্ত, মদনসেনার স্বামী আর চোর—এই চারজনের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, চোরই সবচেয়ে ভাল।

বেতাল বলল, কেন মহারাজ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, মদনসেনা যা করেছিল তা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ প্রতিজ্ঞা পালনের থেকে সতীত্ব রক্ষা নারীর প্রধান ধর্ম ও কর্তব্য। গভীর অন্ধকার রাতে একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কোন যুবতী স্ত্রীর পক্ষে উচিত কাজ নয়।

মদনসেনার স্বামী তাকে যাবার অনুমতি দিলেও তাকে বিশ্বাস করে খুশি মনে এ অনুমতি দেয়নি। তা যদি দিত তাহলে তার স্ত্রী ফিরে এলে এমন ব্যবহার করত না।

সোমদত্ত প্রথমে মদনসেনাকে পাবার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। পরে শাস্তি পাবার ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল। তার কাজের মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

চুরি করার সুযোগ হাতে পেয়েও চুরি করেনি চোর। গভীর রাতে নির্জনে মদনসেনাকে একা পেয়ে তার সব গয়না অনায়াসে নিয়ে নিতে পারত। কিন্তু প্রথমে সে তার কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দেয়। পরে সে তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তার গয়না নিতে চায়নি। সামান্য এক চোরের পক্ষে এই ধরনের উদারতা ও মহানুভবতা দেখা যায় না।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে শ্মশানের গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে হাঁটতে লাগলেন আবার।

বেতাল এবার দশম কাহিনী বলতে শুরু করল।

দশম কাহিনী

সেকালে গৌড় দেশে বর্ধমান নামে এক নগর ছিল। সেখানে গুণশেখর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রীর নাম ছিল অভয়চন্দ্র। মন্ত্রী অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

মন্ত্রীর মুখ থেকে বুদ্ধের বাণী শুনে রাজাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেই রাজা সারা রাজ্যে দেবদেবীর সব পূজা বন্ধ করে

দিলেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্র মতে কেউ কোন অনুষ্ঠান করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ঘোষণা করে দিলেন।

প্রজারা তা না চাইলেও শাস্তির ভয়ে সব পূজা, কুলাচার ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম ত্যাগ করল। যারা লুকিয়ে তা করতে লাগল তারা শাস্তি ভোগ করল।

মন্ত্রী অভয়চন্দ্র রাজাকে উপদেশ দিতেন, সব ধর্মের চেয়ে বড় হলো অহিংসা ধর্ম। আমাদের ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা হলো অহিংসাই পরম ধর্ম। কোন লোক যদি এ জন্মে অন্য কাউকে হত্যা করে তাহলে নিহত ব্যক্তি পরজন্মে সেই লোককে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেয়। বিরাটকায় ব্যক্তি থেকে অতি ক্ষুদ্র পোকামাকড় পর্যন্ত সব প্রাণীর প্রাণের মূল্য সমান। তাই তাকে বিনাশ করা মহাপাপ। প্রতিটি প্রাণীর প্রাণরক্ষা করা মহৎ কাজ। পরের মাংস খেয়ে যারা নিজেদের দেহের মাংসবৃদ্ধি করে তাদের মত পাপী আর এ জগতে নেই। এ কাজ করলে মৃত্যুর পর নরক ভোগ করতে হয় তাদের।

মন্ত্রীর কাছ থেকে এইসব উপদেশ শুনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে।

কিন্তু রাজা গুণশেখরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ধর্মধ্বজ রাজা হতে বৌদ্ধধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সারা রাজ্য থেকে। কারণ ধর্মধ্বজ ছিলেন সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। তিনি রাজা হয়েই বৌদ্ধদের শাস্তি দিতে লাগলেন। মন্ত্রী অভয়চন্দ্রের মাথা মুড়িয়ে গাধার উপর চাপিয়ে সমস্ত নগর ঘুরিয়ে তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রজারা আবার তাদের সনাতন হিন্দুধর্ম ফিরে গেল।

বসন্তোৎসবের দিন রাজা তাঁর তিন রাণীকে নিয়ে একটি উপবনে বিহার করতে গেলেন। সেই উপবনের মধ্যে একটি সরোবরে অনেক পদ্মফুল ফুটে ছিল। রাজা সেই সরোবর থেকে তিনটি পদ্মফুল এনে তিনজন রাণীকে দিলেন।

কিন্তু একটি ফুল এক রাণীর পায়ে পড়ে যেতে সেই ফুলের আঘাতে তার পা ভেঙ্গে গেল। ব্যথায় কাঁদতে লাগল রাণী।

এর কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদের আলো গায়ে লেগে দ্বিতীয় রাণীর গায়ে ফোসকা পড়ে গেল। সে রাণীও ব্যথায় কাতর হয়ে উঠল।

এমন সময় পাশের এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে হামানদিস্তার শব্দ কানে আসতেই তৃতীয় রাণী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, মহারাজ! বলত, এই তিন রানীর মধ্যে কার শরীর সবচেয়ে কোমল ও স্পর্শকাতর?

রাজা বললেন, চাঁদের আলো গায়ে লেগে যে রাণীর গায়ে ফোসকা পড়ে সেই রাণীর গা-ই সবচেয়ে কোমল ও স্পর্শকাতর।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে আবার গাছে গিয়ে উঠল। রাজাও আবার তাকে নামিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে পথ চলা শুরু করলেন।

বেতালও আবার একাদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

একাদশ কাহিনী

পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ ও দানশীল। প্রজারা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত। তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল সত্যপ্রকাশ।

রাজা একদিন মন্ত্রী সত্যপ্রকাশকে ডেকে বললেন, সারাজীবন শুধু যদি পরের জন্যই খেটে মরি তা হলে রাজা হয়ে লাভ কি? তাই ঠিক করেছি এবার থেকে ভোগসুখে দিন কাটাব। আমোদ আহ্লাদ করব। এখন থেকে রাজকার্য তুমিই দেখাশোনা করবে।

মন্ত্রী তাতে বাধ্য হয়ে রাজী হলেও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাজার সব কাজ মন্ত্রীর পক্ষে করা সম্ভব নয়।

তবু বাধ্য হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করে যেতে লাগলেন মন্ত্রী।

অবসর সময়ে এই সব কথা প্রায়ই ভাবতেন মন্ত্রী। একদিন মন্ত্রীর স্ত্রী লক্ষ্মী এসে স্বামীকে চিন্তান্বিত দেখে বলল, সব সময় এত কি ভাব বলত তুমি।

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ বললেন, রাজার সব কাজ চালাতে আমি আর পেরে উঠছি না। এদিকে রাজা আমার উপর সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমোদ-প্রমোদ করে দিন কাটাচ্ছেন।

মন্ত্রীপত্নী বলল, রাজকার্য অনেক চালিয়েছ। এখন সব ছেড়ে চল, কিছুদিন তীর্থ ঘুরে আসি।

স্ত্রীর কথা এড়াতে না পেরে রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ

করতে চলে গেলেন মন্ত্রী। অনেক তীর্থ ঘুরে শেষে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গেলেন। এখানে রামচন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সেই মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বেরিয়ে এসে সমুদ্রের দিকে তাকাতেই অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলেন সত্যপ্রকাশ। দেখলেন সমুদ্রের জল থেকে বিরাট এক সোনার গাছ উঠে এল আর সেই গাছের মাথায় পরমা-সুন্দরী এক মেয়ে বীণা বাজাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাছটি আবার জলের মধ্যে তলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

এই দৃশ্য দেখে আর দেরি না করে দেশে ফিরে এলেন সত্যপ্রকাশ। এসেই রাজার সঙ্গে দেখা করে সেই অদ্ভুত দৃশ্যের কথা বললেন।

মন্ত্রীর সব কথা বিশ্বাস করতেন রাজা। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দৃশ্য নিজের চোখে দেখার জন্য মন্ত্রীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে রামেশ্বরের পথে রওনা হয়ে পড়লেন।

মন্দিরে মহাদেবের পূজো দিয়ে বাইরে এসে রাজা সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন। সমুদ্রের জলের উপর যেখানে সোনার গাছটি দাঁড়িয়ে ছিল রাজা তাড়াতাড়ি নৌকোয় করে সেখানে চলে গেলেন। তারপর উঠে পড়লেন গাছটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে গাছটি তাঁকে নিয়ে সমুদ্রের তলায় পাতালে চলে গেল।

পাতালপ্রদেশে গিয়ে সেই সুন্দরী কন্যা রাজাকে বলল, তোমার বীরত্ব ও সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু কে তুমি? কেনই বা এখানে এসেছ?

রাজা বললেন, আমি পুণ্যপুরের রাজা। আমার নাম বল্লভ। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে এখানে এসেছি। আমি তোমাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে চাই।

কন্যা বলল, আমি তোমার স্ত্রী হতে পারি। কিন্তু একটি শর্তে। কৃষ্ণা-চতুর্দশীর দিন তুমি আমার সংস্পর্শে আসতে পারবে না।

রাজা কন্যার এই শর্তে সম্মত হলে গন্ধর্বমতে তাঁদের বিয়ে হলো। দুজনে সেই পাতালে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন রাণী রাজাকে সেই শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তারপর তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল রাজাকে।

রাজাও এই কথা মেনে নিয়ে সরে গেলেন। কিন্তু রাণী কেন তাকে দূরে সরিয়ে দিল এবং কি করবে তা দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে অন্ধকারে একটি মুক্ত তরবারি হাতে একটু দূরে লুকিয়ে রইলেন রাজা। রাণী কি করে তা দেখতে চাইলেন।

রাজা দেখলেন রাত্রি গভীর হলে রাণীর ঘরে একটি রাক্ষস এসে রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করল। রাজা তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তরবারি হাতে সেই রাক্ষসের সামনে এসে বললেন, ওরে দুরাচার রাক্ষস, তোর স্পর্ধা ত কম নয়। তুই আমার রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করছিস ?

এই বলে তরবারির আঘাতে রাক্ষসের মাথা কেটে ফেলল রাজা।

তা দেখে আনন্দে রাণীর চোখ জলে ভরে উঠল। রাণী বলল, তুমি আমায় এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসটার কবল থেকে বাঁচিয়েছ। এই রাক্ষসটা প্রতি কৃষ্ণাচতুর্দশীতে আসত আমার কাছে। তার ভয়ে জীবন্মৃত হয়ে ছিলাম আমি। অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত আমায়।

রাজা রাণীর প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলেন। বললেন, কেন তুমি এই যন্ত্রণা ভোগ করে আসছ ?

রাণী তখন তার দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল, আমি গন্ধর্বরাজ বিদ্যাধরের কন্যা। নাম রত্নমঞ্জরী। বাবা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমি ছিলাম তাঁর অতি আদরের মেয়ে। বাবার খাবার সময় আমি কাছে না বসলে তাঁর খাওয়াই হত না। একদিন বাবার খাবার সময় আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়েছিলাম। বাবার খাবার সময়ের কথা আমার মনেই ছিল না। আমি ফিরে এসে দেখলাম আমার জন্য অপেক্ষা করে করে ক্ষুধায় কাতর হয়ে উঠেছেন বাবা। বাবা তখন রেগে গিয়ে আমাকে শাপ দিলেন, তোকে পাতালে গিয়ে বাস করতে হবে আর প্রতি কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন এক রাক্ষস এসে তোকে নানাভাবে যন্ত্রণা দেবে।

আমি তখন বাবার পায়ে মাথা ঠুকতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমার সামান্য একটা ভুলের জন্য এত বড় শাস্তি দিলে তুমি। তবে বলে দাও, কিভাবে এবং কখন শাপমুক্ত হব আমি ?

বাবাও তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন তাঁর স্নেহের কন্যাকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ে ফেলেছেন তিনি। তিনি বললেন, মর্ত্যের এক বীর রাজা যেদিন ঐ রাক্ষসকে বধ করবে সেইদিন শাপমুক্ত হবে তুমি।

আমি তাই রোজ একবার করে পাতাল থেকে সমুদ্রের জলের উপর উঠে তাকাতাম চারিদিক। অবশেষে একদিন দেখা হয় তোমার সঙ্গে। আজ এতদিনে শাপমুক্ত হলাম আমি। এখন তোমার অনুমতি পেলে বাবার কাছে ফিরে যাই।

রাজা বললেন, তুমি যদি আমাকে ভালবেসে থাক তাহলে আগে

আমার সঙ্গে আমার রাজধানীতে চল। পরে তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাবে।

রাণী রত্নমঞ্জরী সম্মত হলে রাজা তাকে পরদিনই তাঁর রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে কিছুদিন আমোদ আহ্লাদে কাটাবার পর রাজা তাকে তাঁর বাবার কাছে যাবার অনুমতি দিলেন।

কিন্তু রত্নমঞ্জরী বলল, আমি দীর্ঘদিন মানুষের সঙ্গে বাস করে মানুষ হয়ে গিয়েছি। আমি আর গন্ধর্ব নেই। আমি এই অবস্থায় বাবার কাছে ফিরে গেলে বাবা হয়ত আমায় আর আগের মত ভালবাসতে পারবেন না। কারণ তিনি গন্ধর্বদের রাজা। সেটা আরো দুঃখজনক হবে আমার পক্ষে। আমার ইচ্ছা আমি এখানেই থেকে যাই।

রাণীকে ছেড়ে দিতে রাজারও মন চাইছিল না। তাই তিনি রাণীর কথা শুনে খুশি হলেন।

রাজা তখন মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের হাতে রাজ্যভার দিয়ে আবার আমোদ প্রমোদে দিন কাটাতে লাগলেন।

আবার রাজকার্যের চাপে বিব্রত হয়ে মনের দুঃখে মারা গেলেন মন্ত্রী।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বলত মহারাজ, মন্ত্রী কেন মারা গেল?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, মন্ত্রী ভাবল, রাজা রাজকার্য ত্যাগ করে ভোগ-সুখে মত্ত হয়ে উঠলে প্রজারা অনাথ হয়ে উঠবে। রাজ্যে অঘটন কোন কিছু ঘটলে দোষ পড়বে মন্ত্রীর উপর। এই দুঃখে মারা গেল মন্ত্রী।

সঠিক উত্তর পেয়ে গাছে গিয়ে ঝুলে রইল বেতাল। রাজা আবার তাকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতালও আবার দ্বাদশ কাহিনী শুরু করল।

দ্বাদশ কাহিনী

সেকালে চূড়াপুর নগরে দেবস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি রূপে গুণে ছিলেন যেমন অতুলনীয় তেমনি তাঁর ধনসম্পদও ছিল প্রচুর। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লাবণ্যবতী। লাবণ্যবতীও ছিল যেমন রূপবতী তেমনি গুণশীলা। সব দিক দিয়েই সে ছিল স্বামীর উপযুক্ত।

স্ত্রীকে নিয়ে সুখেশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন দেবস্বামী।

সেদিন ছিল গ্রীষ্মকালের এক রাত। তাই ঘরের মধ্যে গরমে শুতে না পেরে ছাদের উপর বিছানা পেতে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন দেবস্বামী।

এমন সময় এক গন্ধর্ব রথে করে সেই ছাদের উপর দিয়ে আকাশপথে কোথায় যাচ্ছিল। লাবণ্যবতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গন্ধর্ব তাকে তার রথে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে দেবস্বামীর সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলেন তার পাশে তার স্ত্রী নেই। তিনি তখন উঠে বাড়িময় খুঁজতে লাগলেন তার স্ত্রীকে। বাড়ির আশেপাশে কোথাও স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে রাতটা কোনরকমে কাটালেন দেবস্বামী।

পরদিন সকালেও চারদিকে খোঁজাখুঁজি করলেন দেবস্বামী। স্ত্রীকে অকস্মাৎ হারিয়ে বাড়িতে কিছুতেই মন টিকল না দেবস্বামীর। তিনি মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী রূপী দেবস্বামী। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর। আমাকে জল ও আহার দান করে আমার প্রাণ বাঁচান।

ব্রাহ্মণ তখন তাড়াতাড়ি করে একবাটি দুধ এনে খেতে দিলেন দেবস্বামীকে।

এদিকে দৈবক্রমে কিছুক্ষণ আগে এক বিষধর সাপ সেই দুধে মুখ দেওয়ায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে সে দুধ।

তাই দেবস্বামী সে দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে উঠলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, আমি ত আপনার কোন ক্ষতি করিনি। তবে কেন দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে আমাকে মারলেন ?

এই বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখনি মারা গেলেন দেবস্বামী।

সাপে মুখ দিয়েছে সেই দুধে একথা ব্রাহ্মণ বা তার স্ত্রী কেউ জানত না। ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে তার স্ত্রীকে গালাগালি করতে লাগল। ব্রাহ্মণীর কোন দোষ না থাকলেও তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল ব্রাহ্মণ।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বল মহারাজ! এদের মধ্যে কে দোষী ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, দুধে মুখ দিয়ে সাপ তার স্বভাব অনুসারেই কাজ করেছে। সুতরাং তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী দুধ বিষাক্ত একথা না জেনেই তা অতিথিকে খেতে দেন। সুতরাং তাদেরও দায়ী করা যায় না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর অতিথিরও সে দুধ না খেয়ে উপায় ছিল

না। কিন্তু ব্রাহ্মণ সব কিছু না জেনে ক্রোধ আর অনুমানের বশবর্তী হয়ে নির্দোষ স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ থেকে নেমে সেই গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। রাজা আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতালও এবার তার ত্রয়োদশ কাহিনী শুরু করল।

ত্রয়োদশ কাহিনী

হৃদয়পুর নগরে রণধীর নামে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন সৎ তেমনি সদাশয় ও হৃদয়বান। কোমলতা আর কঠোরতা দুই-ই ছিল তাঁর স্বভাবের মধ্যে। তাঁর সুশাসনে সুখে শান্তিতে বাস করত রাজ্যের প্রজারা।

একবার নগরে চোরের উপদ্রব দেখা দিল। প্রতিদিনই রাত্রিবেলায় নগরমধ্যে বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়িতে চুরি হতে লাগল।

প্রজারা তখন একযোগে রাজার কাছে গিয়ে তাদের দুঃখের কথা জানাল।

রাজা বললেন, এবার থেকে আর যাতে চুরি না হয় তার ব্যবস্থা করছি আমি। তোমরা যাও।

রাজা প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। রাত্রিবেলায় নগরের বিভিন্ন জায়গায় নিযুক্ত করা হলো প্রহরীদের যাতে কোন পথে চোর প্রবেশ করতে না পারে নগরমধ্যে। এরপর রাজা ঘোষণা করলেন, কোন চোর চুরি করে পালিয়ে গেলে সেই অঞ্চলে নিযুক্ত প্রহরীর প্রাণদণ্ড হবে।

প্রহরীরা ভয়ে সতর্ক হয়ে পাহারা দিতে লাগল।

কিন্তু চুরি কমল না এতকিছু সত্ত্বেও। বরং আগের চেয়ে আরো বেড়ে গেল। তখন প্রজারা আবার রাজার কাছে এসে প্রতিকার প্রার্থনা করল।

রাজা তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, প্রহরার ব্যবস্থা আরো কঠোর করা হবে।

রাজা এবার ঠিক করলেন, এত প্রহরী থাকা সত্ত্বেও কেন এত চুরি হচ্ছে তা তিনি নিজে সারারাত নগরমধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে দেখবেন।

রাত্রি গভীর হতে একা বেরিয়ে পড়লেন রাজা। পথে একজন অপরিচিত লোককে দেখে রাজা বললেন, কে তুমি? এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?

লোকটি বলল, এত রাতে যখন বার হয়েছি তখন বুঝতেই পারছ আমি কে। আমি চোর। চুরি করাই আমার কাজ। কিন্তু তুমি কে?

রাজা বললেন, আমিও তোমার মতই এক চোর।

চোর খুশি হয়ে বলল, তাহলে চল, একসঙ্গে চুরি করতে যাই। যাক, একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

রাজাও রাজী হয়ে গেলেন চোরের কথায়।

সেরাতে নগরে এক ধনীর বাড়িতে চুরি করে অনেক ধনরত্ন পেল চোর।

তারপর চোর রাজাকে সঙ্গে করে নগরবাইরে গিয়ে এক সুড়ঙ্গপথে ঢুকে পড়ল। রাজাকে নিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে পাতালে চলে গেল চোর। তারপর সে তার বাড়ির বাইরে রাজাকে দাঁড়াতে বলে নিজে চলে গেল বাড়ির ভিতরে।

ঠিক এই সময় এক দাসী এসে রাজার সঙ্গে কথা বলে রাজার পরিচয় জানতে পেরে বলল, এই চোর এক দুর্ধর্ষ দস্যু। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও ত এখনি পালিয়ে যাও এখান থেকে।

রাজা বললেন, আমি ত এখান থেকে বার হবার পথ জানি না। তুমি আমাকে দয়া করে পথটা দেখিয়ে দাও।

দাসী রাজাকে পথ দেখিয়ে দিলে তখনি তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেলেন রাজা।

পরদিন তিনি অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধের সাজে পাতালে গিয়ে সেই চোরের বাড়িটি আক্রমণ করলেন।

এক রাক্ষস সেই পাতালনগরের রক্ষাকর্তা ছিল। চোর অনেক ধনরত্ন চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাঁর কিছু কিছু রাক্ষসকে দিত।

চোর রাজার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সেই রাক্ষসের কাছে গিয়ে বলল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে এসে আমার বাড়ি আক্রমণ করেছে। তুমি আমাকে যদি রক্ষা না করো তাহলে আমাকে পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

এই বলে রাক্ষসকে কিছু উপহার দিল চোর।

রাক্ষস বলল, তোমার কোন ভয় নেই। আমি রাজার সৈন্যদের সব খেয়ে ফেলব।

এই বলে রাক্ষস রাজার সৈন্যদের সামনে তাদের ধরে ধরে খেতে লাগল। ভয়ে পালাতে লাগল রাজার সৈন্যরা।

রাজাও অবশেষে পালাতে লাগলেন। তখন সেই চোর সাহস পেয়ে রাজার

পিছু পিছু ধাওয়া করল। পিছন থেকে রাজাকে ডেকে বলল, তুমি ক্ষত্রিয় ও রাজা হয়ে যুদ্ধ না করে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাচ্ছ! তোমার নরকবাস হবে।

এই বিদ্রূপবাণ সহ্য করতে না পেরে রাজা ঘুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেন চোরের সঙ্গে। সে যুদ্ধে পরাজিত হলো চোর। রাজা কিন্তু তাকে প্রাণে না মেরে বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

বিচারে প্রাণদণ্ড হলো চোরের। তাকে শূলেতে চড়াবার আদেশ দিলেন রাজা। শূলে চড়াবার আগে তাকে গাধার পিঠে চাপিয়ে ঘোরানো হলো।

সেই নগরে ধর্মধ্বজ নামে এক বণিক ছিল। তার একমাত্র কন্যা শোভনা বাড়ি থেকে চোরকে দেখে তাকে ভালবেসে ফেলল। সে তার বাবাকে বলল, যেমন করে হোক রাজাকে বলে চোরকে মুক্ত করে ওর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো।

বণিক তার মেয়েকে বলল, এই চোরকে ধরার জন্য অনেক সৈন্য সামন্ত ক্ষয় হয়েছে। রাজার প্রাণ অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। সুতরাং রাজা তাকে ছাড়বেন না।

শোভনা বলল, রাজাকে বল, তোমার সব সম্পত্তির বিনিময়ে তিনি তাকে ছেড়ে দিন।

বণিক ধর্মধ্বজ রাজাকে গিয়ে এই কথা বলল।

কিন্তু রাজা বললেন, এই চোর আমার ও আমার প্রজাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আমার প্রাণ নেবার চেষ্টা করেছে। একে কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

বণিক বিফল হয়ে ফিরে গিয়ে তার কন্যা শোভনাকে বলল একথা। শোভনা কাঁদতে লাগল দুঃখে।

এদিকে বধ্যভূমিতে যথাসময়ে চোরকে এনে শূলের কাছে দাঁড় করানো হলো। শোভনার কথা সে শুনেছিল। নগরের সবাই জানত একথা। চোর একথা শুনে প্রথমে হাসল। তারপর সে কাঁদল। এরপর তাকে শূলে চড়ানো হলো।

মৃতদেহকে চিতায় চাপানো হলো দাহ করার জন্য। শোভনাও চোরের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার জন্য সেখানে এসে চিতায় উঠল।

শ্মশানের পাশেই ছিল কাত্যায়নী দেবীর মন্দির। শোভনার ভালবাসায়

নিষ্ঠা দেখে দেবী সেই শ্মশানে আবির্ভূত হয়ে চিতা জ্বালানোর আগেই শোভনাকে বললেন, আমি তোমার নিষ্ঠা ও সততায় তুষ্ট হয়েছি। বল, কি বর চাও।

শোভনা চোরের মৃতদেহ দেখিয়ে বলল, হে দেবী, যদি আমায় কৃপা করো তাহলে এই দেহে প্রাণসঞ্চার করো।

'তথাস্তু' বলে চোরকে প্রাণদান করলেন দেবী।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, আচ্ছা মহারাজ! চোর প্রথমে কেন হেসে-ছিল এবং পরে কেন কেঁদেছিল?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, চোরটি প্রথমে হেসেছিল এই কারণে যে আমি যখন মরতে চলেছি মেয়েটি তখন আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। পরে সে কেঁদেছিল কারণ মেয়েটি তাকে যথাসর্বস্ব দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে এমনই হতভাগ্য যে তাকে কিছুই দিতে পারল না।

সঠিক উত্তর পেয়ে রাজার কাঁধ থেকে সোজা গাছে গিয়ে উঠল বেতাল। রাজাও তাকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার চতুর্দশ গল্প শুরু করল।

চতুর্দশ কাহিনী

কুসুমবতী নগরে সুবিচার নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজার চন্দ্রপ্রভা নামে এক কন্যা ছিল।

একদিন রাজধানীর কাছে এক উপকূলে মনস্বী নামে এক রূপবান ব্রাহ্মণকুমার পথে ক্লান্ত হয়ে সেই উপবনে এক গাছের শীতল ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা তার সখীদের সঙ্গে সেই উপবনে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

রাজকন্যা ও তার সখীদের পায়ের শব্দে মনস্বীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল মনস্বী। এমন রূপসী মেয়ে জীবনে কখনো দেখেনি সে।

রাজকন্যাও মনস্বীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মনে হলো এমন রূপবান যুবক সে দেখেনি কখনো। সখীরা রাজকন্যার মনের কথা বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে তখনি ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে।

ব্রাহ্মণযুবক মনস্বী রাজকন্যার বিরহে তখনি মূর্ছিত হয়ে পড়ল সেইখানে।

এমন সময় শশী ও ভূদেব নামে দুই পথিক পাশের পথ দিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে সেই উপবনে এসে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল। সহসা মূর্চ্ছিত মনস্বীকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল তারা।

ভূদেব তার সঙ্গী শশীকে বলল, এই যুবকটি অচেতন হয়ে পড়ে আছে কেন?

শশী বলল, কোন কারণে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

তখন দুজনে মনস্বীর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান ফিরে এল মনস্বীর। এবার পথিক দুজন তাকে তার মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করল।

মনস্বী বলল, তোমরা আমার দুঃখ দূর করতে পারবে না। আমার কথা শুনে উপহাস করবে শুধু।

ভূদেব বলল, আমাকে সব কথা খুলে বল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার দুঃখের প্রতিকার করব।

মনস্বী তখন রাজকন্যার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা সব বলল। বলল, তার রূপলাবণ্যে আমি এমনই মুগ্ধ হয়েছি যে তাকে না পেলে আমি বাঁচব না।

ভূদেব তখন তাকে বলল, আমার সঙ্গে চল। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

এই বলে মনস্বীকেও তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে মনস্বীকে একাক্ষর একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিল ভূদেব। তারপর বলল, এই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তুমি এক যুবতীতে পরিণত হবে এবং ইচ্ছা করলে তোমার বয়স ষোল বছর হয়ে যাবে।

তখন মনস্বী সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে ষোল বছরের এক তরুণী যুবতীতে পরিণত হলো। ভূদেব হলো আশী বছরের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

এরপর ভূদেব মনস্বীকে নিয়ে তার পুত্রবধূর বেশে সাজিয়ে রাজা সুবিচারের কাছে চলে গেল তখনি।

রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে ভক্তিভরে বসতে আসন দিলেন। ভূদেবও রাজাকে আশীর্বাদ করে বসল।

রাজা তখন তাদের পরিচয় ও বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করলে ভূদেব বলল, মহারাজ! এ আমার পুত্রবধূ। তাকে তার বাপের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে এসে দেখি আমাদের গ্রামে ওলাওঠা মহামারী চলছে। আমার স্ত্রী ও পুত্র গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। আমার এই পুত্রবধূকে

আপনার কাছে রেখে আমি দেশে দেশে তাদের খুঁজতে চাই। আপনি আমাদের দেশের রাজা। আপনার মত বিশ্বস্ত আর কে আছে। তাই আপনার আশ্রয়ে আমার পুত্রবধূকে রেখে যেতে চাই। তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে কন্যার মত রাখুন দয়া করে।

রাজা ভাবলেন পরের মেয়েকে ঘরে রাখা উচিত না হলেও রাখতে না চাইলে মনে কষ্ট পাবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণের কথায় রাজী হয়ে রাজা বললেন ঠিক আছে তাই হোক। রাজা হিসাবে এ কর্তব্য পালন করা আমার উচিত।

ভূদেব রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলে রাজা ব্রাহ্মণবধূ বেশী মনস্বীকে নিয়ে রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভার সখী নিযুক্ত করে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।

রাজকন্যাও তাকে পেয়ে খুশি হলো নতুন সখীকে খুবই ভালবাসতে লাগল চন্দ্রপ্রভা। দুজনের মধ্যে ভালবাসাবাসির এক সম্পর্ক গড়ে উঠল।

একদিন বধূরূপী মনস্বী রাজকন্যাকে বলল, তুমি সব সময় কি চিন্তা কর বলত। তোমার শরীর রোগা হয়ে যাচ্ছে।

রাজকন্যা তখন তার মনের কথা খুলে বলল। বলল, সেই ব্রাহ্মণ যুবককে দেখার পর হতে আমার মনের অবস্থা এমনি হয়েছে। অথচ তার কোন ঠিকানা জানি না।

মনস্বী বলল, আমি যদি সেই যুবকের সঙ্গে তোমার মিলন ঘটিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাকে কি দেবে বল।

রাজকন্যা বলল, এটা অসম্ভব ব্যাপার। তবু যদি তুমি তা করতে পার তাহলে আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।

মনস্বী তখন সেই মন্ত্রবলে আবার একজন যুবকে পরিণত হলো। রাজকন্যা বিস্মিত হয়ে কিভাবে কি হলো তা জানতে চাইল।

মনস্বীও প্রথম থেকে সব কথা খুলে বলল। সঙ্গে সঙ্গে গন্ধর্ব মতে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

কিছুকালের মধ্যে রাজকন্যা সন্তানসম্ভবা হলো।

একদিন মন্ত্রীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। রাজকন্যা তার সঙ্গে ব্রাহ্মণবধূরূপী মনস্বীকেও নিয়ে গেল সেখানে। রাজকন্যার সখী ব্রাহ্মণবধূকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল মন্ত্রীপুত্র।

সে তার বন্ধুকে বলল, আমি ঐ কন্যাকে স্ত্রীরূপে না পেলে প্রাণত্যাগ করব।

মন্ত্রীপুত্রের বন্ধু একথা মন্ত্রীকে জানাল এবং মন্ত্রী রাজাকে জানাল। বলল, আপনি যেমন করে হোক ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করুন। তা না হলে আমার ছেলের প্রাণ যাবে।

রাজা বললেন, এই কন্যা একজনের বিবাহিত পত্নী। এক ব্রাহ্মণ তাকে আমার আশ্রমে রেখে গেছেন। তার বিনা অনুমতিতে কিছুই করতে পারব না আমি।

মন্ত্রীও নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এসে তার পুত্রের মত আহার নিদ্রা ত্যাগ করল। তার কাজকর্ম সব ছেড়ে বাড়িতেই দিনরাত কাটাতে লাগল।

মন্ত্রীর অভাবে কাজকর্মের ক্ষতি হতে লাগল। রাজার কর্মচারিরা রাজাকে বলল, এর একটা বিহিত করুন মহারাজ। মন্ত্রীপুত্র মারা গেলে মন্ত্রীও মারা যাবে। তাঁর মত বিচক্ষণ মন্ত্রী পাওয়া যাবে না।

রাজা একদিন ব্রাহ্মণবধূবেশী মনস্বীর কাছে গিয়ে তাকে সব কথা জানালেন।

মনস্বী বলল, আমি বিবাহিতা নারী, আপনার আশ্রিত। আপনি সুবিচারক হয়ে এই অন্যায় প্রস্তাব কি করে করলেন ?

রাজা তা শুনে লজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন।

এদিকে মনস্বী ভূদেব ভাবল এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। এক অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে। সে তাই একদিন মন্ত্রবলে পুরুষবেশ ধারণ করে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেল।

একথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন রাজা। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে তার পুত্রবধূকে ফিরে চাইলে তিনি তাকে কি বলবেন তা খুঁজে পেলেন না।

এদিকে মনস্বী সোজা চলে গেল ভূদেবের বাড়িতে। ভূদেব সব শুনে তার বন্ধু শশীকে ডেকে তাকে এক যুবক সাজিয়ে নিজে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করল।

ব্রাহ্মণযুবকবেশী শশীকে নিয়ে ভূদেব সোজা রাজার কাছে চলে গেল। রাজাকে বলল, আমি আমার পুত্রকে পেয়েছি। এবার পুত্রবধূকে নিয়ে যেতে চাই।

রাজা তখন ভূদেবকে যা যা ঘটেছে তা সব বললেন। কিন্তু তা শুনে রেগে গেল ভূদেব। রাজাকে বলল, রাজা হয়ে আমার সঙ্গে এইভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা করা কি উচিত কাজ হয়েছে আপনার ?

রাজা বললেন, যে ক্ষতি আমি আপনার করেছি যে কোন মূল্যে তা পূরণ করতে চাই।

ব্রাহ্মণবেশী ভূদেব বলল, তাহলে আমার পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিয়ে দিন। একমাত্র তাহলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করা হবে।

রাজা অন্য কোন উপায় না দেখে রাজী হয়ে গেলেন। শুভ দিনে শশীর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিলেন।

শশী রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ভূদেবের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়ে উঠল। তখন মনস্বী এবং শশী দুজনেই রাজকন্যাকে স্ত্রী হিসাবে দাবি করতে লাগল।

মনস্বী বলল, এই রাজকন্যাকে আমি অনেক আগেই গন্ধর্বমতে বিয়ে করেছি।

শশী বলল, রাজা সকলের সামনে রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন। রাজকন্যা আমার স্ত্রী।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল মহারাজ! বলত, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কার স্ত্রী হওয়া উচিত রাজকন্যার?

বিক্রমাদিত্য বললেন, মনস্বীর।

বেতাল বলল, শাস্ত্র মতে কন্যার দান, বিক্রয় ও পরিত্যাগে পিতার অধিকার আছে। রাজা সকলের সামনে শশীকে কন্যাদান করেছেন। তবু মনস্বী কোন যুক্তিতে দাবি করতে পারে তাকে?

রাজা বললেন, মনস্বী আগেই তাকে বিয়ে করেছে এবং তার ঔরসজাত সন্তান রাজকন্যার গর্ভে আছে। সুতরাং রাজকন্যা মনস্বীর স্ত্রী হলে তার সতীত্ব ও ধর্ম দুইই রক্ষা হয়।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। রাজাও তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

বেতালও এবার পঞ্চদশ কাহিনী শুরু করল।

পঞ্চদশ কাহিনী

সেকালে হিমালয়ের পাদদেশে পুষ্পশের নামে এক নগরে জীমূতকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন গন্ধর্বদের রাজা।

রাজা জীমূতকেতুর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় দীর্ঘকাল ধরে কল্পবৃক্ষের আরাধনা করতে থাকেন।

অবশেষে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজা ছেলের নাম রাখলেন জীমূতবাহন। ছোটবেলা থেকে পড়াশুনোয় ভাল ছিল জীমূত-বাহন। অল্পদিনের মধ্যেই সকল শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে সে।

আর একবার কল্পবৃক্ষের আরাধনা করেন রাজা জীমূতকেতু। এবার তিনি নিজের জন্য কিছু না চেয়ে শুধু প্রজাদের সুখসম্পদ কামনা করলেন কল্পবৃক্ষের কাছে। তাঁর মত প্রজারাও প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে উঠল। ঐশ্বর্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার এল তাদের মনে। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা রাজাকেও মানতে চাইল না। ফলে অরাজকতা দেখা দিল সারা রাজ্যে।

তখন রাজার অমাত্য ও জ্ঞাতিরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলাবলি করতে লাগল, রাজা ও রাজপুত্র সব সময় ধর্মকর্ম নিয়ে থাকায় রাজকার্য পরিচালনায় ঠিকমত মন দেন না। এতে রাজ্যের ক্ষতি হচ্ছে। যুবরাজও রাজাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে অন্য কোন উপযুক্ত লোককে রাজা করতে হবে।

তারা প্রজাদের বোঝাতে লাগল এই কথা। ফলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে একদিন রাজপ্রসাদ ঘেরাও করল।

জীমূতবাহন রাজাকে বলল, মহারাজ! আমাদের জ্ঞাতিরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। আপনি আদেশ দিলে এদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করে বিদ্রোহ দমন করি।

রাজা বললেন, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই রাজ্য ও ঐশ্বর্যও ক্ষণস্থায়ী। এই সব কিছুর জন্য যুদ্ধ ও নরহত্যা করে কি লাভ? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করেও শেষে অনুতাপ করতে হয়েছিল ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে। তার থেকে চল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ের কোন এক নির্জন স্থানে কুটির নির্মাণ করে তপস্যা করি। তাতে অনেক শান্তি পাওয়া যাবে মনে।

এই বলে সেই মুহূর্তে প্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ের এক নির্জন স্থানে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন তাঁরা।

সেখানে একদিন রাজকুমার জীমূতবাহনের সঙ্গে এক ঋষিকুমারের বন্ধুত্ব হয়। একদিন দুই বন্ধুতে মিলে বেড়াতে বেড়াতে কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরের কাছে যেতেই দেখল মন্দিরের ভিতর থেকে বীণা বাজানোর শব্দ আসছে।

তখন কৌতূহলী হয়ে তারা দুজনে মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়ল। ঢুকেই

দেখল এক পরমাসুন্দরী কন্যা বীণা বাজিয়ে দেবী কাত্যায়নীর স্তবগান করছে। তারা দাঁড়িয়ে তা শুনতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর গান শেষ করে সেই কন্যা জীমূতবাহনের দিকে মুখ তুলে তাকাল। তাকে ভাল লেগে গেল তার। মনে মনে সে জীমূতবাহনকে স্বামী-রূপে বরণ করে নিল। তারপর সখীদের দিয়ে তার নাম ও পরিচয় জেনে নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

সেই কন্যার সখী বাড়ি গিয়ে তার মাকে সব কথা বলল। মা তার মেয়ের কথা স্বামীকে জানাল। কন্যার বাবার নাম ছিল মলয়কেতু।

রাজা মলয়কেতু সব শুনে তার ছেলে মিত্রাবসুকে ডেকে বলল, তোমার বোনের বিয়ের বয়স হয়েছে। উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে হবে। শুনলাম গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু তাঁর পুত্রকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে মলয়পর্বতে এসে বাস করছেন। আমি তাঁর পুত্র জীমূতবাহনের সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিতে চাই। তুমি রাজা জীমূতকেতুর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে কথা বল।

মিত্রাবসুর কাছ থেকে সব কথা শুনে রাজা জীমূতকেতু তাঁর পুত্র জীমূত-বাহনকে তখনি মিত্রাবসুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

মলয়কেতু এক শুভদিনে জীমূতবাহনের সঙ্গে কন্যা মলয়বতীর বিয়ে দিলেন।

কিছুকাল পর একদিন মিত্রাবসুর সঙ্গে মলয়পর্বতের উত্তর দিকে বেড়াচ্ছিল জীমূতবাহন। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা ঢিবি দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল সে। মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি?

মিত্রাবসু বলল, একসময় গরুড়ের সঙ্গে নাগদের যুদ্ধ হয়। নাগরা পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করে। তখন গরুড় তাদের বলে, আহারের জন্য প্রতিদিন তোমরা যদি একটি নাগকে উপহার দিতে পার তাহলে আমি অন্য কাউকে খাব না।

নাগরা গরুড়ের প্রস্তাবে সম্মত হলো। সেদিন থেকে রোজ ওইখানে একটি করে নাগ এসে উপস্থিত থাকে। গরুড় যথাসময়ে এসে সেই নাগকে আহার করে চলে যায়। দীর্ঘকাল ধরে নাগদের হাড় জমে জমে ঐ রকম এক ঢিবি হয়ে যায়।

একথা শুনে নাগদের জন্য মনে ব্যথা পেল জীমূতবাহন। সে তখন মিত্রাবসুকে বিদায় দিয়ে সেই ঢিবির কাছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

সে মনে মনে সংকল্প করল আজ কোন নাগ এলে আমি আমার জীবন দিয়ে তাকে উদ্ধার করব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বৃদ্ধা নাগী এসে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল। জীমূতবাহন তার কাছে গিয়ে বলল, তুমি কাঁদছ কেন মা ?

বৃদ্ধা নাগী বলল, আজ আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের পালা। গরুড় এসে তাকে খাবে। আমার আর কোন সন্তান সেই।

জীমূতবাহন বলল, আমি আমার প্রাণ দিয়ে তোমার পুত্রকে রক্ষা করব। তুমি কেঁদো না।

এমন সময় শঙ্খচূড় এসে মার কাছ থেকে সব কথা শুনল। শঙ্খচূড়ের মা জীমূতবাহনকে বলছিল, একজনের প্রাণের বিনিময়ে আমার ছেলের প্রাণ বাঁচাতে পারব না।

শঙ্খচূড় জীমূতবাহনকে বলল, আপনি ধর্মপ্রাণ ও দয়ালু। আমার মত সামান্য এক প্রাণীকে বাঁচাতে আপনার মত এত মহৎ প্রাণ নষ্ট হওয়া উচিত নয়। আপনি বেঁচে থাকলে অনেক প্রাণীর উপকার হবে।

জীমূতবাহন বলল, শোন শঙ্খচূড়, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, নিজের প্রাণ দিয়ে তোমার প্রাণ বাঁচাব। আমি ক্ষত্রিয় হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না।

এই বলে শঙ্খচূড়কে বিদায় দিয়ে গরুড়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে।

জীমূতবাহন কোন কথা শুনবে না দেখে শঙ্খচূড় দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে তার জীবন রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল।

এদিকে গরুড় যথাসময়ে এসে জীমূতবাহনকে পেয়েই তাকে ঠোঁটে করে নিয়ে আকাশে ঘুরতে লাগল চক্রাকারে। জীমূতবাহনের ডান হাতে একটি কেয়ূর ছিল। সেটাতে রক্ত লেগে গেল। সেই রক্তমাখা কেয়ুরটা উপর থেকে মলয়বতীর সামনে পড়ে গেল। সেই কেয়ূরে জীমূতবাহনের নাম লেখা ছিল।

তা দেখে রাজবাড়ির সকলেই কান্নাকাটি করতে লাগল। মলয়কেতু চারদিকে লোক পাঠাল জামাইএর খোঁজে।

এদিকে শঙ্খচূড় গরুড় যেখানে উড়ছিল তার নিচে দাঁড়িয়ে গরুড়ের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি যাঁকে খাবার জন্য ধরেছ তিনি ধর্মপ্রাণ জীমূতবাহন। তিনি তোমার নির্দিষ্ট আহার নন, আমিই তোমার নির্দিষ্ট আহার। তুমি আমাকে আহার করো।

গরুড় এতক্ষণে বুঝতে পারল সে যাকে ধরেছে সে কোন নাগ নয়, একজন গন্ধর্ব।

জীমূতবাহন তখন মৃতপ্রায়। গরুড় তাকে বলল, তুমি নিজের জীবন দিয়ে পরকে বাঁচাতে চাইছ কেন ?

জীমূতবাহন বলল, মরতে ত একদিন হবেই। দুদিন আগে মরে যদি কারো উপকার করা যায় তাহলে এ জীবন সার্থক হবে আমার।

এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে গরুড় বলল, সত্যিই তুমি ধর্মপ্রাণ ও হৃদয়বান। বল, কি বর চাও।

জীমূতবাহন বলল, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে বর দেন তাহলে বলুন আজ হতে আর কোন নাগকে ভক্ষণ করবেন না। আর যে সব নাগদের খেয়েছেন এই মুহূর্তে তাদের জীবন ফিরিয়ে দিন।

গরুড় তাতে সম্মত হয়ে তখনি অমৃত এনে সেই হাড়গুলোর ঢিবিতে খানিকটা ঢেলে দিতেই মৃত নাগরা বেঁচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

গরুড় তখন জীমূতবাহনকে বলল, শোন রাজকুমার, আমার কৃপায় তুমি তোমাদের রাজ্য ফিরে পাবে।

চারদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। মলয়কেতু তা শুনে খুশি হলো। জীমূতকেতুর রাজ্যের প্রজারা ভুল বুঝতে পেরে জীমূতকেতুর কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল। তাঁকে আবার রাজা করল।

এইখানেই গল্প শেষ করল বেতাল। তারপর রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, বলত মহারাজ ! জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড় এই দুজনের মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশী ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, শঙ্খচূড়ের।

বেতাল বলল, তা কি করে হয় ? যে ব্যক্তি পরের প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন দিতে গেল তার মহত্ত্ব বেশী হবে না ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, জীমূতবাহন জাতিতে ক্ষত্রিয়। প্রাণদান তাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। যে কোন ক্ষত্রিয়ই একাজ করতে পারত। কিন্তু শঙ্খচূড় জীমূতবাহনের প্রাণদানের প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হয়নি। পরে তাকে নিরস্ত করতে না পেরে সে দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে তার জীবনের জন্য প্রার্থনা করেছে। তারপর আবার নিজের প্রাণের বিনিময়ে জীমূতবাহনকে বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল গরুড়ের কাছে।

এবার সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে চলে গেল। রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার তার ষোড়শ গল্প বলতে লাগল।

ষোড়শ কাহিনী

চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে এক বণিক বাস করত। উন্মাদিনী নামে তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটির রূপলাবণ্য এত বেশী ছিল যে রত্নদত্ত মনে করত তার মেয়ে রাজরাণী হবার উপযুক্ত।

মেয়ের বিয়ের বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে রত্নদত্ত সেই দেশের রাজার কাছে চলে গেল। সে রাজাকে বলল, মহারাজ, আমার এক রূপসী মেয়ে আছে। আপনি তাকে একবার দেখে আসুন।

রাজা তা শুনে নিজে না গিয়ে কয়েকজন মন্ত্রীকে পাঠালেন।

মন্ত্রীরা মেয়েটিকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হলো। দেখল মেয়েটি সত্যিই রূপসী। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, মেয়েটির রূপ এত বেশী যে রাজা তাকে পেয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বেন একেবারে। তিনি আগের মত রাজকার্য না করে অন্তঃপুরে রাণীর কাছেই সব সময় কাটাবেন। তাতে রাজ্যের ক্ষতি হবে।

তাই মন্ত্রীরা একমত হয়ে রাজার কাছে ফিরে এসে জানাল, মেয়েটি সুন্দরী হলেও রাজরাণী হবার মত সুন্দরী নয়। তাছাড়া তার লক্ষণ ভাল নয়।

মন্ত্রীদের কথায় বিশ্বাস করে রাজা তার মেয়েকে বিয়ে করবেন না জবাব দিলেন রত্নদত্তকে। তখন রত্নদত্ত রাজার সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর উন্মাদিনী স্বামীর কাছে এসে সুখেশান্তিতে ঘরকন্না করতে লাগল। কিন্তু রাজা তাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান করে যে অপমান করেছেন তা সে ভুলতে পারছিল না কিছুতেই। তাই মনের মধ্যে প্রায়ই একটা জ্বালা অনুভব করত সে।

শীত গিয়ে বসন্তকাল এল। বসন্তোৎসবের দিন মহা ধুমধাম হয় নগরে। বসন্তোৎসবের দিন হাতির পিঠে চড়ে নগর পরিক্রমা করতে বার হলেন রাজা। একদল লোক দামামা বাজাতে বাজাতে তাঁর আগে আগে যেতে লাগল।

দামামার শব্দ শুনতে পেয়ে বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়াল উন্মাদিনী। নিজের অসাধারণ রূপলাবণ্য একবার রাজাকে শুধু দেখাতে চায় সে। রাজা নিজের চোখে দেখুক, অপরের কথায় কেন এমন মেয়েকে প্রত্যাখ্যান

করেছেন। এইভাবে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেই তাঁর উপর প্রতিশোধ নেওয়া সার্থক হবে উন্মাদিনীর।

উন্মাদিনীর বাড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল রাজার হাতিটি। বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা উন্মাদিনীর উপর চোখ পড়ল রাজার। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই এক মুগ্ধ বিস্ময়ে বিহ্বল ও হতবাক হয়ে গেলেন রাজা। দেখলেন রূপ নয়, যেন এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। মনে হলো এমন রূপসী মেয়ে জীবনে কোথাও কখনো দেখেননি তিনি এর আগে।

যে সব মন্ত্রীরা এই মেয়েকে বিয়ে করতে দেয়নি তাঁকে, যারা এই মেয়েকে কুলক্ষণা বলে বাতিল করে দেয় তাদের উপর প্রচণ্ডভাবে রেগে গেলেন রাজা। সেই সব মন্ত্রীদের নির্বাসনদণ্ড দান করলেন।

সেইদিন থেকে রাজা সব কাজকর্ম ও চিন্তা ত্যাগ করে দিনরাত শুধু উন্মাদিনীর রূপের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর কেবলি অনুশোচনা হতে লাগল নিজের দোষে পরের কথায় এক উজ্জ্বল নারীরত্নকে হারিয়েছেন তিনি।

এই সব ভাবতে ভাবতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল অন্তর। দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগল তাঁর দেহটা। দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু তাঁর মনের দুঃখের কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারলেন না তিনি লজ্জায়। মনের গোপন কথা গোপনেই রয়ে গেল।

অবশেষে রাজার কয়েকজন অন্তরঙ্গ এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কথায় কথায় রাজার কাছ থেকে তাঁর মনের কথা জেনে নিল।

বন্ধুরা সব কিছু জেনে রাজাকে পরামর্শ দিল, আপনি কেন বৃথা মন খারাপ করে নিজেকে ক্ষয় করছেন মহারাজ? যে মেয়েকে না পেয়ে আপনার এই অবস্থা হয়েছে সে মেয়ে ত আপনার হাতের কাছেই আছে। আপনারই অধীনস্থ কর্মচারি সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার।

কিন্তু ধর্মপ্রাণ রাজা বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি পরিষ্কার বললেন, আমি রাজা হয়ে এই অপকর্ম করতে পারব না। যে কাজের জন্য পরকে শাস্তি দিই সে কাজ কেমন করে করব আমি?

সব কিছু শুনে সেনাপতি বলভদ্র রাজার কাছে এসে তাঁর পা ধরে বলল, মহারাজ, আমি আমার স্ত্রীকে অকুণ্ঠচিত্তে দান করছি আপনাকে। আমার স্ত্রীকে আপনি আপনারই দাসী বলে মনে করবেন। তাতেও যদি আপনার আপত্তি থাকে তাহলে আমি কোন মন্দিরে গিয়ে শপথ করে আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করব। আপনি তারপর তাকে গ্রহণ করবেন।

কিন্তু রাজা কিছুতেই রাজী হলেন না সেনাপতির কথায়। তিনি শুধু বললেন, আমি রাজা হয়ে যদি অন্যায় ও অধর্ম করি তাহলে প্রজারা কখনই ন্যায়ও ধর্মপথে চলতে পারে না। তাহলে লোকে কি বলবে আমায় ? আমি যদি এই কাজ করি তাহলে ইহকালে সুখ পেলেও পরকালে দুঃখ পেতে হবে। তুমি যদি আমাকে শ্রদ্ধা করো, যদি আমার মঙ্গল চাও তাহলে এই অন্যায় ও অধর্ম করতে কেন প্ররোচিত করছ আমায় ? তুমিই বা কেন ধর্মপত্নীকে বিনা দোষে ত্যাগ করবে ? তা যদি করো তাহলে তোমাকেও শাস্তি দিতে হবে আমায়।

বিফল হয়ে চলে গেল সেনাপতি।

এরপর রাজ্যের প্রজারাও রাজার কাছে এসে সকলেই সেই একই অনুরোধ করল। সকলেই রাজাকে অনুরোধ করল, আপনি সেনাপতির স্ত্রীকেই আপনার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করুন।

কিন্তু এই অন্যায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন রাজা দৃঢ়তার সঙ্গে।

দিনে দিনে রাজার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল। রাজাকে সবাই ভালবাসত। সেনাপতি বলভদ্র রাজার শরীরের অবস্থা দেখে চিন্তা করতে লাগল।

অবশেষে একদিন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দিল বলভদ্র।

গল্প শেষ করে বেতাল বললল, বলত রাজা ! রাজা ও সেনাপতি দুজনের মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশী ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজার মহত্ত্বই বেশী।

বেতাল বলল, তা কেন হবে ? সেনাপতিই ত বেশী প্রশংসা পাবার যোগ্য। কারণ সে সুন্দরী নারীসঙ্গ উপভোগের স্বাদ জেনেও রাজার প্রতি ভক্তিবশতঃ স্ত্রীকে দান করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজা ত নারীসঙ্গ কেমন তা জানতেনই না।

রাজা বিক্রমাদিত্য হেসে বললেন, ভৃত্যরা নিজেদের প্রাণ দিয়েও প্রভুর প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য হয়। সেনাপতি যা করেছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু রাজারা সাধারণতঃ মত্ত হস্তীর মত শক্তির দ্বারা নিজেদের ভোগবাসনা মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এই রাজা সারা দেশের অধিপতি হয়েও অধর্ম করেননি। বরং তিনি ত্যাগের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন। অন্যায়ভাবে অধর্মের পথে নিজের বাসনাকে চরিতার্থ করতে চাননি। তাই রাজার মহত্ত্বই বেশী।

রাজার কাছে ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার তাঁর কাঁধ ছেড়ে গাছে চলে গেল। রাজাও তাকে নামিয়ে এনে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার সপ্তদশ কাহিনী শুরু করলেন।

সপ্তদশ কাহিনী

সেকালে হেমকূট নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। তার ছেলের নাম ছিল গুণাকর। বিষ্ণুশর্মা নিজে পরম ধার্মিক প্রকৃতির হলেও তার ছেলে গুণাকর ছিল অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির।

গুণাকর দ্যূতক্রীড়া বা পাশাখেলায় খুব বেশী আসক্ত ছিল। পাশাখেলার পণে হারতে হারতে তার সব সঞ্চয় ফুরিয়ে যায়। তখন সে চুরি করতে আরম্ভ করে। এজন্য ধর্মপ্রাণ বিষ্ণুশর্মা রাগে ও লজ্জায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় গুণাকরকে।

বাড়ি থেকে নিরাশ্রয় হয়ে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল গুণাকর। একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক শ্মশানে এসে দেখল একজন সন্ন্যাসী যোগসাধনা করছে।

সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তার পাশে দাঁড়াল গুণাকর।

সন্ন্যাসী তাকে দেখে বুঝল সে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। তাই সে একটি নরকপালে করে কিছু ভাত তরকারি এনে খেতে দিল।

কিন্তু গুণাকর তা খেল না।

সন্ন্যাসী তার মনের কথা বুঝতে পেরে যোগাসনে বসে চোখ বন্ধ করতেই এক যক্ষিণী এসে তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বলল, আদেশ করুন প্রভু।

সন্ন্যাসী বলল, এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ আমার আশ্রমে এসেছে। তার আহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করো।

যক্ষিণীর মায়াশক্তিবলে সেইখানে তখনি এক সুরমা প্রাসাদ দেখা দিল। যক্ষিণী গুণাকরকে সেই প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে অনেক রকম উপাদেয় খাদ্য দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে আহার করাল। রাতটা সেই প্রাসাদেই কাটাল গুণাকর।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল, সেই প্রাসাদের কোন চিহ্ন নেই। গুণাকর তখন সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সন্ন্যাসী বলল, যার যোগবিদ্যা জানা নেই যক্ষিণী তার ডাকে আসবে না।

গুণাকর তখন সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে বলল, প্রভু, আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই। আপনি আমায় যোগবিদ্যা শিখিয়ে দিন।

গুণাকরের ভক্তি ও আগ্রহ দেখে দয়া হলো সন্ন্যাসীর। সে তখন গুণাকরকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলল, চল্লিশ দিন দুপুর রাতে জলে গলা ডুবিয়ে একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র জপ করবে।

গুণাকর চল্লিশ দিন এইভাবে মন্ত্র জপ করার পর সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে এসে বলল, এবার কি করতে হবে বলুন।

সন্ন্যাসী বলল, আরো চল্লিশ দিন চারদিকে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে এই মন্ত্র জপ করতে হবে। তাহলে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

গুণাকর বলল, আমি অনেকদিন বাড়ি থেকে এসেছি। বাবা মাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। আগে বাবা মাকে দেখে আসি। তারপর আপনার কথামত কাজ করব।

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়ি চলে গিয়ে দেখা করল বাবা মার সঙ্গে। গুণাকর সব ঘটনার কথা বলল। তারপর সে বলল, দেখা করেই আবার চলে যাবে বাড়ি থেকে। সে তার যোগসাধনার কথাও বলল।

মা বলল, বাবা মার মনে দুঃখ দিয়ে যোগসাধনার কোন ফল পাবি না। ঘরে সংসারধর্ম পালন করলেই যোগসাধনার ফল পাবি। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাই হলো পরম ধর্ম।

গুণাকর বলল, এই অসার মায়াময় সংসারে আবদ্ধ থেকে আর আমি ভুল করব না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না।

এই বলে বাবা মাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল গুণাকর। সে ফিরে গেল সন্ন্যাসীর কাছে।

কিন্তু চারদিকে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে চল্লিশ দিন মন্ত্র জপ সত্ত্বেও কোন ফল হলো না। বাবা মাকে কাঁদিয়ে বাড়ি ছেড়ে এসে সাধনায় সিদ্ধ হতে পারল না সে।

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল বলল, মহারাজ বলত, এত কিছু করেও ব্রাহ্মণযুবক গুণাকর এত জপ তপ ও সাধনা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারল না কেন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, গুণাকরের যোগ সিদ্ধিলাভের বাসনা থাকলেও তার সাধনায় একাগ্রতা ছিল না। তা যদি থাকত তাহলে তার সাধনা শেষ না হতেই বাবা মাকে দেখার জন্য বাড়ি যেত না।

এই কথা শুনে বেতাল মনে মনে রাজার বুদ্ধির প্রশংসা করে আবার গাছে গিয়ে ঝুলে থাকল। রাজাও তাকে নামিয়ে এনে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার অষ্টাদশ কাহিনী বলতে শুরু করল।

অষ্টাদশ কাহিনী

কুবলয়পুর নামে এক গ্রামে ধনপতি নামে এক বণিক বাস করত। ধনবতী নামে তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। গৌরীদত্ত নামে এক বণিকপুত্রের সঙ্গে অল্প বয়সেই বিয়ে হয় ধনবতীর।

বিয়ের কয়েকবছর পর ধনবতীর একটি কন্যাসন্তান হয়। ধনবতী তার নাম রাখে মোহিনী। হঠাৎ ধনবতীর স্বামী গৌরীদত্ত অকালে মারা যান। তখন তার আত্মীয়েরা ধনবতীকে অসহায় দেখে তার বিষয় সম্পত্তি সব কেড়ে নেয়।

শেষকালে প্রাণহানির আশঙ্কা দেখে একদিন অন্ধকার অমাবস্যার রাতে স্বামীর ঘর ছেড়ে মেয়ের হাত ধরে বাপের বাড়ির পথে রওনা হয়ে পড়ে ধনবতী।

অন্ধকার রাতে পথ চলতে চলতে ভুল করে এক শ্মশানে গিয়ে ওঠে ধনবতী।

সেই শশ্মানে এক চোর রাজার দণ্ডাদেশে শূলের উপর বসে ছিল। রাজার আদেশে তাকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিন দিনেও তার মৃত্যু হয়নি। শূলের উপর বসে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছিল চোর। তার প্রাণ বার হচ্ছিল না কিছুতে।

অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে চোরের গায়ে ধাক্কা লাগল ধনবতীর। চোর তখন তাকে বলল, কে তুমি? আমার এই কষ্টের উপর তুমি আবার আমায় কষ্ট দিলে কেন?

ধনবতী বলল, আমি দেখতে পাইনি। জেনে শুনে কষ্ট দিইনি তোমায়। কিন্তু এই অন্ধকারে একা বসে এখানে কষ্ট ভোগ করছ কেন?

চোর বলল, আমি জাতিতে বণিক। কিন্তু চুরির অপরাধে রাজা আমাকে শূলদণ্ড দিয়েছেন। জন্মকালে এক জ্যোতিষ আমার হাত দেখে বলেছিল

অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে না। এখন বুঝতে পারছি আজ তিন দিন হলো শূলে বসে আছি, তবু মৃত্যু হচ্ছে না কেন আমার। অথচ এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না আর আমি। এখন একমাত্র তুমিই আমাকে এ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে পার। তুমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেই আমার মৃত্যু হবে। আমার যে ধনসম্পদ আছে আমি তা তোমায় দিয়ে যাব।

ধনবতীর কিছুটা আগ্রহ হলেও মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে ধনবতী বলল, তুমি ত এখনি মারা যাবে। তাহলে আমার মেয়ে ত কখনো ছেলের মুখ দেখতে পাবে না।

চোর বলল, আমি অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি তোমার মেয়ে বড় হলে কোন ব্রাহ্মণ পুত্রের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দেবে। তাহলে সে সন্তান লাভ করবে।

ধনবতী তখন সেই চোরের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিল।

চোর বলল, ঐ সামনের গ্রামেই আমার বাড়ি। বাড়ির পূর্বদিকে একটা কূয়োর কাছে একটা বটগাছের নীচে আমার সমস্ত ধনরত্ন মাটিতে পোঁতা আছে। সেগুলো নেবার ব্যবস্থা করো।

এই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই চোরের মৃত্যু হলো।

চোরের কথামত ধনবতী সেই গ্রামে চোরের বাড়িতে গিয়ে মাটি খুঁড়ে সব ধনরত্ন নিয়ে তার বাপের বাড়ি চলে গেল। সেইখানেই সে বাস করতে লাগল মেয়েকে নিয়ে।

ক্রমে তার মেয়ে মোহিনীর বিয়ের সময় হলে মোহিনীর পছন্দমত এক ব্রাহ্মণ যুবককে বাড়িতে এনে তার সঙ্গে আবার বিয়ে দিল ধনবতী। বিয়ে দিয়ে বাড়িতেই রেখে দিল তাদের।

কিছুকাল পরে একটি পুত্রসন্তান হলো মোহিনীর।

এর পর একদিন মোহিনী স্বপ্ন দেখল, মহাদেবের মত দেখতে এক দেবতা এসে তাকে বলছে, তোমার ছেলে ক্ষণজন্মা পুরুষ। আগামীকাল মাঝরাতে একটি বাক্সের মধ্যে তোমার ছেলেকে ভরে সঙ্গে একহাজার মোহর দিয়ে রাজবাড়ির সামনে সদর দরজার কাছে রেখে দিয়ে আসবে। অপুত্রক রাজা তাকে যত্ন করে মানুষ করে তুলবে। ভবিষ্যতে সে-ই রাজা হবে। মোহিনী ঘুম হতে জেগে উঠে তার মাকে সব কথা বলল। তার স্বপ্নের কথামত ছেলেকে মোহরসহ একটা বাক্সের মধ্যে ভরে রাজবাড়ির সামনে গভীর রাতে নামিয়ে দিয়ে এল।

এদিকে রাজাও সেই একই ধরনের এক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন স্বপ্নে দেবতার মত এক দিব্য পুরুষ তাঁকে বলল, বাড়ির বাইরে সুলক্ষণ যুক্ত এক শিশু তোমার অপেক্ষায় আছে। তাকে গ্রহণ করে পুত্রের মত পালন করো। ভবিষ্যতে সেই ছেলে রাজা হয়ে মুখ উজ্জ্বল করবে তোমার।

ঘুম ভাঙ্গতেই রাণীকে একথা বললেন রাজা। দুজনেই তখন কৌতূহলী হয়ে প্রাসাদের সদর দরজা খুলেই একটি বাক্স দেখতে পেলেন। বাক্সটি খুলেই দেখতে পেলেন দিব্যকান্তি এক শিশু শুয়ে আছে তাতে। তার পাশে রয়েছে এক হাজার মোহর।

রাণী খুশি হয়ে কোলে তুলে নিলেন শিশুকে।

পণ্ডিতদের ডেকে পরদিনই ছেলের ভাগ্য গণনা করালেন রাজা।

পণ্ডিতগণ একবাক্যে বললেন, এই ছেলে বড়ই সুলক্ষণযুক্ত। ভবিষ্যতে এই ছেলেই আপনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে আপনার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

ছেলের বয়স ছয়মাস হলে তার অন্নপ্রাশন হলো। রাজা তার নাম রাখলেন হরিদত্ত।

হরিদত্ত ছেলেবেলা থেকে পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল। যথাকালে সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল সে।

পরে রাজার মৃত্যু হলে হরিদত্ত রাজা হলো। ক্রমে সে রাজ্য আরও বাড়িয়ে নিজের একাধিপত্য স্থাপন করল।

কিছুদিন পর তীর্থযাত্রায় বার হলো হরিদত্ত। বহু তীর্থ ঘুরে শেষে গয়ায় এসে পিণ্ডদান করতে বসল। কিন্তু সে পিণ্ডদান করতে গেলে জল থেকে তিনখানা হাত উঠে এল তার সামনে। একটি হাত চোরের, একটি রাজার আর একটি সেই ব্রাহ্মণ যুবকের।

বেতাল গল্প শেষ করে বলল, এই তিন জনের মধ্যে কে হরিদত্তের পিণ্ড পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী? শাস্ত্রমতে যুক্তিসহ এর উত্তর দাও।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, চোরের। কারণ ব্রাহ্মণ যুবক হরিদত্তের জনক যে সে নিজেকে বিক্রি করেছিল টাকার জন্য। রাজাও প্রতিপালনের জন্য এক হাজার মোহর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই চোর অনাগত সন্তানের জন্য তার যথাসর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিল।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে আবার শিরীষ গাছে উঠে ঝুলে পড়ল। রাজাও তাকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথচলা শুরু করলেন।

বেতালও তার উনবিংশ কাহিনী শুরু করল।

উনবিংশ কাহিনী

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন।

একদিন ঘোড়ায় চড়ে বনে মৃগয়া করতে যান রাজা রূপদত্ত। কিন্তু সেদিন হরিণ শিকার করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে এক ঋষির তপোবনে গিয়ে উপস্থিত হন। তপোবনের সামনে ছিল স্বচ্ছনীল জলে ভরা এক সুন্দর সরোবর।

এমন সময় রাজা দেখলেন আশ্রম থেকে এক পরমাসুন্দরী ঋষিকন্যা বেরিয়ে এসে স্নান করার জন্য সরোবরে নামল। তার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হলেন রাজা।

ঋষিকন্যা স্নান সেরে তীরে উঠে আশ্রমের দিকে এগিয়ে যেতেই রাজা তার সামনে গিয়ে বললেন, আমি ক্লান্ত, তোমার অতিথি।

এমন সময় ঋষিও ফল ফুল সমিধ প্রভৃতি নিয়ে ফিরে এলেন।

রাজা ঋষিকে দেখে তাঁর পায়ে জড়িয়ে প্রণাম করলে ঋষি আশীর্বাদ করলেন, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক।

রাজা বললেন, আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাই। আমার এই মনোবাসনা পূর্ণ করুন প্রভু।

এ কথায় রাজার উপর ঋষি রেগে গেলেও বাইরে সে রাগ প্রকাশ না করে রাজার সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিলেন।

নববধূ ঋষিকন্যাকে নিয়ে রাজধানীর পথে রওনা হলেন রাজা। পথে রাত হলে বনপথের ধারে কিছু ফল খেয়ে একটি গাছের তলায় দুজনে শুয়ে রইলেন।

দুপুর রাতে এক রাক্ষস এসে রাজাকে জাগিয়ে বলল, আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি তোমার স্ত্রীর নরম মাংস খেতে চাই।

রাজা বললেন, তুমি আমার স্ত্রীর মাংসের বদলে অন্য যা কিছু চাইবে আমি তা দেব তোমাকে।

রাক্ষস বলল, যদি বারো বছরের এক ব্রাহ্মণের ছেলের মাথা কেটে আমাকে দিতে পার তাহলে আমি তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দেব।

রাজা তাঁর নববধূকে বাঁচাবার জন্য এই পাপকর্মে সম্মত হলেন। তিনি রাক্ষসকে বললেন, সাত দিন পর তুমি আমার রাজধানীতে এলে তুমি যা চাও তা পাবে।

রাক্ষস তখন রাজা ও তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে দিল।

পরদিন রাজা রাজধানীতে উপস্থিত হয়েই মন্ত্রীকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগলো।

মন্ত্রী বলল, আপনি কিছু ভাববেন না মহারাজ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

এরপর মন্ত্রী এক স্বর্ণকারকে ডেকে মানুষের মত এক সোনার মূর্তি তৈরি করাল। তারপর সেই মূর্তির গায়ে গয়না পরিয়ে রাজধানীতে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘোষণা করল, যে ব্রাহ্মণ তার বারো বছরের ছেলেকে বলিদান দেবেন তিনিই এই মূর্তিটি পাবেন।

সেই নগরে এক ব্রাহ্মণের বারো বছরের একটি ছেলে ছিল। তারা ছিল দারুণ গরীব। অতি কষ্টে দিন চলত তাদের। দুবেলা আহার জুটত না।

রাজার ঘোষণার কথা শুনে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলল, এই দারিদ্র্য আর সহ্য করা যাচ্ছে না। কোনদিন দুবেলা জোটে, কোনদিন জোটে না। ছেলেটারও কষ্ট হচ্ছে খাওয়া পরার। তার থেকে ছেলেটাকে বলি দাও। তাহলে আমরা ঐ সোনার মূর্তিটা আর তার গায়ের গয়নাগুলো সব পাব। এইভাবে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হব আমরা।

ব্রাহ্মণীও এ কথায় সম্মত হলো। ব্রাহ্মণ তখন তার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে রাজার হাতে তুলে দিয়ে সেই সোনার মূর্তিটি পেয়ে গেল। তারপর সেটা বিক্রি করে প্রচুর টাকার মালিক হলো।

রাজা বারো বছরের এক ব্রাহ্মণপুত্রকে পেয়ে খুশি হলেন। রাক্ষস তাঁকে এই কথাই বলেছিল। অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে রাক্ষস এসে উপস্থিত হলে রাজা নিজের হাতে খড়্গ দিয়ে ব্রাহ্মণ বালকের মাথা কেটে রাক্ষসকে দিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মণপুত্র কি জন্য কিভাবে তার অকালে মৃত্যু ঘটছে তা সব বুঝতে পারল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শুধু একটু খানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

এখানেই গল্প শেষ কার বেতাল বলল, মহারাজ! ব্রাহ্মণপুত্র মৃত্যুর পূর্বে হেসেছিল কেন? মৃত্যুর আগে ত ভয়ে সবাই কাঁদে।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, পিতামাতা ও রাজার কর্তব্যজ্ঞান দেখে সে নিতান্ত বালক বয়সেই না হেসে পারেনি। বাপ মার কাজ হচ্ছে সব বিপদ থেকে ছেলেকে রক্ষা করা। কিন্তু নিজেদের ভোগ সুখের জন্য সেই ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল তার বাবা মা। তারপর রাজার ধর্ম হচ্ছে প্রজা পালন করা এবং তাদের রক্ষা করা। কিন্তু সেই রাজা নিজের স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য

নিজের স্বার্থে একটি নির্দোষ নিরীহ বালককে হত্যা করলেন নিজের হাতে। বালক মনে মনে এই কথা স্মরণ করে হেসেছিল।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে রাজাকে ছেড়ে গাছের উপর চলে গেল। রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে আবার পথ চলতে লাগলো।

বেতালও এবার বিংশতি কাহিনী বলতে শুরু করল।

বিংশতি কাহিনী

বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে এক বণিক বাস করত। অনঙ্গমঞ্জরী নামে এই বণিকের একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল।

কিছুকাল দেখাশোনার পর কমলপুর গ্রামের অধিবাসী মদনদাস বণিকের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল অর্থদত্ত।

কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই মদন দাস তার স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে রেখে বিদেশে বাণিজ্য করতে গেল।

একা একা থাকতে ভাল লাগল না অনঙ্গমঞ্জরীর। সে প্রায়ই তার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় লোক চলাচল দেখত।

একদিন এইভাবে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অনঙ্গমঞ্জরী যখন রাস্তায় লোক চলাচল দেখছিল তখন সেই পথ দিয়ে কমলাকর নামে এক সুদর্শন ও সুপুরুষ ব্রাহ্মণ যুবক যাচ্ছিল। তাকে দেখে তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল অনঙ্গমঞ্জরী। অনঙ্গমঞ্জরীকে দেখেও মুগ্ধ হলো কমলাকর। দুজনেই দুজনকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল।

অনঙ্গমঞ্জরী বেশী কাতর হয়ে উঠল। সে মৃতপ্রায় হয়ে পড়। তাকে মরণাপন্ন দেখে তার সখী কমলাকরকে ডেকে নিয়ে এল। কিন্তু কমলাকর এসে দেখল অনঙ্গমঞ্জরী তারই বিরহে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। সেই দুঃখে সেও মাটিতে পড়ে গিয়ে তখনি মারা গেল।

বাড়ির ও পাড়ার লোকেরা সব কিছু জানতে পেরে শ্মশানে নিয়ে গেল দুটি মৃতদেহকে। একই চিতায় তাদের দাহ করা হল।

এমন সময় অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামী মদন দাস বিদেশ থেকে বাণিজ্য করে অনঙ্গমঞ্জরীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। সেখান থেকে সোজা শ্মশানে চলে গেল। সব কিছু শুনে সে স্ত্রীর শোকে সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করল।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, মহারাজ! এই তিনজনের মধ্যে কার ভালবাসা সব চেয়ে বেশী ছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, মদন দাসের।

বেতাল বলল কেন?

রাজা বললেন, অনঙ্গমঞ্জরী পরপুরুষকে ভালবেসে তাকে সময়ে না পেয়ে প্রাণ ত্যাগ করল। কমলাকরও একই কারণে প্রাণত্যাগ করল। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি মদনদাসের ভালবাসা এমনই গভীর ছিল যে সে তার স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত জেনেও তার জন্য প্রাণত্যাগ করল।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ ছেড়ে গাছে গিয়ে ঝুলল। রাজাও আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ হাঁটতে লাগলেন।

বেতাল তখন তার একবিংশতি গল্প আরম্ভ করল।

একবিংশতি কাহিনী

সেকালে জয়স্থল নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক। বিষ্ণুশর্মার চার ছেলে ছিল।

বিষ্ণুশর্মা যেমন ধার্মিক ছিল তার ছেলেরা ছিল ঠিক তেমনি তার উল্টো। তার বড় ছেলে ছিল জুয়াড়ী, মেজ ছেলে চরিত্রহীন, সেজটি ছিল নির্লজ্জ বেহায়া আর ছোট ছেলে নাস্তিক।

হঠাৎ বিষ্ণুশর্মা ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই মারা গেলেন। তাঁদের অপদার্থ চার ছেলেই অনাথ অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তাদের আত্মীয় জ্ঞাতিরা তাদের সব বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিল।

তখন চার ভাই সহায় সম্বলহীন হয়ে যুক্তি করে তাদের মামার বাড়ি যজ্ঞস্থলে চলে গেল। সেখানে গিয়ে তারা কুস্বভাব ত্যাগ করে চার ভাই বেদপাঠ ও পড়াশুনো করতে লাগল।

প্রথম প্রথম মামারা তাদের ভালবেসে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিল। পরে তাদের অবজ্ঞা করতে লাগল। তারা কোন রোজগার করত না বলে মামারা আর বেশীদিন পুষতে চাইল না।

এই সব দেখে শুনে বড় ভাইএর দুঃখ সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। সে

একদিন তার তিন ভাইকে ডেকে বলল, ঘুরতে ঘুরতে শ্মশানে গিয়ে এক মৃত ব্যক্তিকে দেখে আমার মনে হলো একমাত্র মৃত্যুতেই আমি জীবনের যত সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে চিরশান্তি লাভ করতে পারি। তাই আত্মহত্যা করার মানসে আমি একটি গাছে উঠে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লাম। কিন্তু ফাঁসটা ভাল লাগল না। দড়ি ছিঁড়ে আমি নিচে পড়ে গেলাম। একজন সহৃদয় লোক আমাকে দেখে আমার সেবা করে আমাকে বাঁচিয়ে দিল। তখন বুঝলাম অদৃষ্টে না থাকলে আত্মহত্যাও করা যায় না।

লোকটি তখন আমায় বোঝাল, আত্মহত্যা করলে নরকে গিয়ে দুঃখ ভোগ করতে হবে।

আমি তাই আত্মহত্যার বাসনা ত্যাগ করে কোন তীর্থস্থানে গিয়ে কঠোর তপস্যা করার সংকল্প করলাম।

তখন তা শুনে তিন ভাই বলল, আমরা আর সম্পদ লাভ করতে চাইব না। ধনসম্পদ নারীর মত চঞ্চলা অসার। আমরা দেশে দেশে ঘুরে এক একটি দিব্য বিদ্যা অর্জন করে এসে এক জায়গায় নির্দিষ্ট দিনে মিলিত হব।

এরপর চার ভাই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এই চার দিকে বেরিয়ে পড়ল।

অবশেষে কিছুকাল পর এক নির্দিষ্ট দিনে এক নির্দিষ্ট জায়গায় এসে মিলিত হলো তারা। তারপর কে কি বিদ্যা শিখেছে তা সবাই বলল একে একে।

এক ভাই বলল, কোন মৃত লোকের হাড় পেলে আমি তাতে মাংস গজিয়ে দিতে পারি। দ্বিতীয় জন বলল, আমি তাতে চামড়া ও লোম বসিয়ে দিতে পারি। আর একজন বলল, আমি তার অন্যান্য অঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিতে পারি।

তখন চতুর্থ ভাই বলল, আমি তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারি।

এর পর তারা তাদের আপন আপন বিদ্যার পরিচয় দিতে চাইল।

তখন বনের মাঝে খুঁজতে খুঁজতে এক মৃত সিংহের হাড় দেখতে পেল।

এক ভাই তখন সেই হাড়গুলো জড়ো করে তাতে মাংস গজিয়ে দিল। এক ভাই তাতে চামড়া ও লোম বসিয়ে দিল। এক ভাই অন্যান্য অঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিল। তখন চতুর্থ ভাই তার বিদ্যা জাহির করার জন্য সেই সিংহের দেহে প্রাণ সঞ্চার করল।

সঙ্গে সঙ্গে সিংহ গর্জন করতে করতে কেশর ফুলিয়ে চার ভাইএর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খেয়ে ফেলল তাদের।

এর থেকে বোঝা যায় ভাগ্য ভাল না হলে অর্জিত বিদ্যাও সুফল দান না করে ধ্বংস ডেকে আনে।

গল্প শেষ করে বেতাল রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, সিংহের হাতে তাদের মৃত্যুর জন্য চার ভাই এর মধ্যে কে দায়ী?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন যে ভাই সিংহের দেহে প্রাণদান করেছে সেই দায়ী। কারণ অন্যান্য ভাইরা আপন আপন বিদ্যার দ্বারা সিংহের দেহটিকে গঠন করেছিল। কিন্তু যে তাকে প্রাণদান করেছিল তার পরিণাম চিন্তা করা উচিত ছিল। তার বোঝা উচিত ছিল প্রাণ পেয়ে সিংহ অবশ্যই তাদের খাবে।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল গাছে চলে গেল। রাজাও তাকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন আবার।

বেতাল এবার দ্বাবিংশ গল্প শুরু করল।

দ্বাবিংশ কাহিনী

বিশ্বপুর গ্রামে নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বার্ধক্যের জন্য তাঁর দেহ দুর্বল হয়ে যেতে থাকে ক্রমশঃ। ইন্দ্রিয়শক্তি বিকল হয়ে ওঠে।

যৌবনে যখন দেহে শক্তি ছিল তাঁর, তখন কোন ভোগবাসনা ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দেহ অশক্ত হয়ে উঠলে ভোগবাসনা জাগতে থাকে তাঁর মনে।

তিনি তখন একদিন ভাবলেন, আমি পরদেহধারণবিদ্যা জানি। এই বিদ্যার দ্বারা আমি এই বার্ধক্যজর্জরিত দেহ ত্যাগ করে এক যুবকের দেহ ধারণ করে ইচ্ছামত সুখ ভোগ করতে পারি। কিন্তু এর জন্য সংসার ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে হবে আমায়।

মনে মনে এই সংকল্প করে নারায়ণ স্ত্রী পুত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সংসার ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। তিনি বলে গেলেন, জীবনের বাকি দিনগুলো বনে গিয়ে যোগসাধনা করে কাটাবেন।

বনে গিয়ে তাঁর বিদ্যার দ্বারা নিজদেহ ত্যাগ করে এক যুবকের দেহ ধারণ করলেন। তখন ইচ্ছামত ভোগ করে যেতে লাগলেন।

বেতাল বলল, মহারাজ, নিজদেহ ত্যাগ করার সময় ব্রাহ্মণ কেঁদেছিল এবং যুবকের দেহ ধারণ করে হেসেছিল। এর কারণ কি?

বিক্রমাদিত্য বললেন, ব্রাহ্মণের কাঁদার কারণ হলো নিজের দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল আত্মীয়দের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর হাসার কারণ হলো যুবকের দেহ ধারণ করে ইচ্ছামত ভোগসুখ করতে পারবেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে চলে গেল। রাজাও তাকে আবার ধরে এনে কাঁধে তুলে পথ চলতে লাগলেন।

বেতাল এবার ত্রয়োবিংশ কাহিনী বলতে শুরু করল।

ত্রয়োবিংশ কাহিনী

সেকালে ধর্মপুর নগরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার দুটি ছেলে ছিল। কিন্তু দুটি ছেলে ছিল দু রকমের। এক ছেলে ছিল ভোজনবিলাসী অর্থাৎ ভাল খাওয়ার প্রতি অসাধারণ লোভ ও লালসা ছিল তার। আর একটি ছেলে ছিল শয্যাবিলাসী অর্থাৎ শুধু আরামদায়ক শয্যার প্রতি তার লোভ ছিল।

দুই ভাইএর দু বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতার কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে রাজার কানে গিয়ে উঠল কথাটা। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে রাজা তাদের ডেকে পাঠালেন রাজসভায়। কার কি বিষয়ে কেমন ক্ষমতা আছে তা জানতে চাইলেন।

রাজা প্রথমে ভোজনবিলাসীকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি রাজবাড়ির প্রধান রাঁধুনিকে ডেকে যত রকমের ভাল খাবার হতে পারে তা সব রাঁধতে বললেন।

রাজার আদেশে রাঁধুনি তার যত রকমের ভাল খাবার জানা ছিল তা সে সব তৈরি করে রাজাকে জানাল।

রাজা নিজে ভোজনবিলাসীকে সঙ্গে করে ভোজনাগারে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে কিছু আহার করতে বললেন। তাকে বসিয়ে দিয়ে রাজা তাঁর জায়গায় ফিরে এলেন। ভোজনবিলাসী আহার করতে শুরু করল।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কিছু না খেয়েই রাজার কাছে চলে এল।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছ ত?

ভোজনবিলাসী বলল, না মহারাজ। আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব হলো না।

রাজা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

সে বলল, মহারাজ, খেতে গিয়ে দেখি ভাতে শবের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে শ্মশানের কাছে কোন জমির ধান থেকে ঐ ভাতের চাল তৈরি হয়েছে।

রাজা প্রথমে হেসে কথাটাকে পাগলের প্রলাপ হিসাবে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। পরে তিনি চালের ভাণ্ডারিকে ডেকে ব্যাপারটা ঠিক কি না খোঁজ নিয়ে দেখতে বললেন।

ভাণ্ডারি খোঁজ খবর নিয়ে এসে রাজাকে জানাল, মহারাজ, নগর বাইরে যে শ্মশান আছে তার পাশের ক্ষেতের ধান থেকে ঐ চাল তৈরি হয়েছে।

রাজা খুশি হয়ে ভোজনবিলাসীকে বললেন, তুমি সত্যিই প্রকৃত ভোজন-বিলাসী

এর পর রাজা একটি শয়নঘরে দুধের মত সাদা এক নরম শয্যায় শয্যা-বিলাসীকে নিয়ে গিয়ে তাকে শুতে বললেন।

কিন্তু সে একবার শুয়েই উঠে পড়ল। তারপর রাজার কাছে চলে গেল।

রাজা আশ্চর্য হয়ে তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শয্যাবিলাসী বলল, মহারাজ, ঐ শয্যার সপ্তম তলায় একটি চুল আছে। তাই আমার শোয়া হলো না। বড় অস্বস্তিবোধ করছিলাম।

রাজা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে নিজে গিয়ে শয্যাটি একে একে তুলে দেখলেন, সত্যিই তার সপ্তমতলে একটি চুল রয়েছে।

রাজা খুশি হয়ে বললেন, তুমি প্রকৃতই শয্যাবিলাসী।

রাজা দুই ভাইকেই প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, মহারাজ ! এই দুই ভাইএর মধ্যে কে বেশী প্রশংসার যোগ্য ?

রাজা বললেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাছ থেকে গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। রাজাও তাকে নামিয়ে এনে কাঁধে তুলে আবার যাত্রা শুরু করলেন।

বেতালও এবার চতুর্বিংশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

চতুর্বিংশ কাহিনী

কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় মনে বড় দুঃখ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে দেবতার কাছে অনেক কাতর প্রার্থনা করার পর অবশেষে এক পুত্রলাভ করেন তিনি।

পুত্রটি ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল। ক্রমে সব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠে সে। পিতামাতার প্রতি তার ভক্তি ছিল প্রগাঢ়। কিন্তু বিদ্বান ও গুণবাণ এই পুত্রটি মাত্র আঠারো বছর বয়সে অকালে মারা যায়।

পুত্রশোকে মর্মাহত ও মৃতপ্রায় হয়ে উঠল বাবা মা। সৎকারের জন্য মৃতদেহ শ্মশানে এনে চিতা সাজানো হলো।

সেই শ্মশানে এক বৃদ্ধ যোগী দীর্ঘকাল ধরে যোগসাধনা করেছিল। সেই যোগী আঠারো বছরের ঐ মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে দেখে ভাবল, আমার এই দেহ বার্ধক্যে জীর্ণ ও শীর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অশক্ত দুর্বল দেহ দিয়ে কোন ভাল কাজই হবে না। আমি যদি যোগশক্তিবলে ঐ ব্রাহ্মণকুমারের দেহে প্রবেশ করি তাহলে অনেকদিন যোগসাধনা করতে পারব।

মনে মনে এই সংকল্প করে যোগী মৃত ব্রাহ্মণকুমারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করল।

সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞশর্মার মৃত পুত্র প্রাণ ফিরে পেঁয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল। যজ্ঞশর্মা পুত্রকে ফিরে পেয়ে প্রথমে আনন্দে হাসতে লাগলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদে মুখভার করে কাঁদতে লাগলেন।

বেতাল এখানেই গল্প শেষ করে রাজাকে প্রশ্ন করল, যজ্ঞশর্মা পুত্রকে ফিরে পেয়ে প্রথমে হাসলেন কেন এবং পরে আবার কাঁদলেনই বা কেন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, মৃত বা হারানো পুত্রকে ফিরে পেয়ে সব বাবাই আনন্দিত হয়। তাই যজ্ঞশর্মাও আনন্দে হেসেছিলেন। কিন্তু তিনি পরদেহ প্রবেশনীবিদ্যা জানতেন বলে তিনি পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন, তাঁর পুত্র আসলে পুনর্জীবন লাভ করেনি। যোগীর যোগসাধনা বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই কথা জানতে পেরে কাঁদলেন তিনি।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজাকে ছেড়ে গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। কিন্তু রাজা আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

বেতালও তার পঞ্চবিংশ গল্প আরম্ভ করল।

পঞ্চবিংশ কাহিনী

দাক্ষিণাত্যে ধর্মপুর নামে এক নগরে মহাবল নামে এক মহা পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করতেন।

একবার আরো শক্তিশালী এক রাজা বহু সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করল। রাজা মহাবলও তখন বাধ্য হয়ে তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু তখন ভাগ্য ভাল না থাকায় বিদেশী রাজার কাছে পরাজিত হলেন মহাবল। তাঁর প্রায় সব সৈন্য বিনষ্ট হলো।

রাজা মহাবল দেখলেন শত্রুসৈন্যরা এখনি প্রাসাদে এসে তাকে বন্দী অথবা বধ করবে। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকেও বন্দিনী করে নিয়ে যাবে। তাই মহাবল স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রাসাদের গোপন দরজা দিয়ে নগর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

নগর বাইরে এক দূর বনে চলে গেলেন মহাবল। অনেক পথ হাঁটার পর ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাঁরা তিনজনেই কাতর হয়ে উঠলেন।

এদিকে দিন শেষ হয়ে আসছিল তখন। সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরি নেই। মহাবল তখন একটি গাছের তলায় স্ত্রী ও কন্যাকে বসিয়ে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু দিনের আলো নিবে গেলেও ফিরে এলেন না রাজা মহাবল। রাজাকে ফিরতে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল তাঁর স্ত্রী ও কন্যা। একই সঙ্গে রাজা ও নিজেদের অনিষ্টের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল তারা।

সেদিন কুণ্ডিলের রাজা চন্দ্রসেন তাঁর বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন সেই বনে। বিকালে তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে পায়ের ছাপ দেখে বনের সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন যেখানে রাজা মহাবলের স্ত্রী ও কন্যা এক গাছের তলায় বসে ছিল।

রাজা চন্দ্রসেন ও তাঁর পুত্র সেখানে গিয়ে দেখলেন, পরমাসুন্দরী দুটি নারী গাছতলায় বসে কাঁদছে।

চন্দ্রসেন তখন রাণী ও রাজকন্যাকে অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। তাদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে তিনি নিজেও দুঃখিত হলেন। পরে সসম্মানে তাদের তাঁরা রাজধানীতে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে।

কিছুদিন পর মহাবলের কোন খোঁজখবর না পেয়ে রাজা চন্দ্রসেন রাজকন্যাকে এবং তাঁর পুত্র রাণীকে বিয়ে করলেন।

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল প্রশ্ন করল, এই দুজনের যখন সন্তান হবে তখন তাদের কি সম্বন্ধ হবে ?

রাজা বিক্রমাদিত্য অনেক ভেবেও বেতালের এই প্রশ্নে কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। তিনি নীরবে পথ চলতে লাগলেন বেতালকে নিয়ে।

রাজা তার প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় বেতাল ভাবল, আমি এবার জিতেছি। এই অসমসাহসী বীরপুরুষকে আর আমি ছলনা করব না। বরং ঐ দুর্বৃত্ত সন্ন্যাসীকে কৌশলে বঞ্চিত করব আমি। যে দিব্যপদ লাভ করতে চায় সন্ন্যাসী তা রাজাকেই দান করব।

এই ভেবে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, শোন রাজা, তুমি আমার জন্য শ্মশানে অনেকবার আনাগোনা করে অনেক কষ্ট করেছ। তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি আমি। আমি এখনি এই শব ছেড়ে চলে যাব। তুমি এই শবটাকে বয়ে নিয়ে যাবে সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী তখন আমাকে আবার আহ্বান জানিয়ে পূজা করবে। পূজার পর সে তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে বলবে। কিন্তু তুমি প্রণাম করবে না। তুমি প্রণামের জন্য মাথা নত করলেই সে খড়্গ দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলবে। তুমি বলবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কি করে করতে হয় জানি না। আপনি শিখিয়ে দিন। সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দেখাতে গেলেই তুমি খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলবে। তাহলে তার লভ্য বিদ্যাধরদের রাজপদ তুমিই লাভ করবে। আমার সব কথা মেনে চলবে। তা না হলে সে তোমায় বলি দেবে। তোমার এই বিপদ ঠেকিয়ে রাখার জন্যই আমি গল্প বলে সময় কাটিয়েছি। তোমাকে যেতে বাধা দিয়েছি।

এই কথা বলে শব ছেড়ে চলে গেল বেতাল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এবার বুঝতে পারলেন সন্ন্যাসী তাঁর শত্রু। তবু তিনি বেতালের কথামত শবটাকে সেই শ্মশানে সন্ন্যাসীর সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন।

রাজা দেখলেন হলুদ রঙের অস্থিচূর্ণ দিয়ে এক বৃত্ত আঁকা। সেই বৃত্তের মাঝে রক্তভরা এক কলস। মরা মানুষের চর্বি দিয়ে এক প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। হোমের আগুন জ্বলছে। বলির নানা উপকরণ রয়েছে। সন্ন্যাসী পূজা করছে।

রাজাকে দেখে খুশি হয়ে সন্ন্যাসী তাঁর অনেক গুণগান করল। বলল, মহৎ লোকেরা নিজের জীবন দিয়েও মানুষের উপকার করে। প্রতিশ্রুত কাজ ঠিক করে।

এই বলে সন্ন্যাসী শবটাকে রাজার কাঁধ থেকে নামিয়ে সেই বৃত্তের মাঝখানে রাখল। তারপর শবটাকে গন্ধদ্রব্য মাখিয়ে তার গলায় মালা পরিয়ে চামড়া দিয়ে তৈরি একটা উপবীত পরিয়ে দিল তার গলায়।

এর পর সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর মন্ত্র পড়ে বেতালকে আহ্বান করল। বেতালকে সে শবের মধ্যে ঢুকিয়ে ফুল ও নরমাংস দিয়ে তার ভোগ দিল।

তারপর সন্ন্যাসী রাজাকে বলল, মহারাজ, মায়াধিপতি বেতাল এসে গেছে। আপনি তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করুন।

বেতালের কথাটা এবার মনে পড়ে গেল রাজার। রাজা বললেন, আপনি দেখিয়ে দিন প্রভু। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কিভাবে করতে হয় আমি তা জানি না।

সন্ন্যাসী তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণামের জন্য শুয়ে পড়তেই রাজা তাঁর তরবারি দিয়ে সন্ন্যাসীর মাথাটা কেটে ফেললেন এক কোপে। তারপর সন্ন্যাসীর হৃৎপিণ্ডটা বার করে তার ছিন্নমুণ্ডের সঙ্গে উপহার দিলেন বেতালকে।

সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের ভূতপ্রেতরা জয়ধ্বনি করতে লাগল রাজার। বেতাল রাজাকে বর চাইতে বলল।

রাজা বললেন, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হয়েছ এতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে। তবু যদি একান্তই বর দিতে চাও তাহলে যে পঁচিশটি গল্প তুমি আমায় বলেছ তা যেন চিরকাল প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে সারা দেশে।

বেতাল বলল, 'তথাস্তু'। এই গল্পগুলির নাম হবে বেতাল পঞ্চবিংশতি। যেখানে এই সব গল্প পড়া হবে সেখানে যক্ষ, বেতাল, ডাকিনী, যোগিনী বা রাক্ষসদের কোন উপদ্রব থাকবে না।

এই বলে বেতাল শব ছেড়ে চলে গেল।

এবার স্বয়ং শিব রাজার সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভণ্ড সন্ন্যাসীকে বধ করার জন্য বাহবা দিচ্ছি তোমায়। পৃথিবীতে রাজত্ব করার পর স্বর্গে গিয়ে তুমি বিদ্যাধরদের রাজা হবে। আগে তোমাকেই আমি আমার অংশে সৃষ্টি করেছিলাম অসুর নিধনের জন্য। তোমাকেই আবার দুষ্কৃতকারীকে বধ করার জন্য বিক্রম নামে সৃষ্টি করেছি। এই দিব্য খড়্গের দ্বারাই তুমি সারা পৃথিবী জয় করতে পারবে।

এই বলে শিব রাজাকে সেই দিব্য খড়্গ দান করলেন। তারপর অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

রাজা তাঁর রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

পরদিন সকালে তিনি দেখলেন গতরাতের তাঁর দুঃসাহসিক কাজের কথা নগরবাসীরা জেনে গেছে।

নগরবাসীরা তাঁকে মহাসমারোহে সম্বর্ধনা জানাল। রাজা প্রাণ ভরে শিবের পূজা করলেন। তারপর নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করলেন।

ক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য শিবদত্ত সেই দিব্য খড়্গের সাহায্যে একে একে সমগ্র দ্বীপাবলী ও পাতালসহ সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হয়ে ওঠেন। শেষে বিদ্যাধরদের রাজপদ লাভ করেন। দীর্ঘকাল ভোগসুখের পর তাঁর জীবনের মূল উৎস শিবের দেহের মধ্যে গিয়ে মিলিয়ে যান তিনি।


সিংহাসন

বত্রিশ সিংহাসন

প্রজাপালক হিসাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মন জয় করেন বিক্রমাদিত্য। তার মত উদার ও দানশীল রাজা সেকালে দেখাই যেত না। তাঁর মহত্ত্বের কথা লোকমুখে প্রচারিত হত দেশে বিদেশে।

একদিন এক দিগম্বর সন্ন্যাসী এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, সর্পভূষণ মহাদেব ও বরাহবেশী বিষ্ণু আপনাকে আরও ঐশ্বর্যশালী করে তুলুন।

তারপর সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন আমি মহাশ্মশানে আঘোরমন্ত্রে হোম করব। আপনাকে সেখানে উত্তরসাধকরূপে উপস্থিত থাকতে হবে।

রাজা তাতে সম্মত হলে বেতাল সন্তুষ্ট হলো। রাজা অষ্টসিদ্ধি লাভ করলেন। সারা ত্রিভুবনে বিক্রমাদিত্যের খ্যাতি ও কীর্তির কথা অব্যাহত ভাবে প্রচারিত হতে লাগল।

এই সময় একদিন দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশী ও রম্ভাকে ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে নৃত্যগীতে যে বেশ পটু তাকে বিশ্বামিত্রের তপোবনে গিয়ে তার তপোভঙ্গ করতে হবে। যে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে পারবে তাকে পুরস্কার দেব।

দুজন অপ্সরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি জানাল। তখন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য দেবতাদের এক সভা ডাকা হলো।

প্রথম দিন রম্ভা ও দ্বিতীয় দিনে উর্বশী নৃত্য করল। দেবতারা তাদের নৃত্য দেখে সন্তুষ্ট হলেন সকলে। কিন্তু কারো নৃত্যকলায় শ্রেষ্ঠত্ব ঠিকমত বিচার করা হলো না।

তখন দেবর্ষি নারদ বললেন, পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা আছেন। তিনি সকল বিদ্যায় বিশেষ করে নৃত্য ও গীতবিদ্যায় পারদর্শী। তিনিই এর মীমাংসা করতে পারবেন।

নারদের কথা শুনে দেবরাজ বিক্রমাদিত্যকে আনার জন্য মাতলিকে পাঠালেন উজ্জয়িনী নগরে।

দেবরাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেবলোকে এসে উপস্থিত হলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। আবার নৃত্যগীতের আসর বসল। প্রথম দিন রম্ভা ও দ্বিতীয় দিন উর্বশী তাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করল।

বিক্রমাদিত্য বিচার করে উর্বশীকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেন।

উর্বশীকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হলো তা জানতে চাইলেন দেবরাজ।

বিক্রমাদিত্য বললেন, নৃত্যকলায় অঙ্গসৌষ্ঠবই শ্রেষ্ঠ। তাতে উচ্চ ও নীচভাবে অঙ্গচালনার সঙ্গে চলবে পদচালনা। কটি, জানু, বক্ষ, মস্তক, অক্ষি-যুগল ও কর্ণ সমান ভাবে সঞ্চালিত হবে। বাকি অংশগুলির মনোহারিতা ও বক্ষস্থলের যথাযথ উন্নতিই হলো নৃত্যবিচারের প্রধান বিষয়।

নৃত্য সম্বন্ধে রাজা বিক্রমাদিত্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হলেন দেবরাজ। তাঁকে মহেন্দ্র বস্ত্র দান করে সম্মানিত করলেন। সেই সঙ্গে একটি রত্নখচিত সিংহাসনও উপহার হিসাবে দান করলেন রাজাকে। সেই সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খচিত ছিল। তাদের মাথার উপর পা দিয়ে সে সিংহাসনে বসতে হয়।

সেই সিংহাসনটি যত্নসহকারে নিজের রাজধানীতে নিয়ে এসে শুভ দিনে সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করে তাতে বসে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন বিক্রমাদিত্য।

এই ঘটনার বহু বছর পরে প্রতিষ্ঠা নগরে রাজা শেষনারের ঔরসে আড়াই বছর বয়সের কন্যার গর্ভে শালিবাহনের জন্ম হলেসারা দেশে ভূমিকম্প, ধূমকেতুর আবির্ভাব, দিগদাহ প্রভৃতি অশুভ ও অমঙ্গলসূচক ঘটনা ঘটতে লাগল।

রাজ বিক্রমাদিত্য তখন দৈবজ্ঞদের ডেকে বললেন, রাজ্যে এই সব অমঙ্গল ঘটছে কেন? এর ফল কি এবং এর দ্বারা কি অনিষ্ট সাধিত হবার সম্ভাবনা আছে?

দৈবজ্ঞগণ বললেন, ভূমিকম্প সন্ধ্যার সময় হলে তাতে রাজার অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। ধূমকেতু দেখা দিলে তা রাজার বিনাশের লক্ষণ। আর পীতবর্ণের দিগদাহ হলে তা রাজার পক্ষে ভয়াবহ।

বিক্রমাদিত্য বললেন, একবার ভগবান আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আমাকে অমরত্বের বর দিতে চান। আমি তখন বলি, আড়াই বছর বয়সের কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার হাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়। ভগবান আমায় সেই বরই দান করেন। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব?

দৈবজ্ঞগণ বললেন, দৈবের বিধানে সব কিছুই সম্ভব। আমাদের চিন্তার বাইরে সে বিধান।

রাজা তখন বেতালকে বললেন, তুমি সারা দেশ খুঁজে দেখ কোথায় সে সন্তান জন্মেছে। তারপর আমাকে জানাও।

বেতাল চারদিকে খুঁজে অবশেষে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠা নগরে কুমোরের বাড়িতে একটি বালিকা ও এক শিশুকে খেলা করতে দেখল।

বেতাল বালিকাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা দুজনে কার কে হও ?

বালিকাটি বলল, এই শিশু আমার ছেলে ?

বেতাল তখন বালিকাকে বলল, তোমার বাবা কে ?

সে তখন একজন ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে দিল।

বেতাল ব্রাহ্মণকে বলল, এই মেয়েটি কে ?

ব্রাহ্মণ বলল, এই মেয়েটি আমার কন্যা এবং এই শিশুটি ওর ছেলে।

বেতাল তখন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি করে সম্ভব হলো ?

ব্রাহ্মণ বলল, নাগরাজের ঔরসে এই কন্যার গর্ভে এই শিশুর জন্ম হয়। শিশুটির নাম শালিবাহন।

বেতাল তাড়াতাড়ি উজ্জয়িনীতে ফিরে এসে রাজা বিক্রমাদিত্যকে সব কথা জানাল।

রাজা তখন একটি অস্ত্র হাতে নিয়ে তখনি প্রতিষ্ঠা নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর সেই অস্ত্র দিয়ে তিনি শালিবাহনকে হত্যা করতে উদ্যত হলে শালিবাহন একটি লাঠি দিয়ে বিক্রমাদিত্যের মাথায় আঘাত করল। সেই আঘাতে বিক্রমাদিত্য শূন্যে উঠে প্রতিষ্ঠা নগর হতে উজ্জয়িনীতে গিয়ে পড়লেন। সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হলো।

রাজপত্নীগণ যখন অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে স্বামীর অনুগামিনী হতে উদ্যত হলেন তখন অমাত্যগণ বললেন রাজা অপুত্রক। এখন আমাদের কর্তব্য কি ?

ভট্টি পরামর্শ দিলেন, রাজপত্নীদের কেউ গর্ভবতী আছেন কি না তা আগে দেখতে হবে।

তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল একজন রাণী সাত মাসের গর্ভবতী। মন্ত্রীরা তখন সেই গর্ভের অভিষেক করে নিজেরা রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। সিংহাসন শূন্যে রয়ে গেল।

একদিন রাজসভায় দৈববাণী হলো হে মন্ত্রীবৃন্দ, এই সিংহাসনে বসার মত যখন কোন রাজা নেই তখন এই সিংহাসনটি কোন পবিত্র জায়গায় রেখে দাও।

মন্ত্রীগণ তাই করলেন।

এই ঘটনার বহুদিন পর ভোজরাজ রাজা হলেন। বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রীরা সেই সিংহাসনটি মাঠের মধ্যে এক পতিত জায়গায় ফেলে দেন। সেটি মাটিতে ঢাকা পড়ে গিয়ে সেখানে এক উঁচু ঢিবি হয়। পরে এক ব্রাহ্মণ সেই

জায়গাটিকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করেন সেই উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে পাখি তাড়িয়ে ফসল রক্ষা করত ব্রাহ্মণ।

একদিন ভোজরাজ রাজকুমারদের সঙ্গে সেইদিকে গেলে ব্রাহ্মণ তাকে বলল, হে রাজন, আপনি এখানে আসায় আমরা কৃতার্থ হয়েছি। আপনি যত খুশি এই জমির ফসল নিয়ে যান।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে ভোজরাজ সৈন্যদের নিয়ে সেই ক্ষেতে প্রবেশ করলেন। সৈন্য ও অশ্বদের পদভরে সে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হলো।

ব্রাহ্মণ তখন রাজাকে বললেন, রাজা হয়ে আপনি এই ক্ষেতের ফসল নষ্ট করলেন কেন?

ভোজরাজ তখন সৈন্যদের নিয়ে ক্ষেতের বাইরে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণ আবার সেই উঁচু ঢিবির উপর উঠে পাখি তাড়াতে লাগল। সে তখন রাজাকে বলল, হে রাজন, চলে যাচ্ছেন কেন? এই ক্ষেতের ফসল ঘোড়াদের খেতে দিন। আপনি তা গ্রহণ করুন।

রাজা তখন সেই ক্ষেতে আবার প্রবেশ করলে ব্রাহ্মণ সেই ঢিবি থেকে নেমে এসে আগের মত ফসলহানির জন্য ভর্ৎসনা করতে লাগল।

ভোজরাজ তখন চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন ব্রাহ্মণ যখন ঢিবির উপর থাকে তখন সে দানশীল হয়ে ওঠে আর তখন সেখান থেকে নেমে আসে তখন হীনবুদ্ধির উদয় হয় তার মধ্যে।

রাজা তাই এবার নিজে সেই ঢিবির উপর উঠে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে অপূর্ব এক উদারতার ভাব দেখা গেল। তাঁর মনে হলো, জগতের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা তাঁর কর্তব্য। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা তাঁর কর্তব্য।

রাজা তখন ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট করে সেই ক্ষেত খনন করার আদেশ দিলেন।

রাজার লোকেরা জায়গাটির অনেকটা খুঁড়ে একটি শিলা দেখতে পেল। রাজাও সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। সেই শিলার নীচে বত্রিশটি পুতুল-সহ রত্নখচিত এক সিংহাসন পাওয়া গেল।

সিংহাসন দেখে ভোজরাজ আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে সেটিকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু সিংহাসনটিকে কিছুতেই ওঠাতে পারল না রাজার লোকেরা।

তখন রাজার মন্ত্রী বলল, যথাবিহিত বলি ও হোমসহ পূজা না দিলে এই দিব্য সিংহাসন উঠবে না।

রাজা তখন ব্রাহ্মণদের ডেকে যজ্ঞ ও পূজার অনুষ্ঠান করতে বললেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে চেষ্টা করতেই সিংহাসনটি হাল্কা হয়ে উঠে আসতে লাগল।

রাজা তখন মন্ত্রীর প্রশংসা করে বললেন, আপনার বুদ্ধিবলেই একাজ সম্ভব হলো।

মন্ত্রী বললেন, মন্ত্রীর অনেক গুণ থাকা প্রয়োজন। যেমন নন্দরাজার মন্ত্রী বহুশ্রুত একবার রাজার ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করেছিলেন।

ভোজরাজ বললেন, কি করে তা করেন ?

মন্ত্রী বললেন, তাহলে শুনুন সে কাহিনী। বিশাল নগরীতে নন্দ নামে এক মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। নিজ বাহুবলে অনেক রাজাকে জয় করে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল বহুশ্রুত আর রাণীর নাম ছিল ভানুমতী।

রাণী ভানুমতী রাজার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিল। রাণীকে এক মুহূর্তও না দেখে থাকতে পারতেন না রাজা। তিনি যখন সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতেন তখন রাণীকে তাঁর কোলের উপর বসিয়ে রাখতেন।

এই সব দেখে মন্ত্রী একদিন রাজাকে বললেন, মহারাজ, আমার একটি আবেদন আছে আপনার কাছে।

রাজা বললেন, বল।

মন্ত্রী বললেন, রাণীকে আপনি যেভাবে রাজসভায় বসিয়ে রাখেন শাস্ত্রকারদের মতে তা অনুচিত।

রাজা বললেন, তা জানি। কিন্তু কি করব ? ভানুমতীকে আমি এত ভালবাসি যে তাকে ছেড়ে ক্ষণকাল থাকাও সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

মন্ত্রী বললেন, তাহলে এক কাজ করুন। এক চিত্রকরকে ডাকিয়ে এনে একখানি চিত্র আঁকিয়ে তা রাজসভার দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখুন।

রাজা তাতে রাজী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরকে ডাকা হলো। রাজা তাকে বললেন, ভানুমতীর রূপ সঠিকভাবে চিত্রিত করে দাও। চিত্রের রূপ যেন তার যথাযথ প্রতিচ্ছবি হয়।

চিত্রকর তখন ভানুমতীকে একবার সামনাসামনি দেখতে চাইল।

রাজা ভানুমতীকে আনিয়ে দেখালেন চিত্রকরকে। চিত্রকর ভানুমতীর

মধ্যে পদ্মিনী নারীর লক্ষণ দেখতে পেল। তার অঙ্গ কোমল, তার অঙ্গগন্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মত। নয়ন চকিত হরিণীর মত।

রাজা চিত্রকরের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন চিত্রকরকে।

একদিন রাজগুরু শারদানন্দ এসে ভানুমতীর চিত্র দেখে চিত্রকরকে বললেন, তুমি ভানুমতীর দেহের সব লক্ষণগুলিই এঁকেছ। কিন্তু একটি ভুল থেকে গিয়েছে।

চিত্রকর বুঝতে না পেরে বলল, কি ভুল প্রভু বলুন।

শারদানন্দ বললেন, ভানুমতীর বাম জঘনস্থলে তিলের মত একটি মৎস্য-চিহ্ন আছে। সেটিকে বাদ দিয়েছ তুমি।

রাজা শারদানন্দের কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য রাত্রিতে ভানুমতীর বাম জঘনস্থল পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখলেন শারদানন্দ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তিনি ভেবে পেলেন না ভানুমতীর দেহের এই গুপ্তস্থানের কথা শারদানন্দ জানলেন কি করে। তবে কি ভানুমতীর সঙ্গে কোন সময়ে অবৈধ সম্পর্ক ছিল শারদানন্দের?

রাজা মনে মনে এই সব কথা ভেবে মন্ত্রীকে ডেকে সব কথা বললেন।

মন্ত্রী বললেন, এসব সত্যও হতে পারে। কিছু বলা যায় না।

রাজা বললেন, তুমি যদি আমার প্রিয়পাত্র হও তাহলে শারদানন্দকে হত্যা করার ব্যবস্থা কর।

মন্ত্রী সকলের সামনেই বন্দী করলেন শারদানন্দকে।

রাজার আদেশে শারদানন্দকে বধ করার জন্য যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন শারদানন্দ একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন পথে। তার অর্থ হলো, মানুষ বলে. যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুর মধ্যে, জলের মধ্যে, সমুদ্রে বা পাহাড়ের চূড়ায় যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় থাকুক না কেন, তার পূর্বের কোন পুণ্য থাকলে সেই পুণ্য তাকে রক্ষা করে।

মন্ত্রী শারদানন্দের কাছেই ছিলেন। তিনি ভাবলেন, আমি ব্রাহ্মণহত্যা করে পাপের ভাগী হই কেন? এ কাজ করা আমার ঠিক হবে না।

এই ভেবে তিনি শারদানন্দকে সকলের অজ্ঞাতসারে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গোপনে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর রাজার কাছে গিয়ে বললেন, আপনার আদেশ পালন করা হয়েছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন রাজপুত্র জয়পাল মৃগয়া করার জন্য

বনে গেল। তখন কতকগুলি অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। তা দেখে মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধিসাগর বলল, রাজকুমার, আজ মৃগয়ায় গিয়ে কাজ নেই। চারদিকে অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

রাজকুমার বলল, এসব কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না।

মন্ত্রীপুত্র তাকে অনেক করে বোঝালেও তা শুনল না রাজকুমার। সে মৃগয়ায় চলে গেল।

মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে বলল, তোমার বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তোমার বিনাশ-কাল উপস্থিত। স্বর্ণমৃগের লোভে রামচন্দ্রেরও এমনি একদিন বুদ্ধিনাশ হয়েছিল।

এদিকে রাজকুমার বনে গিয়ে অনেক হিংস্র জন্তু বধ করার পর একটি কালো হরিণের পিছু ধাওয়া করে গভীর বনে প্রবেশ করল। হঠাৎ দেখল সেই হরিণটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার সঙ্গে কোন সৈন্য বা অনুচর নেই।

যাই হোক, রাজকুমার ঘোড়ায় চড়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল। গিয়ে একটি সরোবর দেখতে পেল।

সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে একটি গাছের সঙ্গে ঘোড়াটিকে বেঁধে গাছের নিচে ক্লান্ত হয়ে বসল। এমন সময় সেখানে একটি বাঘ এসে পড়লে ঘোড়াটি বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে গেল।

রাজপুত্রও ভয় পেয়ে সেই গাছের উপর উঠে গেল। বাঘটা গাছের নিচে বসে রইল। সেই গাছে একটা ভালুক ছিল।

ভালুক রাজকুমারকে বলল, তুমি আমার অতিথি। তোমার কোন ভয় নেই। তুমি এখানে থাক। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। বাঘও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ভালুকের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে খুশি হলো রাজপুত্র। বাঘটি তেমনি গাছতলায় বসে রইল।

দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকার নেমে এল বনে। ক্লান্ত রাজ-পুত্রের চোখে ঘুম নেমে এল। সে বসে থাকতে পারছিল না।

ভালুক বলল, গাছ থেকে পড়ে গেলে তোমার বিপদ হবে। তুমি বরং আমার কোলে ঘুমোও।

রাজপুত্র ভালুকের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাঘ তখন ভালুককে বলল, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। আজ তুমি যার জীবন

রক্ষা করছ পরে সে কোনদিন শিকার করতে এসে আমাদের বধ করবে। ও আমাদের শত্রু। সুতরাং ওকে তুমি ফেলে দাও গাছ থেকে।

ভালুক বলল, ওর চরিত্র যাই হোক, ও এখন আমার শরণাগত। ওকে রক্ষা করা আমার পবিত্র কর্তব্য।

রাজপুত্রের একসময় ঘুম ভাঙ্গলে ভালুক বলল, এবার বোধহয় তোমার ক্লান্তি দূর হয়েছে। এবার তুমি জেগে থাক, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

এই বলে ঘুমিয়ে পড়ল ভালুক।

বাঘ তখন রাজপুত্রকে বলল রাজকুমার, ভালুককে বিশ্বাস করো না। নখই ওর অস্ত্র। শাস্ত্রে বলে যাদের নখ, শিং অথবা হাতে অস্ত্র আছে তাদের বিশ্বাস করতে নেই। এই ভালুক আমার হাত থেকে রক্ষা করে তোমাকে খাবে। সুতরাং এই সুযোগে তুমি ওকে ফেলে দাও। ওকে খেয়ে আমি চলে যাই। তুমি বাড়ি চলে যাও।

রাজপুত্রের মনে হলো বাঘ ঠিকই বলেছে। তাই সে ঘুমন্ত ভালুককে ঠেলে গাছ থেকে ফেলে দিল। কিন্তু পড়তে পড়তে গাছের একটা ডাল ধরে বেঁচে গেল ভালুক।

রাজপুত্র এবার ভয় পেয়ে গেল। একূল ওকূল দুদিকই গেল তার।

ভালুক তখন তাকে বলল, পাপিষ্ঠ, ভয় পাচ্ছ কেন? যেমন কর্ম করেছ তার ফল তোমায় ভোগ করতেই হবে। এখন থেকে তোমাকে পিশাচরূপ লাভ করে 'সসেমিরা' এই কথা অনবরত বলে বলে বেড়াতে হবে।

ক্রমে রাত্রি ভোর হয়ে গেলে বাঘ সেখান থেকে চলে গেল। ভালুক অভিশাপ দেবার পর চলে গেল সেই গাছ থেকে।

এদিকে রাজপুত্রও পিশাচ হয়ে বনে বনে ঘুরতে লাগল আর মুখে 'সসেমিরা' এই কথাটা বলে যেতে লাগল।

রাজপুত্রের শূন্য ঘোড়াটি রাজধানীতে ফিরে গেলে রাজার লোকেরা রাজাকে জানাল।

রাজা তখন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, কুমার যখন মৃগয়া করতে যায় তখন অনেক কুলক্ষণ দেখা যায়। তবু সে কিছু গ্রাহ্য করেনি। সে নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে। আমি এখনি বনে তার খোঁজে যাব।

মন্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

রাজা তাঁর অনুচরদের নিয়ে বনে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখলেন রাজপুত্র পিশাচ হয়ে 'সসেমিরা' বলতে বলতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাজপুত্রকে তখন সঙ্গে করে প্রাসাদে নিয়ে এসে রাজা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই কোন ফল হলো না।

রাজা তখন মন্ত্রীকে বললেন, এই সময় শারদানন্দ থাকলে তিনি রাজপুত্রকে ঠিক সুস্থ করে তুলতে পারতেন। আমি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ভুল করেছি।

মন্ত্রী বললেন, এখন তাহলে কি করতে চান?

রাজা বললেন, রাজ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হোক যে ব্যক্তি আমার কুমারের রোগ সারিয়ে তাকে ভাল করে তুলতে পারবে, তাকে আমি অর্ধেক রাজত্ব দান করব।

মন্ত্রী তখন বাড়িতে গিয়ে শারদানন্দকে রাজার কথা সব বললেন।

শারদানন্দ মন্ত্রীকে বললেন, আপনি রাজাকে গিয়ে বলুন, আমার একটি কন্যা আছে। রাজা এই বাড়িতে এসে তার সঙ্গে দেখা করলে সে কুমারের আরোগ্যলাভের উপায় বলে দেবে।

মন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে এই কথা বললেন।

রাজা সভাসদদের সঙ্গে মন্ত্রীদের বাড়িতে এলেন। রাজপুত্রও 'সসেমিরা' বলতে বলতে তাঁদের সঙ্গে এল।

কিন্তু মন্ত্রীকন্যা দেখা দিল না সামনে এসে। মন্ত্রী বলল, সে যা বলবে পর্দার আড়াল থেকেই বলবে।

এদিকে শারদানন্দই পাশের ঘরের মধ্যে পর্দার আড়াল থেকে মন্ত্রীকন্যার নামে একটি শ্লোক আবৃত্ত করলেন। এই শ্লোকটির প্রথমে ছিল 'সদ্ভাব' এই শব্দটি। শ্লোকটির অর্থ হলো যে সত্যনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত তাকে বঞ্চনা করার মধ্যে কোন নৈপুণ্য বা কৃতিত্ব নেই। কোলের মধ্যে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে থাকা শিশুকে বধ করার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই।

এই শ্লোকটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'সসেমিরা' শব্দটি থেকে প্রথম বর্ণ 'স' বাদ দিয়ে কেবল 'সেমিরা' শব্দটি উচ্চারণ করতে লাগল।

তখন শারদানন্দ আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন যার প্রথম শব্দ ছিল 'সেতুং'। শ্লোকটির অর্থ হলো সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও গঙ্গাসাগরে গেলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর মুক্তি কোথাও নেই।

এই শ্লোকটি শোনার পর রাজপুত্র 'সসে' বাদ দিয়ে শুধু 'মিরা' শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল।

শারদানন্দ এবার তৃতীয় শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন। এই শ্লোকের প্রথমে ছিল 'মিত্রদ্রোহী' শব্দটি। এই শ্লোকের অর্থ হলো পৃথিবীতে মহাপ্রলয় নেমে না আসা পর্যন্ত মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতকদের নরকভোগ করে যেতে হয়।

এই শ্লোক শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'সসেমি' বাদ দিয়ে শুধু 'রা' বলতে লাগল রাজপুত্র।

এর পর শারদানন্দ চতুর্থ শ্লোক আবৃত্তি করলেন। এই শ্লোকের প্রথমে ছিল 'রাজা' শব্দটি। এই শ্লোকের অর্থ ছিল, মহারাজ, আপনার পুত্রকে যদি সুস্থ করে তুলতে চান তাহলে ব্রাহ্মণদের দান আর দেবতাদের আরাধনা করুন।

চতুর্থ শ্লোকটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র 'সসেমিরা' শব্দটি উচ্চারণ করা ছেড়ে দিল একেবারে। সে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মত হয়ে উঠল। সে তখন বনের মধ্যে সেদিন ভালুকের সঙ্গে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল তা সব খুলে বলল।

রাজা তখন মন্ত্রীকন্যার উদ্দেশ্যে বললেন, কুমারী, তুমি ত কোনদিন বনে যাওনি, তুমি কিকরে কুমারের এই সব বৃত্তান্ত জানলে?

শারদানন্দ তখন পর্দার আড়াল থেকে বললেন, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কৃপায় আমার জিহ্বায় সব সময় সরস্বতী বাস করেন। তাই আমি সব কিছু জানতে পারি যেমন জেনেছিলাম ভানুমতীর অঙ্গের তিল।

রাজা এবার আশ্চর্য হয়ে পর্দা সরিয়ে শারদানন্দকে দেখতে পেলেন। রাজা তখন শারদানন্দকে প্রণাম করলেন।

রাজা খুশি হয়ে মন্ত্রীকে বলতে লাগলেন, এখন বুঝলাম সৎ সংসর্গে বাস করা সব মানুষের কর্তব্য। সৎ সংসর্গে বাস করলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আজ তোমার জন্যই আমার পুত্র রক্ষা পেল। রাজার উচিত উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ মন্ত্রীর সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করা।

এইভাবে রাজা মন্ত্রীর অনেক গুনগান করে তাঁকে নানা দানে সন্তুষ্ট করলেন।

ভোজরাজের মন্ত্রী বহুশ্রুতের কাহিনী এখানেই শেষ হলো।

প্রথম উপাখ্যান

তখন ভোজরাজ তাঁর মন্ত্রীর প্রশংসা করে বস্ত্র ও রত্ন দিয়ে তাঁর সম্মান করে সিংহাসনটিকে নগরমধ্যে নিয়ে এলেন। একহাজার স্তম্ভবিশিষ্ট এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়ে তার মধ্যে সিংহাসনটিকে বসানো হলো।

এক শুভদিনে রাজা সেই সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য তার সামনে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ করলেন রাজাকে। রাজা গরীব দুঃখীদের অনেক দান করলেন।

ভোজরাজ সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য প্রথম পুতুলের মাথার উপর পা দিতেই পুতুল জীবন্ত কথা বলতে লাগল। সে বলল, মহারাজ, এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের। বিক্রমাদিত্যের মত আপনার যদি সাহস, বীরত্ব ও উদারতা প্রভৃতি গুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বললেন, যে সব গুণের কথা তুমি বললে সেই সব গুণই আমার আছে। আমি দান করেছি অনেক।

পুতুল বলল, আপনি নিজ মুখে নিজের গুণকীর্তন করছেন এটাই ত আপনার একটা দোষ। সজ্জন ব্যক্তিরা কখনো নিজের গুণকীর্তন ও পরের নিন্দা করে না।

পুতুলের কথা শুনে ভোজরাজ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। নিজের প্রশংসা করে আমি ভুল করেছি। তুমি এই সিংহাসন যাঁর তাঁর উদারতার কথা বল।

পুতুল বলল, রাজা বিক্রমাদিত্য কেউ টাকার আশায় তাঁর কাছে এলেই তাকে এক হাজার মোহর দিতেন। কেউ তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে দশ হাজার এবং মহৎ লোককে এক লক্ষ মোহর দান করতেন। আবার কারো উপর বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হলে এক কোটি মোহর দান করতেন তাকে। আপনার যদি এই উদারতা থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য দ্বিতীয় পুতুলের মাথায় পা দিতেই পুতুলটি জীবন্ত হয়ে বলল, মহারাজ, আপনার যদি বিক্রমাদিত্যের মত ধৈর্য থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বললেন, বিক্রমাদিত্যের ধৈর্য কিরকম ছিল তা বল।

পুতুল বলল, একবার রাজা বিক্রমাদিত্য চরদের বললেন, তোমরা দেশ-ভ্রমণে যাও। যেখানে যত আশ্চর্য বস্তু দেখবে আমাকে এসে বলবে। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে তা দেখব।

চরেরা তখনি দেশভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ল চারদিকে। কিছুদিন পর এক চর এসে বলল, মহারাজ, চিত্রকূট পাহাড়ের কাছে এক তপোবনে এক দেবমন্দির আছে। সেখানে পাহাড় থেকে এক নির্মল জলের ধারা বেরিয়ে আসছে। সে জলে স্নান করলে সব পাপ দূর হয়ে যায়। সে জলে কোন মানুষ স্নান করলে পুণ্যবান হয়ে ওঠে। সেই দেবালয়ের কাছে এক ব্রাহ্মণ হোম করছেন। রোজ তিনি হোমকুণ্ডে আহুতি দেন। তারপর কুণ্ডের ধারে ছাই-এর গাদার সঙ্গে মিশে থাকেন। এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা আমি কখনো দেখিনি জীবনে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে রাজা তখনি সেই চরের সঙ্গে চলে গেলেন চিত্রকূট পাহাড়ের কাছে।

তিনি দেখলেন, জায়গাটি সত্যিই মনোরম। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, এ স্থান অতি পবিত্র। দেবী জগদম্বা বিরাজ করেন এখানে।

এর পর রাজা সেই পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার জলে স্নান করে মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর সেই পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, আপনি কত বছর এই মন্দিরে কাজ করছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন রেবতী নক্ষত্রে ছিল সেই সময় থেকে এই মন্দিরে হোম করে আসছি। সপ্তর্ষিমণ্ডল এখন অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থান করছে। এই কাজে আমার একশো বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। তবু দেবতারা তুষ্ট হলেন না বা আমায় দেখা দিলেন না।

রাজা বিক্রমাদিত্য নিজে সেই হোমকুণ্ডে আহুতি দিলেন। তবু প্রসন্ন হলেন না দেবতা।

তখন বিক্রমাদিত্য দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে দেবী, আমি আমার এই মাথা তোমায় নিবেদন করলাম।

এই বলে তিনি খড়্গ ধরে নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হতেই দেবী তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে হাত ধরে বললেন, রাজা, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর। তুমি বর চাও।

রাজা তখন দেবীকে বললেন, হে দেবী, এই ব্রাহ্মণ বহুকাল ধরে এখানে হোম করছেন, তবু তুমি কেন প্রসন্ন হচ্ছ না তাঁর উপর ? আর আমার উপরেই বা এত শীঘ্র প্রসন্ন হলে কেন ?

দেবী বললেন, এই ব্রাহ্মণ হোম ও পূজা করছে ঠিক, কিন্তু ওর তেমন কোন একাগ্রতা নেই। আঙুলের ডগা দিয়ে ব্যস্তভাবে যে জপ করা হয়, তাতে কোন ফল হয় না। দেবতা মাটি কাঠ বা পাথরের মূর্তির মধ্যে থাকে না, দেবতা থাকে মনের ভাবের মধ্যে। মন্ত্র, দেবতা ও ঔষধের উপর যার যেমন ভাবনা ও বিশ্বাস তার সেই রকমই সিদ্ধি হয়।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ করো।

দেবী বললেন, তুমি পরোপকারী গাছের মত নিজে কষ্ট করে অন্যের পরিশ্রমের ফল পূর্ণ করছ। যে পরোপকার করে তার জীবন সার্থক হয়।

এইভাবে রাজার গুণগান করে দেবী ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। রাজাও তাঁর রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

তার কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, আপনার যদি এমন ধৈর্য থাকে তাহলে সিংহাসনে বসুন।

স্থির হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

তৃতীয় উপাখ্যান

পরদিন রাজা আবার সিংহাসনে বসার জন্য তৃতীয় পুতুলের মাথায় পা দিতেই সেই পুতুল জীবন্ত হয়ে বলল, আপনি যদি বিক্রমাদিত্যের মত আপন-পর ভেদ-জ্ঞান ত্যাগ করতে পারেন তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বললেন, তুমি সেই রাজার আপন-পর ভেদের কথা বল।

পুতুল বলল, বিক্রমাদিত্যের আপন-পর বলে কিছু ছিল না। সাহস, ধৈর্য ও উদ্যমে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

একদিন বিক্রমাদিত্য ভাবলেন, এই সংসার অসার, জীবন অনিত্য। শাস্ত্রে বলে, উপার্জিত অর্থ ভোগ অথবা দান করতে হয়। আমি আমার অর্থ যথাসম্ভব সৎপাত্রে দান করব।

এই সব ভেবে বিক্রমাদিত্য সর্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন। শিল্পীরা এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করল। রাজা চারদিকে লোক পাঠিয়ে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মুনি ঋষিদের নিমন্ত্রণ করলেন।

রাজার পক্ষ থেকে সমুদ্রকে নিমন্ত্রণ করার জন্য এক ব্রাহ্মণ সমুদ্রতীরে গিয়ে যোড়শোপচারে সমুদ্রের পূজা করে বলল, হে সমুদ্র, রাজা বিক্রমাদিত্যের আদেশে আমি তোমায় আহ্বান করতে এসেছি।

এই বলে সমুদ্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সেখানে বসে রইল ব্রাহ্মণ। কেউ কোন উত্তর না দেওয়ায় ব্রাহ্মণ উজ্জয়িনীতে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হতেই সমুদ্র এক সাধুর বেশে তার কাছে এসে বললেন, বিক্রমাদিত্য আমাকে আমন্ত্রণ করতে তোমাকে পাঠিয়েছে। এতে আমি সম্মানিত হলাম। বন্ধু দূরে থাকলেও তার প্রতি ভালবাসা কম হয় না। রাজা যে যজ্ঞ করতে চলেছেন তার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমি চারটি রত্ন দিলাম। প্রথমটির সাহায্যে ধনরত্ন, দ্বিতীয়টির সাহায্যে খাদ্য, তৃতীয়টির সাহায্যে অশ্ব ও সৈন্য আর চতুর্থটির সাহায্যে অলঙ্কার পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ তখন রত্ন চারটি নিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে এসে রাজাকে তা দিলেন। তখন যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। বিক্রমাদিত্য তাঁর সব ধনরত্ন দান করে দিয়েছেন। কিছুই অবশিষ্ট নেই। ব্রাহ্মণকে কি দেবেন তা ভেবে পেলেন না। তখন সমুদ্রদত্ত চারটি রত্নের মধ্যে যে কোন একটিকে খুশিমত বেছে নিতে বললেন ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ বলল, আমি বাড়ি গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা করব কোনটা নেব।

ব্রাহ্মণ বাড়িতে গিয়ে রত্নগুলির গুণ বর্ণনা করল। তা শুনে তার ছেলে বলল, যে রত্ন দিয়ে সৈন্য পাওয়া যাবে সেইটাই নাও। তাহলে সৈন্যদের সাহায্যে রাজত্ব করা যাবে।

ব্রাহ্মণের স্ত্রী বলল, যে রত্ন দিয়ে খাদ্য পাওয়া যাবে সেটাই নাও। কারণ খাদ্যের জন্যই মানুষ বেঁচে থাকে। মর্ত্যবাসীদের বেঁচে থাকার জন্য বিধাতা যে অন্ন দিয়েছেন তার জন্যই প্রার্থনা করা উচিত।

পুত্রবধূ বলল, যে রত্ন দিয়ে অলঙ্কার পাওয়া যায় সেটা নিন। কারণ অলঙ্কারের দ্বারা দেবতাদের প্রীতি লাভ করা যায়।

ব্রাহ্মণ নিজে বলল, যে রত্ন দিয়ে ধন পাওয়া যায় সেইটাই নেওয়া উচিত। কারণ ধন থেকেই সব পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ এবার রাজার কাছে ফিরে এসে চারজনের চার মতের কথা বলল। রাজা তখন তাকে চারটি রত্নই দান করলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, দান করলেই দাতা হওয়া যায় না। আপনি যদি বিক্রমাদিত্যের মত এমন দাতা হন তাহলেই এ সিংহাসনে বসুন।

চতুর্থ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসার জন্য চতুর্থ পুতুলের মাথায় পা দিতেই পুতুল জীবন্ত হয়ে বলল, মহারাজ আগে আমার একটি কাহিনী শুনুন।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন জ্ঞানী তেমনি গুণবান। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

এজন্য মনের দুঃখে দিন কাটত ব্রাহ্মণের। একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে মহাদেব বললেন, তুমি প্রদোষ ব্রতের অনুষ্ঠান করো। তাহলে সন্তান হবে।

সকালে উঠে ব্রাহ্মণ গ্রামের বৃদ্ধদের বললেন স্বপ্নের কথাটা।

বৃদ্ধরা সকলে বলল, এ স্বপ্ন সত্য। তুমি প্রদোষ ব্রতের অনুষ্ঠান করো। তোমার সন্তান হবে।

সকলের কথা শুনে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে শনিবারে প্রদোষ ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন ব্রাহ্মণ। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রবর দান করলেন ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ পুত্রলাভ করে পুত্রের নাম রাখলেন দেবদত্ত।

যথাসময়ে ছেলের পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন ব্রাহ্মণ। কালক্রমে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল দেবদত্ত। দেবদত্তের বয়স যখন ষোল তখন তার বিয়ে দেওয়া হলো।

ছেলের বিয়ে দেবার পর ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে চলে গেলেন। যাবার সময় ছেলেকে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গেলেন। তিনি বলে গেলেন কখনো নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করবে না, কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না।

সকলকে দয়া করবে। ভগবানের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস রাখবে। সাধুদের সেবা করবে। নিজের আয় দেখে ব্যয় করবে। কুসঙ্গে মিশবে না কখনো এবং মেয়েদের কাছে কখনো গোপন কথা বলবে না। এই সব উপদেশগুলি মেনে চললে জীবনে শান্তি পাবে।

দেবদত্ত তার বাবার উপদেশমত দিন কাটাতে লাগল। একদিন সে হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গেল।

দেবদত্ত যখন বনের ভিতর কাঠ কাটছিল তখন রাজা বিক্রমাদিত্য শিকার করতে গিয়েছিলেন সেই বনে। তিনি তখন একটি শূয়োরের পিছনে ছুটতে ছুটতে সেই বনে এসে পড়েছিলেন। সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

এমন সময় সহসা দেবদত্তের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। রাজা দেবদত্তকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করাতে দেবদত্ত নিজে রাজাকে সঙ্গে করে নগরে পৌঁছে দিল। খুশি হয়ে দেবদত্তকে এক মর্যাদাপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত করলেন রাজা।

রাজা তবু মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলতেন, দেবদত্তের ঋণ কি করে আমি শোধ করব ?

দেবদত্ত ভাবল রাজার এই দুঃখটা সত্যি কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এই ভেবে একদিন দেবদত্ত রাজার ছেলেকে চুরি করে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখল। তারপর রাজপুত্রের গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে তার চাকরকে দিয়ে স্যাকরার দোকানে বিক্রি করতে পাঠাল।

এদিকে রাজবাড়িতে রাজার ছেলেকে কোথাও পাওয়া গেল না। সারা নগরে একথা প্রচার হয়ে গেল। ছেলেকে খোঁজার জন্য চারদিকে লোক পাঠানো হলো।

রাজার লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে একটি স্যাকরার দোকানে দেখল দেবদত্তের চাকর রাজপুত্রের গয়না বিক্রি করছে সেই দোকানে। তারা তখন তাকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

রাজার লোকেরা চাকরকে জিজ্ঞাসা করল, এ গয়না পেলি কোথায় ?

চাকর বলল, দেবদত্ত এগুলো আমায় বিক্রি করতে পাঠিয়েছে।

রাজা তখন দেবদত্তকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবদত্ত, এই গয়না কে তোমায় দিল ?

দেবদত্ত বলল, কেউ দেয়নি। আমি টাকার লোভে কুমারকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বধ করে চাকরের হাত দিয়ে তার এই সব গয়না বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে যা খুশি শাস্তি দিতে পারেন।

তখন রাজপুরুষেরা বলল, মহারাজ এ শিশুহত্যা করেছে, তার উপর সোনা চুরি করেছে অতএব একে শতখণ্ড করে চিলকে দিয়ে খাওয়ানোর আদেশ দিন।

দেবদত্ত সর্বশাস্ত্রবিদ হয়েও একাজ কেন করল তা রাজসভার লোকেরা কেউ ভেবে পেল না।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, দেবদত্ত আমার আশ্রিত। তাছাড়া একদিন ও আমায় বনের মধ্যে পথ দেখিয়ে দিয়ে মহা উপকার করেছে। আশ্রিতের দোষ গুণ চিন্তা করা সং ব্যক্তির কর্তব্য নয়। উপকারীর প্রতি সদ্ব্যবহার সকলেই করে, কিন্তু অপকারীর প্রতি যে সদ্ব্যবহার করে সে-ই প্রকৃত সাধু।

রাজা এবার দেবদত্তকে বললেন, দেবদত্ত তুমি ভয় পাবে না। আমি আমার পূর্বের কর্মফলের জন্য ছেলেকে হারিয়েছি। আমি বুঝলাম উপকারী একবার উপকার করলে তার ঋণ কোনদিন শোধ করা যায় না।

এর পর রাজা বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি নানা উপহার দেবদত্তকে দিয়ে তাকে সসম্মানে ছেড়ে দিলেন।

দেবদত্ত তখন তার ঘরে গিয়ে রাজকুমারকে এনে রাজাকে দিল। রাজসভায় সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। রাজা বললেন এ কি ব্যাপার দেবদত্ত ?

দেবদত্ত বলল, আগে আপনি প্রায়ই বলতেন আমার উপকারের ঋণ থেকে আপনি মুক্ত হতে পারছেন না। আপনার কথা সত্য কি না তা পরীক্ষা করার জন্যই এ কাজ করেছিলাম আমি। এখন দেখলাম সত্যিই আপনি জগতের উপকারী। আপনিই প্রকৃত সজ্জন। আপনার কৃতজ্ঞতার তুলনা হয় না।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, যদি আপনার এমন ঔদার্যগুণ ও কৃতজ্ঞতা গুণ থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পঞ্চম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল বলল, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এক রত্নবণিক একদিন এসে রাজাকে একটি মহামূল্যবান রত্ন উপহার দেয়।

রাজা তখন রত্নবিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের ডেকে বললেন, এই রত্নটি পরীক্ষা করে এর মূল্য কত তা আমাকে জানাও।

পরীক্ষা করে রত্নকারেরা জানাল, মহারাজ, এটি এক অমূল্য রত্ন। কিন্তু এর সঠিক মূল্য না জেনে কিনলে মহা অনিষ্ট ঘটবে।

রাজা এবার রত্নবণিককে অনেক কিছু উপহার দিলেন এবং এই ধরনের আর রত্ন তার কাছে আছে কি না তা জানতে চাইলেন।

বণিক বলল, মহারাজ, এই ধরনের রত্ন বর্তমানে আমার কাছে নেই। আমার বাড়িতে এই রকম দশটি রত্ন আছে। প্রয়োজন হলে দাম দিয়ে তা নিতে পারেন।

রত্নপরীক্ষকরা একটি রত্ন পরীক্ষা করে দাম ঠিক করে বলল, একটি রত্নের দাম ছয় কোটি টাকা। এর পর রাজা হিসাব করে টাকা দিয়ে একজন বিশ্বস্ত লোককে বণিকের সঙ্গে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, আজ হতে আটদিনের মধ্যে রত্ন নিয়ে ফিরে এলে উপযুক্ত উপহার দেব।

লোকটি বলল, আট দিনের মধ্যে ফিরতে না পারলে আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

এই বলে সে রত্নবণিকের সঙ্গে তার বাড়ি চলে গেল।

বণিক তার বাড়িতে গিয়ে দশটি রত্ন রাজার লোকের হাতে দিয়ে দিল। লোকটি যখন বাড়ি ফিরছিল তখন পথে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো।

পথে একটি নদী ছিল। প্রবল বৃষ্টির জন্য প্লাবন দেখা দিল নদীতে। পারাপারের খেয়া বন্ধ।

রাজার লোকটি নাবিককে বলল, আমাকে নদী পার করিয়ে দাও।

নাবিক বলল, নদীতে এখন প্রবল স্রোত। এ অবস্থায় নৌকো চালানো বিপজ্জনক।

লোকটি বলল, আজ আমাকে রাজার কাছে যেতেই হবে। আমার

কাছে দশটি রত্ন আছে। সেই রত্ন নিয়ে আজ রাজার কাছে পৌঁছতে না পারলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে আমাকে।

নাবিক বলল, আমাকে যদি পাঁচটি রত্ন দাও তাহলে আমি কষ্ট করে তোমাকে নদী পার করে দিতে পারি।

কোন উপায় না দেখে লোকটি দশটি রত্নের মধ্যে পাঁচটি দিয়ে দিল নাবিককে।

লোকটি রাজার কাছে গিয়ে বাকি পাঁচটি রত্ন রাজাকে দিল।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বণিক কি তাহলে তোমাকে দশটি রত্ন দেয়নি ?

লোকটি বলল, বণিক আমাকে দশটি রত্নই দিয়েছিল। কিন্তু ফেরার পথে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় নদীতে প্লাবন দেখা দেয়। নাবিক কিছুতেই নদী পার করছিল না। এদিকে আজকে আমি ফিরব বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। তাই কোন উপায় না দেখে পাঁচটি রত্ন নাবিককে দিয়ে নদী পার হই।

রাজা লোকটির কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ঐ পাঁচটি রত্নও দিয়ে দিলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি বলল, মহারাজ, আপনার যদি ঐ রূপ উদারতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ নিরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ষষ্ঠ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে একটি কাহিনী শুনুন।

একবার চৈত্রমাসে বসন্ত উৎসবকালে বিক্রমাদিত্য রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করার জন্য নগর বাইরে শৃঙ্গার বনে গমন করেন। নানা গাছ ও ফুল ফলে শোভিত ছিল সে বন।

সেই বনের কাছে চণ্ডিকাদেবীর একটি মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে এক-জন ব্রহ্মচারী সাধনা করত। রাজাকে সেই বনে রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে দেখে ভোগবাসনা জাগে ব্রহ্মচারীর মনে। সে মনে মনে ভাবল, শুধু তপস্যা করে করে সারা জীবনটা কাটালাম। সংসার সুখ ও নারীসঙ্গ কি জিনিস তা জানলাম না।

সে আরও ভাবল, আমার পরম সৌভাগ্য এই সময় এখানে রাজা বিক্রমাদিত্য উপস্থিত আছেন। আমি বরং তার কাছ থেকে একখণ্ড জমি দান হিসাবে চেয়ে নিয়ে কোন সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে ভোগসুখে বাকি জীবনটা কাটাব।

এই ভেবে রাজার কাছে এসে রাজাকে আশীর্বাদ করল ব্রহ্মচারী।

রাজা তাঁকে বললেন, হে ব্রহ্মচারী, কোথা হতে আসছেন আপনি?

ব্রহ্মচারী বলল, আমি ঐ জগদম্বার মন্দিরের পূজারী। আমি পঞ্চাশ বছর ধরে ব্রহ্মচারীরূপে দেবীর সেবা করে আসছি। আজ রাত্রিশেষে দেবী আমায় বললেন, এবার তুমি সংসারী হও, পুত্র উৎপাদন করো। পরে মোক্ষলাভের চেষ্টা করবে। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—এই তিন আশ্রমের কাজ না করে যে মোক্ষলাভ করতে চায় তার মোক্ষলাভ হয় না। তুমি রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে গিয়ে তোমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করো। তিনি তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন।

ব্রহ্মচারী রাজা বিক্রমাদিত্যকে তার এই মনগড়া কাহিনীটি বলল।

রাজা বুঝতে পারলেন ব্রহ্মচারী মিথ্যা কথা বলছে। তবু তিনি ভাবলেন, এ এখন আমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছে। সুতরাং এর ইচ্ছা পূরণ করাই আমার কর্তব্য। শাস্ত্রে বলে, দীনজনে দান এবং আশ্রিতদের প্রতিপালন করে কোন রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন।

এই ভেবে রাজা বিক্রমাদিত্য সেই ব্রহ্মচারীকে সেখানে একটি নগর নির্মাণ করিয়ে তা দান করলেন। সেই সঙ্গে পঞ্চাশটি হাতি, পাঁচশত ঘোড়া, চার হাজার সৈনিক ও একশত বিলাসিনী রমণীও তাকে দিলেন। সেই নগরের নাম রাখলেন চণ্ডিকাপুর।

এই উপাখ্যান শেষ করে পুতুল বলল, হে মহারাজ, আপনার যদি এমন উদারতাগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ নিরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সপ্তম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করত। রাজ্যে কারো মনে কোন লোক হিংসা বা পাপপ্রবৃত্তি ছিল না। সকলের মনেই ছিল জীবের প্রতি দয়া আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

রাজধানীতে ধনদ নামে এক বণিক ছিল। সে ছিল অতুল ধনসম্পদের অধিকারী। কিন্তু ক্রমে ধনসম্পদের উপর বিতৃষ্ণা জাগল তার মনে। সে ভাবল শরৎকালের মেঘের মত সমস্ত ধন ঐশ্বর্য ও ভোগসুখ ক্ষণস্থায়ী। এ সংসার অনিত্য। সব কর্মের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ধর্মপথে চলার মধ্যেই আছে প্রকৃত সুখ।

সে ঠিক করল সৎপাত্রে দান করে তার অর্জিত ও সঞ্চিত সব ধনের সদ্ব্যবহার করতে হবে। বটগাছের ফল যেমন কোন ভাল জমিতে অল্প পরিমাণে পড়লেও তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় তেমনি সৎপাত্রে ধন দান করলে সে ধনও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

এই উদ্দেশ্যে ধনদ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে তার সমস্ত ধন সৎপাত্রে দান করতে আরম্ভ করল।

এরপর একদিন সে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য দ্বারাবতীর পথে রওনা হলো। সে ভাবল শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হলেই সফল হবে তার দানব্রত।

সমুদ্রতীরে গিয়ে দীন দরিদ্রকে অনেক কিছু দান করল ধনদ। তারপর দ্বারাবতী যাবার জন্য নৌকোয় চাপল। নৌকোয় করে যেতে যেতে দেখল সমুদ্রের মধ্যে একটি পর্বতের উপর একটি দেবমন্দির রয়েছে।

তৎক্ষণাৎ সেই মন্দিরে গিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীকে ভক্তিভরে পূজা দিল ধনদ। তারপর বাঁদিকে তাকাতেই সে দেখল এক পুরুষ ও এক নারীর ছিন্ন-মস্তক পড়ে রয়েছে এবং দেওয়ালের উপর লেখা আছে, যদি কোন পরোপ-কারী পুরুষ নিজের গলা কেটে সেই রক্ত দিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজা করে তাহলে এই পুরুষ ও নারী পুনরায় জীবন ফিরে পাবে।

এই দৃশ্য দেখে ধনদ বিস্মিত হলো। যাই হোক, সে দ্বারাবতী গিয়ে কৃষ্ণ-মূর্তি দর্শন করে স্তব ও পূজা নিবেদন করল। তারপর সে তার নিজের দেশে ফিরে এল।

সবাইকে কৃষ্ণের প্রসাদ বিতরণের পর সে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

রাজা তার কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে বললেন।

ধনদ তখন সমুদ্রের মধ্যে পর্বতোপরি সেই মন্দিরে দেখা দৃশ্যের কথা সব বলল।

এই দৃশ্যের কথা শুনে রাজা বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তিনি

ধনদকে সঙ্গে নিয়ে তখনি সেই মন্দিরের পথে চলে গেলেন। মন্দিরে গিয়ে বাঁ পাশে পড়ে থাকা সেই ছিন্ন মস্তক দুটিও দেখতে পেলেন।

রাজা তখন মনে মনে সংকল্প করলেন তিনি তাঁর মাথা কেটে সেই রক্তে দেবীর পূজা করে মৃত পুরুষ ও নারীকে পুনর্জীবিত করে তুলবেন।

এই ভেবে তিনি খড়্গ দিয়ে নিজের গলা কাটতে উদ্যত হতেই সেই ছিন্ন মস্তক দুটি আপনা থেকে নিজ নিজ দেহে যুক্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা জীবন ফিরে পেল।

দেবী ভুবনেশ্বরী তখন রাজার সামনে আবির্ভূত হয়ে রাজার হাত থেকে খড়্গটি নিয়ে বললেন, হে রাজন, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার ত্যাগ ও পরোপকারব্রত দেখে। এখন বর চাও আমার কাছে।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তবে এই দম্পতিকে রাজ্য দান করো।

দেবী তখন 'তথাস্তু' বলে সেই দম্পতিকে রাজ্য দান করলে রাজা ধনদকে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, এই রকম পরোপকার করার শক্তি যদি আপনার থাকে তাহলেই এ সিংহাসনে বসতে পারেন।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

অষ্টম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার উপক্রম করতেই আর একটি পুতুল তাঁকে বলল, আগে আমার কথা শুনুন। তারপর বসবেন।

পুতুল বলতে লাগল, রাজা বিক্রমাদিত্য নানা কারণে প্রসিদ্ধ ও ঔদার্যগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি চরদের মাধ্যমে রাজ্যের প্রজাদের অবস্থার কথা জানতেন।

একবার রাজার একদল চর রাজ্য পরিভ্রমণ করে এসে রাজার সঙ্গে দেখা করলে রাজা বিশেষ কিছু জানার থাকলে তা বলতে বললেন।

তখন চরেরা বলল, মহারাজ, কাশ্মীর রাজ্যে এক ধনী বণিক বাস করে।

সেই বণিক পাঁচক্রোশ লম্বা একটি পুকুর কাটিয়েছে। সেই পুকুরের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের একটি মন্দিরও নির্মাণ করিয়েছে। কিন্তু পুকুরে জল উঠছে না।

বণিক জলের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের দিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণের অনেক জপ তপ ও যাগযজ্ঞ করায়। তবু কিন্তু জল উঠল না পুকুরে।

বণিক তখন পুকুরের পাড়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগল, হায়, এত চেষ্টাতেও জল উঠল না। আমার সমস্ত অর্থ ও শ্রম বিফল হলো।

একদিন দৈববাণী হলো বণিকের উপর। দৈববাণী বলল, হে বণিক, দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের কণ্ঠরক্তে যেদিন এই পুকুরের মাটি সিক্ত হবে সেদিন এ পুকুর নির্মল জলে ভরে যাবে। এছাড়া জল পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই।

এই দৈববাণী শোনার পর সেই পুকুরের পাড়ে অন্নছত্র খুলল বণিক। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু লোক এসে আহার করতে লাগল।

বণিকের লোকেরা উপস্থিত লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে ঘোষণা করতে লাগল, যে ব্যক্তি তার কণ্ঠরক্ত দিয়ে এই পুকুরের মাটি সিক্ত করবে তাকে একশো কলসী সোনার টাকা দেওয়া হবে।

কিন্তু আজও পর্যন্ত কোন লোক এগিয়ে এল না তার কণ্ঠরক্ত দান করতে।

রাজা বিক্রমাদিত্য একথা চরমুখে শোনার পর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ কাশ্মীর রাজ্যে সেই বণিকের কাটানো পুকুরের পাড়ে চলে গেলেন।

পুকুর ও তার মাঝে নির্মিত বিষ্ণুমন্দির দর্শন করে প্রীত হলেন রাজা। তিনি ভাবলেন, আমার কণ্ঠরক্তে এই পুকুর নির্মল জলে ভরে উঠলে অসংখ্য লোকের উপকার হবে। আমার শরীর একশো বছর থাকলেও তা একদিন বিনষ্ট হবেই। সুতরাং পরের উপকারের জন্য এ জীবন দান করব।

এই ভেবে রাজা বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে পূজা সেরে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, হে জলদেবতা, তুমি আমার কণ্ঠরক্ত পান করে এই পুকুর জলে পরিপূর্ণ করে তোল।

এই বলে খড়্গ তুলে নিজে কণ্ঠচ্ছেদ করতে উদ্যত হতেই দেবতা তাঁর হাত থেকে খড়্গটি নিয়ে বললেন, হে বীর, তোমার বীরত্ব ও পরোপকার-ব্রত দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, হে দেব, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই পুকুরটি জলে পরিপূর্ণ কর।

দেব বললেন, হে রাজন, তুমি শীঘ্র এই পুকুরের তীরে উঠে যাও। তারপর এই পুকুরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেই পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

রাজা তখন দেবতার নির্দেশমত পুকুরের তীরে উঠে পুকুরপানে তাকাতেই সঙ্গে সঙ্গে নির্মল জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল পুকুরটি।

এরপর রাজধানীতে ফিরে গেলেন রাজা।

এই কাহিনী শেষ করে পুতুলটি বলল, হে রাজন, আপনার যদি এইরকম পরোপকারিতা ও ঔদার্যগুণ থাকে তবেই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নবম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলেই আর একটি পুতুল বলল, মহারাজ, আগে আমার কথা শুনুন। তারপর বসবেন।

পুতুল বলতে লাগল, রাজা বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রীর নাম ছিল ভট্টি, উপমন্ত্রীর নাম গোবিন্দ, সেনাপতির নাম চন্দ্রশেখর এবং পুরোহিতের নাম ছিল ত্রিবিক্রম।

ত্রিবিক্রমের পুত্রের নাম ছিল কমলাকর। কমলাকর খুব বিলাসী ছিল। সে তার বাবার টাকায় উত্তম খাদ্য ভোজন করত এবং মূল্যবান বস্ত্র পরত। এইভাবে সে বিলাসবহুল জীবন কাটাত।

এইসব দেখে কমলাকরের বাবা রাজপুরোহিত ত্রিবিক্রম একদিন তাঁর ছেলেকে বললেন, তুমি পূর্বজন্মের পুণ্যবলে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছ। কিন্তু তোমার মন বিলাসব্যসন ও ভোগ বাসনায় আসক্ত। তুমি পড়াশুনা বা কোন সৎকর্ম করো না। শুধু বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও। এখন বিদ্যার্জনের সময় যদি বিদ্যাভ্যাস না করো তাহলে পরে দারুণ দুঃখ পেতে হবে। যাদের বিদ্যা বা ধর্ম নেই তারা পৃথিবীর বোঝাস্বরূপ। বিদ্যার চেয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার আর নেই। দেশে বিদেশে বিদ্যাই প্রকৃত বন্ধু, বিদ্যাই প্রকৃত ধন। বিদ্যা রাজাদের কাছে পূজনীয়। বিদ্যাহীন ব্যক্তি মহাকুলজাত হলেও তার জন্ম বিফল। তাই বলছি, আমি যতদিন জীবিত থাকব তোমাকে বিদ্যাভ্যাস করে যেতে হবে।

বাবার কথা শুনে অনুতপ্ত হলো কমলাকর। সে মনে মনে সংকল্প করল, সে মানুষ হয়ে উঠবে। যেমন করে হোক উপযুক্ত বিদ্যার্জন করে সে যদি কোনদিন সর্বগুণে ভূষিত হয়ে উঠতে পারে তবেই সে তার বাবাকে এ মুখ দেখাবে।

এই সংকল্প সাধনের জন্য বাড়ি থেকে তখনি বেরিয়ে পড়ল কমলাকর। সে সোজা কাশ্মীর রাজ্যে চলে গেল। সেখানে গিয়ে পণ্ডিত চন্দ্রমৌলি ভট্টের সঙ্গে দেখা করল। তাঁকে প্রণাম করে সে বলল, আমি মূর্খ, আপনার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে বিদ্যালাভ করতে এসেছি আপনার কাছে। আপনি দয়া করে আমায় বিদ্যাদান করুন।

কমলাকরের নিষ্ঠা দেখে খুশি হলেন পণ্ডিত চন্দ্রমৌলি। তিনি বিদ্যাদানে সম্মত হলেন।

কমলাকর দিনরাত পরম যত্নসহকারে গুরুর সেবা করে যেতে লাগল।

এইভাবে অনেকদিন গুরুসেবার পর গুরু সদয় হলেন কমলাকরের উপর। একদিন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে সিদ্ধসারস্বত মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন কমলাকরকে। এই মন্ত্রবলে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল কমলাকর। তারপর গুরুর অনুমতি নিয়ে সে তার বাড়ি চলে গেল।

যাওয়ার পথে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হলো সে। তখন নরেন্দ্র সেন ছিলেন কাঞ্চীনগরের রাজা। সেই নগরে নরমোহিনী নামে এক রূপসী বারবণিতা ছিল। তাকে যে দেখত তার অসামান্য রূপে মোহগ্রস্ত ও উন্মাদ হয়ে যেত সে। আবার কেউ যদি তার ঘরে যেত তাহলে বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস এসে তাকে বধ করে তার রক্ত পান করত।

এই কথা শুনে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল কমলাকর। তাকে দেখে খুশি হলেন তার বাবা মা।

পরদিন সে তার বাবার সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে দেখা করল রাজার সঙ্গে। রাজাকে তার কিছু বিদ্যানৈপুণ্যও দেখাল।

রাজা তাকে নানা উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন।

এরপর পর বিদেশে গিয়ে কমলাকর উল্লেখযোগ্য কোন কিছু দেখেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

কমলাকর বলল, আমি যে দেশে গিয়েছিলাম সে দেশে কিছু দেখিনি। কিন্তু ফিরে আসার পথে কাঞ্চীনগরে এক অদ্ভুত কাহিনী শুনলাম।

রাজা বিক্রমাদিত্য তা শুনে কমলাকরকে নিয়ে কাঞ্চীনগরে চলে গেলেন।

বিক্রমাদিত্য সেখানে গিয়ে নরমোহিনীকে দেখে তার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হয়ে রাত্রিকালে তার ঘরে গেলেন। নরমোহিনী রাজাকে তাম্বুলদানে আপ্যায়িত করে বলল, আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করায় আমার গৃহ ধন্য হলো।

নরমোহিনী ঘুমিয়ে পড়লে রাজা সেই ঘরেই রয়ে গেলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে রাক্ষসের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে রাজা লুকিয়ে রইলেন ঘরের এক কোণে। ঘরের মধ্যে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছিল।

রাক্ষস ঘরের মধ্যে দেখল শুধু নরমোহিনী শুয়ে আছে। অন্য কোন লোক নেই। তাই সে ফিরে যাচ্ছিল। এমন সময় রাজা অতর্কিতে আক্রমণ করে বধ করলেন রাক্ষসকে।

গোলমাল শুনে নরমোহিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে রাক্ষসকে মৃত দেখে খুশি হয়ে রাজাকে বলল, হে রাজন, আজ আমি রাক্ষসের উপদ্রব হতে মুক্ত হলাম চিরদিনের মত। প্রতিদানে আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই করব।

রাজা বললেন, যদি আমার আদেশ পালনে সম্মত হও তাহলে কমলাকরকে বিয়ে করে তাকে সুখী করো।

রাজার আদেশমত নরমোহিনী স্বামীরূপে বরণ করে নিল কমলাকরকে।

এরপর উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, হে রাজন, যদি আপনার এসব মহৎ গুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

দশম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে দশম পুতুল বলল, থামুন রাজন, আগে আমার কথা শুনুন। তারপর বসবেন।

পুতুল বলতে লাগল, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একবার উজ্জয়িনীতে এক যোগী এসে উপস্থিত হন। বেদ, চিকিৎসা, গণিত, সঙ্গীত প্রভৃতি এমন বিদ্যা নেই যাতে পাণ্ডিত্য ছিল না সেই যোগীর। তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এই যোগীর খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে লোকমুখে।

রাজা তা শুনতে পেয়ে এই যোগীকে রাজসভায় আনার জন্য একজন পুরোহিতকে পাঠান।

পুরোহিতের সঙ্গে যোগী রাজার কাছে এসে বললেন, রাজন, আপনি যদি মন্ত্রসাধনা করেন তাহলে জরা মৃত্যুকে জয় করতে পারবেন।

রাজা বললেন, সে মন্ত্র আমায় শিখিয়ে দিলে আমি তা সাধনা করব।

যোগী তখন রাজাকে সেই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, একবছর ব্রহ্মচারী হয়ে এই মন্ত্র জপ করবেন। তারপর দুর্বাঘাস দিয়ে মন্ত্রজপ শেষ করে ঐ দুর্বাঘাসের দশভাগের এক ভাগ হোমের আগুনে আহুতি দেবেন। এইভাবে পূর্ণাহুতি দেবার পর সেই হোমকুণ্ড হতে এক পুরুষ ফলহাতে বেরিয়ে এসে সেই ফল আপনাকে দান করবে। সেই ফল খেলেই আপনি জরামৃত্যুহীন হয়ে উঠবেন। বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠবে আপনার দেহ।

এই বলে সেখান থেকে চলে গেলেন যোগী।

এদিকে সেই হোমানলে পূর্ণাহুতি দেবার সময় সেই জ্বলন্ত হোমকুণ্ড হতে এক দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হয়ে রাজাকে একটি ফল দান করলেন।

সেই ফল নিয়ে রাজা যখন নগরে প্রবেশ করে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শীর্ণদেহ এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে বললেন, হে রাজন, আপনি সকলের দুঃখ দূর করেন। আমার দুঃখ আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করুন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে দয়া হলো রাজার। তিনি তখন তাঁর সেই প্রাপ্ত ফলটি দিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণকে। ভাবলেন, এই ফলটি খেলেই জরাব্যাধি হতে মুক্ত হবে ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার যদি এমন গুণ থাকে তাহলে সিংহাসনে বসুন।

পুতুলের কথা শুনে হতবাক হয়ে রইলেন ভোজরাজ।

একাদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে একাদশ পুতুল বলল, মহারাজ, আগে আমার একটি কথা শুনুন। তারপরে বসবেন।

রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যাপারে রাজা বিক্রমাদিত্যের কোন

দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি অন্য সব রাজাদের নিজের অধীনে এনে তাদের উপর আদেশ দিয়ে রাজ্যপালন করতেন।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্যের দেশভ্রমণের ইচ্ছা হয়। তাই তিনি মন্ত্রীর উপর রাজকার্য পরিচালনার ভার দিয়ে সন্ন্যাসী সেজে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াতে থাকেন। যেখানে কিছু আশ্চর্য জিনিস দেখতে পান সেখানেই কিছুদিন থেকে যান।

এইভাবে একদিন তিনি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন এক বনপথে সূর্য অস্ত যায়। কাছে কোন ঘরবাড়ি দেখতে না পেয়ে একটি গাছে আশ্রয় নেন তিনি। সেই গাছে চিরঞ্জীব নামে এক বৃদ্ধ পাখি বাস করত। তার পুত্র ও পৌত্রেরা প্রতিদিন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে নিজেরা আহার করে সন্ধ্যাবেলায় একটি করে ফল এনে চিরঞ্জীবকে দিত। চিরঞ্জীব সেই ফল খেয়ে সুখে দিন কাটাত।

সেদিন রাতে চিরঞ্জীব ফল খাবার পর তার পুত্র ও পৌত্রদের জিজ্ঞাসা করল, তোমরা নানা স্থানে ঘুরে বেড়াও। কোথাও কোন আশ্চর্য জিনিস দেখেছ কি ?

একটি পাখি বলল, আজ আমি কোন আশ্চর্য জিনিস দেখিনি। তবু আজ আমার মন বড় খারাপ।

চিরঞ্জীব বলল, কিজন্য তোমার মন খারাপ ?

পাখি বলল, বললে কোন ফল হবে কি ?

চিরঞ্জীব বলল, সুহৃদের কাছে দুঃখের কথা বললে নিশ্চয়ই কোন ফল হয়।

পাখিটি তখন বলল, উত্তর দেশে একটি পাহাড়ের ধারে পলাশনগর নামে একটি নগর আছে। সেই পাহাড়ে একটি রাক্ষস বাস করত। সে প্রতিদিন সেই নগরে এসে যাকে সামনে পেত তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়ে বসে খেত।

একদিন সেই নগরের সব লোক মিলিত হয়ে বলল, তুমি যাকে তাকে বধ করো না খাবারের জন্য। আমরা প্রতিদিন একটি করে লোককে পাঠাব তোমার কাছে। তুমি তাকেই খেও।

এই প্রস্তাবে রাজী হলো রাক্ষস।

তার পর থেকে প্রতিদিন আহারের জন্য রাক্ষসের কাছে একজন করে লোককে পালাক্রমে পাঠানো হত। এইভাবে বহুদিন কেটে যায়। কাল যে

ব্রাহ্মণের পালা সে পূর্বজন্মে আমার বন্ধু ছিল। তার একটিমাত্র ছেলে আর স্ত্রী আছে বাড়িতে। ছেলেকে পাঠালে বংশনাশ হয় আর সে নিজে গেলে তার স্ত্রী বিধবা হয়। স্ত্রীকে পাঠালে সংসার শূন্য হয়ে যায়। তাই তাদের এই দুঃখে আমি দুঃখিত।

তার কথা শুনে অন্য পাখিরা বলল, বন্ধুর দুঃখে যে দুঃখিত হয় এইভাবে সে-ই প্রকৃত বন্ধু।

রাজা বিক্রমাদিত্য পাখির দুঃখের কথা শুনে তখনি পলাশনগরে চলে গেলেন।

সেখানে গিয়ে যার পালা ছিল সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে তাকে অভয় দিলেন। পরদিন সকালবেলায় স্নান করে নিজে সেই বধ্যশিলায় গিয়ে বসে রইলেন রাক্ষসের অপেক্ষায়।

যথাসময়ে রাক্ষস এসে দেখল বধ্যশিলার উপর একজন নির্ভয়ে বসে আছে। সে তখন বলল, কে তুমি? মৃত্যুভয় পাও না? এই শিলায় এসে আমার খাবারের জন্য যে বসে সে ভয়ে আগেই মরে যায়। কিন্তু তুমি কে? রাজা বললেন, এ কথায় তোমার কি লাভ। আমি আমার এই দেহ পরের জন্য দান করছি। তুমি তোমার কাজ করো।

তখন রাক্ষস মনে মনে চিন্তা করল, লোকটা সত্যিই সাধু পুরুষ। এ পরের জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করছে। একে মারলে আমার পাপ হবে।

রাক্ষস এই ভেবে রাজাকে বলল, হে সাধু পুরুষ, তুমি পরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করছ। তুমি সত্যিই পূণ্যবান। তোমাকে মারলে আমার পাপ হবে। তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন, হে রাক্ষস, যদি তুমি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে আজ থেকে মানুষ বধ বন্ধ করো। তোমার কাছে নিজের প্রাণ যেমন প্রিয় তেমনি সকলের কাছে তার নিজের প্রাণ প্রিয়। নিজের প্রাণ যেমন রক্ষা করা উচিত, তেমনি পরের প্রাণও রক্ষা করা উচিত।

রাজার কথায় রাজী হয়ে সেদিন থেকে মানুষ বধ বন্ধ করল রাক্ষস। রাজাও খুশি মনে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার যদি এমন পরোপকারিতাগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বাদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে দ্বাদশ পুতুল বলল, আগে আমি বিক্রমাদিত্যের একটি কাহিনী বলব। আপনি শুনুন, তারপর বসবেন।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে উজ্জয়িনীতে ভদ্রসেন নামে এক বণিক বাস করত। তার অগাধ ধনসম্পত্তি থাকলেও সে টাকাপয়সা খরচ করতে চাইত না। কালক্রমে ভদ্রসেনের মৃত্যু হয়।

তার পুরন্দর নামে একটিমাত্র পুত্র ছিল। পুরন্দর ছিল তার বাবার ঠিক উল্টো এবং অমিতব্যয়ী। বাবার মৃত্যুর পর সে বন্ধুদের নিয়ে ভোগবিলাসে সব টাকাকড়ি অকাতরে খরচ করে যেতে লাগল।

[illegible] নামে পুরন্দরের এক বন্ধু ছিল। সে একদিন পুরন্দরকে বলল, তুমি বণিকপুত্র। ধন উপার্জন করাই তোমার কর্তব্য। তা না করে তুমি ক্ষত্রিয়পুত্রের মত অর্থব্যয় করে যাচ্ছ কেন ? ভবিষ্যতে ধন কাজে লাগবে বলেই বুদ্ধিমানেরা ধন উপার্জন করে।

পুরন্দর বলল, ভবিষ্যতে কবে কোনদিন কাজে লাগবে বলে ধন ব্যয় না করার কোন অর্থ হয় না। বিপদ আপদ এলে উপার্জিত ধনও ক্ষয় হয়ে যায়। বুদ্ধির অতীত বিষয়ে শোক ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য চিন্তা করা উচিত নয়।

এইভাবে কারো কোন কথা না শুনে টাকা খরচ করে যেতে লাগল পুরন্দর। কিছুদিনের মধ্যেই ভোগবিলাসে সব অর্থ ক্ষয় করে ফেলল সে। সে তখন নিঃস্ব হয়ে উঠল একেবারে। তার বন্ধুরা তার সঙ্গ ত্যাগ করল।

পুরন্দর তখন মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের পাদদেশে একটি গ্রামে চলে গেল। সেই গ্রামের পাশে একটি বাঁশবন ছিল। রাত্রিবেলায় পুরন্দর একটি বাড়ির চাতালে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে কার আর্ত চিৎকারে সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল পুরন্দরের। ঘুম থেকে জেগে উঠেই সে দেখল সেই বাঁশবনের ভিতর থেকে 'আমাকে বাঁচাও একটা রাক্ষস আমায় মারছে'—এই বলে একটি মেয়ে চিৎকার করছে।

পুরন্দর কিন্তু একা দুপুররাতে সেই অন্ধকার বাঁশবনের মধ্যে যেতে সাহস করল না।

পরদিন সকালে সে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করল, ঐ বাঁশবন থেকে রাত্রিবেলায় একটি মেয়ে চিৎকার করছিল কেন বলতে পারেন ?

গ্রামবাসীরা বলল, রোজ রাতে ঐ বনের ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের এক আর্ত চিৎকার শোনা যায়। কিন্তু ভয়ে কেউ দেখতে যায় না সেখানে।

পুরন্দর এই কথা শুনে সে তার বাড়ি ফিরে এল। তারপর সে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে এই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা জানাল।

রাজা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পুরন্দরের সঙ্গে সেই গ্রামে চলে গেলেন। তারপর রাত্রিবেলায় নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে একটি তরোয়াল নিয়ে সেই বাঁশবনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন এক ভীষণাকার রাক্ষস একটি মেয়েকে প্রচণ্ডভাবে মারছে আর মেয়েটি আর্তনাদ করছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য তখন রাক্ষসকে বললেন, রে পাপিষ্ঠ! এই অনাথা মেয়েটিকে মারছ কেন?

রাক্ষস বলল, তা দিয়ে তোমার দরকার কি? তুমি চলে যাও, তা না হলে তোমাকেও মরতে হবে।

রাজা তরবারি দিয়ে আক্রমণ করলেন রাক্ষসকে। দুজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই তরবারি দিয়ে রাক্ষসের মাথা কেটে ফেললেন রাজা।

মেয়েটি তখন রাজার পায়ে পড়ে বলল, হে প্রভু, আজ আপনি আমায় শাপমুক্ত করে সকল দুঃখ থেকে উদ্ধার করলেন।

রাজা বললেন, কে তুমি?

মেয়েটি বলল, এই গ্রামে এক ধনী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আমি তাঁর স্ত্রী ছিলাম। আমি রূপের গর্বে সব সময় মত্ত হয়ে থাকতাম। তাঁকে প্রায়ই মনোকষ্ট দিতাম। একদিন তিনি আমায় শাপ দেন, তুই যেমন আমায় সারাজীবন দুঃখ দিয়েছিস তেমনি তুইও তোর সারাজীবন ধরে কষ্ট পাবি। রোজ রাতে এক রাক্ষস এসে তোকে পীড়ন করবে।

আমি তখন এই শাপের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। আমি শাপমুক্তির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম।

তিনি তখন বললেন, যদি কোনদিন কোন বীরপুরুষ এসে রাক্ষসকে বধ করে তাহলে তার পায়ে প্রণাম করলে তুই মুক্তি পাবি এই শাপ থেকে। আমার সব ধনসম্পদ তাকেই দিবি।

এই বলে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। এখন থেকে আমি আপনার অধীন হলাম। এই ধনপূর্ণ কলসটি আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা সেই ধন নিজে না নিয়ে পুরন্দরকে দিয়ে দিলেন। রাজার আদেশে পুরন্দর সেই মেয়েটিকে বিয়ে করল। রাজা তাঁর রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

পুতুল এই কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার যদি এমন সাহস ও বীরত্ব থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, হে রাজন, রাজা বিক্রমাদিত্যের একটি গল্প শুনুন।

একবার বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার দিয়ে যোগীর বেশে দেশ পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি গ্রামে একরাত ও শহরে পাঁচরাত কাটাতেন।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক নগরে এসে উপস্থিত হন। সেই নগরের বাইরে নদীর ধারে এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরের চাতালে বসে মহাজনরা প্রাচীন পুরাণকাহিনী শুনছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য সেই নদীতে স্নান করে এসে সেই চাতালে বসে পুরাণ-কথা শুনতে লাগলেন। তখন পুরাণ থেকে পরোপকারের কথা শোনান হচ্ছিল। যে পরের উপকার করে সে-ই পুণ্যবান আর যে পরকে দুঃখ দেয় সে-ই পাপী। যে পরের দুঃখে দুঃখী এবং পরের সুখে সুখী হয় সে-ই প্রকৃত ধার্মিক।

রাজা বিক্রমাদিত্যও একমনে এই সব পুরাণকথা শুনছিলেন। এমন সময় এক আর্ত চিৎকারে সকলে সচকিত হয়ে উঠল। সকলে দেখল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে নিয়ে নদী পার হতে গিয়ে নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল।

যে সব মহাজন পুরাণকথা শুনছিল নদীর ধারে মন্দিরের চাতালে বসে ব্রাহ্মণ তাদের লক্ষ্য করে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে চিৎকার করছিল। কিন্তু পরোপকার সম্বন্ধে অত সব পুরাণকথা শুনেও তারা কেউ গেল না ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করার জন্য।

কিন্তু বিক্রমাদিত্য থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ 'ভয় নেই, ভয় নেই' বলে অভয় দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে প্রবল স্রোতের কবল থেকে ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করে নদীর কূলে নিয়ে এলেন।

ব্রাহ্মণ তখন রাজাকে বললেন, প্রথম প্রাণ পেয়েছিলাম বাবা ও মায়ের কাছ থেকে, আজ আবার দ্বিতীয়বার প্রাণ দিলেন আপনি। আপনি আমার যে উপকার করেছেন তার প্রতিদানে আমিও আপনাকে কিছু দিতে চাই। আমি এই গোদাবরী নদীর জলে বারো বছর ধরে মন্ত্র জপ করে যে পুণ্য লাভ করেছি তা আপনাকে দান করলাম। তাছাড়া চান্দ্রয়াণি ব্রত করে অনেক কষ্ট ভোগ করে আমার যা পুণ্য হয়েছে তাও দিলাম আপনাকে।

এই বলে রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন ব্রাহ্মণ।

এমন সময় এক রাক্ষস বিক্রমাদিত্যের কাছে এলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাজন, কে তুমি ?

রাক্ষস বলল, আমি এক ব্রাহ্মণ ছিলাম। এই নগরেই আমার বাস ছিল। আমার ধর্মে কোন মতিগতি ছিল না। আমি যত সব দুষ্কর্ম করে বেড়াতাম। গুরু ও সাধুদের প্রতি কোন ভক্তি ছিল না আমার; তাদের নিন্দা করতাম। তাই সেই পাপের ফলে আমি রাক্ষস হয়ে এই গাছে হাজার বছর ধরে কষ্ট ভোগ করছি। আজ আপনি দয়া করলে আমি মুক্তি পাব।

রাজা একথা শুনে এর আগে নদী হতে ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করে যে সব পুণ্য ফল পেয়েছিলেন তা সব দান করলেন সেই রাক্ষসকে। সেই পুণ্যফলে সে দিব্যরূপ লাভ করে রাজার প্রশংসা করতে করতে স্বর্গে চলে গেল। রাজাও রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, আপনার যদি এমন পরোপকার গুণ ও মহত্ত্ব থাকে তবেই এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

চতুর্দশ উপাখ্যান

পরদিন সকালে ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে চতুর্দশ পুতুল বলল, মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। আপনি আগে তা শুনুন।

একবার বিক্রমাদিত্য ঠিক করলেন তিনি দেশভ্রমণ করে কোথায় কি আশ্চর্য জিনিস আছে আর কোথায় কোন তীর্থে কোন দেবতা আছেন তা দেখবেন।

এই ভেবে তিনি যোগীর বেশে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

ঘুরতে ঘুরতে একবার তিনি এক নগরে এসে পৌঁছলেন। সেই নগরে একটি নদীর ধারে দেবী জগদম্বার মন্দির ছিল। রাজা নদীতে স্নান করে মন্দিরে গিয়ে দেবীকে প্রণাম করে মন্দিরের এক জায়গায় বসলেন।

এমন সময় এক যোগী এসে রাজার পাশে বসলেন।

যোগী রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথা হতে আসছেন?

রাজা বললেন, আমি এক তীর্থযাত্রী। তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি।

যোগী বললেন, না, আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য। আপনাকে উজ্জয়িনীতে দেখেছি। আমি আপনাকে চিনি। এখানে কি জন্য এসেছেন?

রাজা বললেন, যোগীবর, আমার ইচ্ছা দেশভ্রমণ করে কোথায় কি আশ্চর্য জিনিস আছে তা দেখব। তাতে সাধুদর্শনও হবে।

যোগী বললেন, আপনি বিজ্ঞ হয়ে অবিজ্ঞের মত কাজ করছেন। রাজ্যে যদি বিদ্রোহ হয় তাহলে কি করবেন?

রাজা বললেন, আমি মন্ত্রীর হাতে রাজকার্যের ভার দিয়ে এসেছি।

যোগী বললেন, আপনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করছেন। রাজ্য ও অমূল্য রত্ন নিজের হাতে রাখতে হয়। কখন কি বিপদ হয় তা বলা যায় না। রাজ্য ছেড়ে দেশভ্রমণ করা আপনার উচিত নয়।

রাজা বললেন, দৈবই একমাত্র সত্য। দেবতারাও দৈবের বিধান লঙ্ঘন করতে পারেন না। বজ্র যাঁর অস্ত্র, বৃহস্পতি যাঁর গুরু, অমরাবতী যাঁর দুর্গ এবং ঐরাবত যাঁর হাতি সেই দেবরাজ ইন্দ্রও মাঝে মাঝে যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে যান। সুতরাং যা হবার তা হবেই। এ বিষয়ে একটি গল্প শুনুন।

উত্তরদেশে নদীপর্বতবন্ধন নামে একটি নগর আছে। সেই নগরে রাজশেখর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। রাজশেখর পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। একবার তাঁর জ্ঞাতিরা তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে রাজাকে নির্বাসিত করে। রাজশেখর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে মনের দুঃখে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাজা কোন নগরের বাইরে একটি গাছের নিচে স্ত্রীপুত্র সহ আশ্রয় নিলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

সেই গাছে পাঁচটি পাখি ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

জিনিসের কথা জিজ্ঞাসা করলে বসুমিত্র সুরবালা ও গরম তেলের কথা বললেন।

রাজা কৌতূহলী হয়ে তখনি বসুমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেই মন্দিরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে ভক্তিভরে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করে সেই গরম তেলের পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উপস্থিত সকলে 'হায় হায়' করতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার দেহটি এক বিকৃত মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। তখন অপ্সরা মন্মথ সঞ্জীবনী অমৃত এনে সেই মাংসপিণ্ডের উপর ছিটিয়ে দিতেই রাজা আবার দিব্যরূপ লাভ করলেন।

তখন সেই অপ্সরা রাজার গলায় বরমাল্য দেবার জন্য এগিয়ে এল।

রাজা তাকে বললেন, হে অপ্সরা, যদি তুমি আমার অনুগত হতে চাও তাহলে আমার কাছে উপস্থিত এই ব্রাহ্মণ বসুমিত্রকে পতিরূপে বরণ করে নাও।

অপ্সরা বলল, হে রাজন, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

এই বলে বসুমিত্রের গলায় বরমাল্য দান করল অপ্সরা মন্মথ সঞ্জীবনী।

এরপর রাজধানীতে ফিরে এলেন রাজা।

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি ভোজরাজকে বলল, আপনার যদি এমন সাহস ও উদারতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ষোড়শ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে ষোড়শ পুতুলটি বলল আসুন, আগে বিক্রমাদিত্যের একটি কাহিনী শুনুন।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয়ে বার হন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে বহু মূল্যবান বস্তু উপঢৌকন স্বরূপ তাঁকে দান করে। বিক্রমাদিত্য তখন সেই সব রাজাদের আপন আপন রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেন।

রাজা নগরমধ্যে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় এক দৈবজ্ঞ এসে রাজাকে বললেন, মহারাজ, এখন থেকে চারদিন আপনার নগর প্রবেশের পক্ষে অশুভ। চারদিন পর নগরে প্রবেশ করবেন।

রাজা তখন নগরের বাইরে এক উদ্যানে তাঁবু খাটিয়ে চার দিন কাটালেন।

তখন বসন্তকাল। একদিন মন্ত্রী এসে রাজাকে বললেন, মহারাজ, ঋতুরাজ বসন্তের আগমন হয়েছে। প্রকৃতি বসন্ত সমাগমে নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে। আজ বসন্তের পূজা করুন। বসন্ত আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন হলে সকল অমঙ্গল দূর হবে।

মন্ত্রীর কথায় সম্মত হয়ে বসন্ত পূজার আয়োজন করতে আদেশ দিলেন রাজা। মন্ত্রী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কুশলী গায়ক ও নর্তকীদের সেই পূজা উৎসবে যোগদান করার জন্য আহ্বান করলেন। রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষ যোগদান করল সে অনুষ্ঠানে।

পূজা মণ্ডপে একটি সিংহাসনের উপর লক্ষ্মীনারায়নের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে রাজা ষোড়শোপচারে পূজা করলেন। পূজা শেষে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের নানা দানে সম্মানিত করলেন।

এর পর গায়করা বসন্তরাগে আলাপ করে বসন্তের স্তুতি করতে লাগল। রাজা সকলকে তাম্বুলদান করে প্রীত করলেন।

এমন সময় সেখানে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, হে রাজা, আমার একটি আবেদন আছে।

রাজা তাকে তা বলতে বললে ব্রাহ্মণ বলল, আমি একজন ব্রাহ্মণ। নন্দীবর্ধন গ্রামে আমার বাড়ি। আমার আটটি পুত্র হয়। কিন্তু কোন কন্যা-সন্তান না হওয়ায় আমি স্ত্রীকে নিয়ে জগদম্বার মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করি, হে দেবী, আমি কন্যালাভ করলে তোমার নামে তার নাম রাখব। তাছাড়া কন্যার সমান ওজনের সোনা দান করব আর কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করব।

এর পর আমি একটি কন্যাসন্তান লাভ করি। এখন বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। এবার তার বিবাহকাল উপস্থিত। একাদশ স্থানে আছেন বৃহস্পতি। কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হলে কন্যার সমপরিমাণ ওজনের সোনা দান করতে হবে। এত সোনা কোথায় পাব? একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্যই আমায় এই দায় হতে উদ্ধার করতে পারেন। তাই আপনার কাছে এসেছি।

রাজা বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। যথাস্থানেই এসেছেন আপনি।

এই বলে রাজা তখনি কোষাধ্যক্ষকে ডেকে আদেশ দিলেন ব্রাহ্মণের

কন্যার সমপরিমাণ ওজনের সোনা দাও এবং বিবাহের অন্যান্য ব্যয়ের জন্য অষ্টবর্গের অর্ধেক আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা দাও।

প্রয়োজনীয় সোনার বেশী পেয়ে আনন্দিত হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল ব্রাহ্মণ। রাজাও নগরমধ্যে প্রবেশ করলেন শুভ মুহূর্তে।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার যদি এমন দানশীলতা ও ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

সপ্তদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে সপ্তদশ পুতুলটি বলল, আগে আমার কাহিনী শুনুন মহারাজ। তারপর সিংহাসনে বসবেন।

বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্যগুণ ও ত্যাগ কারো ছিল না এবং এখনো নেই। শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য ও জ্ঞান অনেকেরই থাকে। কিন্তু ত্যাগ গুণ সকলের থাকে না। রাজা বিক্রমাদিত্য ছিলেন এই বিরল গুণের অধিকারী।

একদিন কোন এক রাজার কাছে এক স্তুতিকার রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণগান করছিল। তা শুনে সেই স্তুতিকারের উপর ভীষণ রেগে যান সেই রাজা। তিনি স্তুতিকারকে বললেন, তোমরা সবাই শুধু বিক্রমাদিত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তার গুণগান করে বেড়াও। কিন্তু তার মত রাজা কি সারা পৃথিবীতে আর একজনও নেই?

স্তুতিকার বলল, না মহারাজ, দানশীলতা, পরোপকার, শৌর্য ও বীর্যে তাঁর মত রাজা আর একজনও নেই। যে দেহ সকল মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু সেই দেহকেও তুচ্ছজ্ঞান করতেন বিক্রমাদিত্য।

তখন সেই রাজা বললেন, আমিও রাজা বিক্রমাদিত্যের মত পরোপকার করব।

তারপর একজন যোগীকে ডেকে সেই রাজা বললেন, প্রতিদিন যাতে পরোপকারের জন্য নতুন নতুন পাত্র পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন।

যোগী বলল, এমন কোন উপায় আমার জানা নেই। তবে কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন চতুঃষষ্ঠি যোগীনীচক্রের পূজা করুন। পূর্ণাহুতির সময় নিজ দেহ আহুতি দিতে হবে।

যোগীর কথামত রাজা তাই করলেন। পূর্ণাহুতিস্বরূপ রাজা নিজদেহ দান

করলে যোগিনীরা প্রসন্ন হয়ে সে দেহ ফিরিয়ে দিয়ে রাজাকে বর চাইতে বলল।

রাজা বললেন, হে মাতৃগণ, যদি তোমরা প্রসন্ন হয়ে থাক আমার উপর তাহলে আমার প্রাসাদে যে সাতটি বড় কলস আছে তা প্রতিদিন সোনায় ভরে দাও।

যোগিনীরা বলল, যদি তিনমাস প্রতিদিন অগ্নিতে তোমার দেহ আহুতি দিতে পার তাহলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে।

রাজা এর পর থেকে প্রতিদিন যজ্ঞ করে অগ্নিতে নিজের দেহ আহুতি দিতে লাগলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন এই ঘটনার কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হয়ে পূর্ণাহুতির সময় অগ্নিকুণ্ডে নিজের দেহটি নিক্ষেপ করলেন।

তখন যোগিনীরা রাজার জীবন ফিরিয়ে দিয়ে তাকে বলল, হে মহাসত্ব, তুমি কে? তোমার দেহত্যাগের কারণ কি?

বিক্রমাদিত্য বললেন, পরের উপকারের জন্য এ দেহ অগ্নিতে আহুতি দিয়েছি।

যোগিনীরা বলল, তোমার উপর আমরা প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার উপর যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে রাজা প্রতিদিন মৃত্যুর জন্য যে কষ্টভোগ করছেন তা বন্ধ করো এবং এর প্রাসাদে সাতটি কলস স্বর্ণপূর্ণ করো।

যোগিনীরা তাই করল। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর নগরে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, পরের জন্য নিজের দেহ উৎসর্গ করার এমন ক্ষমতা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি এ সিংহাসনে বসুন।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে আমার কাহিনীটি শুনুন।

অসৎ ও দুর্জনের সংসর্গে বিনাশ হয়। সাধুসঙ্গে শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করা যায়। তাতে শ্রেয় লাভ হয়। কারো সঙ্গে শত্রুতা করতে নেই। পরের

মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। অকারণে ভৃত্যদের দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। গুরুতর দোষ না দেখলে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে নেই। লক্ষ্মী চঞ্চলা। ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ধন বিতরণ করা উচিত। আর্তজনকে দান করা উচিত। স্ত্রীদের কাছে গুপ্তকথা প্রকাশ করতে নেই।

রাজা বিক্রমাদিত্য নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

একদিন এক বিদেশী পর্যটক রাজসভায় এসে রাজাকে দর্শন করে বসলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্র, আপনার নিবাস কোথায়?

পর্যটক বলল, আমার নিবাস বলতে কিছু নেই। সর্বদা ঘুরে বেড়াই।

রাজা বললেন, আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন। আশ্চর্য জিনিস কোথাও দেখেছেন?

পর্যটক বলল, উদয়াচলে এক সূর্যমন্দির আছে। তার পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সেই গঙ্গার তীরে পাপবিনাশন নামে এক শিবমন্দির আছে। সেখানে গঙ্গার জল থেকে প্রতিদিন একটি করে সোনার স্তম্ভ বেরিয়ে আসে। সেই স্তম্ভের উপর নবরত্নখচিত একটি সিংহাসন আছে। সেই স্বর্ণস্তম্ভটি সূর্য ওঠার পর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে মধ্যাহ্নকালে সূর্যকে স্পর্শ করে। আর সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা গঙ্গার মধ্যে ডুবে যায়। প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখা যায়।

রাজা বিক্রমাদিত্য কৌতূহলবশে সেই পর্যটকের সঙ্গে তখনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। রাত্রিটা গঙ্গাতীরেই কাটালেন।

পরদিন সূর্য ওঠার সময় দেখলেন গঙ্গাগর্ভ থেকে একটি স্বর্ণস্তম্ভ উঠল। সেই স্তম্ভের মাথায় ছিল একটি রত্নসিংহাসন।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে সাহসের সঙ্গে সেই স্তম্ভের উপর গিয়ে বসলেন। স্তম্ভটি রাজাকে নিয়ে সূর্যমণ্ডলের দিকে উঠে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। রাজা সূর্যের কাছে উপস্থিত হলে সূর্যের প্রখর কিরণে রাজার দেহ ঝলসে এক মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো।

রাজা সেই অবস্থাতেই সূর্যদেবকে প্রণাম করে বললেন, সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুস্বরূপ ও জগতের একমাত্র চক্ষু আদিত্যদেবকে প্রণাম জানাই।

তখন সূর্যদেব অমৃত দিয়ে সেই স্তম্ভের অভিষেক করলে দিব্যদেহ লাভ করলেন রাজা।

সূর্যদেব তখন রাজাকে বললেন, তুমি মহাসত্ত্বশালী পুরুষ। যে সূর্যমণ্ডল

সকল মানুষের অগম্য তুমি সেখানে উপস্থিত হয়েছ। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন, মুনিদের অগম্য এই সূর্যমণ্ডলে এসে আপনার দর্শন লাভ করেছি। আমার মত ভগ্যবান আর কে আছে! আপনার কৃপায় আমার কোন কিছুর অভাব নেই।

রাজার কথায় সূর্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর কুণ্ডলদুটি দান করলেন। বললেন, এই কুণ্ডলদ্বয় প্রতিদিন এক ভার করে সোনা দান করবে।

রাজা সেই কুণ্ডলদুটি নিয়ে সূর্যদেবকে প্রণাম করে সেখান থেকে বেরিয়ে উজ্জয়িনীর পথে রওনা হলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে বলল, মহেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

এর পর ব্রাহ্মণ বলল, আমি এক গৃহস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমার সংসারে অনেক পোষ্য। ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ করি তাতে আমাদের উদরপূরণ হয় না।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা দয়াপরবশ হয়ে কুণ্ডলদুটি তাকে দান করে বললেন, এই কুণ্ডলদুটি প্রতিদিন এক ভার করে স্বর্ণদান করবে।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হয়ে রাজার স্তুতি করতে করতে চলে গেল। রাজাও উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার এমন গুণ ও ত্যাগব্রত থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

কোন উত্তর দিতে পারলেন না ভোজরাজ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে রাজা বিক্রমাদিত্যের একটি গল্প শুনুন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভায় সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় এক ব্যাধ এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, মহারাজ, অরণ্যের মধ্যে এক বিরাট আকারের বরাহ এসেছে কোথা থেকে। আপনি যদি দেখতে চান ত আসুন।

তা শুনে রাজা রাজপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে তখনি বনে চলে গেলেন।

দেখলেন বরাহটি সত্যিই বনের মধ্যে রয়েছে। রাজা তখন সকলের সঙ্গে একযোগে ছাব্বিশটি অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন সেই বরাহকে।

কিন্তু বরাহ সেই অস্ত্রের আঘাত অবলীলাক্রমে সহ্য ও উপেক্ষা করে একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করল।

রাজাও তার পিছু পিছু সেই গুহায় প্রবেশ করলেন। গুহার ভিতরটা ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কিছুদূর যাওয়ার পর রাজা সোনার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আকাশচুম্বী এক নগর দেখতে পেলেন। বহু অট্টালিকায় শোভিত ছিল সে নগর।

নগরমধ্যে গিয়ে রাজা এক রাজভবন দেখতে পেলেন। বিরোচনপুত্র বলি সেখানে রাজত্ব করতেন।

রাজভবনে বিক্রমাদিত্য যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলি উঠে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করে রত্নখচিত এক সিংহাসনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু, আপনি কোথা হতে এসেছেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আপনাকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে আমি উজ্জয়নী থেকে এখানে এসেছি।

বলি বললেন, আপনার পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হলো।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আপনার জন্ম ও জীবন কত গৌরবময়! বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ আপনার গৃহে নিত্য বিরাজমান।

বলি বললেন, এখানে আসার আপনার কারণ কি? আমার জানতে বড় ইচ্ছা করছে।

রাজা বললেন, হে দানবপতি, আমি আপনাকে দেখার জন্যই এখানে এসেছি অন্য কোন কারণ নেই।

বলি বললেন, যদি আমাকে বন্ধু ভেবে থাকেন তাহলে আপনি কিছু প্রার্থনা করুন।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার কিছুরই অভাব নেই। আপনার প্রাসাদে যা আছে তা সবই আমার আছে।

বলি বললেন, আমি সে অর্থে একথা বলছি না। আসলে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ কিছু উপহার আমি দিতে চাই।

এই বলে বলি রস ও রসায়ন নামে দুটি বস্তু দান করলেন।

রাজা বলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ে রাজধানীর পথে যাত্রা শুরু করতেই এক ব্রাহ্মণ তার পুত্রকে সঙ্গে করে

রাজার সামনে এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং পীড়িত। আমার পোষ্য অনেক, অনাহারে দিন কাটছে। যাতে পর্যাপ্ত ভোজন দ্বারা তৃপ্তি লাভ করতে পারি এমন ধন দান করুন।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, এখন আমার কাছে কোন ধন নেই। তবে রস ও রসায়ন নামে দুটি দ্রব্য আছে। দুটি দ্রব্যের দুটি গুণ আছে। রসের সঙ্গে সংযোগে সপ্তধাতু সোনা হয়ে উঠতে পারে। আর রসায়ন সেবন করলে জরামৃত্যু হতে মুক্ত হতে পারা যাবে চিরতরে। এই দুটি বস্তুর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন।

ব্রাহ্মণ বলল, রসায়ন সেবন করলে জরামৃত্যু হতে চিরতরে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। আমাকে রসায়ন দান করুন।

কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র বলল, রসায়নে আমাদের কি লাভ? জরামৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেলে অনন্তকাল ধরে দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করে যেতে হবে আমাদের। তার থেকে যে রস সংযোগে সপ্তধাতু সোনাতে পরিণত হয় সেই রস আমাদের দান করুন।

পিতাপুত্রের মতবিরোধ দেখে রাজা তাদের রস ও রসায়ন দুটিই দিলেন।

ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল। রাজাও উজ্জয়িনী চলে গেলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, বলুন রাজা, এমন দানশীলতা যদি আপনার থাকে তবেই এ সিংহাসনে বসুন।

বিংশতি উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে আমার একটি কাহিনী শুনুন। পরে বসবেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য বছরের মধ্যে ছয়মাস রাজসভায় বসে রাজকর্ম পরিচালনা করতেন আর ছয়মাস দেশভ্রমণ করে বেড়াতেন।

একবার দেশভ্রমণকালে পদ্মালয় নামে এক নগরে গিয়ে উপস্থিত হন রাজা বিক্রমাদিত্য। সেই নগরমধ্যে এক উদ্যানে স্বচ্ছ জলে ভরা একটি সরোবর দেখতে পেলেন। সেই সরোবরে স্নান করে তার তীরে একটি গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন তিনি।

এই সময় কয়েকজন বিদেশী এসে সেই সরোবরে জলপান করে সেই গাছের ছায়াতলে বসল। তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল।

তারা বলাবলি করছিল, এত দেশ আমরা ভ্রমণ করলাম। কিন্তু মহাপুরুষের দর্শনলাভ আজও হলো না আমাদের।

তাদের মধ্যে একজন বলল, মহাপুরুষের দর্শনলাভ হবে কি করে! তাঁরা যেখানে থাকেন সে স্থান সাধারণ মানুষের পক্ষে অগম্য। সেখানে গেলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। সুতরাং যে চেষ্টায় জীবন বিপন্ন হতে পারে সে চেষ্টা আমাদের কখনো করা উচিত নয়।

রাজা বিক্রমাদিত্য একথা শুনে বললেন, শোন বিদেশী, আমি একমত হতে পারলাম না তোমার সঙ্গে। পৌরুষ ও সাহসের সঙ্গে মানুষ যদি কোন কাজ করতে এগিয়ে যায় তাহলে সে যত দুঃসাধ্যই হোক না কেন, তাতে সে সফল হবেই। এইভাবে অনেক দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়। কিন্তু অলস ও ভীরু প্রকৃতির লোকেরা কোন কাজেই সফল হতে পারে না। সংসারে সাহসী, পরিশ্রমী ও বীর্যবান পুরুষেরা সাফল্য ও সুখলাভ করে থাকেন।

রাজার কথা শুনে সেই বিদেশী বলল, হে মহাঃসত্ত্ব, আপনি কি কিছু করতে মনস্থ করেছেন ?

রাজা বললেন, এখান থেকে দ্বাদশ যোজন দূরে এক অরণ্যমধ্যে এক পর্বত আছে। সেই পর্বতের উপর যোগীশ্রেষ্ঠ ত্রিকালনাথ সাধনা করেন। তাঁর কাছে দাবি করলে তিনি যত সব আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করেন। আমি সেখানেই যাব।

বিদেশীরা বলল, আমরাও তাহলে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে যাব।

রাজা বললেন তাঁর কোন আপত্তি নেই।

সেই বিদেশীরা রাজার সঙ্গে পথ চলতে লাগল। পথে এক দুর্গম অরণ্য দেখে রাজাকে বলল তারা, সে পর্বত আর কতদূর ?

রাজা বললেন, এখান থেকে এখনো আট যোজন দূর। পথ খুবই দুর্গম ; তবু শোন, আমরা সেখানে যাবই। আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

ছয় যোজন পথ অতিক্রম করার পর তারা দেখল ভয়ঙ্কর একটি বিরাট সাপ তাদের পথরোধ করে পড়ে আছে। সেই সাপের মুখ থেকে আগুনের মত বিষ বার হচ্ছে। সাপ দেখে সকলেই ভয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু রাজা পালালেন না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন। সাপটা তাঁকে

জড়িয়ে ধরে দংশন করল। রাজা তখন বিষাক্ত ক্ষত জায়গাটা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়ে সেই পর্বতের উপরে উঠে যোগী ত্রিকালনাথকে দর্শন করলেন।

যোগীরাজকে দর্শন করে ভক্তিভরে প্রণাম করতেই বিষমুক্ত হয়ে আগের মত সুস্থ হয়ে উঠলেন রাজা।

যোগীরাজ তখন হেসে রাজাকে বললেন, হে মহাসত্ত্ব, মানুষের অগম্য বিপদসংকুল এই জায়গায় কেন এসেছ ?

রাজা বললেন, আমি আপনাকে শুধু দর্শন করতে এসেছি।

যোগী বলল, তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে ?

রাজা বললেন, আমার কোন কষ্টই হয়নি। এবং আপনাকে দর্শন করে আমার সকল পাপতাপ দূর হলো। আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হলাম।

যোগীবর তখন সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে একটি খুঁটি, একটি যোগদণ্ড আর একটি কাঁথা দিলেন। তারপর বললেন, এই খুঁটি দিয়ে মাটির উপর যতগুলি রেখা টানা যায়, এক দিনে তত যোজন পথ অতিক্রম করতে পারা যাবে। এই যোগদণ্ডটি ডান হাতে নিয়ে মৃত সৈন্যের গায়ে স্পর্শ করলেই সে জীবিত হয়ে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে। আর বাঁ হাতে নিয়ে স্পর্শ করলে শত্রুসৈন্য বিনাশ হবে। এই কাঁথাখানি ঈপ্সিত যে কোন বস্তু দান করবে।

এই তিনটি বস্তু গ্রহণ করে রাজা যোগীকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

পথে যেতে যেতে দেখলেন এক রাজপুত্র আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ সংগ্রহ করছে।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করছ ?

রাজপুত্র বলল, আমি রাজপুত্র। কিন্তু জ্ঞাতিশত্রুরা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে আমায়। আমি নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এইভাবে নিঃস্ব নিরাশ্রয় হয়ে দরিদ্রজীবন যাপন করা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আমি তাই সংকল্প করেছি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে এ জীবন ত্যাগ করব।

রাজা তাকে বুঝিয়ে শান্ত করে যোগীর কাছ থেকে পাওয়া সেই তিনটি মহামূল্যবান বস্তু রাজপুত্রকে দিয়ে তাদের গুণাগুণ বুঝিয়ে দিলেন। এই সব বস্তুর সাহায্যে সে তার হারানো রাজ্য ফিরে পেয়ে নতুন ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে।

রাজকুমার অতিশয় আনন্দিত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে চলে গেল। রাজাও তার রাজধানী উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার মধ্যে এই উদারতা আছে কি ?

ভোজরাজ নীরবে মাথা নত করে রইলেন।

একবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে যেতেই আর একটি পুতুল বলল, আমি একটি কাহিনী বলছি আগে শুনুন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসিন্ধু নামে এক মন্ত্রী ছিল। মন্ত্রীর একটি পুত্র ছিল। তার নাম ছিল অনর্গল। লেখাপড়াতে তার একেবারেই মন ছিল না। সব সময় সে শুধু খেলাধূলা করে বেড়াত।

মন্ত্রী একদিন তার পুত্রকে ডেকে বলল, তুমি আমার পুত্র হয়েও মূর্খ হয়ে রইলে। বিদ্যালাভের কোন চেষ্টাই কর না। অজাত, মৃত এবং মূর্খ এই তিনের মধ্যে অজাত এবং মৃত বরং ভাল। কারণ তাদের থেকে অল্প দুঃখ পাওয়া যায়। কিন্তু মূর্খ পুত্র যতকাল বেঁচে থাকে ততকালই দুঃখ দেয়।

এই সব ভর্ৎসনার কথা শুনে অনুতপ্ত হলো অনর্গল। সে মনে মনে সঙ্কল্প করল যেমন করে হোক সে বিদ্যালাভ করে মানুষ হবে।

এই উদ্দেশ্যে সে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেল। ঘুরতে ঘুরতে সে এক নগরে গিয়ে এক উপাধ্যায়কে ধরে তার শিষ্য হয়ে পড়াশুনো করতে লাগল। নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে সে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হলো।

পথের ধারে একটি বনের মধ্যে এক দেবমন্দির দেখতে পেল সে। সেই দেবমন্দিরের কাছে পদ্মবনশোভিত এক মনোরম সরোবর ছিল। সেই সরোবরের একদিকের জল খুব উষ্ণ ছিল।

অনর্গল সরোবরের ধারে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

ক্রমে সূর্য অস্ত গেল। রাত্রি হলো। তখন এক সময় অনর্গল দেখল সরোবরের উষ্ণ জলের মধ্য থেকে আটজন দিব্যাঙ্গনা বেরিয়ে এসে সেই মন্দিরে গিয়ে দেবপূজা করে নাচগান করে দেবতাকে প্রীত করতে লাগল।

সকাল হতেই সেই দিব্যাঙ্গনারা অনর্গলকে দেখতে পেল। তাদের মধ্য থেকে একজন তাকে বলল, হে সৌম্য, আমাদের সঙ্গে আমাদের নগরমধ্যে এস।

কিন্তু তাদের জলের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে অনর্গলের ভয় হলো। ইচ্ছা হলেও সে যেতে পারল না তাদের সঙ্গে।

যথাসময়ে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এল অনর্গল।

পরদিন রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেই আশ্চর্য ঘটনার কথা সব বলল।

রাজা অনর্গলকে নিয়ে তখনি সেই অরণ্যমধ্যস্থিত মন্দিরে চলে গেলেন। সূর্য তখন সবেমাত্র অস্ত গেছে। রাজা ও অনর্গল সেই মন্দিরের বাইরে বসে রইলেন।

রাত্রি গভীর হলে সেই দিব্য কন্যারা জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরে গিয়ে পূজা সেরে নাচগান করতে লাগল সারারাত ধরে।

সকাল হতেই তারা রাজাকে দেখতে পেয়ে বলল, হে ভদ্র, তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের নগরে এস।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন সাহস এবং বীরত্বে অতুলনীয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই দিব্যাঙ্গনাদের পিছু পিছু জলমধ্যে প্রবেশ করলেন। দিব্যাঙ্গনারা সপ্ত পাতালে তাদের নগরে প্রবেশ করল।

দিব্যাঙ্গনারা এবার রাজাকে বলল, হে মহাসত্ত্ব, আপনার মত শৌর্যবীর্য কারো নেই। আমরা আপনার উপর প্রসন্ন হয়েছি। আপনি আমাদের এই নগরের রাজা হোন।

রাজা বললেন, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমি নিতান্ত কৌতূহলের বশেই এখানে এসেছি।

দিব্যাঙ্গনারা বলল, তাহলে আপনি বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন, আগে বলুন আপনারা কারা? আপনাদের পরিচয় দান করুন।

দিব্যাঙ্গনারা বলল, আমরা অষ্ট মহাসিদ্ধা।

রাজা বললেন, তাহলে আমাকে অষ্ট মহাসিদ্ধি দান করুন।

দিব্যাঙ্গনারা তখন রাজাকে অষ্টগুণযুক্ত আটটি রত্ন দান করল।

রাজা সেই রত্নগুলি নিয়ে রাজধানীর পথে রওনা হলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করল ব্রহ্মার নাম করে।

রাজা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, কোথা হতে আসছেন আপনি ?

ব্রাহ্মণ বলল, চম্পাপুর নিবাসী আমি এক গরীব ব্রাহ্মণ। বাড়িতে অনেক পোষ্য। আহার জোটাতে পারি না। স্ত্রীর ভৎর্সনা সহ্য করতে না পেরে অর্থ উপার্জনের আশায় বিদেশে এসেছি। নির্ধন পুরুষের কোন মূল্য নেই সংসারে।

ব্রাহ্মণের দুঃখের কথা শুনে মনে ব্যথা পেলেন রাজা। তখন তিনি দিব্যাঙ্গনাদের কাছ থেকে পাওয়া সেই আটটি রত্নই দিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণকে। তারপর নিজের নগরে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, রাজন, আপনার যদি এমন উদারতা ও দানশীলতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, আগে আমার একটি গল্প শুনুন। তারপর সিংহাসনে বসবেন।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ করতে করতে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আকাশচুম্বী এক প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন রত্নশোভিত সেই প্রাসাদের মধ্যে রয়েছে বহু শিবালয় ও বিষ্ণুমন্দির।

রাজা এক সরোবরে স্নান করে এসে বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে বিষ্ণুকে প্রণাম করে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন।

তারপর মন্দিরে বসে থাকা এক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা, হে বিপ্র, কোথা হতে এসেছেন আপনি ?

ব্রাহ্মণ বলল, আমি এক তীর্থযাত্রী। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি কোথা হতে এসেছেন ?

রাজা বললেন, আপনার মত আমিও এক তীর্থযাত্রী।

ব্রাহ্মণ ভালভাবে রাজাকে দেখে বলল, আপনার চেহারা দেখে কিন্তু সাধারণ তীর্থযাত্রী বলে মনে হচ্ছে না। আপনার দেহে রাজলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনি তেজস্বী ও বীরপুরুষ। আপনার রাজসিংহাসনে বসা উচিত ছিল। তবে সবই ভাগ্যের লিখন। এ লিখন কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

রাজা এই কথা স্বীকার করলেন।

এর পর রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, আপনাকে এত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছে কেন ?

ব্রাহ্মণ বলল, নিকটে নীল নামে একটি পর্বত আছে। সেখানে কামাক্ষী দেবীর মন্দির আছে। সেই মন্দিরের ভিতরে পাতালে যাবার একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। সেই বিবর পথের মুখ বন্ধ থাকে। কামাক্ষীমন্ত্র জপ করলে সেই দ্বার খুলে যায়। সেই বিবর পথের মাঝে আছে এক রসকুণ্ড। সেই রসের স্পর্শে অষ্টধাতু খাঁটি সোনা হয়ে যায়। আমি দ্বাদশবর্ষ কামাক্ষীমন্ত্র জপ করছি। কিন্তু সেই ভিতর দ্বার খোলেনি।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজা কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজা দিয়ে তাঁর স্তব করে খড়্গ দিয়ে নিজেকে বলি দিতে গেলেন। এমন সময় দেবী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে রাজার হাত ধরে বললেন, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর। বল, কি বর চাও।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক, তাহলে এই ব্রাহ্মণকে রসকুণ্ডের রস দান করো।

দেবী 'তথাস্তু' বলে সেই ভিতর দ্বার উন্মুক্ত করে রসদান করলেন ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ তখন রাজার গুণগান করে চলে গেল সেখান থেকে।

রাজাও তাঁর নগরে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, আপনি কি নিঃস্বার্থ, পরোপকারিতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন কখনো ? আপনার যদি এমন গুণ থাকে ত সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

পরদিন সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল একটি গল্প বলল ভোজরাজকে।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ শেষ করে রাজধানীতে ফিরে আসার পর প্রচুর দান করেন। বহু লোককে দান ও ভোজনে তৃপ্ত করেন।

সেই রাত্রিতে ঘুমোতে ঘুমোতে এক স্বপ্ন দেখলেন রাজা। দেখলেন তিনি মহিষের পিঠে চেপে দক্ষিণ দিকে কোথায় যাচ্ছেন।

পরদিন সকালে রাজসভায় এসে ব্রাহ্মণদের কাছে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বললেন রাজা।

তা শুনে সর্বজ্ঞভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বললেন, স্বপ্ন দুই রকমের। কতকগুলি স্বপ্নের ফল শুভ আর এক শ্রেণীর স্বপ্ন অশুভ ফল দান করে। যেমন হাতির পিঠে আরোহণ, প্রাসাদে আরোহণ, রোদন, মৃত্যু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, শঙ্খ ও সুবর্ণদর্শন প্রভৃতি স্বপ্ন শুভ ফলপ্রদ হয়। কিন্তু মহিষ বা গদর্ভপৃষ্ঠে আরোহণ, কণ্টকবৃক্ষে আরোহণ, ভস্ম, শূকর ও বানরাদি দর্শন প্রভৃতি স্বপ্নের ফল অশুভ হয়।

যাই হোক, আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা অনিষ্টকর আপনার পক্ষে।

রাজা বললেন, তাহলে এর প্রতিবিধান কি?

সর্বজ্ঞভট্ট বললেন, আপনি প্রথমে স্নান করে যজ্ঞদর্শন করে ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার ও বস্ত্র দান করুন। তারপর নববস্ত্র পরিধান করে দেবতার আরাধনা করুন। সেই সঙ্গে অন্ধ, অনাথ, আর্ত, বধির, পঙ্গু প্রভৃতি অসহায় ও দীন-দুঃখী মানুষদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করে তাদের পরিতৃপ্ত করুন। এই সব দানের ফলে স্বপ্নজনিত অশুভ ও অনিষ্টকর প্রভাব খণ্ডিত হয়ে যাবে।

সর্বজ্ঞভট্টের কথামত রাজা তিন দিন ধরে পর্যাপ্ত দান করার জন্য কোষাগার উন্মুক্ত রাখলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, এমন দানশীলতা কি আপনার আছে?

ভোজরাজ উত্তর দিতে পারলেন না।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার চেষ্টা করলে আর একটি পুতুল আর একটি গল্প বলল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে পুরন্দরপুরী নামে এক নগর ছিল। সম্পদশালী নামে এক ধনী বণিক বাস করত সেই নগরে। তার চার পুত্র ছিল।

বৃদ্ধ বয়সে একদিন সেই বণিক তার পুত্রদের ডেকে বলল, আমার মৃত্যুর

পর তোমরা চার ভাই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ করতে পার। তাই আমি আগে থেকে আমার সব সম্পত্তি বড় ছোট অনুসারে ভাগ করে দিচ্ছি। আমার মৃত্যুর পর আমার নির্দেশমত তোমরা তা গ্রহণ করবে।

এর কিছুদিন পর বণিকের মৃত্যু হলো। তার ছেলেরা একসঙ্গে কিছুকাল থাকার পর ঝগড়া বিবাদ শুরু হলো তাদের মধ্যে।

তখন চার ভাই এক জায়গায় বসে স্থির করল, তাদের বাবার নির্দেশমত সব বিষয় সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে পৃথকভাবে শান্তিতে বাস করবে।

এর পর তারা তাদের বাবার নির্দেশমত বাবার ঘরে খাটের নিচে মাটি খুঁড়ে একটি বড় ভাঁড় পেল তারা। সেই ভাঁড়ের মধ্যে চারটি কৌটো ছিল। একটি কৌটোর মধ্যে মাটি, একটিতে অঙ্গার বা পোড়া কাঠ, একটিতে হাড় এবং একটিতে কিছু খড় পাওয়া গেল।

এই সব দেখে চার ভাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা এর অর্থ কিছু বুঝতে পারল না।

তারা তখন বলতে লাগল, কে এমন ব্যক্তি আছে যে এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

এর পর চার ভাই যুক্তি করে রাজসভায় গিয়ে রাজাকে সব কথা বলল। রাজসভায় অনেক পণ্ডিত ছিল। কিন্তু তারা কেউ এসবের অর্থ কিছু বুঝতে পারল না।

তখন ভাইরা হতবুদ্ধি হয়ে অন্য এক রাজার রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হলো।

সেই রাজ্যে এক কুমোরের ঘরে শালিবাহন বাস করত।

শালিবাহনের কানে কথাটা যেতেই সে নিজে থেকে রাজসভায় চলে গেল। সে বলল, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই ভাইরা একই পিতার পুত্র। এদের পিতা জীবিতকালেই তাঁর বিষয় সম্পত্তি তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গেছেন।

তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে মাটি দিয়ে গেছেন। এর অর্থ হলো সমস্ত ভূসম্পত্তি বা জমি জ্যেষ্ঠ পুত্র পাবে। দ্বিতীয় পুত্রকে তিনি দিয়ে গেছেন খড়। এর অর্থ হলো যত ধান মজুত আছে তা সে পাবে। তৃতীয় পুত্রকে দিয়েছে হাড়। এর অর্থ হলো যত সব গৃহপালিত পশু আছে সে তা পাবে। চতুর্থ পুত্রকে দিয়ে গেছে অঙ্গার। তার অর্থ হলো, এই পুত্র সব সোনা পাবে।

শালিবাহন এইভাবে বিষয়ভাগের তাৎপর্যটা চার ভাইকে বুঝিয়ে দিয়ে তারা সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই বিষয়ভাগের কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠলেন। তিনি শালিবাহনের বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি শালিবাহনের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে আহ্বান জানালেন তাঁর রাজসভায় আসার জন্য।

কিন্তু এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল শালিবাহন। সে বলল, রাজার কাছে আমার যাবার প্রয়োজন নেই। রাজার যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তিনি আমার কাছে আসবেন।

দূতমুখে শালিবাহনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। তিনি অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য নিয়ে শালিবাহনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে প্রতিষ্ঠা নগরে উপস্থিত হলেন রাজা।

রাজা নগরদ্বার থেকে এক দূত পাঠালেন শালিবাহনের কাছে। দূত গিয়ে শালিবাহনকে বলল, মহারাজ এসেছেন। আপনি নগর বাইরে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করুন।

কিন্তু শালিবাহন নত হলো না। সে দূতকে বলল, রাজাকে তুমি বলবে, আমি একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা করব তাঁর সঙ্গে। দেখব রাজা বিক্রমাদিত্য কত বড় বীর।

দূতমুখে শালিবাহনের স্পর্ধার কথা শুনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

উভয়পক্ষের সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তাদের পদভরে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। দিকচক্র আন্দোলিত হলো। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

উভয়পক্ষের সৈন্যদল শত্রু বিনাশ করতে লাগল। অসংখ্য অশ্বক্ষুরের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল চারদিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা বিক্রমাদিত্যেরই জয় হলো। তিনি শালিবাহনের সব সৈন্যকে পরাজিত করলেন।

শালিবাহন তখন কোন উপায় না দেখে শেষ নাগকে স্মরণ করল। শেষ নাগ ছিল শালিবাহনের জন্মদাতা পিতা। শেষ নাগ পুত্রের সাহায্যে অসংখ্য সাপ পাঠান। সেই সব সাপেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রাজা বিক্রমাদিত্যের সৈন্যদের দংশন করতে লাগল। বহু সৈন্য মারা গেল সাপের বিষে।

এই দৃশ্য দেখে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর মৃত সৈন্যদের বাঁচাতে জলে গা ডুবিয়ে নয় বছর ধরে বাসুকিমন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

অবশেষে বিক্রমাদিত্যের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বাসুকি এসে বর দিতে চাইলেন তাঁকে।

রাজা বললেন, হে নাগরাজ, আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রেরিত সর্পগণ আমার যে সব সৈন্যদের দংশন করে হত্যা করেছে তাদের বাঁচিয়ে দিন। এর জন্য আপনি আমায় অমৃতকুম্ভ দান করুন।

বাসুকি অমৃতকুম্ভ দান করলেন রাজাকে।

রাজা সেই অমৃতকুম্ভ নিয়ে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। এমন সময় পথে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, আমি এক ব্রাহ্মণ, আমি প্রতিষ্ঠা নগর থেকে আসছি। আপনি কোন প্রাণীকে কখনো বিমুখ করেন না। আপনার কাছে আমার একটি বস্তু চাইবার আছে।

রাজা বললেন, কি সে বস্তু? আপনি যা চাইবেন তাই আমি দেব।

ব্রাহ্মণ বললেন, আপনার হাতে যে অমৃতকুম্ভ আছে সেটি আমায় দান করুন।

রাজা বললেন, আপনাকে কে পাঠিয়েছে?

ব্রাহ্মণ বলল, শালিবাহন।

রাজা তখন সমস্ত ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। কিন্তু কোন উপায় নেই। তিনি ব্রাহ্মণকে দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে। তা না হলে অধর্ম হবে।

তাই তিনি ব্রাহ্মণকে বলল, হে বিপ্র, আপনি এই অমৃতকুম্ভ গ্রহণ করে আমার প্রতিশ্রুতি পালনে সাহায্য করুন।

সেই অমৃতকুম্ভ নিয়ে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট চিত্তে রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল।

রাজাও রাজধানীতে ফিরে এলেন।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, এই ধরনের ত্যাগ, উদারতা ও মহানুভবতা যদি আপনার আছে কি? যদি থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল একটি গল্প বলল। বলল, আগে এই গল্প শুনুন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় একদিন এক জ্যোতিষী এসে রাজাকে বললেন, সকল গ্রহ অনুকূল হয়ে আপনার মঙ্গল করুন। সূর্যদেব আপনাকে শৌর্যবীর্য দিন, চন্দ্র দিন ইন্দ্রত্ব, মঙ্গল দিন সুমঙ্গল, বুধ দিন বুদ্ধি, বৃহস্পতি দিন গুরুত্ব, শুক্র দিন পুত্র, শনি দিন কল্যাণ, রাহু দিন বাহুবল আর কেতু বংশের উন্নতি দান করুন।

রাজা তখন সেই জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বছর কোন গ্রহের কোথায় স্থান তা বলুন।

জ্যোতিষী বললেন, এ বছর রবি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী ও মেঘাধিপতি। শনি রোহিণী শকট ভেদ করে যাবে। তার ফলে দেশে অনাবৃষ্টি হবে। বরাহমিহির বলেছেন, শনি রোহিণী শকট ভেদ করে গেলে তখন ঘোর অনাবৃষ্টি এমন কি রক্তবৃষ্টিও হতে পারে, তখন সাগর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়।

রাজা বললেন, এর কি কোন প্রতিকারের উপায় নেই?

জ্যোতিষী বললেন, হ্যাঁ আছে। গ্রহহোম করলে বৃষ্টি হয়।

রাজা তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে গ্রহহোম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে বললেন। অনুষ্ঠানের শেষে রাজা প্রচুর দান করলেন। কিন্তু বৃষ্টি হলো না।

রাজ্যের প্রজারা হাহাকার করতে লাগল। রাজা মহাসংকটে পড়লেন। তিনি প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের কথা ভাবতে লাগলেন।

এমন সময় আকাশবাণী হলো, হে রাজন, যদি বত্রিশ লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের ছিন্নমস্তক অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে উৎসর্গ করতে পার তাহলে তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে।

এই আকাশবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দেবীর সামনে খড়্গ দিয়ে নিজের মাথাটি কাটতে উদ্যত হলেই দেবী তার হাত ধরে ফেললেন। বললেন, তোমার সততা ও সাহস দেখে প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন, হে দেবী, আমার উপর যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই অনাবৃষ্টি দূর করে সুজলা সুফলা করে তোল বসুন্ধরাকে।

দেবী 'তথাস্তু' বলে অন্তর্ধান হলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার এমন গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ষড়বিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল বলল, আগে আমার এই উপাখ্যানটি শুনুন।

একদিন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র সিংহাসনে বসে ছিলেন। তাঁর কাছে তখন ছিলেন তেত্রিশ কোটি দেবতা, অষ্ট আশী হাজার ঋষি, আটজন লোকপাল, উনপঞ্চাশ জন মরুৎ বা বায়ু, বারো জন আদিত্য, নারদ আর নয়জন অপ্সরা। সেই সঙ্গে গন্ধর্বরাও ছিল।

নারদ একসময় বললেন, সারা ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্যের মত কীর্তিমান, পরোপকারী ও মহাসত্ত্বগুণসম্পন্ন রাজা আর একজনও নেই।

নারদের কথা শুনে সভায় উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন।

কামধেনু বলল, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বসুন্ধরা সত্যিই বহুরত্নগর্ভা।

দেবরাজ ইন্দ্র তখন সুরভিকে ডেকে বললেন, তুমি মর্ত্যলোকে এখনি গিয়ে বিক্রমাদিত্যের দয়া, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণের বিষয় জেনে এখানে এসে আমাকে তা জানাও।

সুরভি তখন দুর্বল এক গরুর রূপ ধারণ করে মর্ত্যে গমন করল।

রাজা বিক্রমাদিত্য যখন একটি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সুরভি ইচ্ছা করে তাঁকে দেখতে পেয়ে কাদায় পড়ে গিয়ে উঠতে না পারার ভাণ করল। রাজার দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল।

রাজা তার কাছে এসে দেখলেন, গরুটি দুর্বল, কাদার মধ্যে তার পাগুলো ঢুকে গেছে, বার হতে পারছে না। এদিকে তার অদূরে একটি বাঘ তাকে খাবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে।

রাজা তখন গরুটিকে তোলার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তখন সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু বাঘের মুখে অসহায় গরুটিকে ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে যেতেও পারলেন না। তাই অস্ত্র হাতে সারারাত সেইখানে দাঁড়িয়ে গরুটিকে পাহারা দিতে লাগলেন।

রাত্রি শেষ হয়ে সকাল হতেই রাজার দয়া ও ধৈর্যগুণ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে তখন নিজেই কাদা থেকে উঠে এসে রাজাকে বলল, হে রাজন, আমি গরু নই, সুরভি। স্বর্গ থেকে তোমার দয়া ও ধৈর্যগুণ নিজের চোখে

দেখার জন্য মর্ত্যে এসেছি। এখন বুঝলাম তোমার মত দয়াবান ও ধৈর্যশীল রাজা পৃথিবীতে সত্যিই বিরল। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাকে বর দিতে চাই। প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, আমার কোন কিছুরই অভাব নেই। কি প্রার্থনা করব?

সুরভি বলল, আমার কথার অন্যথা হবে না। আমি তাহলে তোমার কাছেই থাকব।

এই বলে সুরভি রাজার সঙ্গে তাঁর বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, বিধাতা আমাকে দরিদ্র করেছেন। তাই আমি সকলকে দেখতে পেলেও আমাকে কেউ দেখতে পায় না।

রাজা বললেন, হে বিপ্র, কি চান আপনি?

ব্রাহ্মণ বলল, আপনি প্রার্থীর কাছে কল্পতরু। আমার দারিদ্র্য যাতে দূর হয় তার ব্যবস্থা করুন।

রাজা তখন বললেন, আপনি তাহলে এই কামধেনুটি গ্রহণ করে আপনার দারিদ্র্য দূর করুন। কামধেনু আপনার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করবে।

এই বলে রাজা বিক্রমাদিত্য কামধেনুকে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিয়ে নগরে ফিরে এলেন।

পুতুল এবার ভোজরাজকে বলল, এমন দয়া, ধৈর্যগুণ ও ত্যাগ আপনার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ কোন কথা বলতে পারলেন না।

সপ্তবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে আবার বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল আর একটি গল্প বলল।

একবার দেশভ্রমণ করতে গিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য এক ধার্মিক রাজার রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেই রাজা শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করতেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রতিপালন করতেন। সে রাজ্যের প্রজারা ছিল সদাচারী, দয়াশীল ও অতিথি-পরায়ণ।

রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে তিন চার দিন থাকবেন বলে ঠিক করেন। তিনি এক দেবমন্দিরে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে সেই মন্দিরে বসলেন।

এমন সময় রাজপুত্রের মত দেখতে সুদর্শন এক যুবক পট্টবস্ত্র পরে এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে একদল লোকের সঙ্গে সে মন্দিরে প্রবেশ করে। কুঙ্কুম ও চন্দনে লিপ্ত ছিল তার দেহ। যুবকটি তার দলের লোকদের কিছু বলার পর তারা চলে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য ভাবতে লাগলেন কে এই যুবক।

পরদিন সেই যুবকটি একা এল মন্দিরে। কিন্তু সেদিন তার দেহে কোন বস্ত্র বা অলঙ্কার ছিল না।

রাজা কৌতূহলবশতঃ যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবক, গতকাল তোমার দেহ বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। সঙ্গে অনেক বন্ধুও ছিল। কিন্তু আজ তোমার কেন এই হীন অবস্থা?

যুবকটি বলল, গতকাল আমার অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু দৈবদোষে আজ আমার এই অবস্থা হয়েছে।

রাজা তার পরিচয় জানতে চাইলেন।

যুবকটি বলল, আমি এক দ্যূতকার।

রাজা বললেন, তুমি পাশা খেলতে জান?

যুবক বলল, আমি পাশাখেলায় খুবই দক্ষ। তাছাড়া শারীরক্রিয়াও জানি। আমার যথেষ্ট বুদ্ধিও আছে! কিন্তু সবই নিরর্থক। দৈববলই প্রকৃত বল।

রাজা বললেন, তুমি বিচক্ষণ হয়েও ঘৃণ্য পাশাখেলার মত পাপকাজ কেন করো?

যুবক বলল, কর্মফল কে খণ্ডন করতে পারে?

রাজা বলল, দ্যূতক্রীড়া, মাংস, সুরা, বেশ্যা, মৃগয়া, চৌর্য এবং পরদারগমন—এই সাতটি পাপ থেকে সাধুব্যক্তিরা দূরে থাকেন। তুমিও দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করো।

যুবক বলল, দ্যূতক্রীড়াই আমার জীবিকা, কি করে ত্যাগ করব? আপনি যদি আমার অর্থ উপার্জনের অন্য কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে এ ক্রীড়া আমি ত্যাগ করব।

এমন সময় দুজন বিদেশী এসে মন্দিরের একপাশে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি পিশাচলিপি দেখেছি। তাতে লেখা আছে, এই মন্দিরের ঈশাণ কোণে তিনটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস আছে। যে নিজের কণ্ঠরক্ত দিয়ে ভৈরবকে তুষ্ট করতে পারবে সে সেই ধনলাভ করবে।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে খড়্গ নিয়ে কণ্ঠরক্ত দিয়ে ভৈরবকে তুষ্ট করার জন্য মাথা কাটতে উদ্যত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাকে আর শিরশ্ছেদ করতে হবে না। তোমার ত্যাগ ও সাহস দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।

রাজা ভৈরবকে বললেন, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই দ্যুতকারকে স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস তিনটি দাও।

ভৈরব তখন কলস তিনটি দ্যুতকারকে দিলে সে রাজার স্তুতি করে চলে চলে গেল। রাজাও নিজ নগরে ফিরে এলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার এমন ত্যাগ গুণ ও সাহস থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অষ্টবিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে আবার বসতে গেলে আর একটি পুতুল আর একটি গল্প বলল।

একবার পৃথিবী পর্যটন করতে গিয়ে একটি নগরে গিয়ে উপস্থিত হন রাজা বিক্রমাদিত্য। সেই নগরের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেছিল।

সেই নদীর তীরে একটি বনের মধ্যে একটি মন্দির ছিল। রাজা নদীতে স্নান করে এসে মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে সেই মন্দিরের একপাশে বসে রইলেন।

এমন সময় চারজন বিদেশী এসে রাজার কাছে বসল। রাজা তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন।

সেই চারজন বিদেশীর একজন বলল, আমরা অপূর্ব এক দেশ থেকে আসছি।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, সে দেশে আশ্চর্য কোন জিনিস আছে?

লোকটি বলল, সে দেশে বেতালপুরী নামে একটি নগর আছে। সেই নগরের এক মন্দিরে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন। সেখানকার রাজা দেশে যাতে কোন অমঙ্গল না হয় তার জন্য প্রতি বছর একজন পুরুষকে

সেই দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে দেবীকে তুষ্ট করেন। সেই নির্দিষ্ট দিনে কোন বিদেশী যদি সেই নগরে গিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে তাকেই দেবীর সামনে বলি দেওয়া হয়।

আমরাও না জেনে সেইদিন সেই নগরে গিয়ে পড়ি। নগরবাসীরা আমাদের বলি দেবার জন্য ধরতে এলেই আমরা কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসি।

এই কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য তখনি দেবী শোণিতপ্রিয়ার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর দেবীকে প্রণাম করে মন্দিরের মধ্যে এক জায়গায় বসলেন।

এই সময় একজন ভীত সন্ত্রস্ত লোককে বন্দী করে তাকে বলি দেবার জন্য আনা হলো। মন্দিরে তখন বলির বাজনা বাজতে লাগল।

লোকটিকে বলি দেওয়া হবে তা বুঝতে পেরে রাজা নিজের প্রাণবলি দিয়ে লোকটিকে বাঁচাবার সংকল্প করলেন।

রাজা তখন মন্দিরের পুরোহিত ও রাজপুরুষদের বললেন, হে মহাজনবৃন্দ, আপনারা এই লোকটিকে নিয়ে কি করবেন ?

তারা বলল, একে আমরা দেবীর সামনে বলি দেব। তাহলে দেবী তুষ্ট হয়ে আমাদের মঙ্গল করবেন।

রাজা বললেন, এই লোকটি ভয়ে কাতর, এর দেহ দুর্বল এবং ক্ষীণ। একে বলি দিলে তুষ্ট হবেন না দেবী। তার থেকে এর পরিবর্তে আমাকে বলি দিন। আমার দেহ হৃষ্টপুষ্ট। আমার দেহের মাংস পেলে দেবী তুষ্ট হবেন। এই লোকটির মুক্তির বিনিময়ে আমি আমার এ দেহ দান করছি।

এই বলে রাজা সেই লোকটিকে মুক্ত করে নিজে দেবীর বেদীর সামনে গিয়ে নিজের হাতে খড়্গ নিয়ে নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হলেন। তখন দেবী আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, হে মহাসত্ত্ব, তোমার পরোপকারিতা দেখে তুষ্ট হয়েছি। বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে আজ হতে এই নরবলিপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করো।

দেবী 'তথাস্তু' বলে অন্তর্ধান হলেন।

উপস্থিত সকলেই একবাক্যে পরহিতব্রতী রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। রাজা তখন তাদের কাছে অনুমতি নিয়ে নিজের নগরে ফিরে এলেন।

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজাকে বলল, যদি আপনার এই রকম পরোপকারিতা গুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

উনত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে আবার বসতে গেলে আর একটি পুতুল আর একটি গল্প বলল। বলল, এই গল্পটি আগে শুনুন।

একদিন রাজসভায় রাজকুমারদের সঙ্গে বসেছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। এমন সময় এক স্তুতিকার এসে বলল, মহারাজ, যতদিন গঙ্গানদী প্রবাহিত হতে থাকবে, যতদিন আকাশে সূর্য কিরণ দেবে, যতদিন সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গদেশে হীরক, ইন্দ্রনীল, স্ফটিক প্রভৃতি শিলা শোভা পাবে ততদিন আপনি পুত্রপৌত্রাদিসহ সুখে রাজত্ব করুন।

এইরূপ আশীর্বাদ করে স্তুতিকার বলল, আমি আপনার খ্যাতি শুনে অনেক দূর থেকে এসেছি। আপনি প্রার্থীদের কাছে কল্পতরুর মত। আপনার খ্যাতি সপ্তসাগর বেষ্টিত সমগ্র ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত। আপনাকে পেয়ে আজ আমার দারিদ্র্যদশা দূর হবে।

স্তুতিকার আরও বলল, আপনাকে দেখে উত্তর দেশে চম্বরী নগরের রাজা ধনেশ্বরের কথা মনে পড়ছে। তিনি অকাতরে দরিদ্রদের ধন দান করতেন। একবার মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীর দিন বসন্তপূজার আয়োজন করেন তিনি। সেদিন অসংখ্য প্রার্থী এসেছিল সেই পূজানুষ্ঠানে। রাজা সেই প্রার্থীদের আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন। সেই রাজার পর উদারতার দিক থেকে আপনিই শ্রেষ্ঠ।

সেই স্তুতিকারের কথা শেষ হতে রাজা বিক্রমাদিত্য কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, এই লোকটিকে কোষাগারে নিয়ে গিয়ে এ যত রত্ন ও মুদ্রা চাইবে তা দিয়ে দাও।

কোষাধ্যক্ষ তাকে তার ইচ্ছামত ধনরত্ন দিলে স্তুতিকার রাজার কাছে এসে বলল, হে রাজন, আপনার দানে আজ আমি ঐশ্বর্যবান হলাম। আপনি সত্যিই তুলনার অতীত। আপনি ব্রহ্মার মত দীর্ঘজীবী হোন।

এই বলে সেই স্তুতিকার চলে গেল।

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার এমন উদারতা ও দানশীলতা থাকে তাহলে আপনি এ সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ আশ্চর্যান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল এক গল্প বলল।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসে ছিলেন। এমন সময় রাজসভায় এক যাদুকর এসে তার যাদুবিদ্যা দেখাতে চাইল। সে বলল, অনেক ঐন্দ্রজালিক তাদের কলাকৌশল দেখিয়েছে আপনাকে। আপনি নিজেও সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী। আজ আমাকে অনুমতি দিন, আমি একটি বুদ্ধির খেলা দেখাব।

রাজা বললেন, আজ সময় হবে না। আগামীকাল সকালে তোমার খেলা দেখব।

পরদিন সকালে দীর্ঘকায় অদ্ভুতদর্শন এক বিদেশী এসে প্রণাম করল রাজাকে। তার মুখে ছিল এক বিরাট দাড়ি ; হাতে ছিল এক বিরাট খড়্গ। তার সঙ্গে ছিল একটি সুন্দরী নারী।

সভায় উপস্থিত রাজপুরুষেরা তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে বিদেশী, কোথা থেকে আসছেন আপনি ?

বিদেশী বলল, আমি আগে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচারক ছিলাম। আমি শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে এসেছি। আমার সঙ্গে যে নারীকে দেখছেন তিনি আমার স্ত্রী। এখন স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের মহাযুদ্ধ বেধেছে। সুতরাং আমি সেখানে যাচ্ছি। শুনেছি রাজা বিক্রমাদিত্য পরস্ত্রীদের নিজের বোনের মত দেখেন। তাই তাঁর কাছে আমার স্ত্রীকে রেখে যেতে চাই।

তার কথা শুনে রাজাও বিস্মিত হলেন।

লোকটি এবার তার স্ত্রীকে রাজার কাছে রেখে খড়্গের উপর ভর করে আকাশে চলে গেল। আকাশ থেকে মার মার শব্দ আসতে লাগল।

সভার সকলে কৌতূহলী হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ থেকে একটি রক্তমাখা খড়্গ ও রক্তাক্ত একখানি হাত রাজসভার মাঝখানে এসে পড়ল।

এই দৃশ্য দেখে সভার সকলে বলল, এই নারীর স্বামীই নিশ্চয় দেবাসুরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তাই খড়্গ আর হাত এসে পড়ল।

এই সময় একটি ছিন্ন মুণ্ড ও মুণ্ডহীন দেহ এসে রাজসভায় পড়ল। তখন সেই বিদেশীর স্ত্রী বলল, আমার স্বামী যুদ্ধে শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর দেহের কাটা অঙ্গগুলিই তার প্রমাণ। আমিও আমার স্বামীর সহগামিনী হতে চাই। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলে সে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়।

এই বলে রাজার অনুমতি নিয়ে স্বামীর শবসহ সহমরণের জন্য চিতার আগুনে ঝাঁপ দিল সেই স্ত্রীলোকটি।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল।

পরদিন যথাসময়ে রাজা রাজসভায় বসলে সেই বিশালকায় লোকটি খড়্গ হাতে এসে কল্পবৃক্ষের ফুল দিয়ে গাঁথা একটি মালা পরিয়ে দিল রাজার গলায়। মধুকরেরা মধু খাচ্ছিল মালার উপর বসে। তারপর যুদ্ধের বর্ণনা দিতে লাগল লোকটি।

এরপর লোকটি বলল, যুদ্ধশেষে দেবরাজ ইন্দ্র আমায় বললেন, হে বীর, তোমাকে আর মর্ত্যে থাকতে হবে না। তোমার শাপের ফল শেষ হয়েছে। আমি তখন তাঁকে বললাম, আমার স্ত্রীকে আমি মর্ত্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে রেখে এসেছি। আমি তাকে নিতে এসেছি। এখন হে রাজন, আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিন। আমি স্বর্গে চলে যাই।

তার কথা শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সভাসদরা বলল, তোমার স্ত্রী মৃত্যু-বরণ করেছে।

লোকটি তার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাজা ও উপস্থিত সকলে চুপ করে রইলেন। কি উত্তর দেবেন তা খুঁজে পেলেন না। এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কেউ কখনো দেখেননি তাঁরা।

অবশেষে লোকটি বলল, হে রাজন, লোককল্প মহাক্রম। আপনি ব্রহ্মার মত দীর্ঘজীবী হোন। আমিই সেই ঐন্দ্রজালিক। আমার ইন্দ্রজালবিদ্যার নৈপুণ্য দেখালাম আপনাদের।

সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

এমন সময় কোষাধ্যক্ষ এসে রাজাকে জানাল, পাণ্ডরাজ্যের রাজা কর হিসাবে প্রচুর ধনরত্ন পাঠিয়েছেন।

কি পাঠিয়েছে রাজা বিক্রমাদিত্য তা জানতে চাইলে কোষাধ্যক্ষ বলল, আটকোটি স্বর্ণমুদ্রা, তিরানব্বই কোটি মুক্তার ভার, পঞ্চাশটি হাতি ও তিনশত অশ্ব।

রাজা আদেশ দিলেন, ঐ সব কিছুই এই ঐন্দ্রজালিককে দিয়ে দাও।

কাহিনীশেষে পুতুল ভোজরাজকে বলল, এমন দানশীলতাগুণ যদি আপনার থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ মাথা নত করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল তাঁকে আর একটি গল্প বলল।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় এক দিগম্বর সন্ন্যাসী এসে রাজার হাতে একটি ফল দিল। তারপর রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, হে রাজন, আমি অগ্রহায়ন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন মহাশ্মশানে হোম করব। আপনি মহাসত্ত্বশলী পুরুষ। আমার ইচ্ছা আপনি আমার উত্তরসাধক হোন। সেই শ্মশানের নিকটে একটি শমীবৃক্ষে এক বেতাল বাস করে। অতি সন্তর্পণে তাকে আপনি নিয়ে আসবেন।

রাজা সন্ন্যাসীকে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সন্ন্যাসী শ্মশানে হোম শুরু করল। রাজাও ঠিক সময়েই গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। সন্ন্যাসী রাজাকে শমীবৃক্ষটি দেখিয়ে দিল।

রাজা বেতালকে কাঁধে নিয়ে যখন নীরবে শ্মশানের দিকে আসছিলেন তখন বেতাল বলল, হে রাজন, পথশ্রম দূর করার জন্য একটি গল্প বল।

রাজা কিন্তু কোন কথা বললেন না। সন্ন্যাসী তাঁকে মৌন থাকতে বলেছিল।

বেতাল বলল, বুঝেছি, মৌনভঙ্গের ভয়ে তুমি কথা বলছ না। বেশ,

আমিই গল্প বলছি। তবে আমার গল্প শেষ হলেও তুমি যদি মৌনভঙ্গ না করো তাহলে তোমার মস্তক শতখণ্ড হবে।

এরপর তার গল্প আরম্ভ করল বেতাল।

হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যবতী নামে এক সুরম্য নগরী আছে। যেখানে সুবিচারক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল ময়সেন।

একদিন রাজপুত্র ময়সেন বনে শিকার করতে গিয়ে একটি হরিণের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেলে।

অনেক কষ্টে বন থেকে বেরিয়ে একটি নদীর ধারে যেতে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলো রাজপুত্রের।

রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে বলল, হে বিপ্র আমি পিপাসার্ত, আপনি আমার অশ্বটি একটু ধরুন। আমি নদী থেকে জলপান করে আসি।

ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে বলল, আমি কি তোমার চাকর নাকি যে একথা বললে আমায়?

রাজপুত্র তখন রাগের মাথায় ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করল।

ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে রাজার কাছে অভিযোগ করতেই রাজা রাজপুত্রকে নির্বাসনদণ্ড দিলেন।

মন্ত্রী রাজাকে বলল, রাজপুত্র সুখে মানুষ হয়েছে। তাকে গুরুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়।

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণদের পূজা করাই শাস্ত্রবিধি। কিন্তু রাজপুত্র হয়েও যে হাতে ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করেছে সে হাত কেটে ফেলা উচিত।

মন্ত্রী তাতে অসম্মত হলে রাজা নিজেই রাজপুত্রের হাত কাটতে উদ্যত হলেন। তখন সেই অভিযোগকারী ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন, হে রাজন। রাজপুত্র অজ্ঞানতাবশতঃ এই অন্যায় কাজ করেছে। আর একাজ কখনো করবে না। আমার একান্ত অনুরোধ আপনি তাকে ক্ষমা করুন।

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা ক্ষমা করলেন রাজপুত্রকে। ব্রাহ্মণ চলে গেল যথাস্থানে।

গল্প শেষ করে বেতাল প্রশ্ন করল রাজাকে, রাজা এবং ব্রাহ্মণ—এই দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন রাজাই শ্রেষ্ঠ।

বেতাল রাজার উপর প্রসন্ন হয়ে বলল, তুমি শ্মশানে গিয়ে আমার পরামর্শমত সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম কিভাবে করতে হয় শিখিয়ে দিতে বলবে।

সে শুয়ে পড়ে দেখাতে গেলে তুমি তাকে হত্যা করবে। তাহলে অষ্টসিদ্ধি লাভ করবে।

রাজা তাই করলে বেতাল খুশি হয়ে বর দিতে চাইল।

রাজা বললেন, আমি যখনি ডাকব আমার সামনে এসে উপস্থিত হবে তুমি।

বেতাল তাই হবে, বলে চলে গেল। রাজাও স্বস্থানে চলে গেলেন।

পুতুল ভোজরাজকে বলল, এমন সাহস যদি আপনার থাকে তাহলে সিংহাসনে বসুন।

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার চেষ্টা করলে শেষ পুতুলটি বলল, হে রাজন, এই সিংহাসনে একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য বসার যোগ্য। তাঁর মত গুণবান রাজা সারা পৃথিবীতে আর একজনও নেই। তিনি দুষ্টের দমনও শিষ্টের পালন করতেন। তিনি বাহুবলে সারা পৃথিবী জয় করে একচ্ছত্র রাজা হয়েছিলেন। তিনি অকাতরে দরিদ্রদের ধনদান করে সকলের দারিদ্র্য মোচন করেন।

হে রাজন, আপনি ত রাজা বিক্রমাদিত্যের সকল গুণের কথা শুনলেন। যদি এইসব গুণ আপনার থাকে তাহলেই এই দিব্য সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ মৌন হয়ে থাকায় বত্রিশটি পুতুল সমস্বরে তাঁকে বলল, হে রাজন, আপনিও একজন সাধারণ রাজা নন। আপনারা দুজনেই নারায়ণের অবতার। আপনার মত পবিত্রচরিত্র, কলাবিশারদ ঔদার্য গুণ সম্পন্ন রাজা বর্তমানে আর কেউ নেই। আপনার জন্য আমরা শাপমুক্ত হলাম। আমাদের শাপক্ষয় হলো।

ভোজরাজ তখন তাদের বললেন, তোমাদের শাপের কথা আমায় বল।

পুতুলরা বলতে লাগল, আমরা বত্রিশ দিব্যাঙ্গনা পার্বতীর সখী ছিলাম। দেবী আমাদের সকলকে খুবই স্নেহ করতেন। আমাদের নাম মিশ্রকেশী, প্রভাবতী, সুপ্রভা ইন্দ্রসেবা, সুদতী, অনঙ্গনয়না, কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতী, কামকলিকা, চণ্ডিকা, বিদ্যাধরী, প্রজ্ঞাবতী, জনমোহিনী, বিদ্যাবতী, নিরুপমা,

হরিমধ্যা, অসসুন্দরী, বিনাসবসিতা, শৃঙ্গারকণিকা, মম্মনজ্জীবনী, রতিলীলা, মদনবতী, চিত্ররেখা, সুরতগহ্বরা, প্রিয়দর্শনা, কামোন্মাদিনী, সুখসাগরা, শশীকলা, চন্দ্ররেখা, হংসগামিনী, কামরসিকা, ও উন্মাদিনী।

একদিন মহেশ্বর আমাদের দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকালে তা দেখে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন আমাদের উপর। তিনি আমাদের অভিশাপ দিলেন, তোরা পুতুল হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের শোভা বৃদ্ধি করবি।

আমরা তখন ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে এই শাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলাম।

দেবী তখন বললেন, এক সময় রাজা বিক্রমাদিত্য যেই সিংহাসনে উপবেশন করবেন। পরে রাজা ভোজরাজ ঐ সিংহাসনে উপবেশন করতে গেলে তোদের মুখ থেকে একে একে বিক্রমাদিত্যের অশেষ গুণ ও দানশীলতার কথা শুনবে এবং তখনই তোরা শাপমুক্ত হবি।

এই বলে ভোজরাজের অনুমতি নিয়ে শাপমুক্ত পুতুলগুলি স্বস্থানে চলে গেল।

এর পর ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর একটি মন্দির নির্মাণ করে অষ্টদলের উপর শিব পার্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন সেই থেকে প্রতিদিন ভক্তিভরে ষোড়শোপচারে তাঁদের পূজা করতেন তিনি।

তিনি ধর্মানুসারে প্রজাশাসন ও রাজ্যশাসন করতেন। তাঁর ধর্মে নিষ্ঠা দেখে পরম পরিতুষ্ট হন দেবী পার্বতী।

॥ সমাপ্ত ॥